প্রেমচন্দ
গল্প সংগ্রহ
৮-ম খণ্ড

॥ সম্পাদক মণ্ডলী ॥

অধ্যাপক সুশীল কুমার ধর

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

রাখালচন্দ্র চৌধুরী

অনঙ্গমোহন ঘোষ

॥ অনুবাদ ॥

শীলা চৌধুরী

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সুব্রত সরকার

যুব প্রকাশনী

২০৬, বিধান সরণী

(শ্রীমাণি বাজার, দ্বিতল)

কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

মমতা

দিল্লী শহরের বাবু রামরক্ষা দাস একজন ঐশ্বর্যশালী ব্যবসায়ী। বড় ঠাট্‌-বাটে দিন কাটান। বাড়ীতে শহরের বড়-বড় আমীর-ওমরাহগণের যাতায়াত। অতিথি আপ্যায়নে রামরক্ষাবাবুর কোন ত্রুটী নেই। শহরের অধিকাংশ লোকেরই তিনি পরিচিত। প্রায় প্রতিদিনই বন্ধুরা জমায়েৎ হয়ে তাঁর বাড়ী আনন্দ-মুখর করে তোলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ খেলেন টেনিস, কেউ কেউ তাস, আবার কেউ হারমোনিয়াম বাজিয়ে সুমধুর গান শোনান। চা আর পান তাঁদের বেশ উৎসাহ যোগায়, এর বেশী তাঁদের আর কী দরকার? রামরক্ষাবাবু এইভাবেই মানবসেবা করতে ইচ্ছুক এবং এটাকেই তিনি অমূল্য সেবা বলে মনে করেন। সমাজে পিছিয়ে পড়া নীচু সম্প্রদায়ের মানুষদের উন্নতির জন্যে তখন দিল্লীতে একটি সোসাইটি গড়ে ওঠে। বাবু সাহেবই সেই সোসাইটির সেক্রেটারী। নিষ্ঠা ও অসাধারণ উৎসাহে তিনি নিজের কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর বাড়ীর বৃদ্ধ ভারী একবার অসুখে পড়লে খ্রীশ্চান মিশনের এক ডাক্তার তার সেবা-যত্ন করেন। পরে সে মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রী নিরুপায় হয়েই অবশেষে খ্রীশ্চান সমাজে আশ্রয় নেয়। ওদিকে বাবুসাহেব সোসাইটির পক্ষ থেকে একটা রেজুলেশন পাশ করিয়ে রেখেছেন। সোসাইটির সদস্যগণ জানতেন যে, বাবু সাহেব এর বেশী আর কী করবেন? তাঁর কিছু করার মনোভাবই বা কোথায়?

মিস্টার রামরক্ষা দাসের মানব-সেবা মুলক কাজ এই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। তাঁর আরও একটা গুণ আছে, সামাজিক কু-প্রথা ও অন্ধ বিশ্বাসকে তিনি আমলই দেন না বরং বলা যায় ঘোর শত্রু। হোলীর দিনে চামার আর ভারীর দল নেশা ক'রে যখন পাড়ায় পাড়ায় ফাগ ছড়িয়ে, ফাগ মেখে, খঞ্জনি বাজিয়ে, গান গেয়ে নগর পরিক্রমা করে, তখন তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে যান। জাতির মূর্খামী দেখে তাঁর চোখে জল আসে। তিনি মনে করেন যে, কু-রীতি নিবারণের পক্ষে তাঁর হাণ্টারই হয়তো প্রকৃত ওষুধ। তাঁর বক্তৃতা অপেক্ষা হাণ্টারের জোরই বেশী। তাই একবার দিল্লীতে হোলীর দিন নেশা করে গান গাওয়ার অপরাধে বেশ কয়েক হাজার লোক তাঁরই চেষ্টায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়। সেই দিনই বেশ কয়েক শো বাড়ীতে হোলীর আনন্দ-কোলাহল পরিবেশের পরিবর্তে মহররমের শোকার্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অন্য দিকে তাঁর বাড়ীর সামনে হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ তাঁর কৃপা প্রার্থনায় বসে বসে কাঁদছে। বাবু সাহেবের হিতৈষী বন্ধুরা তখনও তাঁর উদারশীল চরিত্র আর সদ্ব্যবহারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বাবু সাহেব এমন সাজগোজ করে চলাফেরা করেন যে, তা দেখে "প্যারিসের" পরীরাও হিংসা করবে। তাঁকে দেখে মনে হয়, ভালই ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স আছে। ব্যবসা করার বাসনায় বেশ কয়েকটা দোকানও খুলেছেন এবং তা দেখাশোনা করার লোকও আছে। তাঁর নিজের দেখার সময় কোথায়? অতিথি-সেবা তাঁর একটা পবিত্র ধর্ম। সেই জন্যে প্রায়ই বলেন—অতিথি-সেবা ভারতের আদিকাল থেকে চলে আসছে। ভারতবাসী মাত্রই এটাকে একটা প্রধান ও পবিত্র ধর্ম বলে মনে করা উচিত। অন্যান্য দেশও জানে যে অভ্যাগতদের আদর সম্মান করতে আমরা অদ্বিতীয়। তাই বিশ্বে আমরা প্রকৃত মানুষ হিসাবে পরিচিতি হলেও দিনের পর দিন সব কিছু নষ্ট করে ফেলেছি। এমন একদিন আসবে, যেদিন আমাদের মধ্যে এই গুণটা শেষ হয়ে যাবে। তখন হিন্দু-জাতির লজ্জা, অপমান আর আত্মহত্যা ঢাকবার পথ থাকবে না।

মিস্টার রামরক্ষা দাস শুধু দেশসেবা ও জনসেবাই করেন না, দেশের অন্যান্য কাজেও অংশ নেন, যেমন—সমাজ সেবামূলক কাজ ও রাজনৈতিক কাজ। সুবক্তা বলে প্রতি বছর দু'তিনবার দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক বক্তৃতা দেন। উপস্থিত জনগণ এবং বন্ধুবর্গ তাঁর বক্তৃতা শুনে প্রশংসা-সূচক শব্দে ধ্বনি দেন আর হাততালি বাজান। ফলে, বাবু সাহেবের বক্তব্য স্থির না থেকে শেষে অস্থির হয়ে ওঠে। বক্তৃতা শেষে বন্ধুরা তাঁকে কাঁধে তুলে নাচান। কেউ কেউ আবার জড়িয়ে ধরেন, আবার কেউ বলেন—সত্যি ভাই, তোর ভাষায় জাদু আছে। বাবু সাহেব প্রশংসা শুনে আনন্দে আত্মহারা হন। তাঁর যশ ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট, আত্মীয় বন্ধু কম নেই, সব কাজেই তিনি অংশ নেন, অর্থাৎ তিনি একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি। মুস্কিল হলো, তাঁর পিতার মৃত্যুর পর বিধবা মা তাঁর সঙ্গে এক সংসারে থাকতে পারলেন না। কারণ, জাতীয় সেবা কার্যে তাঁর স্ত্রী তাঁর বিশেষ সহযোগী। ছেলে ও পুত্র বধূর আচরণ বিধবা মায়ের মনঃপুত নয়, তাই সংসারে থাকা অসম্ভব। গৃহ বধূর স্বাধীনচেতা ভাবটা তাঁকে অসহ্য করে তোলে। তাছাড়া শাশুড়ীর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করতে হয়, সংসারে গুরুজনদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয়, সে শিক্ষা বউ পায় নি। তাই, বাবু রামরক্ষা স্ত্রীকে নিয়ে মায়ের কাছ থেকে আলাদা থাকেন। শুধু তাই নয়, মায়ের নামে ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা স্থায়ী আমানতও করে দিলেন, যাতে সুদের টাকায় তাঁর ভালভাবে চলে যায়। মা ছেলের আচরণে মোটেই খুশী নন, তাই দিল্লী ত্যাগ করে অযোধ্যায় গিয়ে বসবাস করছেন। তিনি আজও সেখানেই আছেন। রামরক্ষা বাবু স্ত্রীকে লুকিয়ে মাঝে মাঝে মাকে দেখতে অযোধ্যায় যান। মা দিল্লীতে আসেন না বটে, তবে যে কোন উপায়ে ছেলের সংবাদ নেবার চেষ্টা করেন।

দুই

দিল্লীতে অন্য আর এক অঞ্চলে গিরিধারীলাল নামে এক শেঠজী থাকেন। তাঁর লক্ষ টাকার লেন দেন। কারণ, তাঁর হীরে আর রত্নের ব্যবসা। বাবু রামরক্ষা হলেন তাঁর দূর সম্পর্কের এক ভায়েরা ভাই। প্রাচীন পন্থী, সকালে যমুনাথ যমুনায় স্নান সেরে নিজের হাতে গো-সেবা করেন। স্বভাবে মিষ্টার দাসের মত নন। রামরক্ষা বাবুর যখনই টাকার দরকার হয়, তখনই শেঠজীর কাছে বিনা দ্বিধায় পেয়ে যান। আত্মীয়ের মধ্যে ব্যাপার, তাই চার আঙুল কাগজের একটা চিঠিতেই কাজ মিটে যায়। কোন দলিলের প্রয়োজন নেই, স্ট্যাম্প লাগে না, সাক্ষীরও প্রয়োজন হয় না। একবার ট্যাক্সী কেনার জন্যে দশ হাজার টাকার দরকার হলো, ব্যাস, সেখান থেকেই এসে গেল। ঘোড়-দৌড়ের মাঠে এক অষ্ট্রেলিয়ান ঘোড়া দেড় হাজার টাকায় মিললো। সে টাকাও শেঠজীরই। দেখতে দেখতে প্রায় বিশহাজার টাকা ধার হয়ে গেল। শেঠজী সরল-স্বভাবের লোক। তিনি মনে করেন, বাবু সাহেবের দোকানগুলো তো রয়েছে, আর ব্যাঙ্কেও তো টাকা আছে। প্রয়োজন হলেই টাকা উসুল করে নেবো। দু'তিন বছর পর ধার শোধ করার আগ্রহের চেয়ে বেশী ধার করার আগ্রহ দেখে শেঠজীর কেমন যেন সন্দেহ হয়। তাই তিনি একদিন রামরক্ষাবাবুর বাড়ীতে এসে সবিনয়ে বললেন—ভাই সাহেব আমার টাকাগুলো এবার সব দিয়ে দাও। তোমার হিসেব করা থাকলে ভালই হয়। এই বলে তিনি হিসেবের কাগজ পত্রের সঙ্গে চিঠিগুলোও বের করলেন।

মিস্টার রামরক্ষা বন-ভোজনে যাবেন বলে তৈরী হচ্ছেন। তাই বললেন—দেখুন, কিছু মনে করবেন না। এখন বড্ড তাড়া আছে, বেরুচ্ছি এক জায়গায়। ভয় নেই, হিসেব করে ফেলবো। এত তাড়াতাড়ি কেন?

রামরক্ষাবাবুর কথা শুনে গিরিধারীলালের রাগ হয়। বললেন—ভাই, তোমার তাড়াতাড়ি না থাকতে পারে, কিন্তু আমার তো আছে। মাসে দু শো' টাকা করে ক্ষতি হচ্ছে, তা জানো? মিস্টার রামরক্ষা বিরক্ত হয়ে ঘড়ির দিকে তাকান। সময় খুবই অল্প। তাই বিনীতভাবে বলেন—দাদা, আপনি বুঝতে পারছেন না, আমি এখন খুবই ব্যস্ত। কালই আপনার বাড়ীতে গিয়ে সব মিটমাট করে দিয়ে আসবো।

শেঠজী শহরের একজন মানী ও ধনী ব্যক্তি। তাই, রামরক্ষাবাবুর কুরুচিপূর্ণ ব্যবহারে অত্যন্ত চটে যান, মনে মনে জ্বলতে থাকেন। ভাবেন, ওর চেয়ে আমি ধনে, মানে, সম্পদে অনেক বড়। আমি ওর মহাজন। ইচ্ছে করলে ওকে চাকর রাখতে পারি। আমার মত লোক ওর ঘরে এসেছে, এটাই ওর সৌভাগ্য। অভদ্র, একটু আপ্যায়ন করতেও জানে না? নাকি, এটা ইচ্ছাকৃত? একটা পানও খাওয়াতে পারলো না? নাকি, পান খাওয়ানোর যোগ্য বলেও মনে করে না? তাই মেজাজ দেখিয়ে বললেন—কালই সমস্ত পাওনা মিটিয়ে আসবে!

রামরক্ষাবাবুও গম্ভীর স্বরে উত্তর দেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে।

শেঠজী বাড়ীতে আসায় রামরক্ষাবাবু মনে-মনে বলতে লাগলেন—শয়তানটার জন্যে আজ আমার মান-সম্মান ধুলোয় মিশে গেল। শেষ পর্যন্ত আমাকে অপমান করে গেল? আচ্ছা, আমিও দিল্লীতে থাকি, তোমাকে একবার দেখে নেবো। মন বিক্ষিপ্ত হওয়ায় এবং নানারকম চিন্তার উদয় হওয়ায় তাঁর বনভোজনে আর যাওয়া হলো না। তাই, পোষাক পরিবর্তন করে চাকরকে বললেন—যাতো মুন্সীজীকে ডেকে নিয়ে আয়। মুন্সীজী এলেন। হিসেব দেখালেন। তারপর ব্যাঙ্কের একাউন্টস্ দেখলেন, কিন্তু যা ভেবেছিলেন তাই হলো, চোখে সরষের ফুল দেখেন। অনেক কিছু ভেবে ছিলেন, কিন্তু কিছুই হলো না। অবশেষে নিরাশ হয়ে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে শুয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। দোকানের মালপত্র বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু সবই ধারে, যদিও নগদে কিছু বিক্রি হয়, সে টাকা চোখে দেখা যায় না। কলকাতার আড়ত দারদের কাছ থেকে যে সব মাল এসেছে, তার টাকা দেওয়ার দিন উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু হাতে টাকা নেই। দোকানগুলোর এই অবস্থা, ব্যাঙ্কের অবস্থা আরও খারাপ। রামরক্ষাবাবু সারারাত বিছানায় ছট্‌ফট করেন। ভাবেন, কী করা যায়? তাঁর মন বলে—সত্যি কথা বলতে কি, গিরিধারীলাল সত্যিই একজন সজ্জন ব্যক্তি। তাঁকে আমার সমস্ত দুঃখের কথা যদি বলি, তাহলে হয় তো তিনি সবই মুকুব করে দেবেন, কিন্তু সে কাজ আমি করবো কেন? সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তায় মুচরে পড়েন, যেন কোন পিছিয়ে পড়া ছাত্রের পরীক্ষার দিন আগত। সকালে বিছানা ছেড়ে উঠলেন না। হাত-মুখ ধুয়ে কিছুই খেলেন না। তাঁর দুঃখের কথা বলার মত কাউকে পাচ্ছেন না। একটা ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আর একটা ঝামেলা এসে পড়তে পারে, এই ভেবে তিনি কোন বন্ধুকেও তাঁর দুঃখের কথা জানান নি। দুপুর হয়, তখনো তিনি একইভাবে বিছানায় শুয়ে। এমন সময় তাঁর ছোট ছেলে ডাকতে এসে বলে—ডাডি, আজ তুমি খেতে গেলে না কেন?

"কি কেয়েছো?"

"মিষ্টি!"

"আল কি কেয়েছো?"

"মার!"

"কে মেলেছে?"

"গিরিধারীলাল!"

মায়ের কথা শুনে বাচ্চাটি কাঁদতে কাঁদতে ঘরের ভেতরে যায় এবং সেখানে গিয়ে গলা ছেড়ে কাঁদে। শেষ পর্যন্ত দুধ ও মিষ্টি দিয়ে তার কান্না থামাতে হয়।

তিন

রোগীর বাঁচবার যখন আর আশা থাকে না, তখন ওষুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দেওয়া হয়। মিস্টার রামরক্ষারও তাই হলো। বিকাল পর্যন্ত তিনি বিছানায় আপাদ-মস্তক ঢেকে পড়ে রইলেন। সন্ধ্যায় আলো জ্বললে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন এবং শুকনো মুখে হাজির হলেন শেঠজীর বাড়ীতে। শেঠজীকে সবিনয়ে বললেন—দাদা, কিছু মনে করবেন না, আপনার হিসেবের টাকা আমি এখন দিতে পারছি না।

শেঠজী অবাক হয়ে বলেন—কেন?

মিস্টার দাস—আমি এখন একেবারে গরীব হয়ে গেছি, যাকে বলে কপর্দ্দক শূন্য। আপনি আমার কাছ থেকে অন্য যে কোন উপায়ে টাকা শোধ করে নেবেন।

শেঠজী—এ তুমি কীরকম কথা বলছো ভাই?

মিস্টার দাস—কেন, সত্যি কথাই তো বলছি!

শেঠজী—দোকান গুলো কী হলো?

মিস্টার দাস—দোকানে কিছুই হয় না।

শেঠজী—ব্যাঙ্কের টাকা?

মিস্টার দাস—সে কবে শেষ হয়ে গেছে!

শেঠজী—তাহলে সব দিক ফাঁকা করে আমাকে পথে বসাতে এসেছো?

মিস্টার দাস—(গর্বের সঙ্গে) আমি আপনার উপদেশ শুনতে আসিনি। যা পারেন করবেন।

এই বলে মিস্টার রামরক্ষা শেঠজীর বাড়ী থেকে চলে এলেন। শেঠজী পরদিনই কোর্টে নালিশ করলেন। কিছু দিন পরে কোর্টের রায় বেরুলো যে, বিশ হাজার টাকা আসল এবং পাঁচ হাজার টাকা তার সুদ বাবদ রামরক্ষাবাবুকে দিতে হবে। তাই তাঁর বাড়ী নীলাম হলো। পনের হাজার টাকার জায়গা পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। দশ হাজার টাকার ট্যাক্সী বিক্রি হয় চার হাজার টাকায়। এত সব বিক্রি করে মাত্র ষোল হাজার টাকা শোধ হয়। রামরক্ষাবাবু মাথা গোঁজার ঠাঁই পান না। তখনো তাঁর দশ হাজার টাকার ঋণ পড়ে আছে। অন্য দিকে তাঁর মান-সম্মান, ধন-দৌলত সবই ধুলোয় মিশে গেছে। এত বড় জনপ্রিয় ব্যক্তির যে কী দশা হয়েছে, তা দেখলে দর্শকের চোখে জল এসে যাবে।

চার

এই ঘটনার কিছুদিন পর দিল্লী পৌর সভার নির্বাচন পর্ব শুরু হয়। নির্বাচনের যারা প্রধান ব্যক্তি, সেই ভোটারদের বাড়ীতে চলে তোষামোদ ও মনোরঞ্জন। দালালদের

সৌভাগ্য, ভোটের জন্যে চলে টাকার খেলা, প্রার্থীদের হিতৈষীরা পাড়ায় পাড়ায় গুণগান করে বেড়ান, এই ভাবে চারদিক হৈ-হৈ আর রৈ রৈ ব্যাপার। একদিন এক উকিল বিরাট জনসভায় এক ভোট প্রার্থীর পক্ষে বললেন—"আমি এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না যে ইনি একেবারে সাধারণ মানুষ। কারণ, এর মধ্যে যথেষ্ট অসাধারণত্ব দেখতে পাওয়া যায়। জানেন, ফরচন্দ আকবরের বিয়ের সময় ইনি নিজে পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করেন।"

উপস্থিত জনগণ উচ্চৈঃস্বরে তাঁর জয়ধ্বনি দেন।

আর একবার কোন অঞ্চলে ভোটারদের সামনে একজন প্রার্থীর প্রশংসা করে বলা হলো—

"আমি এটা বলতে চাইনা যে, আপনারা শেঠ গিরিধারীলালকে ভোট দিয়ে মেম্বার করুন। আপনারা আপনাদের ভালমন্দ যথেষ্ট বোঝেন, তাই শেঠজী সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু বলতে চাই না, তাছাড়া তিনিও প্রসংশার কাঙাল নন। আমি শুধু একটা নিবেদন রাখবো যে, আপনারা যাকে ভোট দেবেন, তাঁর দোষ-গুণ ভাল করে বিচার করবেন। আমি জানি দিল্লীতে একটাই মানুষ আছেন, যিনি গত দশ বছর ধরে আপনাদের সেবা করে আসছেন। জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট, মন্দির-সংস্কার, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এসব কিছুরই তিনি সুব্যবস্থা করার চেষ্টা করে আসছেন। তিনিই হলেন শ্রীমান বায়সরায় মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র। আশাকরি আপনারা সবাই তাঁকে চেনেন।

সভায় সকলেই হাততালি দিয়ে উঠে।

শেঠ গিরিধারীলালের পাড়ায় আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী মুন্সী ফৌজুল রহমান খাঁ ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিরাট জমিদার এবং বিখ্যাত উকিল। বাবু রামরক্ষা নিজের দৃঢ়তা, সাহস, বুদ্ধিমত্তা আর মৃদু ভাষণের দ্বারা মুন্সীজীকে জেতাবার সংকল্প নিয়েছেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য শেঠজীকে হারানো। তাই, দিনরাত পরিশ্রম করছেন। নির্বাচক মণ্ডলী তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্যে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করে থাকেন। একদিন এক সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে রামরক্ষাবাবু বললেন—"আমি হলফ করে বলতে পারি যে, মুন্সী ফৌজুল রহমানের চেয়ে উপযুক্ত প্রার্থী দিল্লীতে আর দুটি নেই। তিনি শুধু উকিল নন, তিনি একজন লেখক গান রচনা করেন। তাঁর নাম আজ সবার মুখে মুখে। এই রকম একজন মহান ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে আমরা আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্ত্তব্য পালন করতে পারি। অত্যন্ত দুঃখের কথা, অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা জাতির নামে পবিত্র কাজ করবেন এই ভাঁওতা দিয়ে টাকা পয়সা ব্যক্তিগতভাবে খরচ করেন। শ্রীমান বায়সরায় এ অঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত ধনী ব্যক্তি। তাঁর ছেলে দেশের কাজ কতটুকু করবেন, তা আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন। তিনি একজন পাক্কা সুদখোর, বেইমান,

স্বার্থপর এবং পরিপূর্ণ ভাবে একজন নির্দয়ী পুরুষ। তিনি জন্ম থেকে ভোগ-বিলাসের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন। তাঁর পক্ষে দেশ সেবা করা কি কখনও সম্ভব হবে?"

পাঁচ

শেঠ গিরিধারীলাল রামরক্ষাবাবুর অন্যায় অসঙ্গতিপূর্ণ বক্তৃতার কথা শুনে রাগে জ্বলতে থাকেন। মনে মনে বলেন কী, আমি বেইমান? সুদখোর? অগাধ সম্পত্তির মালিক? আমার কাছ থেকে উপকার পেয়ে আমারই দুর্নাম ছড়াচ্ছো? ঠিক আছে, এর বদলা আমি নেবোই! আমি যে ভাবে চাইবো, সেই ভাবেই তোমাকে নাচাতে পারি, তা জানো? তুমি জানো না, ঘুমন্ত বাঘকে জাগিয়ে তুলেছো! অন্যদিকে রামরক্ষাবাবুও খুবই তৎপর। অবশেষে ভোটের দিনটি এসে গেল। মিস্টার রামরক্ষার উদ্যোগ সফল হবে বলে অনেকেই আশা করছেন। আজ তিনি বড় প্রসন্ন। তাঁর মনোবাসনা যে গিরিধারীলালকে আজ একটা শিক্ষা দিতে হবে। আজ তাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে সংসারে একমাত্র ধনসম্পত্তি সবকিছু নয়। ফৈজুল রহমান ভোটে জয়লাভ করলে তাঁর সামনে আমি হাততালি বাজাবো, দেখতে হবে তাঁর মুখের ভাবটা কেমন হয়, মনে হয় মুখ তুলে তাকাতেই পারবে না। এই রকম ভেবে নিয়ে প্রসন্নচিত্তে তিনি দুপুর বেলায় হাজির হলেন টাউন হলে। উপস্থিত লোকেরা তাঁকে উল্লাসের সঙ্গে স্বাগত জানান। খানিক পরে ভোট দান শুরু হয়।

ভোট প্রার্থীরা ভাবনা চিন্তার মধ্যে আছেন। কারণ, ভোটের ফলাফল কী হবে কে জানে! সন্ধ্যা ছ'টার সময় চেয়ারম্যান ভোটের ফলাফল শোনালেন। শেঠজী নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন, জয়লাভ করেছেন ফৈজুল রহমান। ভোটের ফলাফল শুনে রামরক্ষা-বাবু মাথার টুপিটা খুলে বার বার আকাশের দিকে ছুড়ছেন আর আনন্দে তিনিও নাচছেন। সারা অঞ্চলটা জয়ধ্বনিতে মুখরিত। দিল্লীর চাঁদনীচক থেকে শেঠজীকে হারানো বড় কঠিন কাজ। শেষ পর্যন্ত শেঠজী যা ভেবেছিলেন তা হলো না। তিনি মুচরে পড়লেন। দুঃখে ও লজ্জায় নির্বাক হয়ে যান। এমন সময় এক উকিল সাহেব তাঁকে সহানুভূতি দেখাবার উদ্দেশ্যে বললেন—শেঠজী, আপনি পরাজিত হওয়ায় আমি খুবই মর্মাহত হয়েছি! আগে যদি জানতাম, মুন্সীর অবস্থা ভাল, তাহলে আমি এখানে আসতাম না, আমি আপনার কথা ভেবেই এসেছি। নির্বাক শেঠজীর চোখে নদীর বাঁধ ভাঙ্গা জলের মত অশ্রু গড়িয়ে পড়তে চায়। তাই বললেন—উকিল সাহেব, বুঝতে পারছি না কী করে এটা সম্ভব হলো? যাই হোক, যা হবার হয়েছে, আমি মনে করি ভালই হয়েছে। জিতলে অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়, কাজেরও ক্ষতি হয়। আবার অর্থ ক্ষয়ও হয়। সত্যি কথা বলতে কি, এটা আমার পক্ষে সত্যই ভুল হয়েছে। বুঝলেন,

এ সব কাজ বেকারদের পক্ষেই ভাল। কেননা, ঘরে বসে না থেকে একটু বেগার খাটা, আর কি? এতদিন চোখ বন্ধ করে থাকাটাই আমার ভুল হয়েছে। শেঠজী এসব বললে কি হবে, মুখ তাঁর শুকনো, ক্লান্ত, যেন অবসাদ-গ্রস্ত। মুখ হলো মনের আয়না, তাই তাঁর মনের ছবিটা ফুটে উঠেছে মুখের ওপর।

অন্যদিকে বাবু রামরক্ষা বেশীক্ষণ আনন্দ উপভোগ করতে পারলেন না এবং শেঠজীর ব্যবহারের প্রতিশোধও নেওয়া গেল না। কারণ, ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর রামরক্ষাবাবু যখন টাউনহল থেকে খুশীমনে গর্বের সঙ্গে বেরিয়ে আসছেন, ঠিক সেই সময় তিন-চার জন পুলিশ তাঁকে ওয়ারেন্ট দেখিয়ে গ্রেপ্তার করে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গর্ব কোথায় মিলিয়ে যায়। অপর দিকে শেঠজী বড় খুশী। এমনকি আনন্দে হাততালি বাজিয়ে মুখ ঘুরিয়ে কুট হাসি হাসেন। রামরক্ষাবাবুর বাড়া ভাতে যেন ছাই পড়ে।

নির্বাচনে জিতেই মুন্সী ফৈজুল রহমান ভোজ দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। আর ভোজের ব্যবস্থাপকও ছিলেন রামরক্ষাবাবু। তবে, "দাতা দিলে বিধাতা দেন না," অর্থাৎ সবই ভেস্তে যায়। শেঠজী ভালই জানতেন যে, বাবুসাহেবের এমন কোন সহৃদয় বন্ধু নেই, যিনি তাঁর জন্যে দশ হাজার টাকা জামিন হতে পারেন। তাই মেম্বার হওয়ার জন্যে দশ হাজার টাকা খরচ করেও তিনি আজ বড় খুশী।

গ্রেপ্তারের সংবাদে মিস্টার রামরক্ষার বাড়ী স্তব্ধ। স্বামীর গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনে স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান। জ্ঞান ফিরলে শুধু চোখের জল ফেলল। তারপর চলে শেঠজীর উদ্দেশ্যে গালাগাল। দেবদেবীর কাছে করেন তাঁর মরণ কামনা। চলে গঙ্গা-যমুনার মানত। প্লেগ ও অন্যান্য মহামারীকে আহ্বান জানান, যাতে গিরিধারী-লালকে তাড়াতাড়ি গ্রাস করে। মনে মনে বলেন—কিন্তু, শেঠজীর দোষ কোথায়? দোষ তো তোমারই! ভালই হয়েছে! তাঁর তোষামোদ করো গে? যাও, এখন নেমন্তন্ন করে খাওয়াও গে? তোমাকে কত বুঝিয়েছি, কত কেঁদেছি, কত রাগ করেছি, তবু আমার কথায় কান দাওনি। শেঠজী যা করেছে, ভালই করেছে। তোমার শিক্ষা হলো, কিন্তু তোমার দোষ কোথায়? আমারই তো দোষ? এ আগুন তো আমিই লাগিয়েছি। কারণ, মখমলের চটি না হলে আমি চলতে পারতাম না। সোনার বালা না পরে আমি ঘুমাতে পারি নি। আমার জন্যেই তো ট্যাক্সী কিনতে হয়েছিল। ইংরেজী শেখার জন্যে আমিই মেম সাহেব রেখেছিলাম। আমিই তো তোমার পথের কাঁটা!

মিসেস্ রামরক্ষা এইসব চিন্তায় থাকেন ডুবে। রাতে ঘুম না আসায় ছট্‌ফট্ করেন। সকালে সবচিন্তা শেষ হলে গিরিধারীলালকেই একমাত্র আসল দোষী সাব্যস্ত করেন।

সিদ্ধান্তে আসেন, গিরিধারীলাল অত্যন্ত বদমাশ ও অহংকারী। আমাদের সবকিছু নিয়েও সন্তুষ্ট নয়। এমন কসাঈ জীবনে কেউ কোনদিন দেখে নি। নানা চিন্তা মনে উদয় হলে রাগে তাঁর চোখ দুটো জ্বলতে থাকে, যেন জ্বালামুখ থেকে আগুন নির্গত হচ্ছে। এমন সময় ছেলে মিষ্টি খাওয়ার জন্যে ঝোঁক ধরে, কিন্তু মিষ্টির বদলে তিনি তাকে মার দেন। ঝি বাসন ধুয়ে উনুনে আগুন দিলে তাকেও একহাত নিয়ে নেন। রেগে বলে ওঠেন—নিজের জ্বালায় মরছি, আবার আঁটকুড়ি উনুন ধরিয়ে বসে রইলো। বেলা ন'টা পর্যন্ত এইসব ঝামেলা চলে। তারপর একটা চিঠি লিখে মনের জ্বালা মেটান।

"শেঠজী,

আপনি টাকার জোরে যা খুশী, তাই করতে চাইছেন, কিন্তু মনে রাখবেন আপনার টাকার জোর চিরদিন থাকবে না। একদিন না একদিন আপনাকে মাথা নোয়াতেই হবে। বড় আপশোষের কথা, গতকাল সন্ধ্যায় আপনি আমার স্বামীকে গ্রেপ্তার করিয়েছেন, সেখানে আমি থাকলে নিশ্চয়ই রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দিতাম। টাকার জোরে আপনি দিনে তারা দেখছেন। আমি থাকলে আপনার সে নেশা ছুটিয়ে দিতাম। একটা মেয়ে মানুষের কাছে অপমানিত হয়ে মনে হয় মুখ দেখাবার পথ আপনার থাকতো না। মনে রাখবেন, এর বদলা আমি নেবোই। সেইদিনই আমার কলিজা ঠাণ্ডা হবে, আর সেইদিনই আপনি নিঃবংশ হয়ে কুলের নাম ডোবাবেন।"

শেঠজী চিঠি পড়ে জ্বলে ওঠেন। যদিও ক্ষুদ্র হৃদয়ের মানুষ নন, তবু রাগে চোখে যেন কিছুই দেখতে পান না। দুঃখীর ক্রন্দন-ধ্বনি শুনে, মনো বেদনার কথা জেনে, মানসিক দুর্ব্বলতা বিচার করেও একবার দেখলেন না। গরীবের প্রার্থনা মঞ্জুর করা উচিত, এটাও একবার ভাবলেন না, বরং চরমতম বিপদে ফেলার কথাই ভাবতে লাগলেন।

ছয়

এই ঘটনার দিন তিনেক পর শেঠ গিরিধারীলাল একদিন সকালে স্নান সেরে জপ করতে যাবেন, এমন সময় চাকর এসে বলে—হুজুর, একটা মেয়েমানুষ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এয়েছে। শেঠজী জিজ্ঞেস করেন—কে এসেছে? চাকর বলে—তা' আমি কী করে বলবো? তবে দেখে মনে হচ্ছে ভদ্দর ঘরের বুড়ি। পরনে সিল্কের শাড়ী, হাতে দুটো সোনার বালা। আর পায়ে মখমলের চটি।

শেঠজীর জপ করার সময় কেউ কোনোদিন দেখা করতে আসে নি বা আসে না। তাই ভাবেন, আজ আবার এমন সময় কে এলো? বলছে, বড় ঘরের বুড়ি! তাহলে কি জপটা বন্ধ রাখবো? কেন না, দেরি হলে যদি চলে যায়? এই রকম সাত পাঁচ ভেবে চাকরকে তখনই আদেশ দিলেন—ডেকে নিয়ে আয়।

বৃদ্ধা ঘরে ঢুকলে শেঠজী উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আহ্বান জানান। তারপর বৃদ্ধার আপাদ-মস্তক দেখে বিনীত কণ্ঠে বললেন—মা, আপনি কোথা থেকে আসছেন? বৃদ্ধার উত্তরে যখন জানতে পারলেন যে, তিনি অযোধ্যা থেকে আসছেন, তখন হাত দুটো জোড় করে প্রণাম জানিয়ে গদগদ হয়ে মিষ্টি স্বরে বললেন—আপনি অযোধ্যা থেকে আসছেন? আহা! শহর নয় যেন দেবদেবীর সাম্রাজ্য! বড় সৌভাগ্য, তাই আপনার দর্শন পেলাম। এখানে কেন এসেছেন মা? উত্তরে বৃদ্ধা বললেন—আমার বাড়ী তো এখানেই। বৃদ্ধার কথা শুনে শেঠজী আরো অবাক হয়ে যান। জিজ্ঞেস করেন—আপনার বাড়ী এখানেই? তাহলে কি আপনি সংসারের সমস্ত মায়া ত্যাগ করে সেখানে গেছেন? আপনাকে দেখে আমি প্রথমেই সেই রকমই অনুমান করেছিলাম। আপনাদের মত দেবীর দর্শন পাওয়া দুর্লভ। আপনার দর্শন পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। আপনার সেবা করে পুণ্যঅর্জন করার মত কি আর যোগ্যতা আছে? তাই ভাবছি, আপনাকে কিভাবে সন্তুষ্ট করবো, বুঝতে পারছি না। জানেন মা, আমাকে শেঠ-সাহুকারদের বদনাম শুনতে হচ্ছে। আমি সবার যেন চক্ষু-শূল। জানি না, কী কারণে তারা এই রকম করে! মনে হয়, এটা তাদের হিংসা, তবে আমি কিন্তু সবার ভাল চাই। যে কেউ আমার কাছে দুঃখের কথা শোনালে তাকে কখনও বিমুখ করি না, এটা আপনি বিশ্বাস রাখতে পারেন। তাই আপনাকে জানাচ্ছি, আপনি আমার কাছে যে জন্যে এসেছেন, সেটা পরিষ্কার করে বলুন, আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করার আমি প্রাণ পণ চেষ্টা করবো।

বৃদ্ধা—বাবা, আমার কাজটা তোমার দ্বারাই হবে, সেটা আমি জানি।

শেঠজীর—(খুশী হয়ে) বেশ, বলুন মা, কী করতে হবে?

বৃদ্ধা—বাবা, আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছি।

শেঠজী—ও কথা বলবেন না মা! বলুন, আপনার কী প্রয়োজন?

বৃদ্ধা—বাবা, আমি বলছি তুমি রামরক্ষাকে ছেড়ে দাও।

বৃদ্ধার কথা শুনে শেঠজী আকাশ থেকে পড়েন। মাথা ঘুরে যায়। তারপর বলেন—জানেন, সে আমার কত ক্ষতি করেছে? তার গর্ব আমি ভাঙবো, তবে ছাড়বো।

বৃদ্ধা—বাবা, তাহলে কি বুড়ি মায়ের অনুরোধ রাখবে না? জানি, মমতা বড় কঠিন বস্তু। সংসার থেকে ধন চলে যায়, জায়গা-জমি চলে যয়ে, মান চলে যায়, ধর্ম চলে যায় কিন্তু মমতা যায় না। মায়ের হৃদয়ের সবকিছু নষ্ট হতে পারে, তবু ছেলের প্রতি মায়া-মমতা ও স্নেহ কোন দিনই নষ্ট হবার নয়। সেখানে বিচারকের রায়, রাজার আদেশ এমন কি ঈশ্বরের নির্দেশও খাটে না। তুমি আমার কথা রাখো বাবা! আমার ছেলেকে

ছেড়ে দাও। তোমার মঙ্গল হবে, সুনাম ছড়াবে। আমি যতদিন বাঁচবো, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবো।

শেঠজীর মনে ক্ষণেকের জন্যে দয়ার উদয় হয়, পরক্ষণেই মিসেস্ রামরক্ষার চিঠির কথা মনে পড়ে যায়। তাই বললেন—দেখুন মা, বাবু রামরক্ষার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। তিনি যদি আমার সঙ্গে বেইমানী না করতেন তাহলে এমনটি হতো না। আপনার কথা শুনেই তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা যেতো, কিন্তু জানেন, তাঁর স্ত্রী আমাকে কীরকম চিঠি লিখেছেন? সে চিঠি পড়লে রাগে আপনিও জ্বলতে থাকবেন। দেখাবো চিঠিটা? তারপর চিঠি পড়ে বৃদ্ধার দু' চোখে জলের ধারা বয়ে যায়। বললেন—বাবা, সে মেয়েকে আমি ভালভাবেই চিনি, সে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। তার জন্যেই আমি সংসার ত্যাগী হয়েছি। তার মেজাজ, কথা ও আচরণ কাউকে কোনদিন খুশী করতে পারবে না। এই মুহূর্তে তার কথা না তোলাই ভাল বলে মনে করি। তুমি তার জন্যে কিছু মনে করো না বাবা! দেশে তোমার যথেষ্ট নাম আছে। তার কথায় রেগে থাকলে তোমার সুনামে দাগ লাগবে। আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি যে, রামরক্ষাকে দিয়ে তোমার এই মহৎ কাজের ঘটনাটা খবরের কাগজে ছাপাবো। রামরক্ষা নিশ্চয়ই সে কাজটা করবে। দেখো, তোমার উপকার সে জীবনে ভুলতে পারবে না। খবরের কাগজে তোমার সেই মহৎ কাজের সংবাদ পড়ে অনেকে তোমাকে দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে। আর বাবা, আমিও আশীর্বাদ করে তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি—তোমার এক একটি উদারতার পরিচয় পেয়ে সরকার বাহাদুরও তোমাকে খুব শীঘ্রই পদবী দিয়ে ভূষিত করবেন। সরকারী মহলে রামরক্ষার যথেষ্ট জানাশোনা আছে। তাই বলতে পারি সরকার এ ব্যাপারেও তার কথা অমান্য করবেন না।

বৃদ্ধার কথা শুনে শেঠজীর মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। ভাবেন, তাহলে মন্দ হয় না। কেননা, পদবী পেতে হলে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হয়, ঘুষ দিতে হয়, অনুনয়-বিনয় করতে হয়, খোসামোদ করতে হয়, আনাগোনা করতে হয়, সবাইকে খুশী রাখতে হয়, তবে সফল হওয়া যায়। বুঝতে পারছি, এ ব্যাপারে বাবু রামরক্ষার যথেষ্ট হাত আছে, কিন্তু নাম নিয়ে কী হবে? তাই বললেন—দেখুন মা, নাম-টামে আমার খুব একটা আগ্রহ নেই। কথায় বলে, টাকায় নাম আসে। পদবী নিতে আপত্তি করি না তবে, পাওয়ার জন্যেও আগ্রহী নই। এখন কথা হলো, আমার টাকার কী অবস্থা হবে? জানেন, তার কাছে আমি এখনো দশ হাজার টাকা পাই?

বৃদ্ধা—বাবা, তোমার টাকার জন্যে আমি জামিন থাকছি। এই দেখ না, আমার কাছে বাংলা ব্যাঙ্কের পাশ বই রয়েছে। এতে আমার নামে দশ হাজার টাকা আছে।

সেই টাকা দিয়ে তুমি রামরক্ষাকে একটা ব্যবসায় লাগিয়ে দাও। তুমি নিজে মালিক থাকবে, আর সে হবে ম্যানেজার। সে তোমার কথামত চলবে, না হলে তোমারই সব। আমি তার সামান্যতম ভাগও নেবো না। আমার দেখাশোনা করার জন্যে ঈশ্বর আছেন। রামরক্ষা ভাল থাকলেই আমার শান্তি। এই বলে বৃদ্ধা শেঠজীর হাতে পাশবইটা দিলেন। বৃদ্ধার মাতৃসুলভ আচরণে শেঠজী বিহ্বল হয়ে যান। মনে মনে ভাবেন, এমন পবিত্র মুহূর্ত তিনি কখনো পাননি। আর কেউ পেয়েছেন কিনা তাও তাঁর অজানা। শেঠজী বৃদ্ধার পরামর্শ মত কাজ করতে ইচ্ছুক হন। আনন্দে চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে। প্রবল জলস্রোত কঠিন বাঁধ ভেঙে যেমন জল বেরিয়ে আসে, তেমনি শেঠজীর হৃদয়েও উল্লাস, স্বার্থ ও মায়ার বাঁধকে ভেঙে চুরমার করে দিতে চায়। তিনি পাশবইটা বৃদ্ধাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—মা, আপনার বই আপনার কাছেই থাকুক। এটা দিয়ে আর লজ্জা দেবেন না। আমার কোন কিছুরই দরকার নেই। আজ আমি সব পেয়েছি। আজ রামরক্ষা যেমন আপনার ছেলে, তেমনি আমারও একজন ভাই।

এই ঘটনার বছর দুয়েক পর দিল্লীর টাউন হলে বেশ বড় একটা জলসা হয়। ব্যাণ্ড বাজছে, ঝাড়ের-বাতি জ্বলছে আর বাতাসে উড়ছে রঙ-বেরঙের পতাকা। দিল্লী শহরে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত হয়েছেন। রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ী আর ট্যাক্সীতে চারপাশ ভরে গেছে। এমন সময় একটা সুসজ্জিত শকট টাউন হলের সামনে এসে দাঁড়ায়। অপূর্ব সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হয়ে শকট থেকে নামলেন শেঠ গিরিধারীলাল। তাঁর সঙ্গে আছেন নব্য-ফ্যাসানের ইংরাজী পোষাক পরিহিত এক যুবক। তিনিই হলেন রামরক্ষাবাবু। তিনি আজ শেঠজীর কারবারের ম্যানেজার। শুধু ম্যানেজার নন, তিনি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও প্রোপ্রাইটর। দিল্লীর দরবার থেকে শেঠজীকে রায় বাহাদুর উপাধি দেওয়া হয়। তাই আজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়মানুসারে সেই মহামান্য ব্যক্তিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সেই আয়োজন। শেঠজীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য রাখলেন মিস্টার রামরক্ষা। যাঁরা ইতিপূর্বে মিস্টার রামরক্ষার বক্তৃতা শুনেছেন, তাঁরা তাঁর বক্তব্য শোনার জন্যে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করে আছেন।

সভা শেষ হলে শেঠজী রামরক্ষাকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে গিয়ে দেখেন সেই বৃদ্ধা এসেছেন তাঁকে আশীর্বাদ করতে। শেঠজী ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলেন। তিনি আজ আনন্দে উদ্বেলিত।

"রামরক্ষা এণ্ড ফ্রেনস্স" নামে একটা চিনির কল স্থাপিত হয়েছে। রামরক্ষাবাবু সেখানে যথেষ্ট ঠাট-বাটে থাকেন, কিন্তু আজকাল বন্ধুদের নিয়ে পার্টি দেন না এবং দিনে তিনবার করে পোষাকও পাল্টান না। তিনি সেই চিঠিটি, যেটি শেঠজীকে তাঁর স্ত্রী

লিখেছিলেন, সেটিকে তিনি একটি মূল্যবান বস্তু বলে মনে করেন, আর তাঁর স্ত্রীও আজকাল শেঠজীর খুব অনুগত হয়ে উঠেছেন। কেননা, কিছুদিন আগে শেঠজীর এক পুত্র-সন্তান হওয়ায় মিসেস রামরক্ষা নিজে সেই ছেলেকে দুটো সোনার বালা উপহার দেন এবং পাড়ার সকলকে মিষ্টি খাওয়ান।

এ সবই হলো, কিন্তু সেই কথাটা, যা আজও বলা হয়নি, মনে হয় আর বলা হবে না। রামরক্ষা বাবুর মা এখনো অযোধ্যাতেই থাকেন। আজও পর্যন্ত তিনি পুত্র-বধূর মুখ দর্শন করেন নি।

বোধ

আপনার ক্লাশে অধ্যাপনা করেন পণ্ডিত চন্দ্রধন, কিন্তু মনে মনে তাঁর আফশোস যেন কোন্ জঞ্জালের মধ্যে এসে পড়েছেন। অন্য কোন দপ্তরে চাকরি হলে দু'পয়সা জমাতে পারতেন, আরামে জীবনটা কাটত। এখানে তো মাসভর অপেক্ষার শেষে পনেরটি টাকা। এদিক আনতে ওদিক কুলোয় না। না খেয়ে সুখ, না প'রে। এরচেয়ে মজুরেরা ভাল আছে।

পণ্ডিতমশাই এর দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ঠাকুর অতিবল সিং থানার হেড কনেষ্টবল। আর অন্যজন মুন্সী বৈজনাথ, তহসিলদার। এদের আয়ু পণ্ডিত মশাইএর চেয়ে বেশি কিছু ছিল না, কিন্তু তারা বেশ আরামে দিন কাটান। সন্ধ্যেবেলা কাছারি থেকে ফেরার পথে বাচ্চাদের জন্য মিঠাই কিনে আনেন। এধার ওধার বেড়াতে যান। ঘরে টেবিল, চেয়ার, দরাজ পাতা। আরো কত কি জিনিস। ঠাকুরসাহেব সন্ধ্যেবেলা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে সুগন্ধী খামির মেশানো তামাক খান। মুন্সীর ছিল সুরার নেশা। নিজের সুসজ্জিত বৈঠকখানা ঘরে বসে বোতলের পর বোতল শেষ করেন। একটু বেশি নেশা ধরলে হারমোনিয়াম খানা টেনে নেন। এই অঞ্চলে বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি তাঁর, এদের দুজনকেই আসতে যেতে দেখলে ব্যবসায়ীরা উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করে। এদের জন্য বাজার দরও আলাদা। চার পয়সার জিনিস দু' পয়সায়-কেনেন। জ্বালানী কাঠ মুফতে পান। এদের ঠাট বাট দেখে পণ্ডিতমশাই নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করতে থাকেন। এরা এতটুকুও জানেন না যে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে নাকি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে।

পণ্ডিতমশাইকে এরা করুণার চোখে দেখেন। কখনো সখনো এক-আধসের দুধ কিংবা একটু-খানি তরকারি পাঠিয়ে দেন তাঁর বাড়ি; পরিবর্তে পণ্ডিতমশাইকে ঠাকুর সাহেবের দুই আর মুন্সীর তিন ছেলের তদারকি করতে হয়। ঠাকুর তাঁকে ডেকে বলেন, "পণ্ডিতমশাই! ছেলে দুটো দিন রাত খেলে বেড়ায়। আপনি একটু খবরা খবর নেবেন।" মুন্সী বলেন, ছেলেগুলো আমার যেন উচ্ছন্নে যাচ্ছে। আপনি একটু খেয়াল রাখবেন।" এসব কথাও খুব অনুগ্রহের স্বরে বলা হয় যেন পণ্ডিতমশাই এদের গোলাম। এদের এই ব্যবহারে পণ্ডিতমশাই মনে মনে খুব রেগে যেতেন, কিন্তু মুখে কিছু বলতেন না, কারণ এদের দৌলতেই মাঝে-মাঝে দুধ-ঘি, চাটনী জুটে যায়। শুধু তাই নয় বাজার থেকে আনাজপাতি ও একটু সস্তায় মেলে। তাই তিনি এই অন্যায় অবিচারও মুখ বুঁজে সহ্য করেন। এই দুরবস্থা থেকে বেরোবার জন্য তিনি নানা রকম প্রয়াস চালিয়েছেন।

অফিসারদের খোসামোদ করেছেন, কিন্তু আশা পূরণ হয় নি। শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু কাজে ফাঁকি দিতেন না কখনো। ঠিক সময়ে যেতেন। দেরী করে ফিরতেন। মন দিয়ে পড়াতেন। ফলে সকলেই সন্তুষ্ট ছিল তার উপর। বছরে একবার পুরস্কার পেতেন তিনি। তাছাড়া বেতন বৃদ্ধির সুযোগ এলে কমিটি তাঁর কথা বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখেন। কিন্তু এই বিভাগে বেতন বৃদ্ধি অনুর্বর জমিতে ফসল ফলার মত। সে গুড়ে বালি। তবে এই অঞ্চলের লোকেরা পণ্ডিতমশাইকে ভালবাসে। ছাত্রের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ছেলেরাও তার জন্য জান লড়িয়ে দিতে পারে। কেউ তাঁর জন্য জল ভরে এনে দেয়। কেউ ছাগলের জন্য গাছের পাতা জোগাড় করে আনে। পণ্ডিতমশাই তাই-ই অনেক ভাগ্য মনে করতেন।

একবার শ্রাবণ মাসে মুন্সী বৈজনাথ আর ঠাকুর অতিবল সিং অযোধ্যা যাত্রার পরামর্শ করছিলেন। অনেক দূরের পথ। সপ্তাহখানেক আগে থেকে তৈরী হতে হবে। বর্ষাকালে সপরিবারে যাওয়াও অনেক মুশকিল। কিন্তু বৌরা ছাড়ল না। শেষ পর্যন্ত দুজনে এক এক সপ্তাহ ছুটি নিয়ে সপরিবারে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে চললেন। পণ্ডিত-মশাইকেও সঙ্গে চলতে বাধ্য করলেন। এধরণের যাত্রায় একজন অতিরিক্ত ফালতু মানুষ বড় কাজে আসে। পণ্ডিতমশাই দোটানায় পড়েছিলেন কিন্তু ওরা যখন তাঁর সমস্ত যাতায়াত খরচা দিতে সম্মত হলেন তখন আর তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। তাছাড়া অযোধ্যা যাত্রার এই সুন্দর সুযোগও হয়তো আর আসবে না।

বিলহৌর থেকে রাত একটায় গাড়ী ছাড়ে। এরা সকলে নৈশাহার সেরে স্টেশনে এসে পৌছেছেন। গাড়ী আসতেই চতুর্দিকে দৌড়ঝাপ শুরু হয়ে গেল। হাজার হাজার যাত্রী চলেছেন। এই হৈ হট্টগোলের মাঝে মুন্সী প্রথমে বেরিয়ে গেলেন ঠাকুরসাহেব ও পণ্ডিতমশাই একই কামরায় উঠলেন। দুঃসময়ে কে কার জন্য অপেক্ষা করে।

গাড়ীতে বড় স্থানাভাব। কিন্তু যে কামরায় ঠাকুরসাহেব পণ্ডিতমশাই ছিলেন সেখানে মাত্র চারজন মানুষ। তারা সব শুয়ে ছিল। ঠাকুরসাহেব চাইছিলেন ওরা উঠে বসুক, তাহলে অনেকটা জায়গা হয়। তিনি একজনকে তেজ দেখিয়ে বললেন "ওঠে বসো, দেখছো না আমরা দাঁড়িয়ে আছি। সে যাত্রী শুয়ে শুয়ে জবাব দিল—"কেন উঠে বসবো, আমি কি তোমাদের বসবার ঠিকা নিয়েছি?"

ঠাকুর—কেন? আমরা কি ভাড়া দিইনি?

যাত্রী—যাকে ভাড়া দিয়েছো তার কাছে জায়গা চাও?"

ঠাকুর—"একটু ভেবেচিন্তে কথা বলো। এই কামরায় দশজন লোকের বসার ব্যবস্থা আছে।"

যাত্রী—"এটা থানা নয়। মুখ সামলে কথা বলো।"

ঠাকুর—"তুমি কে হে বটে!"

যাত্রী—"আমি সেই গুপ্তচর যার ওপর তুমি গুপ্ত অপরাধের অভিযোগ এনেছিলে। আমি সেই যার কাছ থেকে ২৫ টাকা পেয়ে তবে তুমি ফিরেছিলে।

ঠাকুর—ওহো এবার চিনেছি। কিন্তু আমিতো তোমাকে ক্ষমা করেছিলাম। চালান করে দিলে তখন টের পেতে।

যাত্রী—আর আমিও তোমাকে ক্ষমা করে এই কামরায় দাঁড়াতে দিয়েছি। ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিলে হাড়-মাংসের হিসেব থাকতো না।

অন্য একজন শুয়ে থাকা যাত্রী এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এই কথায় সে জোরে হেসে উঠে বলতে লাগল—কি ঠাকুর সাহেব আমাকে ওঠাচ্ছো না কেন?"

ঠাকুর সাহেব রাগে লাল হয়ে উঠলেন। ভাবতে লাগলেন থানা হলে জিভখানা টেনে ছিঁড়ে নিতেন। কিন্তু এখন খুব খারাপ ভাবে ফেঁসে গেছেন। তিনি বেশ শক্তিশালী পুরুষ, কিন্তু এই শুয়ে থাকা দুজনও কম যায় না।

ঠাকুর—'সিন্দুকটা নীচে নামিয়ে রাখো, একটু জায়গা হয়ে যাবে ব্যস।'

দ্বিতীয় যাত্রী—আর আপনিই বা নীচে বসছেন না কেন। এতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে। এটা তো থানা নয় যে আপনার ভেল্লা কমে যাবে।

ঠাকুর সাহেব তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, তুমিও কি আমার কোন শত্রু নাকি?"

দ্বিতীয় যাত্রী—"হ্যাঁ আমি তো আপনার রক্তের পিপাসু।

ঠাকুর—"আমি তোমার কি করলাম? তোমার মুখখানি কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।"

দ্বিতীয় যাত্রী—"আপনি আমার মুখ দেখতে পারেন, কিন্তু আপনার ডাণ্ডা দেখছি! কত ডাণ্ডা যে খেয়েছি। আমি চুপচাপ মজা দেখতাম অথচ আপনি এসে পিটিয়ে যেতেন। তখনকার মত চুপ করে ছিলাম কিন্তু ঘা লেগে রয়েছে বুকের মধ্যে। আজ তার শাস্তি পাবেন।

এই বলে সে আরো পা ছড়িয়ে শু'ল আর আগুন ভরা চোখে দেখতে লাগল। পণ্ডিতমশাই এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভয় পাচ্ছিলেন এই বুঝি মারপিট শুরু হয়ে যায়। এইবার তিনি ঠাকুর সাহেবকে বোঝাতে শুরু করলেন। তৃতীয় স্টেশন এসে ঠাকুর সাহেব তার বৌ বাচ্চাকাচ্চাদের নামিয়ে এনে অন্য কামরায় তুললেন। বদমাইশ দুজন এদের বাকস-স্যুটকেশ সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে স্টেশনে ফেলে দিল। ঠাকুর সাহেব যখন নামছিলেন, তাকে এতজোর ধাক্কা মারল যে তিনি মুখ থুবড়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর পড়লেন। এমন সময় ট্রেন ছাড়বার সিটি দিতে কোনরকমে কামরায় গিয়ে উঠলেন।

ওদিকে মুন্সী বৈজনাথের অবস্থা আরো করুণ। সারা রাত জেগে কাটল তাঁর। একটু পা অদলবদল করারও উপায় নেই। আজ তিনি থলি ভর্তি করে বোতল এনেছিলেন। প্রত্যেক স্টেশনে ট্রেনে যেমন কয়লা, জল দেয়, তিনি তেমনি বোতল গিলছিলেন। ফলে হল কি—পাচন ক্রিয়ার গণ্ডোগোল। একবার বমি হ'ল, পেটের মধ্যে যেন যুদ্ধ হচ্ছে। বেচারা খুব মুশকিলে পড়লেন। লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত কোনরকমে পৌছলেন। তারপর আর পারলেন না। একটা স্টেশন আসতে নেমে পড়ে প্ল্যাটফর্মে শুয়ে পড়লেন। বৌ তার ঘাবড়ে গেল। পড়ি-মরি করে বাচ্চাকাচ্চা সমেত নেমে পড়ল। জিনিষপত্রও নামানো হল কিন্তু তাড়াহুড়োয় বড় ট্রাঙ্কখানা নামাতে ভুলে গেল। গাড়ি ছেড়ে দিল। দারোগাসাহেব তাঁর বন্ধুকে এই অবস্থা দেখে বৌ বাচ্চা পণ্ডিত-মশাই সমেত নেমে পড়লেন। বুঝলেন আজ পেটে একটু বেশিই পড়েছে, মুন্সীর অবস্থা সত্যিই ভীষণ কাহিল। জ্বর, পেটে যন্ত্রণা, অসারে পায়খানা, তার ওপর নেশার ঘোরে তো জ্ঞান নেইই। স্টেশনমাস্টার অবস্থা দেখে বুঝলেন বুঝি কলেরা হ'ল। হুকুম দিলেন এক্ষুনি বাইরে নিয়ে যাও। সকলে ধরাধরি করে মুন্সীকে একটা গাছতলায় এনে শুইয়ে দিল। তার বৌ কাঁদতে শুরু করে দিল। ডাক্তার বদ্যির সন্ধান শুরু হ'ল। জানা গেল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের দিকে একটা ছোট হাসপাতাল আছে। এও জানা গেল যে ডাক্তারবাবুর বাড়ি বিলহৌর। দারোগাসাহেব হাসপাতালের দিকে দৌড়ালেন। ডাক্তারবাবুকে সব খবর জানিয়ে তাকে একবার দেখতে আসার জন্য অনুরোধ করলেন, ডাক্তারবাবুর নাম চোখেলাল। আসলে কম্পাউণ্ডার। লোকে ভালবেসে ডাক্তারবাবু বলে ডাকে। সব শুনে বললেন—এইসময় হাসপাতাল ছেড়ে বাইরে যাবার হুকুম নেই—আমার।

দারোগা—তাহলে মুন্সীকে এখানে নিয়ে আসি?

চোখেলাল—হ্যাঁ, তাই করুন।

দারোগা দৌড়াদৌড়ি করে একটা ডুলির ব্যবস্থা করলেন। মুন্সীকে কোনরকমে তাতে চড়িয়ে হাসপাতালে আনা হল। বারান্দায় উঠতে না উঠতেই চোখেলাল লাল চোখ করে বলল—কলেরা রুগীকে ওপরে আনার হুকুম নেই। বৈজনাথের জ্ঞান এসেছে এতক্ষণে। চোখ খুলে ধীরে ধীরে বললেন—আরে ইনিতো বিলহৌরেই থাকেন, কী যেন নাম? তহশিলে যাতায়াত আছে। কি মশাই চিনতে পারছেন?

চোখেলাল—বিলক্ষণ চিনতে পারছি।

বৈজনাথ—চিনতে পেরেও এত নিষ্ঠুরতা। আমার জান বেরিয়ে যাচ্ছে। দয়া করে একটু দেখুন।

চোখেলাল—হ্যাঁ, তা না হয় দেখলাম। এই তো আমার কাজ। কিন্তু ফিস্?

দারোগা—হাসপাতালে আবার ফিস্ কিসের ?

চোখেলাল—ব্যস ঐ নিয়মেই, যে নিয়মে মুন্সী আমার কাছ থেকে ফিজ আদায় করেছিলেন তহশিলে বসে বসে।

দারোগা—কি যা-তা বলছেন বুঝতে পারছি না।

চোখেলাল—আমার বাড়ি বিলহৌরে। ওখানে একটু জমি-জায়গা আছে আমার। বছরে বার-দু-তিন তার দেখাশুনা করতে যেতে হয়। তহশিলে তার হিসেব নিকেশ দিতে গেলে মুন্সী জোর করে কিছু আদায় করেন। না দিলে সন্ধ্যে অবধি দাঁড করিয়ে রাখেন। নৌকা কখনো গাড়িতে চড়ে, গাড়িকেও কখনো কখনো নৌকোয় চড়তে হয়। আমার ফিজ দশ টাকা বের করুন! তারপর দেখবো ওষুধ দিলে বিদেয় হবেন।

দারোগা—দশ টাকা !!!

চোখেলাল—হ্যাঁ, মশাই। আর এখানে ভর্তি করতে চাইলে রোজ আরো দশ টাকা।

দারোগা যেন চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগলেন। তখন হঠাৎ তার নিজের ট্রাঙ্কের কথা মনে পড়ল। ব্যস্ নিজের বুকে করাঘাত করতে লাগলেন। তাঁর পকেটেও বেশি টাকা পয়সা নেই। কোন রকমে খুঁজে পেতে দশটা টাকা দিলেন চোখেলালের হাতে। তবে তিনি ওষুধ দিলেন। সারা দিন ঐ ভাবেই কাটল। রাত্রিবেলা একটু সামলে উঠলেন। পরের দিন আবার ওষুধের দরকার। মুন্সীর বৌএর গয়না যার দাম কুড়িটাকার কম কিছুতেই নয়, বাজারে প্রায় জলের দরে বিক্রি করতে হ'ল। সন্ধ্যেবেলা মুন্সী একটু চাঙ্গা হলেন। সেদিন রাতে গাড়িতে বসে খুব গালাগাল দিলেন।

অযোধ্যায় পৌঁছে আশ্রয়ের সন্ধান শুরু হল। পাণ্ডাদের ঘরে জায়গা নেই। মানুষে-মানুষে ভর্তি। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত খুঁজেও ঠাঁই মিলল না। শেষে ঠিক হল গাছতলায় থাকা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু দেখা গেল যে গাছের তলাতেই যাওয়া যায় সেখানেই কেউ না কেউ বাসা বেঁধেছে। শেষে খোলা আকাশের নীচে খোলা মাঠে পড়ে থাকা ছাড়া অন্য কোন উপায় রইল না। তাঁরা একটা পরিষ্কার জায়গা দেখে শতরঞ্জি বিছিয়ে বসতে না বসতে চারিদিক আঁধার করে মেঘ ঘনিয়ে এল। দু-একফোঁটা বৃষ্টিও শুরু হল। বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল। মেঘের আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড়। বাচ্চারা ভয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। বৌদের বুক টিপটিপ করতে লাগল। এই ফাঁকা মাঠের ওপর বসে থাকা দুষ্কর হয়ে উঠল, কিন্তু যাবেনই বা কোথায়।

হঠাৎ নদীর দিক থেকে লণ্ঠন হাতে একজন মানুষকে তাদের দিকে আসতে দেখা গেল। কাছাকাছি আসতে তিনি পণ্ডিতমশাই-এর দিকে তাকালেন। যেন একটু

চেনা চেনা লাগছে। এরা সকলে জিজ্ঞাসা করলেন—ভাই এখানে একটু থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে না? তিনি কিন্তু পণ্ডিতমশাই-এর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন। শেষে বললেন—আপনিই পণ্ডিত চন্দ্রধর না?

পণ্ডিতমশাই—হাসি মুখে বললেন—হাঁ, কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কি করে?

সেই লোকটি—পণ্ডিতমশাই-এর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন—আমি আপনার প্রাক্তন ছাত্র। আমার নাম কৃপাশঙ্কর। আমার বাবা কিছুদিন বিলহৌরে ডাক-মুন্সি ছিলেন। তখন আমি আপনার কাছে শিক্ষালাভ করেছি।

পণ্ডিতমশাই এতক্ষণে চিনতে পেরে বললেন—"ওহো, তুমিই কৃপাশঙ্কর। তুমি তো তখন খুব রোগা-পটকা ছিলে। তা প্রায় আট-ন বছর হবে। তাই না? কৃপাশঙ্কর—হাঁ তা হবে। আমি ওখান থেকে এসে এন্ট্রান্স পাশ করলাম। এখন মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকরি করছি। আপনারা বেশ জায়গায় রয়েছেন তো? ভাগ্য ভালো আপনাদের সঙ্গে দেখা হল।

পণ্ডিতমশাই—তোমাকে দেখে বড় আনন্দ পেলাম। তোমার বাবা এখন কোথায়।

কৃপা—তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমার সঙ্গে মা থাকেন। আপনারা কবে এসেছেন।

পণ্ডিত—এই আজই এসেছি। পাণ্ডাদের ওখানে জায়গা পেলাম না বাধ্য হয়ে এখানেই রাত কাটানোর বন্দোবস্ত করছিলাম।

কৃপা—বাচ্চাদের সঙ্গে এনেছেন?

পণ্ডিত—না আমি তো পরিবার সঙ্গে আনিনি। তবে আমার বন্ধু আছেন দুজন দারোগা আর মুন্সী। তাঁদের বৌ-বাচ্চারা সঙ্গে আছে।

কৃপা—মোট কতজন হবেন?

পণ্ডিত—তা প্রায় দশজন হবে। কিন্তু একটু জায়গা পেলে ও চলে যেত।

কৃপা—না পণ্ডিতমশাই, অনেক জায়গা নিয়েই থাকবেন। আমার দোতলা বাড়ি খালি পড়ে আছে। চলুন আপনার যেমন খুশি দুদিন চারদিন থাকবেন। আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার সেবা করার সুযোগ পাব।

কৃপাশঙ্কর কুলি ডেকে আনলেন। জিনিসপত্র তার মাথায় চাপিয়ে সকলকে নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। ঘরদোর সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চাকরেরা চারপাই বিছিয়ে দিল। রান্নাঘর থেকে লুচির গন্ধ ভেসে আসতে লাগল। কৃপাশঙ্কর সেবকের মত এধার ওধার দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন। সেবার আনন্দ ফুটে উঠেছে চোখে মুখে। তার বিনয় ও নম্রতা সকলকে মুগ্ধ করল।

সকলে খাওয়া দাওয়া করে শুয়েছেন, কিন্তু পণ্ডিত চন্দ্রধরের চোখে ঘুম নেই। তিনি মনে মনে সমস্ত যাত্রার বিচার বিশ্লেষণ করছিলেন। রেলগাড়িতে গণ্ডগোল, হাসপাতালে

গণ্ডগোল—আর সে সবের সামনে কৃপাশঙ্করের সহৃদয়তা আতিথেয়তার প্রকাশময় দীপ্তি।

পণ্ডিতমশাই আজ শিক্ষকতার গৌরব উপলব্ধি করলেন। এই পদের প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধি করলেন আজ।

তাঁরা তিনদিন অযোধ্যায় রইলেন। কোন রকম কষ্ট নেই। কৃপাশঙ্কর নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সব ধাম দর্শন করালেন।

শেষদিন যাত্রার সময় স্টেশন অবধি পৌছে দিতে এলেন। ট্রেন ছাড়ার সিটি বাজলে সজলচোখে পণ্ডিতমশাই-এর চরণস্পর্শ করে বললেন মাঝে মাঝে সেবককে স্মরণ করবেন।

পণ্ডিত মশাই নিজের বাড়ি ফিরে এলে তাঁর আচার আচরণে বিরাট পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি আর অন্য কোন বিভাগে চাকরির চেষ্টা করেন নি।

কলুষিত আত্মা

ঘোরতর আকাল দেখা দিয়েছে। সারা বছরে এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। মাইলের পর মাইল জমি জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেছে। ঘাসগুলো পর্যন্ত জ্বলে গেছে, একমুঠো দানা বা এক বিন্দু জলও নেই। খিদের তাড়নায় মানুষগুলো গাছের ছাল কামড়ে খেতে শুরু করে দিয়েছে। অর্ধেক রাত অব্দি লু বয়ে চলে আর দুপুরে তো কথাই নেই, মাটি থেকে যেন আগুনের স্রোত বয়ে চলে। মনে হয় আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত ঘটছে। আগুনের তাপে যেন মানুষের অন্তর পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। কেউ আর কারো খোঁজ-খবরটুকুও নেয় না। সবাই নিজের নিজের দুঃখে কাতর হয়ে যেন মুখের ভাষাও হারিয়ে ফেলেছে। রোজই মন্দিরে, মসজিদে লোক জমা হয়ে আকুল কণ্ঠে ভগবানের কাছে প্রাণের আর্তি নিবেদন করছে। কিন্তু তাদের কান্না ভগবানের কানে পৌঁছোয় কিনা সন্দেহ, তাহলে নিশ্চয় তিনি যমরাজকে এতটা নির্দয় হতে নিষেধ করতেন। জ্যোতিষী-নক্ষত্রবিদদের দরজায় রোজই লোকের ভীড় লেগে রয়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর গাইছে—

কাল-কলুটী উজলী ধোতী
মেঘা দাদা পানী দো।'
(মেঘারাণী, মেঘারাণী,
ঝপঝপাইয়া ফ্যালাও পানী।)

এক রসায়নশাস্ত্রবিদ ঠিক করেছেন যে তিনি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত ঘটাবেন। সবাই চাঁদা দিয়ে তাকে সাহায্য করল। লাখ লাখ টাকা নিয়ে তিনি তাঁর গবেষণা শুরু করলেন। মেঘের উপর চুম্বকের প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হলেন কিন্তু তাঁর কপাল মন্দ, বৃষ্টি আসা দূরে থাক, ইন্দ্রদেবের গায়ে একটু আঁচড়ও লাগল না। এদিকে লোকের অবস্থা দিনকে দিন খারাপই হয়ে চলেছে।

দুই

শেষে প্রজারা সবাই মিলে ঠিক করলেন যে সাধু ও সিদ্ধ ফকিরের দরবারের এর কারণ জেনে প্রতিকার চাইবেন। তাঁরাই একমাত্র এ বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার করতে পারবেন! হিন্দুরা বাবা দুর্লভদাসের আশ্রমের সামনে গিয়ে হত্যে দিলেন আর মুসলমানরা খাজা রশীদ জালালের রিফত্-নিশানের আস্তানায় গিয়ে মাথা খুঁড়তে লাগলেন। এ সংকট থেকে মুক্তি পেতে তারা সবাই ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। বাবা

দুর্লভদাস দেশের সব সাধু-সন্তদের ডেকে পাঠালেন। এদিকে খাজা সাহেবও চারদিকের বাঘা বাঘা খোদার খিদমদগারদের তলব করলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে দলে দলে সাধু-সন্ত, ফকিররা সব এসে হাজির হলেন। রাজধানীতে এর আগে কখনও এরকম সাধু সমাবেশ ঘটেনি। এই মহাত্মারা সবায়ই নিজের নিজের কেরামতি দেখিয়ে উপস্থিত সকলকে তাক লাগিয়ে দিলেন। তাঁদের উপর প্রজাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে তাঁরা ইশারা করলে মেঘের দেবতার সাধ্য কি, তা অমান্য করেন। একদিন বাবা দুর্লভদাস মহা ধুমধাম করে তাঁর বিরাট সাধু বাহিনী নিয়ে শহরের বাইরে রওনা দিলেন। মিছিলের পুরোভাগে একদল সাধু দুন্দুভি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের ঠিক পরেই বিভিন্ন ধরণের সুদৃশ্য ধ্বজা-পতাকায় সুসজ্জিত হয়ে, শঙ্খ-ঘন্টা বাজিয়ে আর একদল সাধু চলে গেলেন। এরপর কেউ হাতীর উপর সুন্দর কারুকার্য্য করা হাওদা চেপে, কেউ বা যুদ্ধের সাজে সজ্জিত ঘোড়ায় কেউ বা নানা রকম ফুল-পাতায় সাজানো পালকীতে চেপে চলেছেন। আর শিষ্যরা তাঁদের মাথায় রূপোর ঝালর দেওয়া ছাতা ধরে চামর দোলাতে দোলাতে সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছেন। এই মিছিলের একটু পরেই পীর-ফকিরদের অনাড়ম্বর মিছিলও একটু একটু করে এগোতে থাকে। তাঁদের চোখে যেন বেহেস্তের চেরাগ জ্বলছে। সারা শহর পরিক্রমা করে সাধু পীর-ফকিরের দল শহরের বাইরে একটা টিলায় গিয়ে জমা হন। সেখানে গিয়ে সবাই আসন গ্রহণ করেন, তারপর কতকজন সমাধিস্থ হয়ে পড়েন, কেউ কেউ আবার খোদার কাছে চোখের জলে ইল্‌তিজা (নিবেদন) করেন, কেউ বা নানান রকমের যোগাসন দেখাতে শুরু করেন। কেউ কেউ রামায়ণ পাঠ করেন। বৈষ্ণবরা কীর্তন করে নারায়ণের আসন টলাতে চেষ্টা করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তথাগতের আরাধনায় মগ্ন হয়ে পড়েন। কেউ কেউ আবার একমনে মালা জপে চলেছেন। কেউ বা একভাবে মাথা খুঁড়ছেন, চোখে বয়ে চলেছে প্রেমবারি ধারা। কেউ আবার একভাবে ঝিমিয়ে যাচ্ছেন। লাখ লাখ প্রজা এই জমায়েতের পেছনে দাঁড়িয়ে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করছেন আর থেকে থেকে আকাশের দিকে দেখছেন মেঘ করল কি-না! ক্রমে দুপুর হলে সূর্যদেব মাথার ওপরে উঠে এলেন। প্রখর রৌদ্র-তাপে সকলের মুখ শুকিয়ে গেলেও মেঘের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। ভগ্নোৎসাহ হয়ে দর্শকরা নীচে নেমে এলেন। তখন খাজা রশীদ জালাল বজ্রকণ্ঠে বললেন—শোন, তোমাদের রাজার পাপেই আজ দেশের এ হাল হয়েছে। তিনি স্বয়ং খোদার দরবারে আর্তনাদ বিলাপ না করলে এ প্রকোপ দূর হবে না। তোমরা সবাই গিয়ে রাজার পায়ে পড়ে তাঁকে রাজী করাও। তাঁর শফায়েতেই তোমাদের মুক্তি হবে, নচেৎ নয়।

এই পৃথ্বীপতি সিংহ-ই ইন্দ্রিয় লোলুপ রাজা। নিজের সুখ-ভোগকে চরিতার্থ

করতে রাজ-কার্যও ভুলে গেছেন। রাগ-রঙ্গের চর্চা করতে তিনি ব্যস্ত মাসের পর মাস মহলের বাইরে পা-ই দেন না। শহরের যত ভাঁড়-লম্পট আর সুরাই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আর সুরাও যে কত রকমের তার কোন হিসেব নেই। আজ যেটা আদর করে চুমুক দেন, কাল তাতেই অরুচি। বাবুর্চি-পাচকের দল নানা রকমের খাবার-দাবার তৈরী করছে। রাজা তো শায়রীতে মত্ত, তাও আবার যে সে শায়রী নয়, কামাগ্নি উত্তেজক শায়রী ছাড়া অন্য কিছু তাঁর রোচেই না। নিজেই ঠুংরী-দাদরা রচনা করে নেশায় বুঁদ হয়ে বাইজীদের সঙ্গে নাচতে শুরু করেন। দেশের এই আকালের কথা এখনো তাঁর কানে পৌঁছোয় নি। স্বার্থপর মন্ত্রীরাও দেশের এই অবস্থার কথা গোপন করে মজা লুটে চলেছেন। দেশের এই ঘোর দুর্দিনেও শাহী দরবারের খরচের জন্য যে করেই হোক খাজনা আদায় করা হোত। প্রজারাও এ অত্যাচার নীরবেই হজম করতেন। তারা মনে মনে স্থির করেছিলেন যে দুর্যোগকে দুর্ভাগ্যের ফল হিসেবেই মেনে নেবেন তবু রাজার ভোগ-আনন্দে বাঁধা দেবেন না, অবশ্য তাদের সে সাহসও ছিল না।

আজ খাজা রশীদ জালাল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে এ দৈবী প্রকোপ ছাড়া আর কিছু নয়। আর একমাত্র রাজাই তাদের এ বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারেন, আর কেউ নয়। এ কথা শুনে প্রজারা সকলেই রাজ-প্রাসাদের সামনের ময়দানে গিয়ে হাহাকার আর্তনাদ বিলাপ করতে শুরু করলেন। আজ আর তাদের প্রাণের মায়া নেই। উজীর-কোটাল-দ্বাররক্ষী-সৈন্য-সামন্ত তাদের সেখান থেকে জবরদস্তী সরাতে গিয়ে ধমকে, হত্যার হুমকী দিয়েও পরাস্ত হল। প্রজারা সবাই যেন একযোগে আত্মাহুতি দিতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। সেই হৃদয় বিদারক আর্তনাদের প্রতিধ্বনি যেন রাজপ্রাসাদের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আবার তাদের কাছে ফিরে ফিরে আসছে। এবারে যেন রাজার আসনও কিছুটা টলে উঠল। রেগে গিয়ে দ্বাররক্ষীদেব জিজ্ঞেস করলেন—প্রাসাদের বাইরে এ কিসের কোলাহল ? ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এক দ্বাররক্ষী বলল—হে রাজন্, আপনি এই অধমের মা-বাপ শহর থেকে এক বিশাল জনসমুদ্র প্রাসাদের সামনে এসে তাদের ভাগ্যকে দোষারোপ করে কান্না-কাটি করছে, কোনমতেই তাদের হটানো যাচ্ছে না।

রাজা—ওরা কি চায় ?

উজীরদের মধ্যে একজন বলে ওঠেন—হুজুর, ওরা যে কি চায়, তাও বোঝা যাচ্ছে না। শুধু মুখে তাদের একটাই কথা, "আমরা আমাদের রাজাকে দর্শন করে ধন্য হতে চাই।"

রাজা—হঠাৎ আজই বা কি কারণে তাদের রাজদর্শনের ইচ্ছে হল ?

উজীর—হুজুর, আমরা ওদের প্রাসাদের সামনে থেকে সরাতে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওরা আপনাকে দর্শন না করে কিছুতেই ফিরে যাবে না।

রাজা—আমার সৈন্যদের গুলি করার আদেশ দাও, দেখা যাক্ এবার তারা পালায় কি-না! ওদের জানা দরকার যে দেশের রাজা আমি, ওরা নয়।

উজীর রাজাধিরাজ! আমরা নিরুপায় হয়েই আপনার কাছে এসেছি। আমার মনে হচ্ছে ওরা সবাই শপথ করেছে যে কামানের গোলা বুকে পেতে নেবে তবু পিছু হটবে না।

রাজা কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—তাহলে নিশ্চয়ই তাদের অভাব অভিযোগ জানাতে এসেছে। আচ্ছা চল, দেখছি কি তাদের অনুযোগ। মুহূর্তের মধ্যে রাজাকে সেই বিশাল জনসমুদ্রে নিয়ে যেতে পাল্কী চলে এলো। যদিও পা দুটো রাজার অঙ্গের পূর্ণতা এনে দিয়েছে, তবুও ও-দুটোর সদ্ব্যবহার তিনি খুব কমই করতেন। ডুলি-পাল্কী-হাতি-ঘোড়া ছাড়া পায়ে হেঁটে প্রাসাদেব বাইরে কোথাও যেতেনই না। পাল্কী চেপে তিনি প্রজাদের সামনে এলেন। তাঁকে দেখেই প্রজাদের জয় জয় ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। যদিও প্রজারা রাজার কাছে নালিশ জানাতে এসেছিল, কিন্তু তার ঐ করুণাঘন চোখের দিকে চেয়ে তাদের মনও যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল। ফকির সাহেবের বজ্রকণ্ঠের আদেশ শুনে তাদের মন কঠোর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন রাজাকে দেখে আনন্দের উত্তেজনায় সেই কঠোর সংকল্পও সাগরের বিশাল ঢেউয়ের মুখে পড়া কুটোগাছার মতই নিমেষের মধ্যে কোথায় যেন উবে গেল।

চারিদিকে শুধু রাজার জয়ধ্বনি। এরপর প্রজারা রাজার কাছে আর্জি পেশ করে বলে—মহারাজ, আমরা এক কঠিন বিপদের মুখে পড়েছি। আপনি আমাদের রাজা। একমাত্র আপনিই আমাদের এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারেন, আর কেউ নয়। নয়তো আমরা আর কিছুদিনের মধ্যে খিদেয়-পিপাসায় ছটফট করতে করতে মারা যাব।

আশ্চর্য্য চকিত হয়ে রাজা জিজ্ঞেস করলেন—কি সে এমন বিপদ, যার জন্য তোমরা এই আশঙ্কা করছ?

প্রজারা—হে দীনবন্ধু! এবছর একফোঁটাও বৃষ্টিও হয় নি। সারা দেশে হাহাকার পড়ে গেছে। কুয়োগুলো সব শুকনো খটখটে, পুকুর-খাল-বিলে জল নেই, এমন কি নদীও বিমুখ হয়ে গেছে। আপনি আমাদের প্রভু, আপনার সুনজরেই আমাদের সব রকম দুঃখ দূর হওয়া সম্ভব।

রাজা—আমি তো আজই প্রথম এ দুঃসংবাদ শুনছি। সত্যিই কি বৃষ্টি হয় নি?

প্রজারা—দীনবন্ধু, আপনি নিজে গিয়ে আমাদের অবস্থা যাচাই করে দেখবেন চলুন। খাদ্য-পানীয় ছাড়া আমাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছে।

রাজা—কেন, তোমরা দেব-দেবীদের প্রসন্ন করতে পূজো যাগ-যজ্ঞ-বলি দাও নি ?

প্রজারা—হুজুর ! সবই করেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি।

রাজা—সাধুদের আশ্রমে, ফকিরদের আস্তানায় গিয়ে পূজো-বলি আহুতি দিতে তাঁদের কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা কর। মহাত্মা দুর্লভদাস, খাজা রশীদ সাহেব জালালের কাছে গিয়ে তোমাদের এ বিপদের কথা জানাও। তাঁদের মত ঈশ্বরভক্ত আর কয়জনই বা আছেন ! তাঁরা ইচ্ছে করলে কি-না পারেন ! এক্ষুনি, এই মুহূর্তে জল-স্থলকে এক করে ফেলতে পারেন।

প্রজারা সমবেত কণ্ঠে বলে ওঠে—হ্যাঁ হুজুর, সেই ধর্মাত্মারা তাঁদের হাজার হাজার শিষ্যদের নিয়ে ঈশ্বরের কাছে আকুল হয়ে প্রার্থনা করতে করতে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছেন কিন্তু সব চেষ্টাই বিফলে গেছে।

রাজা—এও কি হতে পারে ?

"হ্যা হুজুর, তাই হয়েছে।"

"আমি তো তাঁদের অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনেছি।"

"আপনি গরীবের বন্ধু রাজন্, আপনার কাছে আর কি বলব ! তাঁরা আমাদের আপনাকে স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরা এও বলে দিয়েছেন যে আপনার দ্বারাই সে দুরূহ কার্য সম্ভব হবে। এ ঈশ্বরীয় প্রকোপ ছাড়া আর কিছু নয়। ঈশ্বর না-কি আপনার কাছ থেকে পূজো পেতে অধীর হয়ে আছেন।"

রাজা হেসে বলেন—মহাপুরুষরাই যখন কিছু করতে পারলেন না, তখন আমার সাধ্য কি !

"হুজুর ! আপনি এ দেশের রাজা, ভাগ্যনিয়ন্তা। আমাদের লালন-পালনের প্রার্থনা আপনি ঈশ্বরের দরবারে পৌঁছে দিলেই আমাদের সব দুঃখ দূর হবে।

রাজা কম্পিত স্বরে বলেন—শোন, আমি তোমাদের কোন রকম আশা-ভরসা দিতে পারছি না। তোমাদের এই বিপদ আমারও বিপদ। অনেকদিন আগেই এ বিপদের মোকাবিলা করা আমার উচিৎ ছিল। কিন্তু যে রাজা প্রজাপালন ছেড়ে দিয়ে নিজের কামনা-বাসনা, ভোগ-সুখে মত্ত হয়ে থাকে, সন্তানসম প্রজারা কি অবস্থায় রয়েছে, সে খোঁজটুকুও নেয় না। সুরা-সাকীর নেশায় চুর হয়ে কামেচ্ছার শিকার হয়ে কাটিয়ে দেয় সেই ভীরু-কাপুরুষ রাজা তোমাদের কোন্ মঙ্গলটা করবে শুনি ? কিন্তু না, আমি তোমাদের বিমুখ করব না। নিজের অসাবধানতায় আর তোমাদের ক্ষতি-সাধন করতে চাই না। যদিও আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার অযোগ্য, তাঁর কাছে কিছু নিবেদন করতেও আমার লজ্জা হয়। কিন্তু তবু একমাত্র তোমাদের রক্ষা করতে আমি সেই করুণাময় ঈশ্বরের দ্বারস্থ হব, আমার ওপর তোমরা অন্তত এ বিশ্বাসটুকু রাখ।

তিন

জলন্ত দুপুর। প্রখর সূর্যের তেজ অগ্নিবাণের মত ধরণীর বুকে এসে বিঁধছে আর ভয়ে ধরনী থরথর করে কাঁপছে। আধপোড়া বালি থেকে গরম ভাপ বেরোচ্ছে, নিরাশ্রয় জমির বুক থেকে যেন আর্তনাদের ধোঁয়া উঠছে। ঠিক তেমনি সময় রাজা পৃথ্বীসিংহ মহলের বাইরে বেরিয়ে এলেন। বহুমূল্য পোষাক-আসাক ছেড়ে কোমরে শুধু একটুকরো কৌপীন জড়িয়ে নিয়ে লজ্জা নিবারণ করেছেন। মুণ্ডিত মস্তক, সারা মুখে কালি মাখানো। কালিমাখা—মুখের দিকে চেয়ে লাল চোখ দুটো দেখে মনে হল যেন কম্বলের উপর লাল রেশমী সুতোয় কাজ করা দুটো ফুল। উদাস চোখে জলের ধারা। মুখটা যেন বাসি ফুলের মত শুকিয়ে গেছে। রাজমুকুট ছেড়ে, খালি পায়ে ব্যাথা-হতাশা-লজ্জার প্রতিমূর্তির মত মহলের সামনের সেই রোদে পোড়া মাঠে এসে দাঁড়ালেন। রাজাকে এই কঠিন সংকল্প থেকে টলাতে উজীব মোসাহেবরা কতই না অনুনয় করলেন! কারো কথায় কর্ণপাত না করে রাজা নিজের লক্ষ্যে অটল হয়ে রইলেন। প্রজারা এ খ র শুনে দৌড়ে এসে রাজার চারপাশে জমায়েত হলেন। রাজাকে এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা সকলেই বিচলিত হয়ে উঠলেন। অত্যন্ত বিনম্র ভাবে তারা রাজাকে বলেন—প্রভু, আপনার এ কষ্ট আমরা আর দেখতে পারছি না। আপনি আপনার মুখের ঐ কালি দয়া করে ধুয়ে ফেলুন।

রাজা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—ভাইসব! আমার মুখের এই কালি একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাবৃষ্টি ছাড়া আর কিছুতেই ধোব না।

প্রায় একঘণ্টা কেটে গেল। কালিমাখা গরম চাটুর মতই রাজার মুখটাও তেতে উঠেছে। চোখ দিয়ে যেন আগুনের হল্‌কা ছুটতে থাকে। ঘর্মাক্ত দেহ থেকে অনবরত ঘাম ঝরে পায়েব তলার মাটি স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে উঠেছে। প্রখর উত্তাপে মাথার ভেতরটা যেন গরম জলের মত টগবগ করছে. সকলেই সশঙ্ক চিত্তে সন্দেহ প্রকাশ করছে, রাজা না আবার মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান। প্রজারা বিনীত হয়ে রাজাকে এ কঠিন শপথ থেকে বিরত থাকতে বলে—হে দীনবন্ধু রাজন্, আপনি আপনার এই কোমল অঙ্গকে এভাবে কষ্ট দেবেন না। বরং আমরা খিদে-তৃষ্ণায় মরে যেতেও রাজী, তবু আপনার এই আত্ম-পীড়ণ আমরা কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

রাজার প্রতিটি অঙ্গে যেন ঐশ্বরিক দ্যুতির চমক, সত্যনিষ্ঠ প্রার্থনায়—যেন ধ্যানস্থ। এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পূর্ণ আনন্দ যেন তিনি অনুভব করছেন। কিন্তু বাহ্য অভিব্যক্তিতে তার কোন প্রকাশ নেই। দেহের প্রতিটি রোমকূপ থেকে যেন ভাষা মূর্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে. হে প্রভু, আজ আমার প্রজারা অন্ন-জল ছাড়া নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে, তুমি ছাড়া তাদের আর কেই-বা রক্ষা করবে! আমি মহাপাপী, অজ্ঞান, এ রাজ্যের

কলঙ্ক স্বরূপ। তোমার কাছে কিছু চাইতেও লজ্জা করছে। কিন্তু না, আমার পাপের শাস্তি আমাকে পেতেই হবে! বিনা দোষে আমার প্রজারা যেন আর কষ্ট না পায়, তুমি দয়া কর প্রভু। আমি আমার পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে তোমার দরবারে এসেছি। এ অধমকে তুমি ক্ষমা না করলে আজ এখানে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে প্রাণ বিসর্জন করব, আমার এ কলঙ্কিত মুখ নিয়ে আর প্রজাদের কাছে ফিরে যাব না। আমি তোমার দাস প্রভু, তাই তোমার কাছে সংকোচ করার তো কিছু নেই। নিজের এই কলঙ্কময় ইতিহাস তোমার দরবারে পেশ করার মধ্যে তো আমি কোন লজ্জা খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু যে প্রজারা আমাকে তাদের রক্ষাকর্তা নিযুক্ত করেছে, তাদের কাছে আমি কোন মুখে ফিরে যাব, তুমিই বলে দাও প্রভু!

দু-ঘণ্টা কেটে গেল। বেলা যত বাড়ছে, সূর্যদেবের রোষাগ্নিও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাটি আগের চেয়েও বেশী করে তেতে উঠেছে। সমস্ত প্রজারা অধীর-আগ্রহে অপলক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু কোথাও এতটুকু মেঘের চিহ্ন মাত্র নেই।

চার

সারা শহর যেন আজ এই নিদারুণ দৃশ্য দেখতে রাজ-প্রাসাদের সামনে এসে ভেঙ্গে পড়েছে। তাদের প্রত্যেকের অন্তরের অন্তস্থলে সত্য কর্তব্যপরায়ণতার ঢেউ উঠেছে, চোখে জলের ধারা। মেয়েরা তো এ দৃশ্য দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে, মাথা খুঁড়ে ঈশ্বরের কাছে তাদের প্রার্থনা জানাচ্ছে আর ভাগ্যকে দোষারোপ করছে। রাজ-প্রাসাদের অন্তঃপুরেও করুণ ক্রন্দন ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে মহলের বাইরে এসে উপস্থিত সকলেরই হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে।

তিনটে বেজে গেল, প্রখর সূর্য-তাপের এতটুকু হের-ফের হয় নি। রাজা পৃথ্বী-সিংহের চোখ দুটো কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে উঠেছে, ঘাড় সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে। শরীর ও চেতনার লাগামটা প্রাণপনে চেপে ধরতে ফুল-কলির মতই নরম ঠোঁটদুটোকে দাঁতে চেপে আছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে দেহে রক্ত বা প্রাণের স্পন্দন পর্যন্ত নেই। একমাত্র নিশ্চিন্ত নিরাশাই তাঁর পাদুটোকে স্থির হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করছে। সকলেই তটস্থ হয়ে আছে, রাজা হয়তো এক্ষুনি মাটিতে পড়ে যাবেন! কিছু লোক তো ধরেই নিয়েছে যে রাজা আর বেঁচে নেই, তাঁর লাশটাই শুধু দাঁড়িয়ে আছে। প্রচণ্ড গরমে মানুষের ঘরে থাকাই দায় হয়ে উঠেছে, ছোট ছোট পোকা-মাকড়গুলো চাষের জমি, ঝোপ-ঝাড় থেকে মিছিল করে বাইরে এসে দাপিয়ে-দাপিয়েই মরে যাচ্ছে। যজ্ঞের উষ্ণ তামার টাটের মতই এই রোদে পোড়া মাটির বুকে কোন জীবিত প্রাণীর

পক্ষে মুহূর্তে মাত্র দাঁড়ানোও অসম্ভব। এরই মধ্যে সুকুমার রাজা এতক্ষণ পর্যন্ত কেমন করে আছেন।

হঠাৎ জয় জয় ধ্বনিতে আকাশ বাতাস যেন কেঁপে উঠল। মনে হল ভূমিকম্পের ফলে দুটো পাহাড়ে ঠোক্কর লেগেছে। লাখ লাখ লোক আনন্দে যেন পাগল হয়ে উঠেছে। অগনিত আঙ্গুল তুলে এই বিশাল জনসমুদ্র একে অন্যকে তাদের প্রার্থিত বস্তু দেখাতে ব্যস্ত। তমসাচ্ছন্ন ঘোর অমানিশায় মিটমিটে প্রদীপের শিখার মতই আকাশের বুকে একখণ্ড কালো মেঘ সকলের নজর কেড়ে নিল। কেল্লা থেকে তোপধ্বনি হতে লাগল, মেয়েরা মঙ্গল গান গাইছে। আর্ত-দরিদ্রদের রাণীরা স্বহস্তে দান করছেন। কিন্তু প্রজারা আনন্দের আতিশয্য কাটিয়ে উঠে এখন আশা-ভয়ের দোলনায় দুলছে। কেমন যেন সন্দেহের দৃষ্টিতে তারা মেঘের দিকে চেয়ে আছে। দেখতে দেখতে সেই খণ্ড মেঘ বারুদের ধোঁয়ার মত সারা আকাশকে ছেয়ে ফেলল। মেঘের গর্জন, কেবল যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া আর সেই সঙ্গে ক্ষণপ্রভার চমক যেন আশার আলো। এই মুহূর্তে প্রজারা যেন স্বর্গের চেয়েও প্রিয় বস্তুকে হাতের মুঠোয় পেতে চলেছে। এই মেঘের গর্জন শুনতে তারা কতদিন ধরেই না অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিল! আজ তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হতে চলেছে। সূর্যদেব যেন অতি দ্রুত পদে পশ্চিমে গিয়ে মুখ লুকোতে চাইছেন। বিশাল মেঘ বাহিনী দেখে ভীত হয়েই হয়তো এ পথ বেছে নিয়েছেন। কিন্তু না, শেষ রক্ষা হল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেঘের বুকেই আশ্রয় নিলেন। চারদিক অন্ধকার করে এল! এ যেন ঈশ্বর সৃষ্টি-আশা-ভরসার আর এক সূর্য।

মেঘের গর্জন, সেই সঙ্গে দু-চারটে করে বৃষ্টির ফোঁটাও পড়তে শুরু করেছে। রাজার প্রতি প্রজাদের বিশ্বাস যেন উপচে পড়ছে! ছুটে গিয়ে তারা রাজার পায়ের কাছে হুমরি খেয়ে মাটিতে মাথা ঠুকতে শুরু করে দিল। তখনো রাজা ছবির মতই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কালি মাখা মুখ বৃষ্টির জলে একটু একটু করে ধুয়ে মেঘের কোলে চাঁদের জ্যোৎস্নার মতই তাঁর প্রেমময় জ্যোতি প্রকাশিত হয়েছে। যেন স্বর্গ হতে কোন দেবদূত নেমে এসেছেন, দু'চোখের তারায় এক অনুপম সৌন্দর্য্য। একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি বারিধারায় তিনি তাঁর মুখের কলঙ্ক মোচন করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। বাস্তবে তাই হল। ঐশ্বরিক ক্ষমতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস আর ওপরওয়ালার সহায়তা না থাকলে এ কিছুতেই হবার নয়। এর আগে কখনো দেশে এত খুশী-আনন্দ-বিশ্বাসের জোয়ার এসেছে বলে তো মনে হয় না।

স্বত্ব রক্ষা

মীর দিলওয়ার আলীর একটা লাল রঙের ঘোড়া ছিল। মীর সাহেবের বক্তব্য— জিন্দেগীতে যত কামাই কল্লুম, তার আদ্দেকটাই ঐ ঘোড়ার পেছনে ঢেলিচি।

আসলে কিন্তু তা নয়। সেনাবাহিনীর কাছ থেকে এটাকে সে বলতে গেলে প্রায় জলের দরেই কিনেছিলেন। বলা যেতে পারে, এই পরিত্যক্ত ঘোড়াটাকে বাহিনীর অধিকর্তা নিজের এক্তিয়ারে রাখাটা অনুচিত মনে করে নীলাম করে দিয়েছেন। মীর সাহেব ছিলেন অফিসের কেরাণী। শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে, তা প্রায় মাইল তিনেক পথ পায়ে হেঁটে রোজই তাকে অফিসে হাজির হতে হোত। তাই একটা ঘোড়া কেনার ইচ্ছে অনেক দিন ধরেই তার মনে ছিল। সুযোগও এসে গেল, তাছাড়া দামেও বেশ সস্তা, ঘোড়াটা। তাই আর হাতছাড়া করলেন না। গত তিন বছর ধরে মীর সাহেব তার ঐ জ্যান্ত শকটে চড়েই অফিসে যাতায়াত করেন। দেখতে শোভা না থাকলেও ঘোড়াটার আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল খুবই টন্‌টনে। ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ অথবা অপমান হয় এমন কোনো কাজ ওকে দিয়ে করানো ছিল স্বয়ং শিবেরও অসাধ্য।

যাই হোক, এ হেন দীর্ঘকায় ঘোড়াটি হাতের মুঠোয় পেয়ে মীর সাহেবের যেন গর্বে মাটিতে পা পড়ে না। অফিস থেকে এসে ঘোড়াটাকে বাড়ীর উঠোনেই বেঁধে রাখেন। ওটার দেখাশোনার জন্য একজন সহিসের ব্যবস্থা করা তার মত ছা-পোষা লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সকাল-সন্ধ্যে দুবেলা নিজের হাতেই ঘোড়ার খিদমত করতেন। ঘোড়াটাও তার মালিকের যত্ন-আত্তিতে খুব খুশী। তাই দানাপানির মাত্রাটা কম হলেও সে যেন তা খুশী মনেই মেনে নিয়েছে। মোট কথা মীরার সাহেবের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। আর এই প্রভুভক্তির ফলে সে দিন কে দিন শীর্ণ হয়ে পড়ছিল! তা সত্ত্বেও রোজই সময়মত মীর সাহেবকে অফিসে পৌঁছে দেবার কাজটা সে হৃষ্ট চিত্তে মাথা পেতে নিয়েছিল। হাব-ভাবে আত্ম-সন্তুষ্টি দ্যোতনা জড়ানো। খুব জোরে দৌড়ানো ছিল তার স্বভাব বিরুদ্ধ। তার চোখে উচ্ছৃঙ্খলতার রেখা ফুটে উঠলেও প্রভুভক্তির কাছে নিজের চির-সঞ্চিত স্বত্বকে বলিদান দিতেও পেছপা হয় নি। নিজের বলতে ছিল শুধু রবিবারের শান্তিনিবাস। সেদিন মীর সাহেবেরও অফিস ছুটি। তিনি সেদিন ঘোড়ার গায়ে হাত বুলিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আদর করতেন, দুপুরে স্নান করিয়ে আনতেন। এতেই ও হার্দিক আনন্দ লাভ করতো। সপ্তাহের অন্য দিনগুলো অফিসের মাঠে একটা গাছের নীচে ওকে বেঁধে রাখা হয়, সারাদিন

শুকনো খড় চিবিয়েই দিন কেটে যায়, দুপুরে বয়ে যাওয়া লু যেন ওর সারাটা শরীর আধপোড়া করে ছাড়ে, কিন্তু এই দিনটি ও ছাপড়ায় শীতল ছায়ায় দাঁড়িয়ে কচি কচি সবুজ ঘাস আরাম করে খায়। অতএব ওর মতে রবিবারের এই বিশ্রাম তার নায্য পাওনা, এ কেউ কেড়ে নিতে পারবে বলে মনে হয় না। আগে মীর সাহেবও এ দিনটিতে ঘোড়ায় চেপে বাজারে যাবার চেষ্টা করে হার মেনেছেন। মুখে লাগামই নেয় না, চলবে তো দূরের কথা। মীর সাহেবও ওর আত্ম-সম্মানে আঘাত করতে মন চায় নি।

দুই

মীর সাহেবের প্রতিবেশী সৌদাগরলাল। ঐ একই অফিসের মহুরী বা কেরাণী না হলেও কার্যবশতঃ তাকেও ওখানে যাতায়াত করতে হয়। তাকে কেউ কখনো স্কুলের গণ্ডী মাড়াতে বা বাড়ীতেও পড়াশোনা করতে দেখেনি, কিন্তু হলে কি হবে, উকীল-মোক্তার মহলে তার খুবই প্রতিপত্তি। মীর সাহেব আর সৌদাগরলাল, দুজনেই যেন হরিহর আত্মা।

জ্যেষ্ঠ মাস। বিয়ের মরসুম। বাজনাদারদের পোয়াবার। আতসবাজির দোকানগুলোতে লোক যেন উপচে পড়ছে। ভাঁড়, কথক ঠাকুরের দল তো বাজনা-দারদের বাঁদর নাচ নাচিয়ে ছাড়ছে। পাল্কীর কাহাররা তো পাথরের দেবতা হয়ে, গেছে, ভেট দিয়েও তাদের মন গলানো যাচ্ছে না। এমনই এক শুভ লগ্নে মুন্সীজী তার ছেলের বিয়ের দিন ধার্য করলেন। ছলে-বলে-কৌশলে উৎসবের সব আয়োজনই করে ফেললেন, বাকী রইল কেবল পাল্কী। তার মতো নাছোড়বান্দা লোকেরাও শেষে কাহারদের কাছে নতি স্বীকার করতে হোল। শেষ মুহূর্তে তারা বায়নার টাকা ফিরিয়ে দিল। মুন্সীজীতো রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তাদের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করার হুমকী দিলেন, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হোল না। নিরুপায় হয়ে ঠিক করলেন যে বরকে ঘোড়ায় চড়িয়ে বিবাহ আসরে নিয়ে গিয়ে চিরাচরিত নিয়ম রক্ষা করবেন।

সন্ধ্যে ছ'টায় বরকে নিয়ে বরযাত্রীরা রওনা হবেন ঠিক হোল। বিকেল চারটে নাগাদ মুন্সীজী মীর সাহেবের কাছে এসে বললেন—আরে ভাই তোমার ঘোড়াটাকে যে একবার দিতে হবে! বেশীদূর নয় বরকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাব। কি বলবো ভাই, চারগুণ বেশী দিয়েও একটা পাল্কী পেলাম না!

মীরসাহেব—তোমার মনে নেই, আজ যে রবিবার।

মুন্সীজী—মনে না থাকার কি আছে, তাছাড়া ঘোড়াটাও তো তোমার ঘরেই রয়েছে। যে করেই হোক স্টেশনে পৌছে দাও ভাই। কি-ই বা এমন দূর?

মীরসাহেব—আমার আর তোমার জিনিসে তফাৎ কি ভাই! ও ঘোড়া তো তোমারই, নিয়ে যাও না। কিন্তু আজ স্টেশন পর্যন্ত যাবে দূরের কথা, পিঠে হাত রাখতে দেবে কি-না সন্দেহ।

মুন্সীজী—তুমি মিথ্যেই ভয় পাচ্ছ। মার খেলে ভূতও ছুটে পালায়, আর এ তো সামান্য ঘোড়া। তোমার আদরেই ও বিগ্‌ড়ে গেছে। বাচ্চা ছেলে পিঠের ওপর ঠিক করে বসে থাকবে, দেখা যাক না বদমায়েশি করে ও কত জোরে ছুটতে পারে!

মীরসাহেব—বেশ তো নিয়ে যাও। ওর জেদ ভাঙ্গতে পারলে, তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

তিন

মুন্সীজী আস্তাবলে ঢুকতেই ঘোড়াটা শশঙ্ক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে দেখে চিঁ হিঁ-চিঁ হিঁ করে ঘোষণা করে, যে তুমি আবার কে হে, আজ আমার শান্তি ভঙ্গ করতে এসেছ। এমনিতেই তো বাজনার ঝম্ ঝম্, পোঁ পোঁ শব্দে উত্তেজিত হয়ে আছে। তার ওপর মুন্সীজী যখন খুঁটি থেকে ওর গলার দড়িটা খুলতে শুরু করলেন। ও কান-দুটোকে খাড়া করে অভিমানের ভাব দেখিয়ে কচি ঘাস খেতে শুরু করলো।

মুন্সীজীও কম যান না। চট্ করে বাড়ী থেকে কিছুটা চানা এনে ঘোড়ার সামনে রাখলেন। ঘোড়াও এ বাড়ীতে ও জিনিসের মুখ অনেকদিন দেখেনি! তাই খুবই তৃপ্তি করে খেতে খেতে কৃতজ্ঞ চোখে মুন্সীজীর দিকে তাকালো, যেন অনুমতি দিয়ে বলছে, এবার আর তোমার সঙ্গে যেতে কোনো আপত্তি নেই।

মুন্সীজীর বাড়ীর দরজার কাছে বাজনা বাজছে। সুসজ্জিত বর ঘোড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে! বাড়ীর মেয়েরা বরকে যাত্রা করাবে বলে মঙ্গল দীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচটা বেজে গেল! মুন্সীজীকে ঘোড়া নিয়ে আসতে দেখে উপস্থিত সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। বাজনাদারেরা একটু একটু করে এগিয়ে যেতে শুরু করলো। একজন দৌড়ে গিয়ে মীরসাহেবের বাড়ী থেকে ঘোড়ার সাজের সামগ্রী নিয়ে এলো।

ঘোড়াকে টেনে নিয়ে যাবে বলে দাঁড়ালো, কিন্তু ও হাতের লাগাম দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। মুন্সীজী মুখে নানা রকম শব্দ করে আদর করলেন, গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন, আবার সামনে চানা রাখলেন। তাতেও ঘোড়া মুখ খুললো না দেখে মুন্সীজী রেগে গেলেন। কষে কয়েকবার চাবুক লাগালেন। তাতেও বেয়াড়া ঘোড়া মুখে লাগাম নিচ্ছে না দেখে তিনি ওর নাকের ওপর চাবুক দিয়ে বেশ কয়েকবার জোরসে খোঁচা মারলেন। দর্‌দর্ করে রক্ত পড়তে লাগলো। দীন-অসহায় চোখে চারদিকে চেয়ে দেখলো। জটিল সমস্যা। এত মার জীবনে কখনো খায় নি। ওর

মালিক মীরসাহেব এতো নির্দয়ভাবে কখনো পেটান নি। তাই ভাবলো, মুখ না খুললে আরো না জানি কত মার ভাগ্যে জুটবে। লাগামটা মুখে ধরলো। ব্যস, মুন্সীজীরই জয় হোল। তিনি তাড়াতাড়ি জিন দিয়ে দিলেন। বর লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে পড়লো।

চার

বর ঘোড়ার পিঠে আসন জমিয়ে বসতেই, ঘোড়ার ভুল ভেঙ্গে গেল। ভাবলো, একমুঠো খাদ্যের বিনিময়ে নিজের স্বত্বাধিকার কে বর্জন করা আর একমুঠো কড়ির কাছে আজন্ম সিদ্ধ অধিকারকে বিকিয়ে দেওয়া একাই কথা। স্মৃতি-চারণা করে ভাবতে থাকে, অনেকদিন থেকেই তো আমি এই রবিবারের আরামটুকু ভোগ করে আসছি, তাহলে আজই বা কেন এই বেগার খাটবো? বুঝতে পারছি না এরা আমায় কোথায় নিয়ে যাবে, ওদিকে মুন্সীজীর ছেলে তো প্রায় পাকাপাকি ভাবেই আমার পিঠে চড়ে বসে আছে। খুব ছোটাবে মনে হচ্ছে, ঠুলি বের করেছে। আমার দুচোখে পরিয়ে দেবে, চাবুক দিয়ে মেরে মেরে আধমড়া করে ছাড়বে, তার ওপর আবার পেটে দানা-পানি পড়বে বলে মনে হচ্ছে না। সাত-পাঁচ ভেবে ও ঠিক করলো আমি বাবা কিছুতেই পা তুলবো না। বড় জোর মার খাবো এই তো! কুছ পরোয়া নেই! সওয়ারী নিয়ে মুখ থুব্ড়ে মাটিতে শুয়ে পড়লে আপ্সে ছেড়ে দেবে! আচ্ছা, আমার মালিক মীরসাহেব ও নিশ্চয়ই এদিক সেদিক কোথাও দাঁড়িয়ে এই মজা দেখছেন। আমি পড়ে পড়ে মার খাচ্ছি, আর উনি মুখে কুলুপ এঁটে দাঁড়িয়ে আছেন! ঠিক আছে কাল কি করে অফিসে যায় দেখবো!

বর ঘোড়ার পিঠে বসতেই মেয়েরা সবাই মিলে মঙ্গলগান গাইতে শুরু করলেন, সঙ্গে সঙ্গে পুষ্প-বৃষ্টি হতে লাগলো। বরযাত্রীর এগিয়ে যেতে শুরু করলো। কিন্তু ঘোড়া এমন করে দাঁড়িয়ে রইল যেন পা-ই তুলতে পারছে না। বর চাবুক মেরে, লাগামের ঝাপটা দিয়ে অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু ঘোড়াটা যেন প্রতিজ্ঞা করেছে "পাদমেকং ন গচ্ছামি"। এগোবার কোনো নাম-গন্ধই নেই।

মুন্সীজী এতো রেগে গেলেন, মনে হোল নিজের ঘোড়া হলে এক্ষুনি গুলি করে মারতেন। তারই এক বন্ধু বললেন—পাজির একশেষ! জানোয়ারটা আজ আর চলবে বলে মনে হচ্ছে না। যাক্, ওটার পেছনে লাঠির খোচা মারলে বাপ বাপ বলে চলবে!

কথাটা মুন্সীজীরও মনে ধরলো। পেছন দিক থেকে বেশ কয়েক ঘা মারলেন, কিন্তু না, ঘোড়া কিছুতেই এগোলো না, যদিও বা সামনের পা তুললো, তাও আবার আকাশের

দিকে। দু চারবার পেছন পা দুটো ছুড়ে সবাইকে বুঝিয়ে দিল যে সে প্রাণহীন নয়। এ ক্ষেত্রে মুন্সীজীর শেষ রক্ষা হলে বাঁচি।

তখন অপর বন্ধু বললেন—একটা জলন্ত মুগুর এনে ওটার লেজের কাছে ধরে দেখো, পুড়ে যাবার ভয়ে ঠিক দৌড়বে।

এ প্রস্তাবও স্বীকৃত হোল। ফলে ঘোড়ার লেজের চুলগুলো সব জ্বলে গেল। বেচারা জ্বালার চোটে দু-তিনবার লাফ দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে পাক্কা সত্যাগ্রহীর মতো এতো রকম শারীরিক নির্যাতন ভোগ করে সংকল্পে আরও দৃঢ় হোল।

এরই মধ্যে সূর্যদেবও পশ্চিমের কোলে ঢলে পড়লেন। পণ্ডিত জী বললেন—আর দেরী করলে কিন্তু বরানুগমনের সময় পেরিয়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি বললেই তো আর হয় না। এতো আর নিজের জাতে নয় যে ইচ্ছে করলেই চলে যাবে। এতক্ষণে বরযাত্রীরা বোধহয় গ্রামের সীমানা পেরিয়ে চলে গেছে। এখানে ঘোড়ার চারপাশে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ও অন্যান্য মহিলারা ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই বলাবলি করছে, "এ কি রকম ঘোড়া, যে পা তুলছে না?"

একজন অনুভবী ভদ্রলোক বলেন—মার-ধোর করে আর কোনো কাজ হবে বলে মনে হয় না। কাউকে দিয়ে কিছুটা চানা এনে ওকে দেখাতে দেখাতে ওর আগে আগে যেতে বলুন। তাহলে লোভে লোভে আপনিই যাবে। মুন্সীজী এ চেষ্টা করেও বিফল হলেন। ঘোড়া কোনো দামেই নিজের স্বত্ব বিক্রী করতে রাজী নয়। তখন একজন বললেন—বেটাকে একটু মদ গিলিয়ে দিন। তাহলেই দেখবেন চারটে ঘোড়ার শক্তি নিয়ে পক্ষীরাজের মতো উড়ে যাবে।

মদের বোতল এলে একটা মালশায় করে খানিকটা ঢেলে এনে ওর সামনে রাখা হোল, কিন্তু ওতে চুমুক দেয়া থাক, শুঁকেও দেখলো না।

এবার কি হবে? সন্ধ্যে হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার শুভ-ক্ষণেরও যে অবসান হয়েছে। ঘোড়াটা এতো দুর্গতি সহ্য করেও মনে মনে এই ভেবে খুব খুশী হয়েছে যে আমার ন্যায্য সুখ বিঘ্নকারীরের দুরবস্থা ও ব্যগ্রতা আমার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এই মুহূর্তে এতোগুলো লোকের প্রযত্নশীলতায় সে একধরনের দার্শনিক তৃপ্তি লাভ করেছে। দেখা যাক্ এরা এখন কি করে। আর মার খাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

এতোগুলো লোক হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে যে একে মারা আর সমুদ্র সিঞ্চন করা একই কথা। অনমনীয় মনোভাব নিয়ে সুযুক্তি বিবেচনায় বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পঞ্চম সজ্জনের মতে—এখন একটাই উপায় আছে। জমিতে সার দেবার দু-চাকার গাড়ী আছে না, ঐ গাড়ী এনে ঘোড়ার সামনে পাদুটো ওতে তুলে দিয়ে আমরা সবাই

মিলে যদি টানি তাহলে নিশ্চয়ই ও পা তুলবে। সামনের পাদুটো এগিয়ে গেলে পেছনের পা উঠতে বাধ্য। তখন বাছাধন না চলে যাবে কোথায় শুনি!

মুন্সীজী প্রায় ডুবতে বসেছেন। এ মুহূর্তে এতটুকু একটু কুটোর সাহায্যও তার কাছে যথেষ্ট। তক্ষুনি দুজনে গিয়ে সেই গাড়ী নিয়ে এলো। বর লাগামটা টেনে নিল। চার পাঁচজন লাঠি হাতে ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তখন দুজনে গিয়ে জবরদস্তী ঘোড়ার সামনের পা দুটো গাড়ীতে তুলে দিল। এদিকে ঘোড়াটা এতক্ষণ ধরে ভেবেছিলো, "আমি বাবা এতেও নড়বো না।" কিন্তু গাড়ী চলতে শুরু করলে তার পা আপনা হতেই উঠে এলো। তার মনে হোল, "তবে কি আমি জলের স্রোতে ভেসে চলেছি না-কি-রে বাবা! পাদুটোকে গায়ের জোরে মাটিতে পুঁতে রাখতে চাইলে কি হবে বুদ্ধিতে তো কিছুতেই কুলোচ্ছে না। চারদিক থেকে সবাই চীৎকার করে উঠলো—'চলেছে-চলেছে।' হাততালির চোটে কানপাতা দায়! ঠাট্টা-বিদ্রূপের-উপহাসের-হাসির বন্যায় ঘোড়ার বুকের ভেতরে তীব্র অপমানের শূল বিদ্ধ হতে লগেলো। কিন্তু এ অবস্থায় কি-ই-বা করার আছে? তবে হ্যাঁ, হাল ছাড়ে নি। তাই মনে মনে বলতে থাকে আমাকে এভাবে কদ্দূর নিয়ে যাবে। গাড়ী থামলে আমি থেমে থাকবো। বড্ড ভুল হয়ে গেছে, গাড়ীতে পা না তুললেই ঠিক হোত।

শেষে ঘোড়ার ইচ্ছেই পূর্ণ হোল। শ' পা কোনো রকমে নিয়ে গিয়ে আর এগিয়ে যাবার মতো কারোরই আর ক্ষমতা রইলো না। এখনো স্টেশন মাইল তিনেক দূরে। এদ্দূর ঐ বেয়ারা ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াও থেমে গেলো! বর লাগামের ঝাপটা মারতে শুরু করলো। চারদিক থেকে যেন চাবুকের বৃষ্টি হতে লাগলো, ও তবু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। নাক থেকে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে, চাবুকে চাবুকে সারাটা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে, পেছনের পাদুটো অনেকখানি কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। কিন্তু ওর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

পাঁচ

পুরোহিত বললেন—আটটা বেজে গেছে। ব্যস, শুভক্ষণও শেষ হয়ে গেল।

হতভাগ্য-দুর্বল ঘোড়ারই জয় হোল। ক্রোধোন্মত্ত মুন্সীজী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বর এক পাও হেঁটে যেতে নারাজ। পায়ে হেঁটে বিয়ে করতে গেলে লোকে কি বলবে! বংশের মুখে চুণ-কালি পড়বে না! তাছাড়া মুন্সীজীর ছেলে বলে কথা! কিন্তু এখন তাছাড়া তো পথ নেই। তিনি এসে ঘোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললেন—তোর ভাগ্য ভাল যে মীর সাহেবের হাতে পড়েছিস। আমি তোর মালিক হলে আজ আর তোকে আস্ত রাখতুম না। পশুরাও যে তাদের স্বাধিকার বজায় রাখতে জানটাকে

বাজী রাখতে পারে একথা আজই হাড়ে হাড়ে টের পেলুম। জানতুম না যে তুই কঠিন ব্রতধারী। নেমে আয় বাবা, এতক্ষণে বরযাত্রীরা বোধহয় স্টেশনে পৌছে গেছে। চল্ পায়ে হেঁটেই যাবো। আমরা দশ-বারজন সবাই নিজেদেরই লোক, হাসনেওয়ালা কেউ নেই। এসব রঙীন কাপড়-চোপড় খুলে ফ্যাল্। রাস্তায় লোকে দেখে বলবে, পায়ে হেঁটেই বিয়ে করতে চলেছে। চল্‌রে নবাবপুত্তর ঘোড়া. তোকে মীরসাহেবের কাছে দিয়ে আসি।

পূর্ব সংস্কার

সজ্জনদের ভাগ্যে পার্থিব উন্নতি যদিও বা কখনো আসে তা হয়তো ভুল করেই। রামটহলের কথাই ধরা যাক্, বিলাস-ব্যসন প্রিয়, লম্পট, চরিত্রহীন হলেও সাংসারিক বিষয় বুদ্ধিতে তার মতো চতুর খুবই কম দেখা যায়। সুদ ব্যাজের ব্যাপারে সে পাই-টু-পাই হিসেব করে নেয়। ভুল হবার জো নেই। তাছাড়া মামলা মোকদ্দমায় তার জুড়ি মেলা ভার। উত্তরোত্তর তার শ্রী বৃদ্ধিই হয়ে যাচ্ছে। ঐ এলাকার সবাই প্রায় তার খাতক। অপরদিকে তার ছোট ভাই শিবটহলের মতো সৎ-ধর্মপরায়ণ ও পরোপকারী খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু দিনকে দিন তার আর্থিক অবস্থার অবনতিই ঘটে চলেছে। বাড়ীতে রোজই কিছু না হলেও কমপক্ষে দু-চারজন অতিথি নারায়ণের সেবার ব্যবস্থা রয়েছে। ওদিকে বড়ভাই যে এলাকায় থাকে সেখানে তার প্রভাব-প্রতিপত্তিও খুব। সবাই তার ভয়ে তটস্থ। নীচু শ্রেণীর লোকেরা তো তার হুকুম পেলেই চক্ষের নিমেষে সব কাজ করে দেয়। বাড়ী-ঘর-দোর মেরামতের কাজে বেগার তাদের খাটতেই হয়। ঋণী আনাজওয়ালা তো রোজই বিনে পয়সায় শাক-সব্জী ভেট দিয়ে যায়। গোয়ালা ধার করেছিল, তাই তাকে খুশী রাখতে সেও রোজই বাজার দরের চেয়ে দেড়গুণ কম দামে খাঁটি দুধ দিয়ে যায়। ছোট ভাই কিন্তু ভুল করেও কোনোদিন কাউকে কোনো কটুকথা বা হম্বিতম্বি করেনি। যেন সাক্ষাত বিনয়ের প্রতিমূর্তি। সাধু-সন্তরা এসে তার ভক্তিতে প্রীত হয়ে স্বেচ্ছায় তার আতিথ্য গ্রহণ করেন, পরম তৃপ্তি করে আহার করে তাকে আশীর্বাদ করে চলে যান। দু-চারজনকে সে ও টাকা ধার দিয়েছে, তবে তা সুদের লালসায় নয়, তাদের বিপদে সাহায্য হবে বলে। টাকার জন্যে কখনো তাগাদাও দেয় না পাছে তাদের মনে দুঃখ হবে।

এভাবে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। শিবটহল তার সব সম্পত্তি নিঃশেষে পরমার্থের পায়ে অর্ঘ দিয়ে সর্বশান্ত হয়ে পড়েছে। অনেক টাকা নষ্ট হয়েছে। ওদিকে রামটহল নতুন বাড়ী করেছে, সোনার দোকান খুলেছে, সেই সঙ্গে বেশ কিছু জমি-জমা কিনে চাষ-বাস করতে লেগে গেছে।

শিবটহলের মাথায় চিন্তার পাহাড় চেপে বসেছে। ছেলে-পুলে নিয়ে কি করে জীবিকা নির্বাহ করবে ? টাকা থাকলেও না হয় কিছু রোজগার-পাতির ধান্ধা করতো। টাকা ছাড়া কোনো কিছু করার মতো বুদ্ধিও তার নেই। কারো কাছ থেকে ঋণ নিতেও সাহস হচ্ছে না। ব্যবসায় ঘাটতি হলে শোধ করবে কি করে ? বংশ মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে এই ভয়ে কারো কাছে চাকরীও চাইতে পারছে না। দু-চার মাস যেমন তেমন করে কাটানোর পর, অবশেষে চারদিক থেকে নিরাশ হয়ে বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে বলে—দাদা, এবার থেকে আমার ও আমাদের পরিবারের দায়িত্বভার তোমার ওপরই পড়লো। তুমি ছাড়া আর যে আমার কেউ নেই। এ দুঃসময়ে কার কাছেই বা যাবো বল ?

রামটহল—ও নিয়ে তুই কিচ্ছু ভাবিস না। কু-কম্ম করে তো আর টাকা ওড়াস নি। তুই যা করেছিস্ তাতে আমাদের বংশের মান বেড়েছে বই কমে নি। ঠগ-জোচ্চোর আমি, দুনিয়াকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে ওস্তাদ। তুই সাদাসিধে ভোলাভালা অন্যকে ঠকানো তোর কম্ম নয়। বার ভুতেই তো তোকে লুটেপুটে খেলে রে! যাক্ সে সব কথা। তোতে আমাতে কি তফাৎ বল্। এটা তোরই বাড়ী। আমার জমি-জমাগুলো দেখা শোনা কর, খাজনা-পত্তর আদায় করে যে ভাবে ভাল হয় কর ভাই। মাসকাবারী যা কিছু খরচা সব আমার কাছ থেকে নিয়ে নিবি। তবে হ্যাঁ, একটা কথা, সাধু-সন্তদের সেবা-টেবা আমার পয়সায় চলবে না বলে রাখলুম, সেই সঙ্গে আর একটা কথা, তোমার মুখ থেকে কখনো যেন আমাকে আমার নিন্দে না শুনতে হয়।

শিবটহল গদগদ হয়ে বলে—দাদা, এতদিন তোমার-নিন্দে করে বড্ড ভুল করেছি, তুমি আমায় মাপ করে দাও। আজ থেকে আমার মুখে যদি তোমার নিন্দে শুনতে পাও, তাহলে তুমি যে শাস্তি দেবে তা হাসি মুখে মাথা পেতে নেবো। আর একটা আর্জি আছে, এতদিন ভাল-মন্দ যা কিছু করেছি, সে জন্যে বৌদি যেন আমাকে গঞ্জনা না দেন।

রামটহল—সে জন্যে ভেবো না। ট্যাঁ-ফোঁ করলে ওর জিভটাই উপড়ে ফেলবো।

দুই

শহর থেকে প্রায় দশ-বার ক্রোশ দূরে রামটহলের জমি-জমা। সেখানে কাঁচা বাড়ী। সেই সঙ্গে বলদ, গাড়ী, চাষ-বাসের অন্যান্য জিনিস-পত্তর রয়েছে। শিবটহল নিজের

বসত বাড়ী দাদাকে সঁপে দিয়ে স্ত্রী-ছেলেপুলেদের নিয়ে গাঁয়ে গিয়ে অফুরন্ত উৎসাহে কাজে কর্মে মন দিল। মুনীষ-কামলারা সবাই খুব চৌকস্। তাই পরিশ্রমের ফল পেতে দেরী হোল না। প্রথম বছরেই অর্দ্ধেক খরচেই দেড়গুণ ফলন বৃদ্ধি পেলো।

কিন্তু ঐ যে কথায় বলে না, স্বভাব যায় না মরলে! তাই আগের মতো না হলে এখনো দু-চারজন মূর্তিমান শিবটহলের কীর্তির কথা শুনে এসে হাজির হন। শিবটহলকে নিরুপায় হয়ে তাঁদের সেবা-সৎকার করতেই হয়। তবে হ্যাঁ, পাছে রাগ করে তার জীবিকা নির্ধারণের পথ বন্ধ করে দেয়, তাই সে কথা দাদার কাছে গোপন রাখতেই হয়। ফলে দাদাকে লুকিয়ে ধান-গম-ডাল, খোল, ভূষি ইত্যাদি বেচতে হোত। এ ঘাটতি পূরণ করতে মজুরদের খুব খাটাত, সেইসঙ্গে নিজেও সাংঘাতিক পরিশ্রম করতো। রোদ-জল-ঝড় কোনো কিছুরই পরোয়া নেই। কিন্তু এর আগে কখনো এত পরিশ্রম করে নি। ক্রমে ক্রমে শরীর দুর্বল হয়ে পড়লো। খাবার বলতে তো ডাল-রুটী। তাও আবার সময়ের কোনো ঠিক নেই। দুপুরের খাবার কখনো বিকেলে কখনো বা সন্ধ্যেতে খায়। তেষ্টা পেলে কখনো কখনো পুকুরের জলই খেয়ে ফেলে। দুর্বলতা রোগের পূর্ব লক্ষণ। অসুস্থ হয়ে পড়লো। গাঁয়ে আবার ভাল ওষুধ-পত্তর, ডাক্তার-বদ্যি মেলে না। তার ওপর পথ্যর নামে কুপথ্যই খেতে হচ্ছে। রোগের আর দোষ কি! সেও শিবটহল কে বেশ জাঁকিয়ে ধরলো। সামান্য জ্বরই পিলেজ্বরের রূপ নিয়ে ছ'মাসেই সব কাম মিটিয়ে দিল।

এই শোক-সংবাদ শুনে রামটহলের তো দুঃখের সীমা রইল না। তিন বছরের মধ্যে সে খোরাকীর বাবদ একটা পয়সাও খরচ করেনি। চিনি-গুড়, ঘি, ভূষি-খড়, ঘুঁটে-কাঠ, সবই গাঁ থেকে এসেছে। খুব কান্না-কাটি করলো, অনুশোচনা হোল ওষুধ-পালা, ডাক্তার-বদ্যি দেখ'নোর সুযোগটুকুও দিল না; আমিও নিজের স্বার্থের জন্য তাকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি কি আর জানতাম যে ম্যালেরিয়া ধরলে মানুষ শেষ হয়ে যায়! নয়তো যথাশক্তি চিকিৎসা করতাম বৈকি। ভগবানের ইচ্ছের ওপর তো আর আমার কোনো হাত নেই!

তিন

জমি-জমা দেখাশোনা করার আর কেউ রইলো না। এদিকে রামটহলেরও চাষ-বাসের স্বাদ মিটে গেছে! তার ওপর অধিক বিলাসিতায় তার স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়েছে। কি আর করবে! তাই নিজেই গ্রামের মুক্ত হাওয়ায় থাকবে বলে স্থির করলো। ছেলেও সাবালক হয়ে উঠেছে, তাকে শহরের ব্যবসার কাজ-কর্ম বুঝিয়ে দিয়ে চাষ-বাসের দিকে নজর দিতে গাঁয়ে চলে এলো।

দিনের বেশীর ভাগ সময়টাই তার কাটতো গো সেবা করে। বেশ কয়েক বছর আগে শখ করে একটা যমুনাপারী গরু কিনেছিলো। কামধেনুর মতই দুধালো, স্বভাব ও ঠিক তেমনি। বাচ্চা ছেলেরাও তার শিংয়ে হাত দিয়ে আদর করতে পারে! যাই হোক, ওটা আবার তখন গাভীন হোল। রামটহলের তো আনন্দ ধরে না। খাওয়ানো, ধোয়ানো চড়ানো, সকাল-সন্ধ্যেতে গায়ে-পিঠে হাত বোলানো সবই নিজে হাতে করে। অনেকেই দেড় গুণ চড়াদামে কিনতে চায়, কিন্তু রামটহল কিছুতেই রাজি হয় নি। বাছুর হলে রামটহল খুব ধুম-ধাম করে জন্মোৎসব পালন করে। ব্রাহ্মণ ভোজন, দান-টান করলো। বেশ কয়েকদিন ধরে বাড়ীতে গান-বাজনার আসরও বসলো। বাছুরটার নাম রাখা হোল 'জওয়াহির'। কোনো এক জ্যোতিষীকে দিয়ে তার জন্ম-পত্রিকাও তৈরী করানো হল। জন্ম-পত্রিকা অনুসারে ওর মত সুলক্ষণ যুক্ত, সৌভাগ্যশালী ও প্রভুভক্ত বাছুর নাকি খুব কমই দেখা যায়। কেবল মাত্র ছ'বছর বয়সে একটা বড় ফাঁড়া আছে। সেটা ভালয় ভালয় কাটলেই সারা জীবন সুখে থাকবে।

ধব ধবে সাদা রং। কপালে তিলকের মতো লাল দাগ। কাজল কালো মায়াময় দুটো চোখ। নাদুস-নুদুস চেহারা, দেখতে খুব সুন্দর। দিনভর খেলা-ধুলো করেই কাটিয়ে দেয়। বাছুরের লম্ফ ঝম্ফ দেখে তো রামটহলের তো আনন্দ ধরে না। বাছুরটা তার এত ন্যাওটা হয়ে গেলো যে সে যেদিকে যায় পোষা কুকুরের মতো ও তার পেছন পেছন ছুটে বেড়ায়। সকাল-সন্ধ্যে রামটহল খাটিয়ায় বসে প্রজাদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলে, জওয়াহির তখন পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার হাত-পা চাটতে থাকে। মালিক পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করলে ওর লেজ খাড়া হয়ে ওঠে, মনের আনন্দ চোখের চাউনিতে ঝিলিক মারে। রামটহলেরও বাছুটার ওপর এতো মায়া পড়ে গেছে যে খাওয়ার সময় বাছুরটা কাছে এসে না বসলে খাবার স্বাদটাই মাটি হয়ে যায়। কখনো কখনো ওকে কোলে জাপটে নিয়ে বসে থাকে। ওর জন্য রূপোর হার, রেশমী ফুল, রূপোলী ঝালর তৈরী করিয়ে এনেছে। রোজ নাওয়াতে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে একজন লোক রেখে দিয়েছে। কাজ-কর্মে দূরের গাঁয়ে গেলে তাকে ঘোড়ায় করে আসতে দেখলে জওয়াহির আনন্দে লাফাতে লাফাতে তার কাছে গিয়ে পা চাটতে শুরু করে পশু আর মানুষের মধ্যে এই পিতা-পুত্রের মত স্নেহ-ভালবাসা দেখে সবাই মুগ্ধ।

চার

জওয়াহিরয়ের আড়াই বছর বয়স হোল। বাছুর থেকে ষাঁড় হয়ে উঠেছে। উঁচু-লম্বা গঠন, সুদৃঢ় মাংস পেশী, সুগঠিত অঙ্গ, চওড়া ছাতি, মস্তানি চাল। সব মিলিয়ে এমন দর্শনীয় ষাঁড় ঐ এলাকায় আর একটাও নেই। রামটহল ঠিক করলো এবার

থেকে ওকে তার নিজের গাড়ীতে জুড়বে। কিন্তু মুশ্‌কিল হোল, ওর জুড়ি মেলা ভার। অনেক টাকা খরচ করা হোল, কিন্তু কোথায় জওয়াহির আর কোথায় ও! কোথায় ল্যাম্প আর কোথায় প্রদীপ!

তবে মজার কথা হোল, গাড়োয়ান হাঁকলে ও পা-ই তোলে না। ঘাড় নেড়ে ভয় দেখায়! কিন্তু রামটহল দড়ি হাতে নিয়ে একবার যদি বলে—চল্ বাবা চল্। তাহলে জওয়াহির পাগলের মতো গাড়ী নিয়ে ছুটে চলে। কোথাও না থেমে এক নিঃশ্বাসে দু-ক্রোশ পথ চলে যায়। মনে হয় ঘোড়াও ওর কাছে হেরে যাবে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা জওয়াহির খোল-ভূষি ভরা নাদে মুখ ডুবিয়ে খাচ্ছে আর রামটহল ওর পাশে দাঁড়িয়ে মশা-মাছি তাড়াচ্ছে, হঠাৎ এক সাধু এসে তার দরজায় দাঁড়ালেন। রামটহল উদ্ধত স্বরে বলে—এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছো সাধু বাবা, আগে যাও!

সাধু—না বাবা, কিছু চাইনে, তোমার এই ষাঁড়টাকে দেখছি। এমন সুন্দর ষাঁড় এর আগে কখনো দেখিনি।

রামটহল—(মনযোগ দিয়ে) ঘরের বাছুর বাবা।

সাধু—সাক্ষাৎ দেবতা।

একথা বলে সাধুজী জওয়াহিরের কাছে গিয়ে তার পদধূলি জিভে ঠেকান।

রামটহল—কোথা থেকে আপনার আগমন ঘটেছে বাবা? আজ আপনি এই গরীবের ঘরে বিশ্রাম নিলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

সাধু—না বাবা তা হয় না। বিশেষ প্রয়োজনে আজই আমাকে রেলগাড়ী চেপে অনেক দূর যেতে হবে। রাতে রাতেই চলে যাবো। বিশ্রাম করলে দেরী হবে।

রামটহল—তাহলে আবার কবে আপনার দর্শন পাবো?

সাধু—হ্যাঁ হবে, তীর্থ পর্যটন শেষ করে তিন বছর পর আবার এদিকে আসবো। তখন ঠাকুর ইচ্ছে করলে তোমার বাসনা পূর্ণ হবে! তুমি খুব ভাগ্যবান বাবা, সাক্ষাত নন্দীর সেবা করার সুযোগ পেয়েছো। একে পশু মনে করো না, সাক্ষাত মহাত্মা। দেখো, যেন কষ্ট না পায়। আর হ্যাঁ, ভুল করে ফুলের আঘাতও যেন করো না।

এ কথা বলে সাধু আবার জওয়াহিরের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে চলে গেলেন।

পাঁচ

সেদিন থেকে জওয়াহিরে আদর-যত্ন আরও বেড়ে গেল। সে পশুত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত হয়েছে। রামটহল ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই আগে ওকে দর্শন করে দুপুরে রান্নাঘর থেকে সব রকম রান্না খাবার-দাবার এনে ওকে খাইয়ে তবেই নিজে অন্ন গ্রহণ

করে। এমন কি নিজের গাড়ীতেও ওকে জুততে নারাজ। কিন্তু কোথায় যাবে মনে করে অন্য ষাঁড়কে গোয়ালের বাইরে আনতে দেখলে মাথা নেড়ে নেড়ে জওয়াহির এমন করে নিজেকে জুততে আগ্রহ প্রকাশ করে যে রামটহলকে অগত্যা ওকেই জুততে হয়। দু একবার এমনও হয়েছে যে অন্য এক জোড়া বলদ গাড়ীতে জুড়ে রামটহল হয়তো কোথাও কাজে গেছে, জওয়াহির তাই মনের দুঃখে সারা দিন নাদে মুখ না দিয়ে উপোষী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তাই আজকাল বিশেষ কোনো কাজ ছাড়া রামটহল খুব একটা কোথাও যায় না।

তার শ্রদ্ধা দেখে গাঁয়ের অন্য লোকেরাও জওয়াহিরকে অন্ন নিবেদন করা শুরু করলো। সকালে তো প্রায় সবাই তাকে দর্শন করে ধন্য হয়।

এভাবেই আরো তিন বছর কেটে গেলে। জওয়াহির ছ' বছরে পড়লো।

রামটহলের জ্যোতিষীর কথা মনে হতে ভয় হোল পাছে তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী সত্যি না হয়। পশু-চিকিৎসা সংক্রান্ত বই-পত্তর এনে পড়তে শুরু করলো। পশু-ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে কয়েক রকমের ওষুধও নিয়ে এলো। জওয়াহিরকে টীকে দেওয়া হোল। চাকর-বাকরেরা ওকে পচা ঘাস-পাতা অথবা নোংরা জল খাইয়ে দেয়, সেই ভয়ে সে ওর ভার নিজের হাতেই তুলে নিলো। নানা রকম পোকা-মাকড় যাতে না লুকিয়ে থাকতে পারে তাই গোয়াল ঘরের মেঝেটা পাকা করে দিলে। রোজই ধুয়ে-মুছে সাফ করে রাখে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। রামটহল নাদের পাশে দাঁড়িয়ে জওয়াহিরকে খাওয়াচ্ছে, সহসা সেই সাধু সেখানে এসে হাজির হলেন, আজ থেকে ঠিক তিন বছর আগে তিনি প্রথম দর্শণ দিয়েছিলেন। রামটহল তাকে দেখেই চিনতে পারলো। গিয়ে প্রণাম করে কুশল সংবাদ নিয়ে তাঁর খাবার আয়োজন করতে অন্দরে চলে গেল। এরই মধ্যে জওয়াহির হঠাৎ একবার জোরে চীৎকার করে উঠেই ধম্ করে মাটিতে পড়ে গেল। রামটহল ছুটে ওর কাছে এসে দাঁড়ালো। ওর চোখ দুটো পাথরের মতো স্থির হয়ে গেছে। একবার শুধু তার দিকে অন্তরের সব মমত্ব ঢালা চাউনিতে চেয়েই সব শেষ হয়ে গেলো।

রামটহল ঘাবড়ে গিয়ে ওষুধ আনতে ঘরে ছুটলো। এইতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাব খাচ্ছিল! এরই মধ্যে হঠাৎ কি এমন হয়ে গেল যে ……।

ঘর থেকে ওষুধ আনতে আনতে জওয়াহির তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল!

ছোট ভাইয়ের মৃত্যুতেও রামটহল এতটা ভেঙ্গে পড়ে নি। সব নিষেধ-বাধা তুচ্ছ করে সে ছুটে এসে জওয়াহিরের মৃত দেহটা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করে।

সে রাতটা তার কেঁদে-কেঁদেই কেটে গেলো। তার জওয়াহিরকে সে কি করে ভুলে যাবে। থেকে থেকে একটা মর্মান্তিক ব্যথা বুকটাকে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

ভোরে জওয়াহিরের সব নিয়ে যাওয়া হোল, গাঁয়ের নিয়ম অনুসারে রামটহল চামারের হাতে তুলে না দিয়ে যথাবিধি দাহ করলো, সে স্বয়ং মুখাগ্নি করলো। শাস্ত্র-অনুযায়ী সব সংস্কারই করা হোল। তের দিনের দিন গাঁয়ের সব ব্রাহ্মণদের ভোজন, সেই সঙ্গে মোটা দক্ষিণাও দিল। সেই সাধুকে কিন্তু সে তখনো যেতে দেন নি। তাঁর কথায় রামটহলের অশান্ত চিত্ত সান্ত্বনা সলিলে অবগাহন করে।

ছয়

একদিন রামটহল সাধুকে জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা বাবা, আমার জওয়াহিরকে কোন কাল রোগে এভাবে শেষ করে দিল? ঠাকুর ওর জন্ম-কুণ্ডলিতে লিখেছিল যে ছ'বছরে নাকি ওর একটা ফাঁড়া আছে। কিন্তু আমি তো এভাবে কোনো জানোয়ারকে মরতে দেখি নি। আপনি তো যোগী পুরুষ, রহস্যটা কিছু আপনি বুঝতে পারছেন কি?

সাধু—একটু যে পারছি না তা নয়।

রামটহল—তবে আমাকে সে কথা বলে এ অশান্ত মনটাকে শান্ত করুন বাবা!

সাধু—তাহলে শোনো, আগের জন্মে ও খুবই সাধুভক্ত, সৎ-পরোপকারী ছিল। সম্পত্তির সবটাই ধর্মে-কর্মে ঢেলে দিয়ে ফতুর হয়ে গিয়েছিল। তোমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে এমন কেউ ছিল?

রামটহল—হ্যাঁ বাবা, ছিল।

সাধু—সে তোমায় ধোঁকা দিয়েছিল—বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তুমি তাকে নিশ্চয়ই কোনো কাজের ভার দিয়েছিলে। সে কি করতো, না তোমার চোখ বাঁচিয়ে তোমারই টাকা-পয়সা দিয়ে সাধুসন্তের সেবা করতো।

রামটহল—আমি তো ভুলেও তাকে কখনো সন্দেহ করিনি। তার মতো সরল, সৎ-চরিত্র লোক কখনো বেইমানি করতে পারে না।

সাধু—কিন্তু তবু সে বিশ্বাসঘাতক। নিজের স্বার্থের জন্য না হলেও, অতিথি-সৎকারের জন্য তাকে তা করতে হয়েছিল। মোট কথা সে তোমার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

রামটহল—যদ্দুর মনে হয় দুরবস্থায় পড়েই সে ধর্মপথ থেকে বিচলিত হয়েছিল।

সাধু—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। সে মহাপ্রাণের স্বর্গবাস অবধারিত। তবে বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত তো তাকে করতেই হবে। বেইমানি, তা পূর্ণ করতে সে

তোমার ঘরে পশু রূপে জন্ম নিয়ে এসেছিল। ছ'বছর ধরে সে তোমার কাছে থেকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলো। শেষ হতেই তার আত্মা নিষ্পাপ ও নির্লিপ্ত হয়ে নির্বাণপদ লাভ করলো।

সাধু পরদিন চলে গেলেন, সেদিন থেকে রামটহলের জীবনেও বড় পরিবর্তন দেখা গেল। তার চিত্ত-বৃত্তির আমূল পরিবর্তন হোল। দয়া আর বিবেকের জোয়ারে হৃদয় দরিয়া কানায় কনায় পূর্ণ হয়ে গেল। সারা মন জুড়ে তার একটাই চিন্তা, এমন ধর্মাত্মা পুরুষেরই যদি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ঘাতকতার এমন কঠোর সাজা হয় তাহলে আমার মতো পাতকীর না জানি কি দুর্গতিই হবে! একথা সে কখনো ভুলতে পারে না।

ভেন্ন

প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর ভোলা মাহাতো দ্বিতীয়বার বউ ঘরে আনলে, তার ছেলে রঘুর সুখের দিন ঘুচল। রঘুর বয়স তখন বছর দশেক। খায় দায় আর চোপর দিন পাড়াময় ডাংগুলি খেলে বেড়ায়। নতুন মা ঘরে আসায় এবার তার ঘাড়ে জোয়াল পড়ল। পান্না রূপসী বউ। আর রূপ থাকলেই রূপের গরব থাকবে। এ হল যেন হাঁড়ির সঙ্গে বেড়ির সম্পর্ক। তা সে-গরবিনী গতর নাড়তেও নারাজ। নিজের হাতে কড়ার কুটোটিও নাড়ে না। গোয়াল থেকে গোবর কাড়তেও রঘু, আবার বলদকে জাবনা খাওয়াতেও সেই রঘু। এঁটো বাসনও রঘুই মাজে। ভোলারও চোখে ইদানীং নতুন ঘোর, সে চোখে রঘুর সব-কিছুই মন্দ লাগে, সব তাতেই দোষ। আর পান্নার কথা তো ভোলা চোখ বুজে মেনে নেবেই, এ যে শাস্তরের নিয়ম। রঘুর নালিশ তার বাপ কানে তোলে না। রঘু নাচার হয়ে নালিশ করাই ছেড়ে দিলে। কার কাছে চোখের জল ফেলবে! আর শুধু কি বাপ, সারা গাঁ সুদ্ধু লোকই ওর শত্তুর।—'ভারি একগুঁয়ে ছেলে, পান্নাকে তো মোটে গেরাহ্যিই করে না··· যেন কোথাকার কে। সে বেচারী যে এত কান্না করে মরে, এত যত্ন-আত্তি, এত আদর সোহাগ। তা সবই ভস্মে ঘি ঢালা। নেহাৎ পান্নার মতন ভালোমানুষ সৎমা পেয়েছিল, তাই। হ'ত আর-কোনো মেয়েছেলে, এক হেঁসেলে বাস করতে হত না।' রঘু ভাবে দুনিয়াটাই এই! সবলের উঁচু গলা সবাই শোনে। নিরুপায়ের আকুতি কেউ আমলই দেয় না। দিন যায়, রঘুর মন ধীরে ধীরে তার নতুন মার ওপর থেকে সরে আসে। এমনি করে আট

বছর কেটে যায়। একদিন ভোলার নামে শমনের পরোয়ানা আসে।

পান্নার চারটি সন্তান—তিন ছেলে এক মেয়ে। সংসারে মোটা খরচ, রোজগারের কেউ নেই। রঘু যে ফিরেও তাকাবে না সে তো জানা কথাই। সে তো এখন বিয়ে-থা করে আলাদা হয়ে যাবেই। আর তার বউ এলে সংসারে বেশ ভালো করেই আগুন লাগবে। পান্না চারিদিক অন্ধকার দেখে। তবে রঘুর হাত-তোলায় এ বাড়িতে আশ্রিতা হয়ে বাঁচবে না, তাতে কপালে যাই থাক্। যে সংসারে এতদিন রাণী হয়ে ছিল, সেখানে দাসীবাঁদী হয়ে বাস করা তার পোষাবে না। তা ছাড়া এতকাল যাকে গোলাম বলে ভেবেছে, তারই মুখাপেক্ষী হতে হবে! রক্ষে করো। আর তা করতেই বা যাবে কেন? তার রূপ আছে। বয়সও এমন কিছু নয়। যৌবন আজো ভরভরন্ত। ইচ্ছে করলে এখনো কি নতুন করে সংসার পাততে পারে না? খুব পারে। লোকে হাসবে, পাঁচকথা বলবে! বয়েই গেল। তা ছাড়া ওদের ঘরে এমন তো হামেশাই হয়। বামুনকায়েতের ঘর তো নয়, যে নাককান কাটা যাবে। ও-সব ঢাকঢাক গুড়গুড় যত ঐ উঁচু জাতের ঘরেই। ওদের অন্দরমহলে যাই ঘটুকনা বার বাড়িতে সব পর্দার আড়াল। পান্নার কী? সে দুনিয়ার লোকের নাকের ওপর দিয়ে অন্যের ঘর করতে যেতে পারে। বেশ করবে। কিসের জন্যে সে রঘুর পায়ের তলায় পড়ে থাকতে যাবে?

ভোলা মারা যাবার পর এক মাস কেটে গেছে। সেদিন সন্ধেবেলা পান্না একা একা বসে সাত-পাঁচ চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছে, হঠাৎ খেয়াল হল—ছেলেরা এখনো বাড়ি ফেরে নি। তাই তো! ভর সন্ধেবেলা। গাই বলদ মাঠ থেকে ফিরবে, যদি তাদের পায়ের তলায় পড়ে। এখন আর কে আছে যে দোরে দাঁড়িয়ে বাছাদের তদারক করবে। রঘুর তো ওরা দু'চক্ষের বিষ। কখনো হাসিমুখে দুটো কথা কয় না। পান্না আর ঘরে থাকতে পারল না। ব্যস্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখে উঠোনের চালাঘরের দাওয়ায় বসে রঘু আখ কেটে কেটে টুকরো করছে। ছেলেরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর বাচ্চা মেয়েটা তার গলা জড়িয়ে ধরে পিঠের ওপর চড়ার চেষ্টা করছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস না হয় না পান্নার। সত্যি দেখছে তো! এ যে নতুন ব্যাপার। হঠাৎ? ও, লোকদেখানি। ভাইবোনদের ওপর কত দরদ তাই দেখাতে চায় আর কী। ভেতরে ভেতরে এদিকে ছুরি শানাচ্ছে। হুঁঃ আস্ত কালসাপ! কঠোর স্বরে ছেলেদের ডাক দেয় পান্না—তোমরা সব এখানে কী করছ? ঘরে ঢুকতে হবে না? চলে এসো, এখনই গোরুটোরু আসবে।

রঘুর চোখে মিনতি, বললে—থাক্ না মা, আমি তো রয়েছি, ভাবনা কিসের?

পান্নার বড়ো ছেলে কেদার বললে—জানো না, রঘুদাদা আমাদের দুটো গাড়ি

বানিয়ে দিয়েছে। এই দেখো, এটাতে আমি আর খুন্নু বসব, আর লছমন আর ঝুনিয়া ওটাতে। দুটো গাড়িই দাদা টানবে।

বলতে বলতে ঘরের কোণ থেকে দুটো ছোটো ছোটো খেলনা গাড়ি টেনে বার করে। গাড়িতে চারটে করে চাকা লাগনো, বসবার জন্যে তক্তা আবার ধরবার জন্যে দু'দিকে দুটো করে হাতল।

পান্না অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—গাড়ি আবার কে বানালে ?

কেদার কিঞ্চিৎ বিরক্ত হল, জবাব দিলে—রঘুদা বানাল, আবার কে বানাবে বললুম না তোমায় ? ভগতদের বাড়ি থেকে দা আর বাঁসুলি চেয়ে এনে চটপট করে বানিয়ে ফেলল ! আর কী জোরে ছোটে না, কী বলব। খুন্নু তুই বোস, আমি টানি।

খুন্নু গাড়িতে বসল। কেদার টানতে লাগল। চড় চড় শব্দ তুলে রঘুর গাড়ি ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠল।

আর-একটা গাড়িতে চেপে লছমন হাঁক দিল....ও দাদা টানো-না। ঝুনিয়াকে কোলে করে গাড়ির ওপর বসিয়ে দিয়ে রঘু এবার গাড়ি নিয়ে ছুটল। ছেলেরা হাত তালি দিতে লাগল। পান্না শুধু অবাক হয়ে দেখছে আর ভাবছে একি সেই রঘু না আর কেউ।

খানিক পরে গাড়ি-দৌড় শেষ হল। ছেলেরা ঘরে ফিরে পরম উৎসাহে যাত্রাপর্বের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লেগে গেল। ওদের খুশির বহর দেখে মনে হয় বুঝি উড়ো-জাহাজেই চড়ে এল।

খুন্নু বললে—মা, গাছগুলো সব ছুটছিল।

লছমন বললে—বাছুরগুলোও।

কেদার বলে—আচ্ছা মা, দাদা দুটো গাড়ি একসঙ্গে টানে কী করে ?

ঝুনিয়া সকলের ছোটো। তার কথার ভাঁড়ার বেশি নয়। সে অঙ্গভঙ্গি দিয়েই তার অভিব্যক্তি জাহির করল। ছোট্ট ছোট্ট হাতে তালি দিয়ে নেচেকুঁদে একশা করল। ওর চোখ দুটো তখন বেজায় খুশিতে জলজল করছে।

খুন্নু বললে—জান মা, এবার আমাদের গোরুও কেনা হবে। দাদা গিরিধারীকে বলেছে কাল আনবে।

কেদার—তিন সের করে দুধ দেয়, মা। খুব দুধ খাব আমরা।

রঘু ঘরে ঢুকতে পান্না খানিকটা অবজ্ঞার ভ্রূকুটি হেনে জিজ্ঞেস করলে—তুমি নাকি গিরিধারীর কাছে গোরু কিনতে চেয়েছ ?

রঘু অপ্রতিভ ভঙ্গিতে তাকাল, বললে—হ্যাঁ, চেয়েছি। কাল আনবে বলেছে।

পান্না—তা টাকাটা আসবে কার বাড়ি থেকে। সে কথা চিন্তা করেছ ?

রঘু—করেছি। আমার গলার এই গিনিটা বেঁচে পঁচিশ টাকা পাচ্ছি। পাঁচ টাকা বাছুরের বাবদ বায়না দিয়ে দোব। দিলেই গোরুটা আমাদের হয়ে যাবে।

পান্না একেবারে নিথর হয়ে রইল। রঘুর ভালোবাসা আর সহানুভূতি তার অবিশ্বাসী মনকে যেন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললে—সোনার জিনিসটা বেচবে কেন? এক্ষুনি গোরু কেনার কী দরকার? হাতে পয়সা কড়ি আসুক, তখন না-হয় কিনো'খন। গলাটা খালি খালি দেখাবে, ভালো দেখাবে না। এতদিন তো গোরু ছিল না, বাচ্ছারা তো আর মরে যায় নি।

রঘু বললে—ছেলেপুলের এই তো খাবার বয়েস ছোটো মা। এই বয়েসে না খেলে, কবে খাবে? আর, ও সোনাদানা পরতে আমার ভালোও লাগে না। লোকেই বা কী বলে, বাপ মরে গেল, ছেলে গিনির লকেট গলায় দিয়ে ঘুরছে।

গোরু কেনার চিন্তা মাথায় নিয়েই ভোলা মাহাতো মরেছে। সংগতি হয় নি, তাই গোরুও জোটে নি। নিরুপায়। আর আজ এত বড়ো একটা সমস্যা রঘু কত সহজে কেমন এক কথায় নিষ্পত্তি করে দিল। জীবনে আজ এই প্রথম বার পান্না রঘুর দিকে ভরসার চোখে তাকাল। বললে—তা যদি গয়নাই বেচতে হয়, তো তোমার মোহর কেন? আমার হাঁসুলিটাই নাও না।

রঘু—ধুৎ। তোমার গলায় হারটা কত সুন্দর মানায়। বেটাছেলের আবার গয়না পরা কী? তুমিও যেমন!

পান্না—যা যা। আমি একটা বুড়ি, হার গলায় দিয়ে ঘুরলে, লোকে বলবে কী? তুই এখনো বাচ্ছা ছেলে, তোর খালি গলা ভালো ঠেকে না।

রঘু মুচকি হাসে—তুমি বুড়ি হয়ে গেলে এর মধ্যে? বললেই হল। গোটা গাঁয়ে আর-একটা সুন্দরী বার কর দিকি তোমার মতন।

রঘুর ছেলেমানুষী উক্তিতে পান্না লজ্জা পায়। তার রুক্ষ শুকনো মুখের ওপর ঈষৎ প্রসন্ন লালিমার আভাস ফুটে ওঠে।

দুই

পাঁচ বছর কেটে গেছে। আজ রঘুর মতন আদর্শ কিষান গাঁয়ে আর জুটি মেলা ভার। যেমন মেহনত করতে পারে। তেমনি সৎ স্বভাব। আর এককথার মানুষ। খাঁটি লোক বলে তার খাতির আছে। বাড়িতেও পান্নার মত না নিয়ে রঘু কোনো কাজ করে না। দেখতে দেখতে তেইশ বছর বয়স হল রঘুর। পান্না রোজই বলে, আর কি, এবার বউকে নিয়ে আয়। আর কতকাল বাপের বাড়িতে পড়ে থাকবে? এটা কি ভালো দেখায়? লোকেই বা কী বলে? তারা আড়ালে আমার বদনাম করে। বলে

ও-ই বউ আনতে দেয় না। রঘু এ-সব কথা বিশেষ আমলে আনে না। বলে, হবে'খন, এত তাড়াতাড়ি কিসের? আসলে লোকমুখে বউয়ের ভাবগতিকের কিছুটা আঁচ পেয়েছিল। কাজেই ওরকম মেয়েছেলে ঘরে এনে ঘরের সোয়াস্তি নষ্ট করার সাধ ছিল না তার।

পান্না কিন্তু শুনল না। একদিন নাছোড়বান্দা হয়ে ধরল। বললে,—কী ব্যাপার বলো তো। বউকে কি আনবে না?

রঘু বললে, বলছি তো হবে'খন। এত তাড়া কিসের?

পান্না—তোমার তাড়া না থাকতে পারে, আমার আছে। আমি আজই লোক পাঠাচ্ছি।

রঘু বললে—পাঠাও। পরে পস্তাবে। সে-মেয়ের মেজাজ ভালো নয়।

পান্না বললে—তুই রাখ্ তো। আমি মুখে কুলুপ এঁটে থাকব। মেজাজ দেখাবে কাকে। হাওয়ার সঙ্গেও কোঁদল করতে পারবে না। ঘরের কাজ, বাইরের কাজ সব আমি একলা কাঁহাতক সামলাব। বউ বাড়িতে এলে, দুটো ফুটিয়ে দিতে পারবে তো। আমি আজই আনতে পাঠাচ্ছি।

রঘু বললে—তোমার খুশি হয়, আনিয়ে নাও। কিন্তু দেখো, পরে আবার আমায় দোষ দিয়ো না যেন। বোলো না যে বউকে বাগে রাখতে পারে না, বউয়ের ভেড়ো।

—না না বলব না। তুই ওঠ তো। বাজার থেকে শাড়ি আর মিষ্টি নিয়ে আয়।

কদিন পরেই মুলিয়া বাপের বাড়ি থেকে এল। দোরে নহবৎ বাজল। শাঁখের ধ্বনি আর সানাইয়ের সুরে আকাশ ভরে উঠল। গাঁয়ের লোক এসে ভিড় করে বউয়ের মুখ দেখল। মুখ বা মুখচন্দ্রিমা। পাকা গমের মতো রঙ, বড়ো বড়ো চোখের ভারী পল্লবে দীর্ঘপক্ষের ঘনছায়ার সারি, কপোলে ঈষৎ অরুণিমা, চাউনিতে মদিরার দুর্নিবার টান। রঘু বেচারা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল।

মুলিয়া খুব ভোরে উঠে ঘড়া নিয়ে জল আনতে যায়। তার গায়ের গোধূমবরণে রোদের সোনায় মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। উষার ভাঁড়ারে রূপরসগন্ধসুষমার যা-কিছু সওদা ছিল, মনে হয় সবই সেই রূপের চুম্বকে বাঁধা পড়ে গেছে। রঘু বেচারা একবার দেখে আর চোখ ফেরাতে পারে না।

তিন

মুলিয়া বাপের বাড়ি থেকেই আগুন হয়ে এসেছিল। সোয়ামী মুখ দিয়ে রক্ত তুলে খেটে মরবে, আর সৎ শাশুড়ী রানীর মতন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকবে, তার ছেলেরা নবাবজাদা সেজে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে—এসব বরদাস্ত করার বান্দা নয় সে।

কারুর দাসীবাঁদী হয়ে থাকতে ওর বয়েই গেছে। বলে, পেটের ছেলেই বড়ো আপন হয়, যে সতাতো ভয়ে কন্না করবে। এখনো পাখা গজায় নি তাই রঘুকে ধরে আছে। একবার পাখনায় জোর পেলেই ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে। তখন আর কেউ কারো নয়। ফিরেও চাইবে না। হুঁ সবাই সেয়ানা—

এর মধ্যেই ফাঁক বুঝে একদিন স্বামীকে বলল, তোমার যখন এত শখ, গোলাম হয়েই থাকো, আমি পারব না।

রঘু বললে —তা কী করব, তুমিই বলে দাও। ছেলেরা তো এখনো লায়েক হয় নি যে সংসারের ভার ঘাড়ে নেবে।

মুলিয়া—বলি, ছেলেরা তো তোমার ছেলে নয়। তারা তোমার সৎমা-র ছেলে। এই পান্নাই একদিন তোমাকে কত খোয়ার করে তবে একমুঠো খেতে দিত, সে-সব মনে নেই বুঝি? আমি সব শুনেছি। যাই হোক, আমি এ-সংসারে ঝি খাটতে আসি নি, সেটা জেনে রেখো। এ সংসারে কী আয়, কী খরচ, আমি তার কোনো হিসেবই জানি না। টাকাকড়ির হিসেব কেন থাকবে না আমার হাতে, আমি জানতে চাই। তুমি কী আনো, আর সেই ঠাকরুণের হাত দিয়ে কোথায় কী খরচ হয়, কিছুই জানি না। তুমি বোধ হয় ভাব, ঘরের টাকা ঘরেই থাকছে। কিন্তু ও'দিকে সব ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। একদিন দেখবে, একটা কানাকড়ির দরকার হলেও তোমার জুটবে না—এই বলে দিচ্ছি। দেখে নিয়ো।

রঘু—টাকা পয়সা তোমার হাতে দিলে দুনিয়ার লোকে 'ছি ছি' করবে না?

মুলিয়া—যার যা খুশি হয় বলুক। আমি দুনিয়ার লোকের ধার ধারি না। তুমিও দেখে রেখো, ঐ খেটে মরাই সার হবে তোমার। 'ভাই'! তা এতই যদি টনটনানি তোমার ভায়েদের জন্যে, তুমি মরো, আমি কেন মরতে যাব?

রঘু কোনো জবাব দিল না। সে যা ভয় করেছিল তাই হতে চলেছে। কিন্তু এত শিগ্‌গির! এখন যা মনে হচ্ছে, ও খুব শক্ত হয়ে চললেও বড়ো জোর আর ছ'মাস এক বছর সামলে চলা যাবে। তারপর ডিঙি উলটে যাবে। ও ঠেকাতে পারবে বলে ভরসা নেই। ভেড়ার মা আর কদ্দিন নেকড়ে ঠেকাবে?

বরষা শুরু হয়ে গেছে। মহুয়া শুকোতো দেওয়া হয়েছিল, পান্না সকাল থেকে তাই নিয়ে ঝাড়া-তোলায় ব্যস্ত। ওদিকে খামারের ফসল ভিজে যাচ্ছে। পান্না মুলিয়াকে ডেকে বললে—বউ, একটু নজর রাখিস, আমি চট করে পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসি।

মুলিয়া উপেক্ষার স্বরে জবাব দিলে—আমার ঘুম পেয়েছে। দেখতে হয় তুমি বসে দেখো। একদিন চান না করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।

পান্না হাতের কাপড় রেখে দিল, নাইতে গেল না। মুলিয়ার চালটা ভেস্তে গেল।

এর দিনকতক বাদে একদিন সন্ধ্যেবেলা পান্না ধান পুঁতে সবে ক্ষেত থেকে ঘরে ফিরেছে। অন্ধকার হয়ে গেছে। দিনভর পেটে কিছু পড়ে নি। আশা করেছিল বাড়ি ফিরে দেখবে বউ হয়তো রুটি গড়ে রেখেছে। হেঁসেলে উঁকি দিয়ে দেখলে—উনুনে আঁচও পড়ে নি। বাচ্চাগুলো ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট করছে। খুব নরম করে মুলিয়াকে জিজ্ঞেস করল—হ্যাঁ বউ, আজ এখনো উনুনে আগুন পড়ে নি?

জবাব দিল কেদার, বললে—আজ দুপুরেও উনুন ধরে নি। বউদি কিছু রান্না করে নি।

পান্না—তা তোরা কী খেলি?

কেদার—কিছু না। রাত্তিরের বাসি রুটি ছিল, খুন্নু আর লছমন তাই খেয়েছে। আমি ছাতু খেয়েছি।

পান্না—আর বউ?

কেদার পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে. কিছু খায় নি।

পান্না সঙ্গে সঙ্গে উনুন ধরাল। রাঁধতে বসল! আটা মাখতে মাখতে ওর কান্না পেয়ে গেল। কী কপাল ওর। সারাদিন তেতেপুড়ে ক্ষেতের কাজ, আবার বাড়ি এসেও উনুনের সঙ্গে যুদ্ধ।

কেদার চোদ্দ বছরে পা দিয়েছে। বউদির রকম সকম দেখে বুঝতে আর কিছু বাকি নেই ওর। বললে, বউদি বোধ হয় আর আমাদের সঙ্গে থাকতে চায় না মা।

পান্না চমকে উঠল। বললে—কেন, কিছু বলেছে নাকি?

কেদার—না বলবে আবার কী। কিন্তু ওর মনের ইচ্ছেটা তাই। তা তাই যখন ওর ইচ্ছে, তুমিই বা ওকে আটকে রাখতে চাইছ কেন। ও ওর খুশি মতন থাকুক। আমাদের মাথার উপর ভগবান আছেন।

পান্না জিভ কেটে বললে—চুপ। আমার সামনে এমন কথা ভুলেও মুখে আনবে না। রঘু তোমাদের বড়ো ভাই নয়, ওই তোমাদের বাপ। এ-সব কথা নিয়ে বউকে কিছু যদি বল, তো জেনে রেখো আমি বিষ খেয়ে মরব।

চার

দশহরার পর্বের দিন এল। গ্রাম থেকে কোশখানেক দূরে মেলা দেখতে গেছে। পান্নাও ভাবছিল ছেলেপুলে নিয়ে মেলায় যাবে! কিন্তু পয়সা কোথায় পায়? চাবি আজকাল মুলিয়ার আঁচলে।

রঘু এসে মুলিয়াকে বললে—ছেলেরা মেলায় যাবে, সকলের হাতে দুটো করে পয়সা দিয়ে দে।

মুলিয়া ঝেঁঝে উঠল। বলল—ঘরে অত পয়সা নেই।

রঘু—এই তো সেদিন তিল বিক্কিরি হল। এর মধ্যেই সব টাকা ফুরিয়ে গেল?

মুলিয়া—হ্যাঁ, গেল।

রঘু—গেল বললেই হল! কী করে ফুরলো, শুনি। পার্বণের দিন, বাচ্চাগুলো মেলা দেখতে যাবে না তা ব'লে?

মুলিয়া—যাও না, মাঠাকরুণকে বলোগে, পয়সা বের করে দিন। পুঁতে রেখে কী হবে?

খুঁটির পায়ে চাবি লটকানো ছিল। রঘু চাবি নিয়ে সিন্দুক খুলতে যেতে, মুলিয়া এসে ওর হাত চেপে ধরল। বললে—চাবি দিয়ে দাও, নইলে ভালো হবে না। খেতে পরতে দিতে হবে বইপত্তর কিনে দিতে হবে, আবার মেলা দেখতে যাবার শখ মেটাতে হবে। বাঁচি না! পাড়ার লোক খেয়েদেয়ে গোঁফে তা দিয়ে বেড়াবে বলেই রক্ত জল করে কামানো হচ্ছে, না?

পান্না এতক্ষণে মুখ খুলল। রঘুকে বললে—পয়সার কী দরকার বাবা, ওরা মেলায় যাবে না।

রঘু ঝেঁঝে উঠে বললে—যাবে না কী রকম। গাঁ সুদ্ধু সবাই যাচ্ছে, আর এ বাড়ির বাচ্ছারা যাবে না।

বউয়ের হাত জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে রঘু সিন্দুক খুলে পয়সা বের করে এনে ছেলেদের হাতে দিলে। তারপর চাবি মুলিয়ার হাতে দিতে গেল। মুলিয়া চাবির গোছা টান মেরে উঠোনে ফেলে দিয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল। ছেলেরা মেলা দেখতে গেল না।

দিন দুই পরের কথা। সকাল থেকে মুলিয়াও খায় নি, পান্নাও কিছু মুখে দেয় নি। রঘু একবার একে সাধছে, একবার ওকে বোঝাচ্ছে, কিন্তু কেউ উঠছে না। শেষে হাল্লাক হয়ে রঘু মুলিয়াকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা তুমি কী চাও একবার মুখ ফুঠে বলো তো।

মুলিয়া দেয়ালকে ডেকে বললে—আমি কিছু চাই না। আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

রঘু—ঠিক আছে, তাই হবে। এখন ওঠো, রান্না-খাওয়া করো।

এবার মুলিয়া রঘুর দিকে ফিরে তাকাল। তার মূর্তি দেখে রঘুর প্রাণ উড়ে গেল। কোথায় সে মধুর লাবণ্য, আর কোথায় বা সেই মোহিনী মায়া। সব উবে গেছে। কোঁচকানো ঠোঁটের আড়ালে দাঁত বেরিয়ে এসেছে, বড়ো বড়ো চোখ যেন ফেটে পড়ছে, নাকের পাটা দুটো ফুলে উঠেছে। ভাঁটির আংরার মতন জলজলে লাল চোখ থেকে

আগুন ঝরিয়ে মুলিয়া বলল—ও, সৎ মা ঠাকরুণ বুঝি এই মন্তর পড়িয়েছেন? অ্যা! আমাকে এতই কাঁচা ঠাউরেছ? বড়ো মজা না? আমি বুকে বাঁশ ডলব তোমাদের। আছ কোন্ আহ্লাদে। খুব সোজা পেয়েছ আমাকে—না?

রঘু—আচ্ছা-আচ্ছা, তাই বাঁশই ডলিস বুকে! এখন ওঠ, দুমুঠো খেয়েদেয়ে নে, গায়ে তাকত না পেলে বাঁশ ডলবি কেমন করে?

মুলিয়া—না, হাঁড়ি আলাদা না হলে দাঁতে কুটো কাটব না আমি। ঢের সহ্য করেছি, আর সইব না।

রঘু একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পুরো একটা দিন ওর মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। আলাদা হবার কথা কোনদিন ও দুঃস্বপ্নেও ভাবে নি। গ্রামে দু-চারটে পরিবারকে এরকম আলাদা হতে ও দেখেছে। ভালো হয় না ওতে। হাঁড়ি ভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গে মনের ওপরও পাঁচিল পড়ে, ও খুব ভালো করে জানে। নিজের লোক এক-মুহূর্তে পর হয়ে যায়। ভায়ে ভায়ে সম্পর্ক ঘুচে যায়, পাড়াপড়শি হয়ে যায়। রঘুর সংকল্প ছিল, এই চরম সর্বনাশকে নিজের ঘরে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু নিয়তিকে ও ঠেকাবে কী করে? উঃ! মুখে চুনকালি পড়ল ওর। দুনিয়ার লোকে বলবে, বাপ মরার পর দশটা বছরও এক হাঁড়ি টিকল না। আর কার সঙ্গে আলাদা হচ্ছি? না যাদের নিজের সন্তানের মতন কোলেপিঠে করে মানুষ করলুম, যাদের জন্যে কষ্টকে কষ্ট মনে করলুম না কোনদিন—তাদের সঙ্গেই বিচ্ছেদ। নিজের স্নেহের ধনদের গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেব? গলার স্বর বুজে এল রঘুর। বাষ্পরুদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে মুলিয়ার দিকে চেয়ে রঘু বললে—আমার ভায়েদের আমি আলাদা করে দেব? ওদের থেকে ভেন্ন হয়ে যাব? এই চাও তুমি? কী বলছ একবার ভেবে দেখেছ? মুখ দেখাব কী করে?

মুলিয়া—আমার এক কথা। ওদের সঙ্গে আমার বনবে না।

রঘু—তা হলে তুমি আলাদা হয়ে যাও। আমাকে টানাহেঁচড়া করছ কেন?

মুলিয়া—তা তোমার ঘরে কি আমার জন্যে মণ্ডা মেঠাই বসানো আছে? নাকি আমার ত্রিভুবনে কোনো চুলোয় জায়গা নেই?

রঘু—তোমার যেখানে খুশি, যেমন করে খুশি থাকোগে যাও না। আমি আমার ঘরের লোকদের ছেড়ে আলাদা হব না। এ বাড়িতে যেদিন দুটো হাঁড়ি চড়বে, সেদিন আমার বুকও ভেঙে দু টুকরো হয়ে যাবে। সে আমি সহ্য করতে পারব না। বলো তোমার কী অসুবিধে, কী কষ্ট, আমি বিহীত করার চেষ্টা করব। আমার যা সাধ্যে কুলোয় আমি করতে পিছপাও হব না। ঘরসংসারের যাবতীয় যা-কিছু আসবাব পত্তর, বাসন-কোসন সব তোমার হাতে, খাবার দাবার কাপড় গয়না সব-কিছুরই মালিক

তুমি—আর কী বাকি আছে, কী তোমার অভাব, আমায় বলো। তোমার যদি সংসারের কাজকর্ম করতে মন না চায়, কোরো না তুমি। ভগবান যদি আমাকে তেমন দিন দিতেন, তোমায় নড়ে বসতে দিতুম না, কুটোটি নাড়তে হত না তোমায়। তোমার সুখের শরীর নধর হাত-পা, গতর খাটার জন্যে নয়, তা জানি। কিন্তু কী করব, আমার উপায় নেই। তবুও বলছি ভালো না লাগে কাজকম্ম করতে হবে না তোমায়। কিন্তু দোহাই তোমার, দুটি পায়ে ধরছি, আমায় ভেন্ন হতে বোলো না।

মুলিয়া এবার রঘুর গা ঘেঁসে দাঁড়াল, মাথা থেকে আঁচলটা ফেলে দিয়ে ফিসফিস করে বললে—আমি কাজ করতে ভয়ও পাই না, বসে বসে খেতেও চাই না। কিন্তু কারুর চোখরাঙানি আমার ধাতে সয় না। তোমার সৎমা সংসারের কাজকম্ম করেন বলে আমার মাথা কেনেন নি। সে খাটে তার নিজের গরজে, তার নিজের ছেলে-পুলের মুখ চেয়ে। আমার কী উদ্ধার করেন যে আমায় মেজাজ দেখাতে আসেন? তার ছেলেমেয়ে আছে, আমার তুমি ছাড়া আর কে আছে? আমি কার মুখ চেয়ে খেটে মরি? বাড়িসুদ্ধু লোক আয়েস করবে, জনাজাতি দুধেভাতে থাকবে, আর যার দৌলতে গুষ্টিসুদ্ধু বেঁচে আছে সে মুখ শুকিয়ে বেড়াবে, তার মুখের দিকে তাকাবার কেউ নেই—এ আমি চোখে দেখতে পারি না। একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছ, কী চেহারা হয়েছে। আর-সকলের কী? তাদের ছেলেরা তো দু-চার বছরের মধ্যেই সব লায়েক হয়ে উঠবে। আর তোমার যে আর ক'বছর গেলে খাটে চড়ার হাল হবে তখন কি কেউ দেখতে আসবে? দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো এখানে। পালাচ্ছ কেন? আমি তোমায় বেঁধে রাখব না আচলে গিঁঠ দিয়ে। নাকি, গিন্নিঠাকরুণ বসবার হুকুম দেন নি। কী আর বলব তোমায়? ঢের ঢের মানুষ দেখেছি, তোমার মতন মাথা-মোটা দুটো দেখি নি। এমন বৈরাগী মানুষের পাল্লায় পড়ব তা আগে জানলে, এ সংসারে ভুলেও পা দিতুম না। এলেও মনটা আর-কোথাও রেখে আসতুম। কিন্তু এখন উপায় কী। এখন যে মনপ্রাণ সব এখানে তোমার কাছে বাঁধা পড়ে গেছে। এখন বাপের বাড়ি চলে গেলেও মনটা এখানে পড়ে থাকবে। কপাল আমার! আমি তোমার কথা ভেবে জলে মরি। আর তুমি আমার দিকে ফিরেও চাও না।

মুলিয়ার এই-সব সোহাগের কথায় রঘুর মনের কিছু ইতর বিশেষ হল না, সে তার কোট আঁকড়ে রইল। বললে—শোনো মুলিয়া, ও আমার দ্বারা হবে না। আলাদা হবার কথা ভাবলেই আমার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠছে। এ ধাক্কা আমি সইতে পারব না।

মুলিয়া ব্যঙ্গ করে বলল—তা হলে যাও, চুড়ি পরে অন্দরমহলে বোসেগে। আমিই বরং গোঁফ লাগিয়ে বেটাছেলে হয়ে দাঁড়াই। ছি ছি ভাবতুম হাজার হোক পুরুষ

মানুষ, শরীরে তেজ আছে। এখন দেখছি একেবারে কাদার তাল।

দাওয়ার একধারে দাঁড়িয়ে পান্না এতক্ষণ চুপ করে দুজনের কথা-বার্তা শুনছিল। আর মুখ বুজে থাকতে পারল না। এগিয়ে এসে রঘুকে বলল—বউ যখন ভেন্ন হবে বলে পণ করেছে, তখন তুমিই বা কেন ওকে জোর করে বেঁধে রাখতে চাইছ? তুমি ওকে নিয়ে আলাদা থাকো। আমার ভগবান আছেন, ওপরঅলা। মাহাতো যেদিন চোখ বুজল, সেদিন একটা কুটোর আশ্রয়ও ছিল না, তখনো যদি তিনি দেখে থাকেন, এখনো দেখবেন, ভয় নেই। এখন তো তাঁর দয়ায় ছেলে তিনটে বড়ো হয়ে উঠেছে। চিন্তা কিসের।

রঘু জলভরা চোখে সৎমার দিকে তাকাল। বললে—তুমিও কি পাগল হয়ে গেলে ছোটো মা? হাঁড়ি আলাদা হলেই মনও ভেঙে যায়—এটা বোঝ না?

পান্না—ও যখন বুঝবেই না, তুমি কী করবে? ভগবানের যদি এই ইচ্ছে থাকে, কে কী করতে পারে? অদৃষ্টে যতদিন একসঙ্গে থাকা লেখা ছিল ততদিন থেকেছি। এখন ওপরঅলার এই ইচ্ছে, তাই হোক। তুমি আমার ছেলেপুলের জন্যে যা করেছ, তা আমি কখনো ভুলতে পারব না। তুমি যদি ওদের মাথার উপর না দাঁড়াতে তবে ওদের যে কী গতি হত, ভাবতেও ভয় করে। কার দোরে ওরা মাথা খুঁড়তে যেত, হয়তো দোরে দোরে ভিক্ষে মাগতে হত, কে জানে? আমি মরার দিন অব্দি তোমার নাম করব। ভেন্ন হই আর যাই হই, যদি কখনো কোনো দরকারে লাগি, তুমি 'তু' করে ডাকলেই ছুটে আসব। বুক দিয়ে পড়ে করব। এটা মনে রেখো, যখন যেখানে থাকি, তোমার মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল চিন্তা কখনো করব না। তোমার ক্ষতির চিন্তা মাথায় আসার আগেই গলায় দড়ি দেব। ভগবান করুন তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকো, দুধেভাতে থাকো, তোমার বাড়বাড়ন্ত হোক। তোমার ঘর ভরে উঠুক। তুমি শতায়ু হও, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীমন্ত হয়ে ওঠো। চিরজীবন তোমায় এই আশীর্ব্বাদ করে যাব। আর আমার ছেলেরা? যদি তারা বাপের বেটা হয়, তবে তোমাকেও তারা বাপের মতন মান্যি করবে।

কথা শেষ করে পান্না চোখের জলে ভাসতে ভাসতে উঠে গেল। রঘু পাথরের মূর্তির মতন দাওয়ায় বসে রইল। একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ ছাপিয়ে জলের ধারা বয়ে চলল।

পাঁচ

পান্নার কথা শুনে মুলিয়া বুঝল এবার ওর পোয়া বারো। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ঘরদোরে ঝাঁট দিল, উনুন ধরাল, ধরিয়ে কুয়োয় জল আনতে গেল। ওর কোট বজায় থেকেছে।

পাড়াগাঁয়ে ছেলেমেয়েদের দুটো দল থাকে। একটা হল বউ-ঝিয়ারীদের দল, অন্যটা শাশুড়িদের দল। যে যার নিজের নিজের দলে যায় সলাপরামর্শ করতে, সহানুভূতি আর সান্ত্বনা পেতে এবং দিতে। দু দলেরই আলাদা আলাদা পঞ্চায়েত বসে। কুয়োতলায় মুলিয়ার সঙ্গে আরো দুটি তিনটি বউয়ের দেখা হল। তাদের একজন জিজ্ঞেস করলে—কী হল, আজ তোমাদের বুড়ি অত কান্নাকাটি করছিল কেন।

মুলিয়া বিজয়গর্বে বলল—এতদিন রানী হয়ে বসেছিল তো, রাজ্যি-পাট ছেড়ে যেতে কারই বা ভালো লাগে বলো। আমি ভাই কারুর মন্দ চাই না কোনো দিন। কিন্তু তোমরাই বলো, ঐ তো একটা মানুষের রোজগার। তা একজনের ঘাড়ের ওপর মোড়েন দিয়ে আর কতকাল চলে। আর আমার জানটা কি মানুষের নয়? খাওয়াপরা, শখ-আহ্লাদের সাধ কি আমার হতে নেই? বলো, এই তো বয়েস। তারপর বাচ্চা-কাচ্চা হলে, তাদের সামলাব না শখ করব? তা নয়, এখন পাঁচজনের কন্না কর, পরের ছেলে-পুলের ঝক্কি সামলাও—হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতেই জন্ম কাটুক। আহা—

সমদরদী এক বউ বললে—যা বলেছিস ভাই। বুড়িদের রকমই এই। জন্মভর বউগুলো সব বাঁদী হয়ে থাকুক। ক্ষুদকুঁড়ো গিলুক আর খেটে মরুক।

আর-একজন বললে—আর হাড় কালি করে যে খেটে মরবে, কার ভরসায়? বলে পেটের ছেলেই ফিরে তাকায় না, তার পরের ছেলের ভরসা! হাতে পায়ে বল এলেই যে-যার পথ দেখবে। বউকে পুজো করবে, না তোমায় দেখবে। তার চেয়ে বাবা আগেভাগে কাটাছেঁড়া করাই ভালো, পরে আর বদনামের ভাগী হতে হয় না।

মুলিয়া জল নিয়ে ঘরে ফিরল। রান্নাবাড়া শেষ করে রঘুকে ডাকল—যাও নেয়ে এসো। রান্না হয়ে গেছে।

রঘুর কানে কথা গেল না। মাথায় হাত দিয়ে দোরের দিকে চেয়ে ঠায় বসে রইল।

মুলিয়া আবার ডাকল—কী বললুম, শুনতে পাচ্ছ না? রান্না হয়ে গেছে। যাও চান করে এসো না।

রঘু—শুনতে পাব না কেন, কালা তো নই। রান্না হয়ে গিয়ে থাকে খেয়ে নাও। আমার খিদে নেই।

মুলিয়া আর কথা বাড়াল না। উঠে গিয়ে উনুন নিবিয়ে দিয়ে, রুটি তরকারী শিকেয় তুলে রেখে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

খানিকপরে পান্না এসে বললে—রান্না হয়ে গেছে, যাও চানটান করে খেয়ে নাও। বউটারও খাওয়া হয় নি।

রঘু তেতে উঠল। বললে—তোমরা কি আমায় বাড়িতে তিষ্টোতে দেবে না? তা

হলে বলো মুখে চুনকালি লেপে পাড়ায় ঘুরি। খেতে তো হবেই। আজ না খাই কাল খাব। এখন আমার খাবার রুচি নেই। আমায় খেতে বোলো না কেউ। কেদার পাঠশালা থেকে ফেরে নি ?

পান্না—না, আসে নি এখনো, এইবার এসে পড়বে।

পান্না বুঝল, যতক্ষণ না ও বাচ্চাদের খাইয়ে নিজে কিছু মুখে দিচ্ছে, ততক্ষণ রঘু খাবে না। শুধু তাই নয় ওকে রঘুর সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে, কথা কাটাকাটি করতে হবে, এমন ভাব দেখাতে হবে যেন, পান্না নিজেই তফাত হয়ে যেতে চাইছে। নইলে রঘু চিন্তায় চিন্তায় ক্ষয়ে যাবে, বাঁচবে না। মন স্থির করে পান্না আলাদা উনুন ধরিয়ে রাঁধতে বসল। ইতিমধ্যে কেদার আর খুন্নু ইস্কুল থেকে এল। পান্না ছেলেদের বলল—আয় খেতে বোস্।

কেদার বলল—দাদাকে ডেকে আনি ?

পান্না—তোমরা খেতে বোসো। তার খাবার, তার বউ আলাদা করে করেছে।

খন্নু—দাদাকে একবার জিজ্ঞেস করে আসি খাবে কিনা।

পান্না—তার যখন ইচ্ছে হবে, খাবে। তুই খেতে বোস তো। তোর অত দরকার কী ? যার যখন খুশি হবে, খাবে, নইলে না খাবে। তারা আলাদা রাধবে বাড়বে, আলাদা খাবে। কে তাদের কী বলতে যাবে ?

কেদার—হ্যাঁ মা, তা হলে কি আমরা আলাদা বাড়িতে থাকব ?

পান্না—সে আমি জানি না। তাদের ইচ্ছে হয় এক বাড়িতে থাকবে, না হয় তো উঠোনে পাঁচিল দিতে চায় দেবে।

খুন্নু দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখল সামনের খড়ের ঘরে একটা চৌকিতে শুয়ে রঘু ডাবের জল খাচ্ছে। বললে—হ্যাঁ মা, দাদা, এখন অবেলায়, ডাব খাচ্ছে। খাবে কখন ?

পান্না—যখন মর্জী হবে।

কেদার—দাদা বউদিকে কিছু বলে নি ? বকে নি ?

মুলিয়া ঘরে শুয়ে শুয়ে সব শুনছিল। বাইরে বেরিয়ে এসে বললে—না তোমার দাদা বোধ হয় বকতে ভুলে গেছে। তা তুমি তো আছ, তুমি এসে শাসন করো।

কেদারের মুখ শুকিয়ে গেল, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। খাওয়া-দাওয়ার পর ছেলেরা বাগানে বেরিয়ে গেল। লু—চলছে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা সব আমবাগানে জড়ো হয়েছে। এরা তিন জনেও সেখানে হাজির হবে বলে বেরোল। কেদারই পরামর্শটা দিলে—চল্ আজ আমরাও আম কুড়োতে যাই। মেলাই আম পড়ছে।

তাতে খুন্নু বললে—দাদা উঠানে বসে রয়েছে না ?

লছমন বললে—আমি যাব না বাবা, দাদা ধোলাই দেবে।

কেদার—যাঃ ওরা তো আলাদা হয়ে গেছে।

লছমন—তার মানে আমাদের কেউ মারলেও দাদা কিছু বলবে না?

কেদার—বাঃ তা কেন বলবে না? ছেড়ে দেবে!

রঘু ওদের বাইরে বেরোতে দেখেও কিছু বলল না। অথচ আগে হলে দরজামুখো হলেই ধমক লাগাত। আজ চুপ করে বসে রইল। তাই দেখে ছেলেদেরও সাহস বাড়ল। ওরা একটু একটু করে এগিয়ে গেল। রঘু কিছু বলতে ভরসা পাচ্ছিল না। কী করে বলে। ছোটো মা ওদের খাইয়ে দাইয়ে দিল। তাকে একবার ডাকল না। কে জানে হয়তো তার মনের ওপর পাঁচিল পড়ে গেছে। এখন ছেলেদের বলতে গেলে যদি মান না থাকে। ডাকলে যদি না আসে? মারা বকাও আর চলবে না। তখন লুয়ের মধ্যে ছুটোছুটি করে যদি অসুখ বিসুখ করে? বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে রঘুর। তবুও নির্বাক হয়ে থাকে ছেলেরা যখন দেখল রঘু কিছু বলছে না তারা নিঃশঙ্ক হয়ে রাস্তায় পা দিল।

এই সময় মুলিয়া এল। বললে—এবার ওঠো, আর কেন। না কি, এখনো সময় হয় নি। যার নামে উপোস করে রইলে, সে তো বেশ নিজের ছেলেপুলেকে খাইয়ে দাইয়ে, নিজে খেয়েদেয়ে আরাম করে গিয়ে বিছানা নিয়েছে। একবার তো মুখ ফুটে বললেও না যে, এসো খাও। বলে, 'মা মরে ঝিয়ের লেগে, ঝি মরে থোঁড়া নেগের লেগে—রঘুর ভেতরে ভেতরে ভয়ানক একটা কষ্ট হচ্ছিল। তার ওপর মুলিয়ার এই-সব ছুঁচ ফোটানো কথা যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছিল। কাতর হয়ে বললে—তোমার মনের ইচ্ছে তো পূরণ হয়েছে। এবার যাও, ঢাক নিয়ে বাজাও।

মুলিয়া—চলো, খাবার বেড়ে বসে আছি।

রঘু—আমায় জ্বালাতন কোরো না। তোমার জন্যে আমারও বদনাম হল। তুমি যদি কারুর কথা না ভাব, অন্যেরই বা কী গরজ পড়েছে আমার খোসামোদ করতে আসবে? যাও, ছোট মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, বাচ্ছারা আম কুড়োতে গেছে। 'লু' চলছে, ওদের ধরে নিয়ে আসব?

মুলিয়া হাতের বুড়ো আঙুল চিতিয়ে ধরে বলল—আমার এই দায় কেঁদেছে! তোমার গরজ থাকে, তুমি একশো বার গিয়ে খোসামোদ করোগে।

পান্না ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। রঘু তাকে শুধোল—ছোঁড়াগুলো বাগানে ঘুরতে গেল যে, 'লু' চলছে।

পান্না—তা ওদের আর কে খবরদারি করবে? বাগানেই যাক, আর গাছেই চড়ুক, আর জলেই ডুবুক, যা প্রাণে চায় করুক গে। একলা আমি কতদিক দেখব?

রঘু—যাব, গিয়ে ধরে আনব ?

পান্না—তা তোমার নিজের টানে যখন যাও নি, আমার কথায় যেতে যাবে কেন ? আমিই বা তোমায় বলতে যাব কেন ? আটকাতে পারতে। তোমার চোখের ওপর দিয়েই তো গেল।

পান্নার মুখের কথা ফুরোবার আগেই রঘু হাতের ডাব মাটিতে ফেলে দিয়ে বাগানের দিকে দৌড়োল।

ছয়

ছেলেদের সঙ্গে করে বাগান থেকে ফিরে এসে রঘু দেখল মুলিয়া তখনো চালাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে। বললে—তুই খেয়ে নিগে যা না। আমার এ বেলা মোটেই খিদে নেই।

মুলিয়া চিবিয়ে চিবিয়ে বললে—হ্যাঁ, তা খিদে থাকবে কেন ? তোমার ভায়েদের তো খাওয়া হয়েছে, তাতেই তোমার পেট ভরে গেছে। ধন্যি !

রঘু দাঁতে দাঁত চেপে বললে—আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে কোনো লাভ হবে না মুলিয়া। খাওয়া পালিয়ে যাচ্ছে না। একবেলা না খেলে মরব না! তুমি কী মনে করেছ ? এ বাড়িতে আজ যা ঘটল তা বড়ো কম কাণ্ড নয়। তুমি কি ভেন্ন চুলোয় আগুন দিয়েছ, আমার পাঁজরায় আগুন জ্বালিয়েছ। আমার বড়ো জাঁক ছিল, যে যত যাই ঘটুক আমার বাড়িতে আমি ঘর-ভাঙার রোগ ঢুকতে দেব না। তা তুমি আমার গুমোর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছ। বেশ করেছ। নিয়তির মার—

মুলিয়া একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। বলল—যত আপসানি তো দেখছি তোমার একলারই। আর যে কারুর কিছু পুড়ছে তা তো মনে হয় না। এক তুমিই জল থেকে আগুনে ঝাঁপাচ্ছ, আগুন থেকে জলে।

রঘু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে—কেন কাটা ঘায়ে নুন ছিটোচ্ছ বলো তো ? তোমার জন্যেই আমার উঁচু মাথা ধুলোয় লুটোল। এই সংসার আমিই হাতে করে, বুকের রক্ত দিয়ে তিল তিল করে গড়েছি। এ ঘর ভাঙলে আমার বুক ভাঙবে না কার ভাঙবে ? যাদের কোলে পিঠে করে বড়ো করলুম। তারা হবে আমার জ্ঞাতি শরিক। যাদের ছেলের মতন করে বকেছি, শাসন করেছি, তাদের ওপর চোখ তুলে কথা কইবারও ক্ষমতা থাকবে না আর। আজ যদি ওদের ভালোর জন্যও কিছু বলি, লোকে বলবে ভায়েদের ঠকিয়ে সম্পত্তি গ্রাস করছে। যাক, আমায় ছেড়ে দাও। খাবার কথা বোলো না, আমি এখন খেতে পারব না।

মুলিয়া—ভালোয় ভালোয় উঠে এসো, খাবে চলো। নইলে দিব্যি দোব।

রঘু—দেখ মুলিয়া, এখনো সময় আছে। জেদ ছাড়। এখনো সব ভাঙে নি। এখনো জোড়া লাগতে পারে।

মুলিয়া—যদি খেতে না বস তো আমার মরা মুখ দেখবে।

রঘু কানে হাত চাপা দেয়। বলে—ছি ছি, এ-সব কী বলছিস যা-তা। চল যাচ্ছি খেতে। নাওয়া ধোওয়া মাথায় থাক্। তবে একটা কথা বলে দিলুম মনে রেখো। রুটিই খাওয়াও আর লুচিই খাওয়াও আর ঘিয়ের জালায় ডুবিয়েই রাখ, যে দাগা আমায় দিলে তা কোনোদিনই জুড়োবে না।

মুলিয়া—সব জুড়োবে'খন। চলো দিকি। গোড়ায় ওরকম সবারই লাগে। পরে সব জুড়িয়ে যায়। দেখছ না ও তরফে এর মধ্যেই কেমন হাসিখুশির ধুম। ওরা তো মনে মনে এঁচেই রেখেছিল। দিন গুণছিল বসে বসে—কবে আলাদা হয়ে যাবে। এখন তো ওদের পোয়াবারো। আর একসঙ্গে থাকতে যাবে কেন? আর তো আগের মতন সোনা-রুপোর আমদানী নেই, যে ঘরে গিয়ে উঠবে। যা ছড়িয়ে পড়েছিল সব কুড়োনো হয়ে গেছে। এখন আর এ তরফের সঙ্গে কী দরকার?

রঘু আহত স্বরে বললে—আমার তো ঐতেই সবচেয়ে বেশি চোট লেগেছে। ছোটো মার কাছে আমি এটা মোটেই আশা করিনি।

রঘু খেতে বসল বটে কিন্তু ওর মনে হল বিষের ডেলা গিলছে। রুটি যেন খড়ের তৈরি। ডাল নয় তো যেন আমানির জল। জল খেতে গেল, গলা দিয়ে নামল না। দুধের বাটির দিকে ফিরেও তাকাল না। দু—চার গরাস মুখে দিয়েই উঠে পড়ল। যেন কোনো অতি প্রিয়জনের শ্রাদ্ধের ভোজ খাচ্ছিল।

রাত্তিরেও একই ব্যাপার। খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করল। কী করবে, বউয়ের মাথার দিবিা। দারুণ উদ্‌বেগে রাতভর ভালো করে ঘুমোতে পারল না। একটা অজানা আশঙ্কায় মন ছেয়ে রইল। ঘুমের ঘোরে মনে হল, বাপ ভোলা মাহাতো এসে দোরে বসে রয়েছে। তার চোখে যেন ভৎর্সনার দৃষ্টি। বার বার চমকে চমকে উঠল। ঘুম ভেঙে গেল।

এখন ওরা দুজনে একা একা বসে খায়। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না বিশেষ। যেন শত্রুরের ঘর করছে। রাত্তিরে ভালো ঘুম হয় না। চোখ বুজলেই বাপের বিষাদ মূর্তি ভেসে ওঠে। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে রঘু। পাড়ায় বেরোয় তাও যেন কেমন লুকিয়ে চুরিয়ে, মুখ নিচু করে হাঁটে, মাথা তুলে দাঁড়ায় না! যেন গো-হত্যা করেছে।

সাত

আরো বছর পাঁচেক কাটল। রঘু এখন দু'ছেলের বাপ। এখন ওদের ভদ্রাসনের উঠোনের মাঝ বরাবর পাঁচিল, ক্ষেতগুলোয় উঁচু আল বেঁধে আধাআধি বখরা হয়েছে,

গোরু বাছুর হালবলদ সব ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। কেদারের বয়স এখন ষোলোর ওপর। সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চাষের কাজে লেগেছে। খুন্নু গোরু চরায়। খালি লছমন এখনো টিমটিম করে পাঠশালায় যায় আসে। পান্না আর মুলিয়ার মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। এ ওকে দেখলে জ্বলে ওঠে। তবে মুলিয়ার ছেলে দুটো বেশির ভাগ পান্নার কাছেই থাকে। পান্নাই তাদের সাজায়, কাজল পরায়, কোলে নিয়ে নিয়ে ঘোরে। তবে তার জন্যে মুলিয়ার মুখ থেকে কৃতজ্ঞতার একটা আওয়াজও বেরোয় না কখনো। অবিশ্যি পান্না তার প্রত্যাশাও করে না। সে যা করে ভালোবেসে নিঃস্বার্থ হয়েই করে। তা ছাড়া মুলিয়ার অনুগ্রহের কোনো প্রয়োজনও তার নেই। তার দুই ছেলে রোজগেরে। মেয়েটাও এখন রান্নাবান্না করতে শিখেছে। সে নিজেও সংসারের আর-পাঁচটা কাজ দেখাশুনো করে। ওদিকে রঘুর অবস্থা তেমন সুবিধের নয়। একলা মানুষ, তার শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, আগের মতন খাটবার ক্ষমতা নেই, অকালে বুড়িয়ে গেছে। বয়েস তিরিশের বেশি নয় কিন্তু চুলে এর মধ্যেই পাক ধরেছে, কোমর দিনদিন নুয়ে পড়েছে। কাশিতে বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। দেখলে কষ্ট হয়। চাষবাসের কাজ হল মেহনতের কাজ। হাড়ভাঙা খাটুনি। সে শক্তি কোথায়! ক্ষেতের উপযুক্ত সেবা করে উঠতে পারে না। কাজেই মনের মতো ফসলও ওঠে না। ধার-কর্জও বাজারে কিছু হয়েছে। সেই চিন্তার বোঝাও মাথায় ভার হয়ে চেপে থাকে। এখন ওর দরকার ছিল একটু বিশ্রাম। একটু আরাম। এতদিনকার নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের পর আজ তো ওর মাথার বোঝা হালকা হবারই কথা, তাই তো হত। শুধু মুলিয়ার স্বার্থপরতা আর অদূরদর্শিতার দরুণ রঘুর ভরা ক্ষেত শুকিয়ে গেল। আজ যদি সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে থাকত, তবে কি আজ রঘুকে আর খাটতে হয়! তার তো আজ দেউড়িতে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে ডাবের জল খাবার কথা। ভাই কাজ করবে, ও পরামর্শ দেবে গাঁয়ের মুখিয়া মাহাতো হয়ে বসবে। লোকজনে সমীহ করবে। ঝগড়া কাজিয়ায় ওকে সালিশ মানবে, ওর কাছে নালিশ জানাবে; ওর বিচার মাথা পেতে নেবে। যেমন হয়। সাধুসন্তের সেবায় মশগুল হয়ে দিন কাটাতে পারত রঘু। কিন্তু সে সুযোগ আজ বহুদিন হল গত হয়েছে। এখন কেবল সঙ্গের সাথী দুশ্চিন্তার বোঝা। দিনে দিনে তিলতিল করে ঘা বেড়ে চলেছে।

শেষের দিকে রোজই অল্প অল্প জ্বর হতে আরম্ভ করল। মনোকষ্ট দুশ্চিন্তা, কঠোর পরিশ্রম আর অভাব—একনাগাড়ে চলার এই ফল। প্রথমে তেমন গা করে নি। ভাবল আপনি হয়েছে আপনিই সেরে যাবে। কিন্তু দুর্বলতা ক্রমেই বাড়ছে দেখে চিকিৎসার কথা চিন্তা করল। যে যা ওষুধ বলে খায়। ডাক্তার কবিরাজ করবে এমন সামর্থ্য আর কই? আর সামর্থ্য থাকলেই বা কী হত। কিছু টাকা পয়সা ব্যয় করা

ছাড়া লাভ কিছু হত না। কারণ এ রোগ তিলতিল করে শরীর ক্ষয় করে। পরিপূর্ণ বিশ্রাম আর পরিপোষক আহার এই এ রোগের আসল চিকিৎসা। তাই বলছি ওষুধ খেয়েও কোনো ফল হত না। কারণ ঘরে বসে বলবর্ধক ভোজন আর বাগানে গিয়ে দু'দণ্ড মলয়মারুত সেবন করার সংগতি ছিল না রঘুর। অতএব দুর্বলতা দিন দিন বেড়েই চলল।

পান্না সময় পেলে মাঝে মাঝে এসে রঘুর কাছে ব'সে দুটো সান্ত্বনার কথা শোনায়। কিন্তু তার ছেলেরা আজকাল রঘুর সঙ্গে কথাও বলে না। ওষুধবিষুধ এনে দেওয়া তো দূরের কথা আড়াতে বরং হাসি মস্করা করে। দাদা ভেবেছিল ভেন্ন হয়ে সোনার দেয়াল দেবে। আর বউঠাকরুণ বোধ হয় সোনারুপোয় নিজেকে মুড়ে রাখবে ঠিক করেছিল। এখন দেখি কাকে কার দরকার পড়ে। কেঁদে কুল প'বে না, এই বলে দিলুম। আর তাও বলি, অত 'নেই নেই' 'চাই চাই' ভালো নয়। মানুষের সামর্থ্যে যা কুলোয় তাই করা উচিত। পয়সার জন্যে কি জান দিয়ে দিতে হবে?

পান্না বলে—আহা, রঘু বেচারার কী দোষ?

কেদার বলে—তুমি রাখ রাখ, ও-সব জানা আছে আমার। আমি হ'লে অমন বউকে ছড়ির আগায় রেখে সিধে করতুম। মেয়েমানুষের গোঁ ভাঙতে পারব না তো পুরুষ কিসের? তা নয়, আসলে ও-সব দাদারই চাল। সাজানো ব্যাপার।

রঘুর পরমায়ু টিমটিম করে জ্বলছিল। একদিন বাতি নিবে গেল। এতদিনে তার সব চিন্তার অবসান হল।

শেষ সময়ে কেদারকে খুঁজেছিল। কিন্তু কেদার তখন আখের ক্ষেতে জল দিচ্ছে। খুব ব্যস্ত। আসল কথা, ওষুধটষুধ আনতে বলবে হয়তো, এই ভয়েই আসে নি। আখের ক্ষেতটেত অছিলা।

আট

মুলিয়ার জীবন অন্ধকার হয়ে গেল। যে মাটির ওপরে তার সাধের পাঁচিল তুলেছিল তার ভিত ধসে পড়ল। যে খুঁটি ধরে তার অত নাচানাচি তার গোড়া শুদ্ধ উপড়ে ভেঙে গেল। এখন পাড়ার লোকে বলাবলি করছে—'এ হল ভগবানের সাজা। হুঁ হুঁ দেমাকে মাটিতে পা পড়ত না একেবারে। এখন? হ'ল তো?'··· সব কথাই কানে আসে মুলিয়ার। মরমে মরে থাকে সদ্য শোকার্তা মুলিয়া। বাচ্চা দুটোকে বুকে চেপে ভাঙা ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে পড়ে থাকে। অথৈ শোকে—লজ্জায়—ভয়ে। গাঁয়ের জনপ্রাণীকে মুখ দেখাবার সাহস হয় না তার। কিন্তু তারপর শোক লজ্জা ভয় সব ছাপিয়ে দেখা দেয় চিন্তা। দিন চলবে কেমন করে। কার আশ্রয়ে দাঁড়াবে? কার

ভরসায় চাষবাস চলবে। বেচারা রঘু—রুগ্‌ণ, দুর্বল, অশক্ত রঘু। শেষ দিনটি অব্দি বিশ্রাম নেয় নি। কাজ করে গেছে। মাঝে মাঝে মাথায় হাত দিয়ে ক্ষেতের মধ্যেই বসে পড়ত। হাঁপাত। আবার দম নিয়ে উঠে দাঁড়াত। আজ কে সামলাবে—ক্ষেতের তৈরি ফসল, খামারের সদ্যকাটা ডাঁইকরা ফসল। ওদিকে আ'খের ক্ষেত শুকিয়ে উঠছে। জল ছেঁচা দরকার। সেও একলা-দোকলার কাজ নয়। তিন তিনটে জন মজুর কম করেও লাগবে। কোথায় পাবে সে। এমনিতেই এখন গাঁয়ে জলের অভাব। তায় ও একা মেয়েমানুষ। অথৈ জলে পড়ল মুলিয়া।

দিন বসে থাকে না। এমনি করেই তেরো দিন কাটল। ক্রিয়াকর্ম চুকেবুকে গেল। পরের দিনই সকালে ছেলে দুটোকে কোলে কাঁখে নিয়ে মুলিয়া খামারে গেল—ফসল মাড়াই করতে। একজনকে গাছতলায় নরম ঘাসের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, আর-এক জনকে ওখানেই বসিয়ে রেখে কাজে লাগল। এক হাতে চোখের জল মোছে, অন্য হাতে বলদ সামাল দেয়। ভগবান এই লিখেছিলে কপালে। এই করতেই জন্ম হয়েছিল? তাই দেখতে দেখতে কটা বছরের মধ্যে সব ওলটপালট করে দিলে! কী থেকে কী হয়ে গেল! এই তো গেল বছর এমনই দিনে খামারে রঘু ফসল মাড়াই করেছে। ও রঘুর জন্যে ঘটিতে সরবৎ আর মটরের ঘুগনি বানিয়ে এনেছে। আজ কোথায় গেল সে দিন। সামনে পেছনে আজ কেউ কোথাও নেই যে 'আহা' বলে।—তা হোক। দর্প দিয়েই বুক বাঁধল মুলিয়া। হোক কষ্ট। তবু কারুর চাকরাণী তো নই। না, ভেন্ন হয়েছে বলে আজও কোনো অনুশোচনা নেই মুলিয়ার।

হঠাৎ ছোটো বাচ্চাটার কান্না শুনে সে'দিকে চোখ ফেরাল। বড়ো ছেলেটা ছোটোটাকে আদর করছে। কান্না ভোলাবার জন্যে চেষ্টা করছে। আধ-আধ বুলিতে বলছে—'কেঁদো না, তুপ তলো!' তার মুখের ওপর মুখ রেখে চুমু খাচ্ছে। তাতেও হচ্ছে না দেখে প্রাণপণে বুকে আঁকড়ে ধরে চুপ করাবার চেষ্টা করছে। শেষে কিছুতেই যখন হালে পানি পেল না তখন সেও কান্না জুড়ে দিল।

এমন সময় পান্না দৌড়ে এল। ছোটো ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি বুকে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে বললে—হ্যাঁরে বউ, ছেলে দুটোকে আমার কাছে রেখে আসিস নি কেন? দেখ তো কত কষ্ট পেয়েছে মাটির ওপর পড়ে। আহা রে বাচ্ছা। আমি মরে গেলে তোদের যা খুশি করিস বুঝলি। যে-কটা দিন বেঁচে আছি বাচ্ছাগুলোকে আর কষ্ট দিস নি। তোরা ভেন্ন হয়েছিস বলে বাচ্চা-কাচ্চা ভেন্ন হয় রে!

মুলিয়া বললে—তোমারও তো হাত খালি ছিল না মা, তুমিই বা কী করবে।

পান্না—তা তোমারই বা এক্ষুনি খামারে আসার কী দরকার ছিল মা? মাড়াই কি আটকে থাকত? তিন তিনটে ছেলে রয়েছে বাড়িতে। এই সময়েই যদি কাজে না

লাগে তবে কবে কাজে লাগবে। কেদার তো কালই আমাকে বলছিল মাড়াইয়ের কথা। আমিই বরং বারণ করলুম। বললুম, আগে তাড়াতাড়ি করে আখে জল দেওয়াটা সেরে নে। মাড়াই তো দশ দিন বাদে হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ছিঁচাই না হলে আখ শুকিয়ে যাবে। তা গতকাল থেকে জল পড়তে শুরু হয়েছে। পরশু দিন নাগাদ ছেঁচা শেষ হয়ে যাবে। তখন মাড়াইয়ে হাত দেওয়া যাবে! তুমি বললে বিশ্বাস করবে না—রঘু যেদিন থেকে গেছে, কেদারের যে কী চিন্তা হয়েছে। দিনের মধ্যে কিছু না হোক দুশো বার এসে এসে আমায় জিজ্ঞেস করছে—হ্যাঁ মা, ভাবী কি খুব কান্নাকাটি করছে? মা, বাচ্চাগুলোর কষ্ট হচ্ছে না তো? খাওয়া হয়েছে তো ওদের? কোথাও কোনো বাচ্ছা কেঁদে উঠেছে কি দৌড়ে এসে বলছে—মা, মা দেখ দেখ ঐ বুঝি কে কাঁদছে। দেখ তো কী হল, কাঁদছে কেন? কাল নিজেই কাঁদছিল। বলছিল—দাদা যে এত শিগ্‌গির ফাঁকি দেবে, যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতুম তো শেষ সময় একটু সেবা করতুম। আগে তো, মা, ওকে ডেকে ডেকে ঘুম ভাঙানো যেত না। আর এখন না ডাকতেই এক প্রহর রাত থাকতে উঠে কাজে লেগে যায়। খুন্নু বুঝি একবার বলে ফেলেছিল, আগে নিজেদের ক্ষেতে জল দিয়ে তারপরে দাদার ক্ষেতে দোব। তাই শুনে কেদার তাকে এমন ধমক দিয়েছে যে বেচারার আর মুখে রা নেই। বললে খবর্দার আমার তোমার করবি না আজ থেকে। জেনে রাখিস, আজ যদি দাদা না মাথার ওপর থাকত তা হলে আর বেঁচে থাকতে হত না। দোরে দোরে ভিক্ষা করতে হত। আজ বড়ো ক্ষেতের মালিক হয়েছিস। খেয়াল রাখিস, দাদার দয়াতেই আজ এতো বড় হয়েছিস। সেদিন খেতে দিয়ে ডাকতে গেছি, দেখি দাওয়ায় বসে বসে কাঁদছে। বললুম—কাঁদছিস কেন রে। তা বলে—মা, দাদা আমার শুধু আলাদা হওয়ার দুঃখে দুঃখেই মরে গেল। নইলে তার কি মরার বয়েস! মাগো তখন কেন বুঝি নি দাদা আমার কী মানুষ ছিল, নইলে কি তাকে ছেড়ে থাকতুম, তার ওপরে রাগ করতে পারতুম।

পান্না এরপর গভীর অর্থবহ দৃষ্টিতে মুলিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে—আমার ছেলেরা তোমায় আর আলাদা থাকতে দেবে না বউমা। ওরা বলেছে দাদা যেমন আমাদের জন্যে জীবন দিয়েছে, তেমনই তার ছেলেদের জন্যে আমরা জীবন দোব।

মুলিয়া কেবল শুনে যাচ্ছে। তার চোখের জল আর থামে না। পান্নার কথায় আজ শুধু অকৃত্রিম দরদ, অবিমিশ্র সহানুভূতি, কেবল সহৃদয় সান্ত্বনা, আর ঐকান্তিক, অকপট, অনাবিল ভালোবাসা আর বেদনা। এই খাঁটি দুঃখের আবহাওয়ায় মুলিয়ার মন আজ এমন করে পান্নার ওপর আকৃষ্ট হল, যেমনটি এর আগে আর কখনো হয় নি।

যার কাছ থেকে খালি ব্যঙ্গ আর উপহাস আর পরোক্ষ ক্ষতিরই আশঙ্কা করে আসছিল, তার হৃদয়ে এত বড় নিবিড় অনুরাগের পরিচয় পেয়ে, মমতা আর শুভেচ্ছার এই পবিত্র প্রকাশ দেখে মুলিয়া স্তব্ধ হয়ে রইল।

আর আজ এই প্রথম তার নিজের উপর বীতরাগ এল, নিজের স্বার্থগৃধ্নুতার উপরে ঘৃণা। এই প্রথমবার আলাদা হওয়ার বিরুদ্ধে তার অন্তর সক্ষোভে ছি-ছি করে উঠল।

নয়

এই ঘটনার পর আরো পাঁচ বছর কেটে গেছে। পান্না এখন পুরোদস্তুর বুড়ি। কেদার বাড়ির কর্তা। মুলিয়া বাড়ির কর্ত্রী। খুন্নু আর লছমনের বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু কেদার আজো আইবুড়ো রয়েছে। বললে বলে বিয়ে করব না। বেশ কয়েক জায়গায় কথাবার্তা হয়েছিল। কোথাও কোথাও সম্বন্ধ পাকা হয় হয় হয়েছিল, তত্ত্বও এসেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পাত্রের মত হয় না। পান্না অনেক চেষ্টা করেছে, অনেক জালও ফেলেছে কিন্তু তাকে ফাঁদে ফেলা যায় নি। বলে—মেয়েছেলের যে কত সুখ, তা জানি। বউ ঘরে এলেই বেটাছেলের মন ঘুরে যায়। তখন আর কেউ কিছু নয়। বউই সর্বস্ব হয়ে ওঠে। মা বাপ ভাই বোন বন্ধু বান্ধব সব পর হয়ে যায়। আমার দাদার মতো মানুষেরই যখন মাথা ঘুরে যেতে পারে, তখন অন্য লোকের কথা তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ভগবানের দয়ায় দুটো ছেলে তো রয়েইছে, আবার কী চাই। বিয়ে না করেই যখন দু-দুটো ছেলে পেয়ে গেলাম, তখন বিয়ের দরকারটা কী? আর আপন পর মানুষের মনে। আপন ভাবলেই আপন, পর ভাবলেই পর।

একদিন পান্না বললে—তোর বংশ থাকবে কী করে?

কেদার—কেন। আমার বংশ তো ঠিকই চলছে। ও ছেলে দুটোকে আমি নিজের ছেলে বলেই ভাবি।

পান্না—তা বটে। ভাবলেই সব হয়। তা ছেলেদের মাকেও তুই নিজের বউ বলেই ভাবিস বোধ হয়।

কেদার বলে—যাঃ তুমি যে গালাগাল দিতে শুরু করলে।

পান্না—কেন গাল হবে কেন। তোর ভাজ তো বটে।

কেদার—তা হলেই বা। আমার মতন কাঠ গোঁয়ারকে ওর পছন্দ হবে কেন।

পান্না—তা তুই যদি বলিস তো আমি ওর মন জানি।

কেদার—না না মা, শেষকালে কান্নাকাটি শুরু করে দেবে আবার।

পান্না তবুও নাছোড়বান্দা। তখন কেদার বললে—আমি জানি না, তোমার যা খুশি করো।

পান্না ছেলের মনের আন্দাজ পেল। ও, তা হলে ছেলের এই মনের কথা! মুলিয়ার ওপর মন। থালি সংকোচে ভয়ে কিছু বলতে পারে নি।

পান্না সেইদিনই মুলিয়াকে ধরল—কী করি বল তো বউ, মনের বাসনা মনেই পুষে রাখতে হয়। কেদারটার ঘরসংসার দেখে যেতে পারলে মনটায় শান্তি পেতুম। নিশ্চিন্তে মরতে পারতুম।

মুলিয়া বলে—তা তোমার ছেলে তো ধনুক-ভাঙা পণ ধরেছে। বিয়ে করবেই না বলে।

পান্না—বলে, যদি এমন মেয়ে পাই যে পরিবারে মিলমিশ বজায় রেখে চলবে। ভাঙন ধরাবে না। তা হলে করতে পারি।

মুলিয়া—তা এমন মেয়ে এখন কোথায় ফরমাস দিয়ে গড়াই। দেখ যদি খুঁজে পাও।

পান্না—আমি অবিশ্যি একটা খোঁজ পেয়েছি।

মুলিয়া—তাই নাকি, সত্যি? কোন্ গাঁয়ের মেয়ে গো মা?

পান্না—সে এখন বলব না। তবে মোদ্দা কথা বলতে পারি, সে মেয়ের সঙ্গে যদি কেদারের বিয়ে হয় তা হলে এ সংসারের পক্ষেও ভালো, আর কেদারের জীবনটাও ভরে উঠবে। কিন্তু এখন মেয়ে রাজি হয় তবে তো?

মুলিয়া—কেন? রাজি হবে না কেন? এমন সুন্দর দেখতে, এত সুন্দর স্বভাব, শক্তসমর্থ রোজগেরে ছেলে কোথায় পাবে? আগের জন্মে নিশ্চয় সাধুসন্নিসি ছিল, নইলে সংসারে ঝগড়া বিবাদ হবে বলে বিয়ে করে না, এমন কে কোথায় শুনেছে। কোথায় থাকে সে মেয়ে বলো না, আমি গিয়ে তাকে ঠিক রাজি করিয়ে নোব।

পান্না—তা তুই ইচ্ছে করলেই হয়। তোর ওপরেই নির্ভর করছে।

মুলিয়া—আমার ওপরে নির্ভর! তা বেশ তো, আমি আজই চলে যাব। আমি তার পায়ে ধরে মত করাব।

পান্না—তা হলে বলেই ফেলি। সে মেয়েটা তুই নিজেই।

মুলিয়া একেবারে লাল হয়ে গেল। বললে—যাও, যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল দিয়ো না।

পান্না—কেন, গালাগাল কিসের। তোর দেওর তো।

মুলিয়া—তা আমার মতন বুড়িকে পছন্দ করবে কেন?

পান্না—না, পছন্দ আবার করবে না। তোকে ছাড়া আর মেয়েই চোখে দেখে না। কেবল ভয়ের চোটে কিছু বলতে পারে না। কিন্তু ওর মনের কথা আমি জেনে ফেলেছি।

বৈধব্যের রূঢ়তায় শোকে বিপন্ন, মুহ্যমান, বিবর্ণ হয়ে গেছিল মুলিয়ার মুখটা ; মুখ নয় মুখপদ্ম। পীতাভ পাণ্ডুর সেই পদ্মটা এখন কথায় কথায় অরুণবরণ হয়ে উঠল। গত দশ বছর ধরে ও যা-কিছু হারিয়ে ফেলেছিল, সে সবই যেন আজ এই মুহূর্তে সুদে আসলে ফিরে এল ওর কাছে। ওর সেদিনের লাবণ্য, সেই উন্মেষ, সেই বিকচ যৌবনের আকর্ষণ সেই কম্প্র নমনীয় তনু, সেই আয়ত চোখের আহ্বান। সব।

সুভাগী

মনুষ্য চরিত্রে যা' ঘটে, তুলসী মাহাতোর ক্ষেত্রেও তাই হলো, অর্থাৎ ছেলে রামু অপেক্ষা মেয়ে সুভাগীকেই বেশী ভালবাসেন। রামু জোয়ান হলে কি হবে, কুঁড়ের বাদশা। সুভাগী এগার বছর বয়সেই সংসারের যাবতীয় কাজ করে। তাছাড়া চাষের কাজেও বেশ নিপুনা। মেয়ে কাজের হয়েছে দেখে মায়ের ভয় হয়। ভাবেন, শেষ পর্যন্ত বাঁচবে তো! লোকে খারাপ করে দেবে না তো! সে যে বাল্য-বিধবা!

সুভাগী অল্পবয়সে বিধবা হওয়ায় সংসারটা হয়ে গেছে নিস্তব্ধ, নিঝুম। মেয়ের দুঃখে লক্ষ্মীদেবী দিনরাত কাঁদত। বাবা তুলসী মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন। মা-বাবার অবস্থা দেখে সুভাগীও চোখের জল ধরে রাখতে পারে না। কাঁদতে কাঁদতে মাকে বলে—মা, কাঁদছো কেন? আমি তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাবো না। অবলা, নির্বোধ ও বাল্যবিধবার কথা শুনে মায়ের চোখ থেকে বাঁধ-ভাঙা জল বেরিয়ে আসে। মনে মনে বলেন—হে ঈশ্বর, তোমার এ কী লীলা! তোমার খেলা কি অপরকে দুঃখ দেওয়া! লোককে পাগল করে দেওয়া! এ তুমি কী পাগলামী করছো ঠাকুর! এ পাগলামীর কী অর্থ? তুমি কেন অপরকে কাঁদিয়ে হাসো? তোমাকে তো লোকে দয়ালু বলে, এই কি তোমার দয়া?

বালিকা সুভাগী মনে মনে ভাবে—অনেক টাকা থাকলে বেশ মজা হতো। বাজারে গিয়ে মা-বাবার জন্যে ভাল-ভাল কাপড়-চোপড় নিয়ে আসতাম। আহা, তাহলে মা-বাবা কতই না খুশী হতো!

দুই

তারপর সুভাগী পরিপূর্ণ যুবতী হলে পাড়ার লোকের তুলসী মাহাতোকে পরামর্শ

দিয়ে বলে—সুভাগীর আবার বিয়ে দাও। এই ভাবে ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয়। গাঁয়ে-ঘরে যাতে নিন্দে না রটে, সেই রকম তো করতে হবে?

উত্তরে তুলসী বলেন—ভাই, আমি তো তৈরী কিন্তু সুভাগী কি রাজী হবে?

একদিন হরিহর সুভাগীকে ডেকে বুঝিয়ে বললেন—দেখ মা, তোর ভালোর জন্যেই একটা কথা বলছি। তোর মা-বাবার বয়েস হয়েছে, তাদের ভরসায় আর ক'দিন থাকবি? তোর বাকি-জীবনটার কথাও তো ভাবতে হবে?

সুভাগী অবনত মস্তকে উত্তর দেয়—কাকা তুমি যা বলতে চাও বুঝেছি, কিন্তু মন কিছুতেই সায় দেয় না। আমি সুখের কথা একবারও চিন্তা করি না। দুঃখ ভোগ করার জন্যেই আমি এ সংসারে এসেছি। তাই বলছি, তুমি আমাকে যা করতে বলবে করবো, কিন্তু নতুন করে ঘর করার কথা আর বলো না। আমার খারাপ কিছু দেখলে নিশ্চয়ই তোমরা শাস্তি দেবে, আমি তা' মাথা পেতে নেবো। আমি যদি বাপের বেটি হই, তাহলে দেখবে, আমার কথা একটুও নড়-চড় হবে না। দেখো কাকা, সব কিছুরই মালিক ভগবান! তুমি-আমি কী বা করতে পারি বলো!

রামুও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলে উঠলো—দেখ, তুই যদি ভেবে থাকিস যে, দাদা রোজগার করবে আর মৌজ করে খাবো, তা' হবে না বলে দিচ্ছি। মনে রাখিস জনম-ভোর কেউ কাউকে খাওয়ায় না।

রামুর বৌ আরো এককাটি সরেস। তাই, চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বললে—দেখো, আমরা কারোর ধারধারি না যে, জনমভোর পেট ভরাতে হবে। খেতে-পরতে গেলে গতর খাটাতে হয়, এমনিতে কেউ বসিয়ে-বসিয়ে খাওয়াবে না, মনে রেখো।

সুভাগী স্বগর্বে উত্তর দেয়—শোনো বৌদি, তোমরা যেন কোন সময় ভেবো না যে, তোমাদের ভরসায় আমি বসে আছি। জানো তো, যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন। তোমরা নিজেরটা দেখে নাও, আমার জন্যে তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না।

রামুর স্ত্রী যখন বুঝতে পারলো যে সুভাগী আর বিয়ে করবে না, তখন দিনরাত তার পিছনে লেগে থাকে। পান থেকে চুণ খসলেই আরম্ভ হয়ে যায় ঝগড়া-ঝাঁটি। তাকে কাঁদনোই ছিল বৌদির একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই বেচারী সুভাগী এক-প্রহর রাত থাকতেই উঠে বাসন-পত্র মাজে, ঘর-দোর ন্যাতা দেয় ঘুঁটে দেয়। তারপর মাঠে যায় ক্ষেতের কাজ করতে। দুপুর বেলায় ঘরে এসে রান্না করে সবাইকে খাওয়ায়। বিকালে মায়ের মাথা আঁচড়ে দেওয়া, গা-হাত দোলে দেওয়া এবং রাতে পায়ে তেল-মালিশ করে দেওয়াও তার কাজ। তুলসী তামাক খেতে বড় ভালবাসেন, তাই তাঁর জন্যে বার-বার তামাক সাজার কাজও আছে। অর্থাৎ সুভাগী যতক্ষণ ঘরে থাকে, মা-বাবাকে কিছুই

করতে দেয় না। তবে দাদার প্রতি সে অসন্তুষ্ট। কারণ, জোয়ান ছেলে কাজ না করে বসে থাকলে সংসারটা চলবে কি করে? সুভাগীর এরকম ন্যায়-পরায়ণতা রামুর মোটেই ভাল লাগে না। স্ত্রী ও মা-বাবাকে কুটি কেটে দুটি করতে দেয় না দেখে তার গা জ্বলে যায়। তাই, একদিন রামু রেগে সুভাগীকে বললে—দেখ, ওদের যখন সংসারের কিছু করতেই দিবি না, তখন মা-বাবাকে নিয়ে আলাদাই তো থাকতে পারিস।

সুভাগী দাদার কথায় উত্তর দেয় না, কারণ তার ভয়, কথা বেড়ে যাবে। মা-বাবাও ছেলের কথা শুনলেন। মাহাতো থাকতে না পেরে বললেন—কিরে রামু কী হয়েছে? বেচারীর পিছনে আবার লাগলি কেন?

রামু এগিয়ে এসে বলে—তুমি আবার নাক গলাচ্ছো কেন, আমি তো ওকে বলছি।

তুলসী—দেখ, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, ওকে কিছু বলতে পারবি না। মরে গেলে যা' পারিস করবি। বুঝতে পারছি ও বেচারীকে বোধ হয় ঘরে টিকতে দিবি না।

রামু—মেয়ে যদি তোমার এত আদরের তবে গলায় বেঁধে রাখো না! তা বলে অন্যায় সহ্য করতে পারবো না।

তুলসী—ভাল কথা, কালই গাঁয়ের পাঁচজনকে ডেকে ভাগ-বাঁটোরা করে দেবো। তাতে যদি ঘর ছেড়ে দিস, দিবি। সুভাগী এ ঘরেই থাকবে, তা বলে দিলাম।

রাতে মাহাতো শুয়েছেন, কিন্তু মনে ভীড় জমিয়েছে সেই পুরোন কথা। রামুর জন্মোৎসব। সে দিন টাকা ধার করে জলসা বসিয়ে ছিলেন, কিন্তু সুভাগী যখন জন্মালো, তখন ঘরে টাকা থাকা সত্বেও একটা পয়সা খরচ করা হয়নি। কেন না, ভেবেছিলেন—পুত্র রত্ন আর কন্যা পূর্বজন্মের পাপের ফল। সেই রত্ন আজ কত কঠোর আর সেই কন্যা আজ কত মঙ্গলময়ী।

তিন

পরের দিন মাহাতো গ্রামের পাঁচজন লোক ডেকে এনে বললেন—দেখুন, রামুর সঙ্গে আমার আর বনিবনা হচ্ছে না। আপনারা বিচার করে আমাকে যা' দেবেন, তাই নিয়ে আমি আলাদা থাকবো। রাতদিন কচ্‌কচানি আর আমার ভাল লাগে না।

গ্রামের মোক্তারবাবু সজন সিং। বড় ভাল লোক। তিনি রামুকে ডেকে বললেন—কি রে রামু, তুই মা-বাবাকে আলাদা করে দিতে চাস? বৌয়ের কথা শুনে মা-বাবাকে সংসার থেকে সরিয়ে দিবি? তোর লজ্জা করছে না? ছ্যা-ছ্যা! রাম! রাম!

রামু উত্তপ্ত স্বরে বলে—এক জায়গায় থেকে অশান্তি হলে আলাদা থাকাই ভাল।

সজন সিং—এক জায়গায় থাকতে তোর কী এমন কষ্ট হচ্ছে?

রামু—সেটা এককথায় বলা যাবে না।

সজন সিং—ঠিক আছে, কিছু তো বল্।

রামু—ওরাই তো এক জায়গায় মিলেমিশে থাকতে পারছে না।

এই বলে রামু রেগে চলে যায়।

মাহাতো—আপনারা দেখলেন তো ওদের মেজাজ! যদি মনে করেন যে, চারটে ভাগের তিনটে ভাগ ওকে দেবেন, সেও ভী আচ্ছা, তবু অমন বদমাইশের সঙ্গে থাকতে পারবো না। ভগবান মেয়েটার এইরকম দশা না করলে জমিজমা নিয়েই বা কি করতাম! যেখানে থাকতাম, সেখানেই অন্ততঃ দুমুঠো খেতে পেতাম! ভগবান যেন সাত জন্মে কারোর অমন বেটা না দেয়। জানেন,—"ছেলে অপেক্ষা মেয়ে অনেক ভাল, মেয়েরা কুলবতী হয়।"

সুভাগী বলে ওঠে—বাবা, আমার জন্যেই কি তুমি ভাগ-বাঁটোরা করতে বসেছো? তার চেয়ে আমাকেই আলাদা করে দাও না! আমি খেটে-খুটে নিজের পেটটা চালিয়ে নিতে পারবো। আলাদা থেকেও তোমাদের সেবা করতে পারলেই আমার সুখ। তবু এ সংসারটা ভেঙে যাওয়া আমি চোখে দেখতে পারবো না। নিজের মাথায় এমন কলঙ্ক নিতে চাই না।

মাহাতো বললেন—না মা, তা হয় না! তোকে আলাদা কেন করে দেবো! রামুর মুখ আমি আর দেখতে চাই না, তাই দূরে থাকতে চাই।

রামুর স্ত্রী বলে—আপনি যার মুখ দেখতে চান না, সে কি আপনার পূজো করবে ভেবেছেন? আমরাও কাউকে পরোয়া করি না জানবেন।

মাহাতো ধৈর্য হারিয়ে পুত্র বধূকে দাঁত খিঁচিয়ে মারতে যান, কিন্তু লোকেরা ধরে ফেলে।

চার

সংসার আলাদা হওয়ায় মাহাতো আর লক্ষ্মীদেবী যেন পেন্‌সন পেলেন। আগে, দুজনেই সুভাগীর নিষেধ সত্ত্বেও কিছু না কিছু কাজ করতেন, কিন্তু এখন পরিপূর্ণ বিশ্রাম। একটু দুধের জন্যে দু'জনেই লালায়িত হতেন দেখে সুভাগী কিছু টাকা সঞ্চয় করে একটা গাইমোষ নিয়ে এসেছে। দুধ, বুড়ো-বুড়ীর পক্ষে খুবই বলকারক। ভাল খাবার না পেলে তাঁরা সুস্থ থাকবেন কি করে? চৌধুরী অবশ্য তার জন্যে যথেষ্ট বিরোধীতা করেছেন। তিনি বার-বার বলেছেন, রোজগার যখন কম, তখন ওসব

ঝামেলা করতো গেলি কেন! সুভাগীর বক্তব্য—একটু দুধ না হলে বাবা ভাল খেতে পারে না।

লক্ষ্মীদেবী হেসে বলেন—আগে অবশ্য ও দুধ খেতো না, তবে এমন একটু করে হলে ভাল হয়।

গ্রামের সবার মুখে সুভাগীর প্রশংসা। বলে—মেয়ে নয় যেন দেবী, ও পুরুষদের চেয়ে বেশী কাজ করে মা-বাপের সেবা-যত্নের কোন ত্রুটী রাখে না। সজন সিং প্রায়ই বলেন—মেয়েটা দেবী হয়েই যেন জন্মেছে। কিন্তু সুভাগীর বাবা এরকম সুখ বেশী দিন ভোগ করতে পারলেন না।

প্রায় সাত-আট দিন হলো মাহাতোর একটানা জ্বর। মনে হয় ম্যালেরিয়া। কোন ভাবেই কাঁপুনি থামানো যাচ্ছে না। নিরুপায় হয়ে লক্ষ্মীদেবী বিছানার পাশে বসে কাঁদছেন। একদিন রোগী জল চাইলে সুভাগী তাড়াতাড়ি জল আনতে যায়, কিন্তু এসেই দেখে বাবার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বাবার এই রকম অবস্থা দেখে দাদা রামুর কাছে ছুটে যায়। বলে—দাদা, একবার চলো, আজকে বাবার অবস্থা বেশ ভাল নয়, সাতদিন হলো জ্বর ছাড়েনি।

রামু গম্ভীর হয়ে বলে—আমি ডাক্তার না কবরেজ যে দেখতে যাবো? যখন ভাল ছিল, তখন তো গলার মালা হয়ে ছিলি। এখন মরতে বসেছে বলে আমাকে ডাকতে এয়েচিস?

ইতিমধ্যে রামুর স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সুভাগীকে জিজ্ঞেস করে—দিদি বাবার কী হয়েছে?

সুভাগী বলার আগেই রামু বলে উঠে—হবে আবার কি, এখন মরছে, তাই ডাকতে এয়েচে।

সুভাগী আর কিছু না বলে সেখান থেকে সোজা চলে যায় সজন সিংয়ের কাছে। সুভাগী ঘর থেকে বেরিয়ে এলে রামু একগাল হেসে স্ত্রীকে বলে—বুঝলে, একেই বলে ইস্ত্রী চরিত্রি।

স্ত্রী—এতে ইস্ত্রী চরিত্রির কী বুঝলে? তোমার যাওয়া কি উচিত নয়?

রামু—আমি যাবো কেন! যেমন আলাদা হয়ে ছিল, আলাদাই থাকুক। মরে গেলেও আমি যাবো না।

স্ত্রী—(বিস্ময়) কী বলছো? মরে গেলে আগুন না দিয়ে কোথায় পালাবে শুনি?

রামু—কোথায় আর যাবো! সবই তো তার মেয়ে করবে!

স্ত্রী—তুমি থাকতে তার কিছু করা চলে?

রামু—আমি থাকতে তাকে নিয়ে যেমন আলাদা হয়েছে, তেমনি করুক।

স্ত্রী—না, না, তা অসম্ভব। যাও একবার দেখে এসো। বাপতো বটে, অন্য তো আর কেউ নয়। না গেলে গাঁয়ে মুখ দেখাবে কী করে?

রামু—চুপ করো। আমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না।

অন্যদিকে বাবু সজন সিং সুভাগীর মুখে খবরটা শুনেই তারই সঙ্গে মাহাতোকে দেখতে গেলেন। দেখেন, মাহাতোর অবস্থা খুবই খারাপ। দেখলেন, নাড়ীর অবস্থা ক্ষীণ। বুঝলেন, আর বেশীক্ষণ নয়। মৃত্যু তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। সজল নেত্রে সজন সিং বললেন—মাহাতো ভাই, আমাদের রেখে কোথায় যাচ্ছো?

মাহাতো অতি কষ্টে চোখ খুলে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—ভাই, যাবার সময় হয়েছে। তুমি সুভাগীকে মেয়ের মত দেখো, তোমার ওপর ভার দিয়ে গেলাম।

সজন সিংয়ের দু'চোখ জলে ভরে যায়। বললেন—সে সব কিছু চিন্তা করো না। ভগবানের ইচ্ছেতে তুমি ভালও তো হয়ে যেতে পারো! সুভাগীকে আমি মেয়ের মতই মনে করি, আর তাকে মেয়ের মতই মনে করে যাবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। সুভাগী আর লক্ষ্মীদেবীর কোন অসুবিধা হবে না।

মাহাতো অত্যন্ত ধীরে ধীরে বললেন—ভাই, আর আমার কোন চিন্তা রইলো না। ভগবান তোমাকে সুখে রাখুন।

সজন সিং—রামুকে ডেকে পাঠাবো? তার সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে তাকে ক্ষমা করে দাও।

মাহাতো—না ভাই। সেই পাপীটার মুখ আর আমি দেখতে চাই না।

তারপরই সৎকারের ব্যবস্থা করতে হলো।

পাঁচ

গ্রামের সকলেই রামুকে মুখাগ্নি করতে কত বোঝালো, কত অনুরোধ করলো, কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হলো না। বরং বললে—যে বাপ মরার সময় আমার মুখ দেখতে চায় নাই, সে আমার বাপ নয়, আমিও তার ছেলে নই জানবে।

শেষ পর্যন্ত সুভাগীকেই সবকিছু করতে হলো। তের দিনের দিন সুভাগী শ্রাদ্ধের সমস্ত আয়োজন করে জিনিসপত্র কিনে নিয়ে আসে। কোথা থেকে সে টাকা সংগ্রহ করলো তা' কেউ জানতে পারলো না। পাড়ার লোক সুভাগীর কর্মোদ্যম দেখে অবাক হয়। দেখতে দেখতে বাসন-পত্র, কাপড়-চোপড় আটা-ময়দা তেল-ঘি সবই এসে গেল। সুভাগীর ব্যাপার দেখে রামুর গা জ্বলে যায়। রামুর গা জ্বালাবার জন্যেই সুভাগীও পাড়ার লোকদের ডেকে এনে সবকিছু দেখায়।

লক্ষ্মীদেবী বললেন—দেখ্ মা, আয় বুঝে ব্যয় কর। আর তো কেউ রোজগেরে

নেই যে সাহায্য করবে? এখন তোকেই কুয়ো খুঁড়ে জল খেতে হবে।'

সুভাগী বলে—দেখো মা, বাবার কাজটা ধুমধাম করেই আমাদের করা উচিত। তাতে আমাদের যত ধার-দেনাই হোক না কেন! বাবা কি আর ফিরে আসবে? আমি দাদাকে দেখিয়ে দিতে চাই যে, অবলার দ্বারাও অনেক কাজ করা সম্ভব। সে হয়তো ভেবেছে, ও ছুটোর দ্বারা কিছুই করা সম্ভব হবে না। তার অহংকার আমি ভাঙাবো।

লক্ষ্মীদেবী চুপ করে যান। তের দিনের দিন আটটা গ্রামের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করা হলো। চারদিকেই সুভাগীর নাম ছড়িয়ে পড়ে।

তখন প্রায় সন্ধ্যা। নিমন্ত্রিতরা খেয়ে চলে গেছেন। লক্ষ্মীদেবী শুয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন। সুভাগী রান্নার বাসনপত্রগুলো সব গুছিয়ে রাখছে। এমন সময় সজন সিং এসে বললেন—মা সুভাগী, তুমিও একটু বিশ্রাম করে নাও। যা' করার, কাল সকালেই না হয় হবে।

সুভাগী—বিশ্রাম পরে নেবো। এখন বলুন, কত খরচ হলো?

সজন সিং—সে সব এখন জেনে কি হবে?

"কিছু না, এমনি জানতে চাইছি।"

"তা প্রায় শ'তিনেক টাকা হয়ে গেছে।"

সুভাগী বিনীত কণ্ঠে বলে—আমি এত টাকার ঋণী হয়ে গেলাম!

"তোমার কাছে কি টাকা চেয়েছি? মাহাতো শুধু তোমার বাবা ছিল না, আমারও বন্ধু! আমারও তো একটা কর্তব্য আছে!"

"আপনি যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। শুধুহাতে তিনশো টাকা আমার হাতে তুলে দিয়েছেন।"

সজন সিং মনে মনে বললেন—মেয়েটা বড় বুদ্ধিমতি ও চতুর।

ছয়

স্বামীর মৃত্যুর পর লক্ষ্মীদেবী কেমন যেন হয়ে গেছেন। পঞ্চাশ বছর ধরে স্বামীর সঙ্গে ঘর করে আজ তাঁকে একান্তে জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। এ যেন তাঁর পক্ষে দুর্বিসহ! মনে মনে ভাবেন, বুদ্ধি আর কাজ করছে না, হাতে-পায়ে বল পাই না, কিছুই ভাল লাগে না। সবকিছু থেকেও যেন আমি বঞ্চিত।

ঈশ্বরের কাছে অনেকবার প্রার্থনা জানিয়ে বলেছেন—ঠাকুর, আমাকে স্বামীর কাছে পৌঁছে দাও, কিন্তু ঈশ্বর সে প্রার্থনা শোনেন নি। মৃত্যুকে যে ভয় করে না সে জীবনকে ভয় পায় কী করে?

এই লক্ষ্মীদেবীই একদিন গ্রামের মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী ছিলেন।

সুনাম ছিল। অপরকে শিক্ষা দিতেন। এখন কেমন যেন হয়ে গেছেন। এখন ভাল করে কথাও বলতে পারেন না।

তিনি খাওয়া-দাওয়ার প্রতিও আজকাল কোন যত্ন নেন না। সুভাগীর অনুরোধে সামান্য কিছু মুখে তোলেন। পঞ্চাশটা বছর পার হয়েছে, কোনদিন স্বামীকে না খাইয়ে খান নি। সে নিয়ম আজ কোথায়?

অবশেষে লক্ষ্মীদেবীর কাশি আরম্ভ হলো। এমন দুর্বল হয়ে পড়লেন যে, বিছানা নিতে হয়। বেচারী সুভাগী কী করবে ভেবে পায় না। সজন সিংয়ের ঋণ শোধ করার জন্যে আজকাল দিনরাত পরিশ্রম করছে। এর মাঝে মা পড়লো অসুখে! মাকে একা রেখে কী করে বাইরে যাবে। মায়ের বিছানার পাশে বসে থাকলে বাইরের কাজই বা হবে কী করে? মায়ের অবস্থা দেখে কেমন যেন সন্দেহ হয়। বুঝতে পারে, মায়ের জ্বরটাও ঠিক তার বাবার মত।

গ্রামের সকলেই কাজে ব্যস্ত। তাই লক্ষ্মীদেবীকে দেখতে ক'জনই বা আসতে পারে! তবে সজন সিং দু'বেলাই আসেন। রোগীকে ওষুধ খাওয়ান আর সুভাগীকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে যান। লক্ষ্মীদেবীর অবস্থা কিন্তু খারাপের দিকেই চলেছে। অবশেষে দিন পনের পর লক্ষ্মীদেবী সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। তাঁর অন্তিম সময় উপস্থিত হলে রামু এসে মায়ের পায়ের কাছে বসলে অসুস্থ লক্ষ্মীদেবী নিজেই তাকে এমন তিরস্কারের স্বরে কথা বললেন যে রামু সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। সুভাগীকে আশীর্বাদ করে বললেন—দেখ্ মা, তুই-ই আমার ছেলে। তাই আমার সব কাজ তুই নিজে করবি। আমার আর কেউ নেই, তাই আমি জানবো। ভগবানকে জানিয়ে রাখছি, আগামী জন্মেও যেন তুই আমার সন্তান হয়ে জন্ম নিস্!

সাত

মা চলে যাওরার পর সুভাগীকে একটা চিন্তাই দিনরাত অস্থির করে তোলে। সেটা হলো, সজন সিংয়ের ঋণ সে কী ভাবে শোধ করবে। বাবার কাজে তিনশো টাকা খরচ হয়েছে, আবার মায়ের কাজেও প্রায় দুশো টাকা। তাই সেই পাঁচশো টাকা ঋণ শোধ করার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো, কারণ সে হেরে যাওয়ার পাত্রী নয়। তিন বছর ধরে সুভাগী দিনরাত পরিশ্রম করে টাকা জমা করে। প্রতিবেশীরা তার কর্মশক্তি ও পৌরুষ দেখে অবাক হয়ে যায়। সুভাগী দিনের বেলায় ক্ষেতের কাজ করে আর রাত্রে গম পেষে। ত্রিশদিন পূর্ণ হলে পনের টাকা করে সজন সিংয়ের হাতে দিয়ে আসে। আশ্চর্যের ব্যাপার, এটা কোন মাসেই তার ভুল হয় না, যেন প্রাকৃতিক নিয়মে চলেছে।

আজকাল চার দিক থেকেই সুভাগীর বিয়ের সম্বন্ধ আসে। এমন মেয়েকে কে না বিয়ে করতে চায়? কেননা, সে যার ঘরে যাবে, তার ভাগ্য ফিরবেই। সকলকেই জবাব দেয়—সেদিন এখনো আসে নি।

যেদিন সুভাগী সজন সিংয়ের হাতে শেষ কিস্তিটা তুলে দিল, সেদিন তার কতই না আনন্দ। সেই দিনই তার জীবনের কঠিন ব্রত পূর্ণ হলো।

টাকা দিয়ে সুভাগী চলে যাচ্ছে দেখে সজন সিং বললেন—মা, একটা কথা বলবো? এই বুড়োটাকে যদি অভয় দাও, তাহলে বলতে পারি।

সুভাগী সকৃতজ্ঞ ভাবে তাকিয়ে বলে—দেখুন, আপনার কথা রাখবো না তো কার কথা রাখবো? আমি আপনার কেনা দাসী, যা আদেশ করবেন, আমি হাসি মুখে তা' করবো।

সজনসিং—দেখো মা, তোমার মনে যদি এখনো দেনাদার আর পাওনাদার এই ভাবটা থাকে, তাহলে আমি সে কথাটা বলতে পারবো না। তুমি তো সবই মিটিয়ে দিলে, আজ তুমি মুক্ত, স্বাধীন। আমি তোমার ওপর আর কিছু দাবী করতে পারবো না।

সুভাগী—কেন পারবেন না, আপনি সব সময় রাখতে পারেন।

সজন সিং—দেখো মা, যদি কথাটা তুমি মেনে না নাও, তাহলে আমি কিন্তু মুখ দেখাতে পারবো না।

সুভাগী—আপনি কি বলতে চান, বলুন না?

সজন সিং—আমি বলতে চাই, তুমি আমার পুত্রবধূ হয়ে আমারই ঘরে থাকো। আমি জাত-পাত মানি, তবে, তোমার ক্ষেত্রে সেটা তুচ্ছ বলে মনে করি। কারণ, তুমিই তার বন্ধন ছিঁড়ে দিয়েছো। আমার ছেলে তোমার খুব প্রশংসা করে। তুমিও তো তাকে দেখেছো। বলো, এবার তোমার কী মত?

সুভাগী—কাকাবাবু, এ প্রস্তাব পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

সজন সিং—কি বলবো মা, তুমি আমার ঘরে এলে, আমি লক্ষ্মী এসেছে বলে মনে করবো।

সুভাগী—আমি আপনাকে বাবার মতই মনে করি। তাই আপনি যা' করবেন আমার ভালোর জন্যেই করবেন। আপনার আদেশ কি আমি অমান্য করতে পারি?

সজন সিং সুভাগীর মাথায় হাত রেখে বললেন—মা, তুমি সুখী হও। তুমি আমার কথা রেখেছো। আজ আমার মত ভাগ্যবান সংসারে আর ক'জনই বা আছে!

সতী

মুলিয়া পরমা সুন্দরী হলে কি হবে, স্বামী সে তুলনায় কিছুই নয়। অবশ্য তার জন্যে সে মনে কিছু করে না, বরং খুশী। অন্যদিকে সুন্দরী স্ত্রীর কাছে কল্লু সন্ত্রস্থ বলা যায়। কেন না, তার ধারণা মুলিয়া অর্থ পেয়েছে, আর সে লাভ করেছে রত্ন, যা' শত শত লোক পেতে আগ্রহী। তাদের দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে কিছুটা খটকা লেগেছে কল্লুরই খুড়তুতো ভাই রাজার। রাজা রূপবান, রসিক, বাক্‌পটু ও মেয়েদের মন ভোলাতে ওস্তাদ। তাই, কল্লু মুলিয়াকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করে৷ কেননা, কারোর চোখ পড়লে হয়তো সে সহ্য করতে পারবে না। আবার মুলিয়ার দুঃখ-কষ্ট ঘোচাবার জন্যে সে দিনরাত পরিশ্রম করে। তার ধারণা, পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলেই হয়তো মুলিয়াকে লাভ করতে পেরেছে। তাই, তার জন্যে জীবন দিতেও প্রস্তুত। মুলিয়া সামান্য অসুস্থ হলে সে অস্থির হয়। একা একা ঘরে থেকে মুলিয়া ডাঙ্গার মাছের মত ছট্‌ফট্ করে। অনেকেই তার প্রতি আকৃষ্ট, সে কিন্তু কল্লুকেই সংসারের একমাত্র সুপুরুষ বলে মনে করে।

একদিন রাজা এসে বলে—বৌদি, দাদা ঠিক তোমার যোগ্য হয় নি।

মুলিয়ার উত্তর—ভাগ্যে যা' লেখা ছিল, তাই তো হবে। এখন আর কী করবো বলো ?

রাজা মনে মনে ভাবে, আর যায় কোথায়, এবার মেরে এনেছি। তাই বলে—তাহলে দেখ, বিধি কেমন ভুল করলো।

মুলিয়া হেসে উত্তর দেয়—নিজের ভুল নিজেই একদিন সুধরে নেবেন।

মুলিয়ার কথা শুনে রাজা নিরাশ হয়।

দুই

সেদিন শুক্লপক্ষের তৃতীয়া, তীজ উৎসব। কল্লু মুলিয়ার জন্যে লাল রঙের একটা মোটা শাড়ী কিনে নিয়ে এসেছে। ইচ্ছে ছিল, একটু ভাল শাড়ী নেবে, কিন্তু টাকা কম, তাছাড়া দোকানদারও বাকী রাখতে চাইলো না।

রাজাও সেদিন নিজের ভাগ্যটা পরীক্ষা করতে চায়। তাই মুলিয়াকে উপহার দেবার জন্যে কিনে এনেছে একটা সুন্দর চুমকী বসানো শাড়ী।

শাড়ী দিতে এনে মুলিয়া বলে—এটা আবার কেন, আমার তো শাড়ী এসে গেছে।

রাজা—তা আমি দেখেছি। তবু নিয়ে এলাম। যে শাড়ীটা নিয়ে এসেছে, সেটা পরলে কিন্তু তোমাকে মানাবে না।

মুলিয়া কটাক্ষ করে বলে—এ ব্যাপারে তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে দিতে পারো না?

রাজা খুশী হয়ে আড় চোখে তাকিয়ে মাদকতার ঢঙে বলে—বুড়ো তোতা কি আর পোষ মানে?

মুলিয়া—আমার কিন্তু সে শাড়ীটা খারাপ লাগে নি।

রাজা—বেশ তো, এ শাড়ীটাও একবার পরে দেখ না, কেমন লাগে।

মুলিয়া—যে মোটা শাড়ী পরিয়ে খুশী হয়, সে এ শাড়ী নিশ্চয়ই পছন্দ করবে না। তাহলে সে নিজেই এই রকম শাড়ী নিয়ে আসতো।

রাজা—তাকে এটা দেখাবার দরকার কি? জিজ্ঞেস না করেই এটা নিয়ে নেবো?

রাজা—এতে জিজ্ঞেস করার আর কি আছে? সে যখন বাইরে যাবে, তখন পরবে। আমিও দেখতে পাবো।

মুলিয়া ঠাট্টা করে হাসতে হাসতে বলে—সেটি হচ্ছে না ঠাকুর-পো। কেউ দেখতে পেলে সর্বনাশ! অতএব এখন যাও।

রাজা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বলে ওঠে—দেখো বৌদি, কত আশা করে এসেছি, না নিলে আমি বিষ খাবো বলে দিচ্ছি!

মুলিয়া তার কথা শুনে শাড়ীটা নিয়ে দড়িতে ঝুলিয়ে রেখে বলে—যাক, এবার তো খুশী হলে?

রাজা নিজের আঙুল কামড়ে বলে—এখন তো নেই, শাড়ীটা একবার পর না!

মুলিয়া ঘরের মধ্যে গিয়ে রাজার শাড়ীটা পরে প্রস্ফুটিত ফুলের মত হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে।

রাজাও আবেগে তাকে স্পর্শ করার জন্যে হাত বাড়ায়। বলে—আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাই।

মুলিয়াও বিনোদ ভাবেই বলে—তাহলে তোমার দাদার কী অবস্থা হবে একবার ভেবেছো?

এই কথা বলেই মুলিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। রাজা নিরাশ হয়ে ভাবে, ভাতের থালাটা সামনে রেখেই তুলে নিয়ে গেল?

তিন

মুলিয়ার মন বার-বার বলে চুমকী বসানো শাড়ীটা কল্লুকে একবার দেখালে হয়, কিন্তু পরিণতি ভেবে তা পারে না। তাহলে শাড়ীটা রাখলো কেন? নিজের ওপর

রাগ হয়, আবার সেটা না নিলে রাজারও দুঃখ হতো। যাই হোক, ক্ষণেকের জন্যে শাড়ীটা পরাতে তার মন তো খানিকটা আনন্দ পেয়েছে।

মুলিয়ার প্রশান্ত মানস সাগরে কিন্তু একটা কীট এসে সব নষ্ট করে দিতে চাইছে, অস্থির করে তুলছে, শাড়ীটা কেন নিল? এটা নেওয়াতে কল্লুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হলো না কি? এই চিন্তায় তার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আবার মনকে বোঝায়, বিশ্বাসঘাতকতাই বা কেন হবে? এতে বিশ্বাসঘাতকতার কী আছে? রাজার সঙ্গে কী এমন আর কথা হয়েছে? একটু হাসলে যদি কেউ খুশী হয়, তাতে কি এমন আর খারাপ কাজ হলো?

কল্লু জিজ্ঞেস করে—আজ রজ্জু এসেছিল কেন?

স্বামীর কথায় মুলিয়ার শরীরটা কেঁপে ওঠে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—তামাক চাইতে এসেছিল।

কল্লু গম্ভীর স্বরে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলে—ওকে ঘরের ভেতর আসতে দিও না, বেশ সুবিধার নয়।

মুলিয়া—আমি বললাম তামাক নেই, তাই চলে গেল।

কল্লু ঝাঁঝালো স্বরে বলে ওঠে—মিথ্যে বলার দরকার কি? সে তো তামাক চাইতে আসে নি!

মুলিয়া—তাহলে এখানে কী জন্যে এসেছিল বলছো?

কল্লু—যে জন্যেই আসুক তামাক চাইতে আসেনি। কারণ সে জানে, আমার ঘরে তামাক নেই। তামাকের জন্যে আমিই তার ঘরে যাই।

মুলিয়া যেন রক্তশূন্য হয়ে পড়ে, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

অবনত মস্তকে মুলিয়া বলে—কার মনে কী আছে কি করে জানবো!

আজ তীজের উৎসব। রাত্রি জাগতে হয়। মুলিয়া পুজোর যোগাড় করছে বটে, কিন্তু মন থেকে উৎসাহ, আনন্দ আর শ্রদ্ধা কোথায় গিয়ে মিলিয়ে গেছে। ভাবে, মুখে কালিমা লেপনের জন্যে সে নিজেই দায়ী। তাই লজ্জিত ও বিমর্ষ হয়ে পড়ে। মনে বলে—ভগবান কেন আমাকে এমন রূপ দিলেন। আমার যদি রূপ না থাকতো, তা হলে রাজা নিশ্চয়ই আমার কাছে ঘেষতো না এবং এমন ঘটনাও ঘটতো না। আমি কুৎসিত হলে হয়তো সুখী হতাম। যে রূপের পিপাসু সে রূপ দেখে তৃপ্ত হলো, কিন্তু আমাকে মিশিয়ে দিল মাটির সঙ্গে।

মুলিয়া বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। উপবাসী বলে তন্দ্রা আক্রমণ করে বসেছে। তাই, সামান্য তন্দ্রার মধ্যেই দেখে—কল্লু মারা গেছে, আর সেই সুযোগে রাজা তার ঘরে ঢুকে তাকে জড়িয়ে ধরতে চায়। হঠাৎ কোথা থেকে এক বৃদ্ধা এসে তাকে

কাছে টেনে নিয়ে বলে—তুই কল্লুকে কেন মেরে ফেললি? মুলিয়া কেঁদে কেঁদে বলে—মা, আমি তো ওকে মারি নি। বৃদ্ধা বলে—হ্যাঁ, তুই ছুরি বা কোন অস্ত্র দিয়ে মারিস নি বটে, তবে যেদিন তুই ওর মন থেকে ক্ষণেকের জন্যে সরে যেতে চেয়েছিলি, সেই দিনই ও মরে গেছে!

মুলিয়া চমকে ওঠে, চোখ খোলে। দেখে, কল্লু সামনেই বারান্দায় শুয়ে। তাড়াতাড়ি গিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে এবং তার বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

কল্লু কিছুই বুঝতে পারে না। বলে—কাঁদছো কেন? ভয় পেয়েছো নাকি? আমি তো জেগেই শুয়ে আছি।

মুলিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে—আজ আমি তোমার কাছে বড় অপরাধ করেছি, তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও।

কল্লু উঠে বসে বলে—ব্যাপার কী? কাঁদছো কেন বলো তো?

মুলিয়া—রাজা তামাক চাইতে আসে নি, আমি তোমাকে মিথ্যে বলেছি।

কল্লু হাসতে হাসতে বলে—আরে সে তো আমি আগেই বলেছি।

মুলিয়া—জানো আমার জন্যে একটা চুমকী বসানো শাড়ী নিয়ে এসেছিল।

"তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো তো?"

মুলিয়া কম্পিত স্বরে উত্তর দেয়—না, আমি সেটা নিয়েছি। বললে, এটা না নিলে আমি আত্মহত্যা করবো।

নির্বাক কল্লু ধীরে ধীরে খাটের ওপর শুয়ে পড়ে। তারপর বলে—আমার তো কোন রূপ নেই, ভগবান দেন নি। তা' আর কী করবো?

কল্লু ঐ কথা না বলে যদি তখন মুলিয়াকে ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে বসিয়ে দিত, তাহলেও হয়তো মুলিয়া এমন ব্যথা পেতো না।

চার

সেই দিন থেকে কল্লুর যেন ছাড়োছাড়ো ভাব। মনে উৎসাহ বা আনন্দ নেই। হাসতে বা কথা বলতেও যেন ভুলে গেছে। মুলিয়া তার সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কল্লু কিন্তু তাকে শতগুণ দোষ বলে মনে করে এবং এই ভূলটা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এখন তার ঘরটা যেন শুধুমাত্র শোয়া-বসার জন্যে আর মুলিয়া যেন ঘরে রান্না করতেই এসেছে। কল্লু আনন্দ পাওয়ার জন্যে কোন কোনদিন তাড়ি-খানায় যায় বা চরস টানে।

কল্লুর চালচলন দেখে মুলিয়া নিরাশ হয়ে পড়ে। তবে, কল্লুর এমন সেবা-যত্ন করে যে তার মন থেকে যেন ভুল ধারণাটা দূর হয়ে যায়। তাকে খুশী করার জন্যে প্রাণপণ

চেষ্টা করে, কিন্তু কল্লু আর তার জালে পড়তে নারাজ। সুখবরের মধ্যে, রাজা যে ইংরেজ সাহেবের খানসামা ছিল, সেই সাহেব স্থানান্তরে যাওয়ায় রাজাকেও তাঁর সঙ্গে যেতে হয়। না হলে দু'ভাইয়ের মধ্যে কী যে হতো কে জানে। এই ভাবে একটা বছর পার হয়ে যায়।

একদিন কল্লু রাতে জ্বর-গায়ে ঘরে এলো। পরদিন তার গায়ে দেখা গেল বসন্তের গুটি। মুলিয়া শীতলা মায়ের মানসিক করে। কিন্তু চার-পাঁচদিন পর বোঝা গেল যে বসন্ত নয়, অন্য কিছু ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধি, কল্লুর কলুষিত ভোগ বিলাসের ফল।

রোগটা ভীষণ ভাবে বেড়ে চলে। এমন দুর্গন্ধ বের হয় যে কেউ কাছে যেতে পারে না। গ্রামে যে রূপ চিকিৎসা ও পরিচর্যা সম্ভব, তাই করে, কিন্তু কোন ফল হয় না। ফলে, কল্লুর অবস্থা দিনের পর দিন খারাপের দিকে যায়। মুলিয়া কিন্তু সেবা-যত্নের কোন ক্রটী রাখে নাই। তাকে রোগী ও সংসারের কাজ দু'দিকই দেখতে হয়। এক-দিকে কল্লু তার কৃত-কর্মের ফল ভোগ করছে, অন্য দিকে মুলিয়া তার কর্তব্য পালন করে প্রাণপাত করছে। মুলিয়ার একটাই সান্ত্বনা যে, এতেও যদি স্বামী তার ভুল বুঝতে পারে। শেষ পর্যন্ত কল্লুর বিশ্বাস ফিরে এলো, বুঝলো, মুলিয়া আগের মতই আছে কোন পরিবর্তন হয় নি। মুখে অবশ্য কিছু বললো না।

সকাল বেলা। মুলিয়া কল্লুর মুখ ধুইয়ে ওষুধ খাইয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এমন সময় কল্লুর চোখে বাঁধ ভাঙা জল বেরিয়ে আসে। তাই সজল নয়নে বললে—মুলিয়া, গত জন্মে আমার সাধনা ছিল বলেই হয়তো তোমাকে এ জন্মে পেয়েছি।

মুলিয়া হাত দিয়ে কল্লুর মুখ চাপা দেয়। বলে—ও কথা বলো না, এমন কথা বললে আমি দুঃখ পাবো। তোমাকে স্বামীরূপে পেয়ে আমার জীবন আজ ধন্য।

তারপর মুলিয়া স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলে—জানো ভগবান আমাকে পাপের শাস্তি দিয়েছেন।

কল্লু উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করে—সত্যি করে বলো তো মুলা, রাজা কেন এসেছিল ?

মুলিয়া বিস্মিত হয়ে বলে—তুমি বিশ্বাস করো, তার সঙ্গে আমার কোনরকম সম্পর্ক নেই। অন্য কিছু হলে ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন না। সে আমাকে একটা চুমকী বসানো শাড়ী দিতে এসেছিল, আমি নিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা আজ আর নেই। আমি সেটা পুড়িয়ে ফেলেছি, সে খবর আজও কেউ জানে না।

কল্লু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—মুলিয়া, আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। হয়তো সেটা আমার মতিভ্রম। তোমাকে পাপী মনে করে আমি নিজেই পাপী হয়ে গেছি এবং আজ তার ফলও ভোগ করছি।

এই কথা বলে চোখের জল মুছে তার দুষ্কর্মের সব কথা বলে ফেলে। মুলিয়া

বিস্মিত ও বিস্ফারিত চোখে সব শোনে। শেষ মুহূর্তে স্বামী যদি নিজের ভুল বুঝতে না পারতো, তাহলে হয়তো তাকেই বিষ খেতে হতো।

পাঁচ

কয়েকমাস পর রাজা ছুটি নিয়ে বাড়ীতে আসে। দেখে কল্লুর ভীষণ অসুখ, তাতে খুশী হয়। তাই রোগীকে দেখতে আসার ছল করে সে প্রায়ই কল্লুর ঘরে আসে। রাজাকে দেখে কল্লু মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবু দিনে দু-তিনবার যেন আসা চাই-ই।

যাই হোক, একদিন মুলিয়া রান্না করছে, এমন সময় রাজা রান্নাঘরে গিয়ে বলে—বৌদি, এখনো কি তোমার দয়া হবে না? কী রকম তুমি বলো তো? কয়েকদিন ধরেই তোমার কাছে আসছি, কিন্তু তুমি পাত্তা দিচ্ছো না। তুমি কি ভেবেছো, দাদা আবার ভাল হয়ে উঠবে? ধরে নিতে পারো, শেষ সময়। তাহলে আর কেন জীবনটা এভাবে নষ্ট করছো? তোমার ফুলের মত শরীরটা শুকিয়ে যাচ্ছে। আমার দিকে হাত বাড়াও, জীবনটা উপভোগ করতে পারবে। এমন দিন তোমার থাকবে না। এই দেখো, তোমার জন্যে কানের দুল নিয়ে এসেছি। একটু পরো না, কেমন মানায় দেখি।

এই বলেই মুলিয়ার সামনে দুল দু'টো এগিয়ে ধরে। মুলিয়া সে দিকে না তাকিয়ে উনুনের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে—ভাই, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে আর বিরক্ত করো না। তোমার জন্যেই আজ আমার এই দশা। তোমার লজ্জা করা উচিত। তুমি এমন যে, দাদার মৃত্যু কামনা করছো? আগেও বলেছি, এখনো বলছি, ও আমার মনের মত মানুষ। আজ আমি না থাকলে ওর অসময়ে কে দেখতো? আমি রয়েছি বলেই এখনো বেঁচে আছে, না হলে কি যে হতো কে জানে!

রাজা হেসে বলে—যা' হবার তাই হয়েছে। মেঘ না চাইতেই জল। এবার আমার পালা তোমাকে সুখী করা।

মুলিয়া এবার মুখ তুলে রাজার দিকে তাকিয়ে রোষ-নেত্রে ওঠে—তুমি ওর পায়ের ধুলোর যুগ্যিও নও, বুঝলে? তোমাকে কে ডেকেছে শুনি? শোনো, ভাল-ভাল কাপড় চোপড় পরে সেজে-গুজে থাকলেই ভাল হওয়া যায় না। ওর মত ভাল ও সুন্দর পুরুষ আমার চোখে এখনো ঠেকেনি জেনে রাখো।

কল্লু ডাকে—মুলা, একটু জল দিয়ে যাও।

মুলিয়া জল নিয়ে যায়। যাবার সময় কানের দুল দুটো এমন ভাবে লাথি মারে যে, উঠানে গিয়ে ঠিকড়ে পড়ে। রাজা রেগে গম্ভীর হয়ে দুলদুটো তুলে নিয়ে সগর্বে চলে যায়।

ছয়

দিনের পর দিন কল্লুর রোগ বেড়ে চলেছে। রোগের ওষুধ ঠিকমত পড়লে হয়তো রোগী সুস্থ হয়ে উঠতো। মুলিয়া একাই বা কী করে! দারিদ্র্যের জন্যেই হয়তো রোগীর এই অবস্থা।

অবশেষে কল্লুর রমন আসে। সংসারের কাজ-কর্ম সেরে মুলিয়া কল্লুর কাছে এসে দেখে তার শ্বাস উপস্থিত। ভয় পেয়ে বলে ওঠে—কি গো, অমন করছো কেন?

মৃত্যুপথ যাত্রী কল্লুর স্বর বের হলো না। সজল চোখে হাত দুটো কোন রকমে এক জায়গায় করে শেষ বিদায় নেয় আর সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা বালিশ থেকে ঢলে পড়ে।

মুলিয়া নিরুপায় ও শোকাতুর হয়ে শবদেহের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে আর কাঁদতে কাঁদতে বলে—ভগবান, শেষ পর্যন্ত তুমি এই করলে? তোমাকে লোকে এই জন্যেই কি দয়ালু বলে? এই জন্যেই কি তুমি আমাদের সংসারে পাঠাও? এমন খেলা খেলো? ওগো। তুমি তো এরকম নিষ্ঠুর নও! তাহলে আমাকে একা রেখে কেন চলে যাচ্ছো? আমাকে কে মুলা বলে ডাকবে! কার জন্যে এখন কুয়ো থেকে জল আনবো? কাকে খাওয়াবো, কাকে পাখার বাতাস করবো? সবই তো শেষ হয়ে গেল, তবে আমাকেও কেন নিলে না ঠাকুর।

গ্রামের প্রায় সবাই এসেছে। তারা মুলিয়াকে সান্ত্বনা দেয়, কিন্তু মুলিয়া ধৈর্য ধরতে পারে না। তার ধারণা, তারই জন্যে হয়তো এমন অঘটন হলো। এখন সে কী করবে বুঝতে পারছে না।

তারপরই পাড়ার লোকেরা সৎকারের ব্যবস্থা করে।

সাত

ছ'মাস হলো কল্লু বিদায় নিয়েছে। মুলিয়া সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করে। তার বিশ্রাম নেওয়ার যেন সময় নেই। মাঝে-মাঝে একান্তে চোখের জলও ফেলে।

অন্যদিকে রাজারও স্ত্রী দেহ রেখেছে। স্ত্রী মারা যাওয়ার দু'চার দিন পর থেকেই তার ছল-চাতুরি আবার শুরু হয়ে যায়। আগে স্ত্রী ভয়ে এতখানি করতে পারতো না। এখন তো ধম্মের ষাড়। আজকাল ডিউটি থেকে ফিরেই মুলিয়ার কাছে যায়। নানা কথা বলার পর আসল কথা আরম্ভ করে। বলে—বৌদি, এবার অভিলাষ পূর্ণ করবে তো, না কি এখনো অপেক্ষা করতে হবে? দাদা তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আবার আমার বউটাও মরে গেল। আমি কিন্তু তাকে ভুলে গেছি। তুমি আর কতদিন দাদার জন্যে কাঁদবে?

মুলিয়া রাজার কথার উত্তর দিয়ে বলে—তোমার দাদা নেই, তাতে কি হয়েছে?

তার স্মৃতি তো রয়েছে। মনে তার ভালবাসার চিহ্ন সর্বত্র, তার চেহারা সব সময় আমার চোখের সামনে ভাসে, তার কথাগুলো এখনো কানে বাজছে। সে তোমাকে জয় করতে না পারলেও আমাকে জয় করে গেছে। তাকে আমি সব সময় দেখতে পাই। সব সময় সে আমার হৃদয়ে জেগে রয়েছে। যতদিন যাবে, তত সে আমার কাছে আসবে। দেখো দাঁত থাকতে কেউ কি দাঁতের মর্ম বোঝে! তুমি কি বউকে কখনো ভালবেসেছো যে এসব কথা বুঝবে? ভগবান তোমাকে হৃদয় দেন নি বলেই তুমি হৃদয়ের মর্ম বোঝ না। বলি, ভালবাসা কি, তা জানো? বউটা ছ'মাসও মরে নি, আর তুমি ষাড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছো, আচ্ছা, তুমি মারা গেলে তোমার বউ কি তোমার মত অন্যের কাছে যেতো? আমার ধারণা, আমি মরে গেলে প্রাণেশ্বর আমার আমার জন্যে সারাজীবন কেঁদে-কেঁদে বেড়াতো। জানো, স্বামীর জন্যে স্ত্রীর জীবনপণ করতে তৈরী থাকে? যা হোক আমার শেষ কথা—তুমি যা' খুশী করো গে, আমার দেখার দরকার নেই, তবে আমার ঘরে আর কখনো ঢুকবে না, এটা আমি পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি। যদি কখনো ঢোকো, তাহলে কি করা উচিত, তা আমি ভাল করেই জানি। যাও—বেরিয়ে যাও।

মুলিয়ার তীক্ষ্ণ মেজাজ, কটূ-উক্তি এবং গাম্ভীর্য দেখে রাজার মুখ থেকে একটা কথাও বের হতে চায় না। তাছাড়া মুলিয়ার কথার জবাবই বা সে কোথায় পাবে? তাই ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

শিকারী রাজকুমার

দুপুরবেলা। সূর্যদেব ধীরে ধীরে মাথার ওপরে উঠে এসে দারুণ রোষে পৃথিবীকে তাপদগ্ধ করে চলেছেন। দেখে মনে হচ্ছে ধরিত্রী ভয়ে থর থর করে কাঁপছেন। এমনি সময় একজন লোক পাগলের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে একটা হরিণের পিছু-পিছু ধাওয়া করছে। তার চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে, ঘোড়াও রোদের তেজে কাবু হয়ে পড়েছে। কিন্তু এদিকে হরিণটাও যেন বায়ু বেগে ছুটছে। তার ভাবখানা যেন, "আমায় ধরা তো দূরের কথা ছুঁতেও পারবে না।"

এই দৌড়ের ওপরই তার জীবন মরণ নির্ভর করছে। পশ্চিমী হাওয়া দুর্বার গতিতে বয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে ধুলো আর আগুন বৃষ্টি হচ্ছে। ঘোড়ার চোখ দুটো

লাল হয়ে উঠেছে, সেইসঙ্গে অশ্বারোহীর শরীরের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছে। হরিণটা এমন করে পালাচ্ছে, যে সে হাতের বন্দুকটাকে পর্যন্ত সামলাতে পারছে না। কত যে আখ ক্ষেত, পলাশ বন ছোট ছোট টিলা তার সামনে পড়লো তার ইয়ত্তা নেই, স্বপ্নের সোনার হরিণ ক্রমশই যেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

ক্রমশঃ হরিণটা পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। উঁচু দেওয়ালের মতোই সামনের ঐ নদীর খাড়া পাড়। সামনে পালিয়ে যাবার রাস্তাও বন্ধ, তাছাড়া ওতে ঝাপিয়ে পড়ার অর্থ সাক্ষাত যমের মুখে লাফ দেওয়া। ভয়ে হরিণের সারা শরীর শিথিল হয়ে পড়লো। অসহায় দৃষ্টিতে চারদিকে দেখছে। শুধু মৃত্যুর ভয়াল ছায়া ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ছে না। অশ্বারোহীর কাছে এক মস্ত সুযোগ। বন্দুকটা গুলি উগরে দিতেই সাক্ষাৎ মৃত্যু এক ভয়ানক জয়ধ্বনির সঙ্গে আগুনের প্রচণ্ড জ্বালা যন্ত্রণা জুড়ে দিলো। হরিণটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

দুই

হরিণটা মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে, অশ্বারোহীর ভয়ঙ্কর হিংসামাখা দুচোখে প্রসন্নতার জ্যোতি মাখানো। মনে হচ্ছে সে যেন অসাধ্য সাধন করেছে। প্রথমে পশুর মৃত দেহটাকে মেপে নিলো। শিংয়ের দিকে চোখ পড়তেই মনটা খুশীতে ভরে উঠলো। এতে ঘরের শোভা দ্বিগুণ হয়ে যাবে, মুগ্ধ চোখে সেই সজ্জিত ঘরের শোভা দু'চোখ ভরে উপভোগ করবে।

সূর্যের অসহ্য তাপের কথা ভুলে সে আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলো, সম্বিত ফিরে পেতেই গরমে কাতর হয়ে নদীর দিকে তাকালো, কিন্তু ওখানে পৌঁছোবার কোনো রাস্তা দেখতে পেলো না, না কোনো গাছের ছায়া, যার ছায়ায় বসে সে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিতে পারে।

অশ্বারোহীর চিন্তান্বিত অবস্থায় এক সুদীর্ঘ পুরুষ নীচ থেকে লাফ দিয়ে নদীর পাড়ে উঠে এসে তার সামনে এলে তাঁকে দেখে অশ্বারোহী চমকে উঠলো। আগন্তুক সত্যিই সুপুরুষ। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনের স্বচ্ছতা নির্মল চরিত্রের ছাপ তার চোখে-মুখে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আশা-নৈরাশ্য, ভয় বলে যে কিছু আছে, তা যেন তাঁর অজানা।

হরিণটাকে দেখে সেই সন্ন্যাসী দ্বিধাগ্রস্থহীন ভাবে বললেন—রাজকুমার, আজ এক মূল্যবান জানোয়ার শিকার করেছো। সত্যিই, এতবড় হরিণ এ অঞ্চলে খুব কমই দেখা যায়।

রাজকুমারের আশ্চর্যের সীমা রইলো না। আরও শুনলো যে সে সন্ন্যাসীর পূর্ব পরিচিত।

রাজকুমার বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই দেখছি। আজ পর্যন্ত যত দেখেছি, এতবড় হরিণ আমার চোখেই পড়ে নি। কিন্তু ওকে ধরতে গিয়ে আমাকেও খুব হয়রান হতে হয়েছে।

সন্ন্যাসী সহৃদয়তার সঙ্গে বলেন—কুমার, চোখ-মুখ দেখেই মনে হচ্ছে তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত। ঘোড়াটাও দেখছি বেদম হাঁপিয়ে উঠেছে। তোমার সঙ্গী-সাথীরা কি অনেক পিছিয়ে পড়েছে?

একথার উত্তর রাজকুমার ভাবলেশহীণ ভাবেই দিল।

সন্ন্যাসী বললেন—এই গরম বাতাসে ধরণীও বিধ্বস্তা, তুমিই বা এই প্রচণ্ড রোদে ওদের পথ চেয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? তার চেয়ে বরং চলো, আমার কুঁড়েঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে। ঈশ্বর তোমাকে সব রকম ঐশ্বর্য প্রদান করেছেন, কিন্তু কিছুক্ষণ আমার আশ্রম দর্শন করে বনস্পতির অপরিসীম শোভায় দেহ-মনকে সুস্থ করে নদীর শীতল জলের আস্বাদ নেবে, চলো।

একথা বলেই সন্ন্যাসী রক্তাক্ত মৃত হরিণটাকে সামান্য ঘাসের বোঝার মতই অতি সহজেই কাঁধে তুলে নিয়ে রাজকুমারকে বললেন—আমি তো প্রায়ই নদীর ঐ খাড়া পাড় বেয়েই এখানে আসি, তবে তোমার ঘোড়া বোধহয় তা পারবে না। অতএব দিনের পথ ছেড়ে দিয়ে আমাদের ছ'মাসে পথই ধরতে হবে। ঘাট এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়, ওখানেই আমার কুঁড়েঘর।

রাজকুমার সন্ন্যাসীকে অনুসরণ করে পথ চলতে থাকে। সন্ন্যাসীর শারীরিক ক্ষমতা দেখে সে অবাক। আধঘণ্টা পর্যন্ত কেউ কোনো কথা বলে না। এরপর তারা ঢালু জায়গার মুখোমুখি হয়, একটু পরেই ঘাটে এসে পৌছোয়। কাছেই কদম্ব-কুঞ্জ, তার ঘন ছায়ায় হরিণ-হরিণীরা নির্ভয়ে চলাফেরা করছে। স্বচ্ছ সলিলা নদীর কুল কুল শব্দ যেন সবসময় মধুর সঙ্গীত পরিবেশন করে চলেছে, সবুজ মাঠে, গাছের ডালে ময়ূর-ময়ূরী আমোদের উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে, কপোত-কপোতী, দোয়েল, শ্যামা ইত্যাদি পাখীরাও নেশায় মত্ত হয়ে আছে। গাছ লতা-পাতা সুশোভিত প্রকৃতির কোলে সন্ন্যাসীর ছোট কুঁড়েঘরটা দেখা যাচ্ছে।

তিন

সবুজ বনে ঘেরা কুঁড়েঘরটা যেন সরলতা ও পবিত্রতার মূর্ত ছবি। এখানে এসে রাজকুমারের মনটাই বদলে গেলো। প্রচণ্ড দাবদাহে ঝলসানো গাছের ওপর বর্ষার জলের মতই এখানকার শীতল বাতাসও তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হোল। তৃপ্তি কোনো সুস্বাদু খাদ্যের ওপর অথবা সুনিদ্রা সুবর্ণ পালঙ্কের ওপর নির্ভর করে না, একথা আজই সে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারলো।

শীতল, মৃদুমন্দ, সুগন্ধি বাতাস বয়ে চলেছে। সূর্যদেব অস্তাচলে যাবার পূর্ব মুহূর্তে আর একবার সতৃষ্ণ চোখে পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখছেন। সন্ন্যাসী একটা গাছের নীচে বসে গান গাইছেন—

"উধো কর্মন কী গতি ন্যারী"

রাজকুমারের কানে সঙ্গীতের মৃদুস্বর যেতেই উঠে বসে শুনতে লাগলো। অনেক নামী-দামী গুণী সঙ্গীতজ্ঞের গান সে শুনেছে, কিন্তু আজকের মতো আনন্দ সে কোনো দিন পায় নি। গানের কথাগুলো যেন তার ওপর মোহিনী মন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে বসে শুনছে। সন্ন্যাসীর কণ্ঠের মাধুর্য যেন কোকিলের কুজনের মতই।

সম্মুখস্থ নদীর জলে যেন কেউ গোলাপী চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। দু-পাড়ের বালি দেখে মনে হয় ঠিক যেন চন্দন কাঠে জলচৌকী। এ স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে রাজকুমার মুগ্ধ। নদীর জলে সন্তরণরত জল-জন্তুগুলোকে দেখে মনে হয় ঠিক যেন জ্যোতির্ময় আত্মা, সন্ন্যাসীর গান শুনে ওরাও মত্ত হয়ে উঠেছে।

গান শেষ হলে রাজকুমার সন্ন্যাসীর সামনে বসে পড়ে ভক্তি নিবেদন করে বলে—প্রভু! আপনার অনুপম প্রেম-বৈরাগ্য প্রশংসনীয়। আমার অন্তর-আত্মাতেও যে প্রভাব পড়েছে, তা অক্ষয় হয়ে থাকবে। যদিও সামনে প্রশংসা করা উচিৎ নয়, তবু বলছি, আপনার সুগভীর প্রেম অতুলনীয়। সংসারের মায়ায় আবদ্ধ না হলে আজন্ম আপনার চরণেই ঠাঁই নিয়ে আপনার সেবা করে জীবন স্বার্থক করতাম। স্বপ্নেও তা থেকে পৃথক হবার কথা চিন্তা করতাম না।

অনুরাগে আপ্লুত হয়ে রাজকুমার যে এরকম কত কথা বললো যা স্পষ্টতই তার আন্তরিক ভাব-বিরোধী। সন্ন্যাসী স্মিত হেসে বলেন—তোমার কথায় আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আমারও একান্ত ইচ্ছে যে তুমি এখানে আরও কিছুদিন থাকো, তাছাড়া সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। এখন রওনা দিয়ে তুমি পথ হারিয়ে ফেলতে পারো। তখন তোমার রাজ্যে পৌছোনোই দুষ্কর হবে। তাছাড়া আমিও তোমার মতই শিকার প্রিয়। একে অন্যকে নিজের গুণ দেখানোর এমন সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়। তুমিই বল! জানি, ভয় দেখিয়ে তোমাকে দমানো যাবে না, কিন্তু শিকারের কথা বললে নিশ্চয়ই থাকবে।

রাজকুমার খুব তাড়াতাড়ি তার এই আবেগের ঘোর কেটে যেতেই বুঝতে পারলো যে এতক্ষণ সে সন্ন্যাসীকে যা বলছিল সবটাই কৃত্রিম, আন্তরিক ভাব যথার্থভাবে তাঁর কাছে ফুটে ওঠে নি। সন্ন্যাসীর কাছে সারাজীবন থাকা তো দূরের কথা একটা রাত কাটানোও তার কাছে অসম্ভব মনে হোল। সে প্রাসাদে ফিরে না গেলে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে। তাছাড়া সঙ্গের লোক-লস্কর, সঙ্গী-সাথীদেরও প্রাণ-সংশয় দেখা দিতে

পারে। ঘোড়াটাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার ওপর চল্লিশ মাইল পথ পাড়ি দেওয়া মুখের কথা নয়! ওদিকে সন্ন্যাসীর কথা শুনে সে আশ্চর্য হয়ে গেলো। তিনি নাকি শিকার করতে ভালবাসেন। নিশ্চয়ই তিনি বেদান্ত জ্ঞানী, তাঁর মতে আবার জীবন-মৃত্যু কোনোটাতেই মানুষের হাত নেই। এঁর সাহচর্যে শিকারে পরিপূর্ণ আনন্দ পাওয়া যাবে।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সন্ন্যাসীর আতিথ্য স্বীকার করে নিলো। আরও কিছুক্ষণ সাধু সঙ্গ লাভ করার সুযোগ পেয়ে মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে স্বীয়-ভাগ্যের প্রশংসা করলো।

চার

রাত প্রায় দশটা। চারদিকে ঘন অন্ধকার। সন্ন্যাসী এসে বললেন—আমাদের যাবার সময় হয়েছে।

রাজকুমার আগে থেকেই তৈরী হয়ে বসেছিলো! বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিয়ে বলে—অন্ধকার রাতই শূওর শিকারের পক্ষে উপযোগী; তবে ওরা খুবই হিংস্র প্রকৃতির।

সন্ন্যাসী হাতে লাঠি তুলে নিয়ে বলেন—ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে আরও ভাল শিকার আমাদের হাতে আসতে পারে। আমি একা শিকার করতে গেলেও কখনো খালি হাতে ফিরে আসিনি। আর আজ আমরা তো দুজন।

দুজনেই নদীর পাড়ের অদূরেই ছোট ছোট বালির টিলা ও খাল পেরিয়ে, ঝোপ-ঝাড়ের মুখোমুখি হয়েও নিঃশব্দে চলে গেলো। একদিকে শ্যামাজী নদী, যার কোলে অসংখ্য তারা আনন্দে নাচছে, ওদিকে রাশি রাশি ঢেউ কুল-কুল স্বরে গান গেয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে দুর্ভেদ্য অন্ধকার, সেখানে জোনাকিগুলো থেকে মিট মিট্ করে ক্ষণস্থায়ী আলো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওরাও অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে ভয় পাচ্ছে।

এ অবস্থায় কয়েকঘণ্টা চলার পর একটা টিলার ওপরে এসে পৌছোলো, কাছেই গাছের আড়ালে আগুন জ্বলছে। দুজনেরই আর বুঝতে বাকী রইল না, যে এখানে তারা ছাড়াও আরও কেউ আছে।

সন্ন্যাসী থেমে যেতে সংকেত করলেন। দুজনেই গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে গভীর মনোযোগ দিয়ে যেন কি দেখছে। রাজকুমার বন্দুকটা ঠিক করে নিলো। টিলার ওপরে একটা বড় বটগাছ আছে। তার নিচে দশ-বারজন সশস্ত্র-সুসজ্জিত লোক গাঁজায় দম দিচ্ছে। তারা সকলেই লম্বা-চওড়া, স্বাস্থ্যবান্ দেখে মনে হচ্ছে একদল সৈন্য বিশ্রাম নিচ্ছে।

রাজকুমার জিজ্ঞেস করলো—এরাও কি শিকারী।

সন্ন্যাসী আস্তে বলেন—হ্যাঁ, পাকা শিকারী। এই হিংস্র পশুগুলোর কাজই হচ্ছে নিরীহ পথিক শিকার করা। এদের অত্যাচারে কত গাঁ যে উজাড় হয়ে গেছে তার হিসেব নেই, কত লোক যে এদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে তা একমাত্র ভগবানই জানেন। শিকার যদি করতে হয় তবে এই পশুগুলোকে করো। এ ধরনের শিকার বড় একটা পাওয়া যায় না। এই পশুগুলোকে হাতের ঐ অস্ত্র দিয়ে নির্মূল করা উচিৎ। এইতো রাজার যথার্থ শিকার। এতে নাম, যশ দুটোই পাওয়া যাবে।

দু-একটাকে তক্ষুনি সাবাড় করে দেবার জন্য রাজকুমারের হাত নিশ্‌পিস্ করতে থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসীই তাকে তখনকার মতো থামিয়ে দিয়ে বলেন—অযথা এদের বিরক্ত করা ঠিক নয়। যদি এরা অন্যায় উপদ্রব না করে তাহলে মেরে কি লাভ? তার চেয়ে বরং এগিয়ে চলো, এরচেয়েও ভাল শিকার হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথি। গভীর রাতে তাই চাঁদ উঠেছে। ওরা দুজনে নদীর পাড় ছেড়ে জঙ্গলকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে। সামনেই একটা মেঠো পথ, আর তারপরেই একটা গাঁয়ের সামনে এসে উপস্থিত হোল। একটা বিশাল প্রাসাদের সামনে এসে সন্ন্যাসী রাজকুমারকে বলেন—এসো, এই বকুল গাছটায় উঠে বসি। কিন্তু সাবধান টু-শব্দ করো না। তাহলে আজই আমাদের জীবনে যবনিকা নেমে আসবে। এ প্রাসাদে একটা সাংঘাতিক প্রাণী-ঘাতক জানোয়ার বহাল তবিয়তে আছে, আমাদের ওকে সংসার থেকে মুক্তি দিতে এগিয়ে আসতে হবে।

কথাটা শুনে রাজকুমারের আনন্দের সীমা রইলো না। ভাবতে থাকে, যাক্ সারা রাতের দৌড়-ঝাঁপ তাহলে সফল হোলো। দুজনেই বকুল গাছে উঠে পড়ে। রাজ-কুমার হাতের বন্দুকটা ঠিক করে ধরে শিকারের প্রত্যাশায় বসে থাকে। সে ভাবতে থাকে হয়তো খুব বড় ধরনের চিতাবাঘ হবে।

অর্দ্ধেক রাতেরও বেশী কেটে গেছে, হঠাৎ প্রাসাদের কাছ থেকে বেশ কিছু লোকের গলা শোনা যাচ্ছে, সেই সঙ্গে বৈঠকখানার দরজাও খুলে গেলো। বড় বড় মোমবাতি জ্বলছে, তাতে ঘরের চারদিকের অন্ধকার কেটে দিনের আলোর মতই সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সুখ আর আভিজাত্যের সামগ্রীতে সুসজ্জিত। ভেতরে স্বাস্থ্যবান একজন লোক পালঙ্কের ওপর আধশোয়া হয়ে সোনার গড়গড়ায় তামাক টানছে, গলায় রেশমী চাদর, কপালে কেশরের অর্ধ লম্বাকার তিলক। এরই মধ্যে নর্তকী গায়িকার দল এসে হাজির হোল। আধশোয়া লোকটা হাবে-ভাবে কটাক্ষে শর নিক্ষেপ করতে থাকে। অন্যান্য সমাজপতিরাও তার সঙ্গে তালে তাল মেলায়। গান-বাজনা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মদ খাওয়াও চলতে থাকে।

রাজকুমার আশ্চর্য হয়ে বসে—দেখে তো মনে হচ্ছে জমিদার-টমিদার হবে ?

সন্ন্যাসী উত্তর দেন—না, না, তা নয়, আসলে ইনি একটা বড় মন্দিরের মহন্ত, সাধু। ইঁ সংসারে ঐহিক ভোগ-সুখ ত্যাগ করেছেন। ওসব দিকে ফিরেও তাকান না, মুখে তো সব সময় পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা। ঘরে যে সব জিনিস-পত্র দেখছো, সবই ওর আত্ম-সুখের জন্যে। হাজার হাজার মানুষের বিশ্বাস, ইনি নাকি জিতেন্দ্রিয়, মহাপুরুষ। দেবতা জ্ঞানে সবাই তাকে পূজো করে।—শিকার যদি করতেই হয় তবে একেই। ঐটাই রাজার যোগ্য শিকার। এধরনের রংচংয়ে শিয়ালগুলোর হাত থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করাই তোমার পরম ধর্ম। এতে তোমার প্রজাদের মঙ্গল হবে, সেই সঙ্গে রাজ্য জুড়ে তোমার নাম-যশও ছড়িয়ে পড়বে।

পাঁচ

দুজন শিকারীই নীচে নামলো।

সন্ন্যাসী বললেন—রাত প্রায় শেষ হতে চললো, তুমিও নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। কিন্তু রাজকুমারদের সঙ্গে শিকার করার সুযোগও তো খুব একটা পাই না। তাই তোমাকে আর একটা শিকারের সন্ধান দিয়েই ফিরে যাবো।

রাজকুমারও এ শিকারে সত্যিকারের উপদেশ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে। তাই সে বলে—না স্বামীজী না, এটাকে পরিশ্রম বলে আমাকে লজ্জা দিবেন না। যদি বছরের পর বছর আপনার সান্নিধ্যে থাকতে পারতাম, তাহলে না জানি আরও কত ধরণের শিকারের শিক্ষা আপনার কাছ থেকে পেতাম।

দুজনেই এগিয়ে চলে। রাস্তাও আগের চেয়ে অনেক ভালো। দুধারে সারি সারি গাছ। কোথাও কোথাও আবার আম গাছের নীচে পাহারাদার শুয়ে আছে। দেড়-দু ঘণ্টা চলার পর তারা একটা গাঁয়ে এসে হাজির হোলো। চওড়া রাস্তার পাশে গ্যাসের বাতি, প্রাসাদোপম ঘর-বাড়ী দেখে মনে হয় বুঝি বা কোনো নগর। একটা বড় বাড়ীর সামনে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী রাজকুমারকে বলেন—এটা একটা সরকারী অফিস। এ রাজ্যের সুবেদারের আবাসভূমিও বলা যেতে পারে। অফিস দিনেও বসে, আবার রাতেও। ন্যায্যদামে সোনা, মণি-মুক্তো ইত্যাদি নানা রকমের বস্তু বিক্রি হয়। তবে একটা কথা, ন্যায্য দাম জিনিসের ওপর নির্ভর করে। পয়সাওয়ালারা গরীবদের আর্তকণ্ঠের আবেদন-নিবেদনে সাড়া না দিয়ে দুপায়ের তলায় পিষে মারে।

তারা যখন কথা বলছিলো তখন হঠাৎ দেখা গেল, দুজন লোক সেই বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। দুই শিকারীই গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

সন্ন্যাসী বলেন—মনে হচ্ছে সুবেদার সাহেব কোনো মামলার মীমাংসা করছেন।

ওপর থেকে শোনা গেল—তুমি এক বিধবার সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছ, একথা জানতে আমার বাকী নেই। কাজটা খুবই গর্হিত, মামলাটাও বেশ জটিল। কম-সে-কম হাজার টাকা দিতে হবে, নচেৎ বুঝতেই পারছো—।

রাজকুমারের এরচেয়ে বেশী সোনার মত ক্ষমতা নেই। রাগে চোখদুটো জবাফুলের মত লাল হয়ে গেছে, শরীরের শিরা-উপশিরাগুলো ওঠানামা করছে। ইচ্ছে হচ্ছে তক্ষুনি গিয়ে সুবেদারের মুণ্ডুটা মাটিতে ফেলে দেয়; কিন্তু সন্ন্যাসী বাধা দিয়ে বললেন—এখনো শিকারের সময় হয়নি। খোঁজ করলে এধরণের অনেক শিকারের সন্ধান পাবে কুমার। আমি শুধু দু-একটা ঠিকানা তোমায় জানালাম। ভোর হতে আর দেরী নেই। আমার আশ্রম, তা এখান থেকে প্রায় মাইল দশেক তো হবেই। পা চালিয়ে চলো।

ছয়

ভোর তিনটেতে শিকারী দুজন আশ্রমের সেই কুঁড়ে ঘরে ফিরে এলো। ভোর রাতের মনোরম পরিবেশ শ্রান্ত শিকারীদের দেহ মন দুটোই চাঙ্গা করে দেয়। ঠাণ্ডা বাতাসের আন্দোলনে ঘুমন্ত গাছগুলো যেন একে একে জেগে উঠছে।

আধঘণ্টার মধ্যেই রাজকুমার তৈরী হয়ে নিলো। কৃতজ্ঞতাও বিশ্বাস প্রকট করতে সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলো।

স্নেহের বশে সন্ন্যাসীও তার পিঠে হাত রাখলেন। আশীর্বাদ করে বলেন—কুমার, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি সত্যিই খুশী হয়েছি। পরমাত্মা তোমাকে তাঁর রাজ্য শাসনের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আশীর্বাদ করি, ধর্ম-বৎসল রাজার মতই প্রজাপালন করো। অযথা পশু-বধ করো না। নিরীহ পশু বধের মধ্যে না আছে সাহস, না আছে বীরত্ব। নিরীহ অ-বলাকে রক্ষা করাটাই সত্যিকারে বীরত্ব। বিশ্বাস করো, যে মানুষ কেবলমাত্র চিত্তবিনোদার্থে জীব হত্যা করে, সে নির্দয় ঘাতকের চাইতেও নির্দয়। ঘাতকের কাছে যা জীবিকা, শিকারীর কাছে তা শুধুমাত্র অবসর যাপনের বিলাস-সামগ্রী। প্রজাদের পক্ষে মঙ্গল দায়ক এমন শিকারই করো। বনের স্বচ্ছন্দ পশুকে বধ না করে, যারা অন্যকে ধোকা দিয়ে পেষণ করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, সেই সব হিংস্র মানুষ রূপী জানোয়ারগুলোকে সমাজের বুক থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পৃথিবীটাকে সুন্দর করে গড়ে তোলো। এ শিকারে তোমার কীর্তি অক্ষয় হয়ে থাকবে। তুমি রাজা, পালন করাই তোমার ধর্ম। বধ যদি করতেই হয় তবে তা শুধু জীবিত রাখতেই করবে। যাও পরমাত্মা তোমার কল্যাণ করুন।

গুপ্তধন

বাবু হরিদাসের ইঁট ভাঁটিটা শহর থেকে বেশ দূরে। আশ-পাশের গাঁ থেকে রোজই শ'য়ে শ'য়ে মেয়ে-পুরুষ, এখানে কাজ করতে আসতো। তাদের মধ্যে আবার বেশ কয়েকটা দশ-বার বছরের ছেলেও ছিল। ভাঁটি থেকে ইঁট মাথায় করে ওপরে নিয়ে গিয়ে সারি সারি করে সাজিয়ে রাখতো। ভাঁটির পাশেই একজন লোক ঝুড়ি ভরা কড়ি নিয়ে বসে থাকতো। কে কত ইঁট মাথায় করে ওপরে নিয়ে গেছে, এই হিসেব করেই মজুর গুলোকে কড়ি দেওয়া হোত। ইঁটের সংখ্যা যত বেশী হবে হিসেবের কড়িও তত বেড়ে যাবে। সেই লোভে অনেক মজুরই সাধ্যাতিরিক্ত কাজ করতে চেষ্টা করতো। কঙ্কালসার বুড়ো আর ছোটো ছোটো ছেলেগুলোকে ইঁটের পাঁজা মাথায় তুলে নিয়ে যেতে দেখলে মনটা সত্যিই ব্যাথায় ভরে ওঠে। কখনো কখনো বাবু হরিদাস স্বয়ং এসে ক্যাশিয়ারের পাশে বসে মজুরদের উৎসাহিত করেন। ইঁটের প্রয়োজন বেশী হলে তখন মজুরদের অবস্থা আরও সাংঘাতিক হয়ে পড়তো। দুনো মজুরীর সঙ্গে সঙ্গে মজুররাও সামর্থ্য অনুযায়ী দুনো বোঝা মাথায় চাপিয়ে নিয়ে যেতো। অতি কষ্টে আস্তে আস্তে সামনে এগোতো। দর দর করে ঘাম ঝরছে, মাথায় ভাঁটির ছাই মাখানো ইঁটের পাহাড়, যেন লোভের ভুত এক লাফে তাদের কাঁধে চেপে বসেছে। একটা ছোটো ছেলের অবস্থা দেখলে মনটা সত্যিই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো, সমবয়সীদের চেয়ে অনেক বেশি ভারী ইঁটের বোঝা মাথায় তুলে সে সারাদিন মুখ বুজে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতো। অপুষ্ট শরীরে চোখে দুঃখ-ব্যাথা-হতাশার চাহনি। অন্য সব ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ সামনের মুদি দোকান থেকে গুড় কিনে খেতো, কেউ বা রাস্তা দিয়ে মোটর, ঘোড়ার গাড়ী যেতে দেখলে সেই দিকে হা করে চেয়ে থাকতো আবার কেউ কেউ মুখের আর গায়ের জোর দেখিয়ে জীবন যুদ্ধে নেমে পড়তেও কুণ্ঠিত হোতো না। কিন্তু ঐ ছেলেটাকে কেউ নিজের কাজ ছাড়া অন্য কিছু করতে দেখেনি। শিশুসুলভ চঞ্চলতা বা দুষ্টুমির কোন রকম চিহ্ন ওর মধ্যে ছিল না, এমন কি তাকে কেউ কখনো হাসতেও দেখেনি। বাবু হরিদাস ছেলেটাকে মনের অজান্তেই যেন কখন ভালবেসে ফেলেছেন। তাই কখনো ক্যাশিয়ারকে হিসেব চেয়ে কিছু বেশি দিয়ে দিতে বলতেন বা খাবার-দাবার থাকলে দিয়ে দিতেন।

একদিন তিনি ছেলেটাকে ডেকে নিয়ে পাশে বসিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে ভাঁটির পাশের গাঁয়েই ও আর বুড়ী মা থাকে। মা শয্যেশায়ী, তাই ওকেই সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করতে হয়। দু-মুঠো ফুটিয়ে দেবার মতও কেউ নেই।

সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরে রান্না করে রুগ্না মায়ের মুখে তুলে ধরে। আজ নয় ভাগ্যদেবী অপ্রসন্ন হয়েছেন, নয়তো একদিন ওদেরও নাম-ডাক-জমিদারী-প্রতিপত্তি সবই ছিল। মহাজনী কারবার, চিনির কল কি-না ছিল! জ্ঞাতিদের চক্রান্তে আজ ওদের এ চরম দুরবস্থা। দিনান্তে একমুঠো ভাতের জন্যে ঐটুকু ছোটো ছেলে মগন সিংকে অমানুষিক পরিশ্রমই না করতে হচ্ছে!

হরিদাস জিজ্ঞেস করেন—গাঁয়ের লোকেরা তোকে কিছু দিয়ে-টিয়ে সাহায্যও করে না!

মগন—তবেই হয়েছে, পারলে ওরা আমাকে মেরে ফেলে! সবাই বলা-কওয়া করে আমাদের ঘরের মধ্যিখানে নাকি ঘড়া ঘড়া মোহর পোঁতা রয়েচে।

হরিদাস উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করেন—হলে হতেও তো পারে, তোর ঠাকুর্দা ছিলেন সেকেলে বনেদী জমিদার। আচ্ছা, তোর মা তোকে এই মোহরের কথা কিছু বলে-টলে না?

মগন—হলফ করে বলছি বাবু, কিচ্ছু নেই, একটা পাই-পয়সাও নয়। টাকা থাকলে আমার মা এত কষ্টই বা করবে কেন বলুন?

দুই

অনাথ ছেলেটার কপাল খুলে গেলো। বাবু হরিদাস মগন সিংয়ের ব্যবহারে খুশী হয়ে নিজের কারবারে লাগিয়ে দিলেন। এখন থেকে সে মজুরদের টাকা-পয়সা বিলি ব্যবস্থার ভার পেয়েছে, সেই সঙ্গে ভাঁটির ক্যাশিয়ার মুন্সীজীর কাছে পড়াশোনা করে।

মগনসিংও খুবই কর্তব্যপরায়ণ, চোখ-কান খোলা রেখে সব রকম কাজ চটপট শিখে নিচ্ছে। নিয়ম-মাফিক কাজে আসে কামাই করে না বললেই চলে। অল্পদিনেই সে মালিকের বিশ্বাসভাজনদের মধ্যে একজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেখা-পড়ায়ও খুব মনোযোগী।

বর্ষাকাল। ইট ভাঁটি জলে ডুবে গেছে। তাই কাজ-কর্ম বন্ধ। মগনসিং তিনদিন ধরে আসছে না দেখে হরিদাসের খুব চিন্তা হয়, কি ব্যাপার, ছেলেটা অসুখে-বিসুখে পড়লো না তো, কোনো অঘটন না ঘটলেই বাঁচি। বেশ কয়েকজনের কাছে ওর কথা জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তারা কেউই সঠিক খবর দিতে পারলো না। চারদিনের দিন বাবু হরিদাস নিজেই খোঁজ করতে করতে মগন সিংয়ের বাড়ীতে এসে হাজির হলেন। বাড়ী না বলে প্রাচীন সমৃদ্ধির ধ্বংসাবশেষ বলাই ভাল। হরিদাসের গলা পেয়ে মগন বাইরে বেরিয়ে এলো। হরিদাস জিজ্ঞেস করেন—এ কদিন যাসনি দেখে তোকে

দেখতে এলাম, তা হ্যারে, মা কেমন আছেন ?

মগন সিং অবরুদ্ধ স্বরে বলে—মার তো খুব অসুখ, বলছে, আমি আর বাঁচবো না। কয়েকদিন ধরে মার মুখে কেবল একটাই কথা, একবার তোর মালিককে গিয়ে আমার কথা বল্, তিনি আমার অবস্থার কথা শুনলে নিশ্চয়ই আসবেন। আমিই লজ্জায় আপনার কাছে যেতে পারিনি। দয়া করে যখন এসেছেন, তখন একবার মার কাছে চলুন, তাহলেই তাঁর ইচ্ছে পূরণ হবে।

হরিদাস ভেতরে গেলেন। সারা বাড়ী জুড়ে একটা ভৌতিক নিস্তব্ধতা যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এখানে সেখানে সুর্কি, কাঁকড় আর ভাঙ্গা ইঁটের স্তুপ। সামনের ঐ ঘরদুটোই যা একটু বাস-উপযোগী। মগন সিং একটা ঘরে ঢুকে ইশারায় তাঁকে আসতে বললো। হরিদাস ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেলেন, একটা সেকেলে ভাঙ্গা তক্ত-পোষের ওপরে শুয়ে এক বুড়ি সমানে রোগ-যন্ত্রণায় কোঁকাচ্ছে।

তাঁর গলা পেয়ে চোখ খুলে অনুমানে চিনতে পেরে বলে—দয়া করে যে আমাদের ভাঙ্গা ঘরে আপনি পদধুলি দিয়েছেন তা আমার মগনেরই ভাগ্যে। বড় সাধ ছিল আপনাকে দেখার। ভগবান সে সাধ মেটালেন। অনাথ-নাবালক ছেলেটার আপনিই মা-বাপ। আপনার হাতেই ওকে সঁপে দিলুম। আর আমার কোনো দুঃখু নেই, নিশ্চিন্তে মরতে পারবো। কি বলবো বাবু, একদিন এ সংসারেও মা লক্ষ্মী পা রেকে ছিলেন, দুদ্দিনে তিনিও মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, নয়তো কি-না ছিল, হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া। রাজা খেতাব পেইছিলেন আমার শ্বশুরের বাপ। তিনিই হয়তো এই অদিনের কথা ভেবে কিছু জিনিস মা বসুমতীর বুকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সঠিক কোন জায়গায় রেকেচেন তাও খুব যত্নে একটা কাগজে লিকে রেকে ছিলেন কিন্তু সেটা যে কোতায় আছে তাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। মগনের বাপও অনেক খোঁজা-খুঁজি করেছে কিন্তু পায় নি। পেলে কি আর আজ আমাদের এ দুর্দশা। আজ তিন দিন হোলো সেই কাগজটা কতগুলো পুরোনো কাগজ ঘেঁটে পেয়েচি। সেদিন থেকে ওকে এ কতাটা বলিনি, মগনটা বাইরেই তো রয়েচে না? আমার মাতার কাচে এই সিন্দুকটা দেকচেন না, এতেই ওটা রেকেচি, সব কতা ওতেই লেকা আচে। গুপ্তধনের হদিশটা ওতেই পেয়ে যাবেন। জায়গা মতো গিয়ে মাটি খুঁড়লেই তা নির্ঘাৎ হাতে পেয়ে যাবেন। আপনি পেলে তা মগনের হাতে আসবেই। এই কতাটা বলবো বলে কদিন ধরে ছেলেটাকে বলচি আপনাকে ডেকে আনতে। আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বেসও হয় না! দুনিয়া থেকে ধম্মাধম্ম সব উটে গেচে বাবু, কার ওপরেই বা ভরসা করি বলুন।

তিন

হরিদাস গুপ্তধনের কথা নিজের মনেই চেপে রাখেন। কি করবেন, নিজেই ঠিক করতে পারেন না। কথায় আছে না, এক কলসী দুধে এক ফোঁটা গো-চনা পড়লে পুরো দুধটাই নষ্ট হয়ে যায়, তাঁর অবস্থাও ঠিক তাই হয়েছে। কাগজটাতে সংকেত দেওয়া আছে যে এ বাড়ীর পাঁচ'শ পদক্ষেপ দূরে পশ্চিম দিকের এক মন্দিরের চাতালে পোতা আছে সে ধন।

হরিদাস গুপ্তধনটা নিজের হাতে করতে চান। কাজটা যদিও খুবই কষ্ট সাধ্য তবু, সাবধান কেউ যেন ঘুণাক্ষরে তা জানতে না পারে। তাহলে সবাই ওর এই জঘন্য মনোবৃত্তির কথা ভেবে ছিঃ ছিঃ করবে, গায়ে থু থু দেবে, সংসারে সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক হচ্ছে বদনামের ভাগী হওয়া, সেদিক থেকেও প্রবল আশঙ্কা আছে।

তিনি আর ভাবতে পারছেন না। যে অনাথ ছেলেটাকে নিজের ছেলের মত করে মানুষ করছেন, তার সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করবেন। কয়েকদিন ধরে একটা অব্যক্ত ব্যথা তার অশান্ত মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। অবশেষে কুবুদ্ধিরই জয় হোল। জীবনে কখনো তো কোনো অধর্ম করিনি, তাহলে আজও করবো না। আচ্ছা কথায় তো আছেই, সুজনেরও ডোবে নাও, হাতিরও পিছলে পা। আমিও তো মানুষ, ভুল তো আমারও হতে পারে না-কি? দোষে-গুণেই তো ভগমান মানুষ সৃষ্টি করেছেন। লোভকে যে জয় করতে পারে সে তো দেবতা! আমি দেবতা হতে চাই না।

মনকে বোঝানো আর কোনো বাচ্চাকে বোঝানো একই কথা। হরিদাস রোজই বিকেলে বেড়াতে যান। এসে সেই মন্দিরের চাতালে বসে থাকেন। সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে একটা কোদাল দিয়ে খুঁড়তে শুরু করেন। দিনের বেলায়ও দু-একবার এসে মন্দিরের চারদিকটা ভাল করে দেখে যান, মনে সব সময় একটা সন্দেহ উঁকি-ঝুঁকি দেয়, এই বুঝি আর কেউ সে জায়গার সন্ধান পেয়ে গেছে! ভণ্ড বৈষ্ণব যেমন ভয়ে ভয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিষিদ্ধ আমিষের স্বাদে নিজের জিভকে তৃপ্তি করে, রাতে নিস্তব্ধ অন্ধকারে একা বসে বসে, ঠিক তেমনি করে একটা একটা করে ইঁট সরিয়ে যান। লম্বা-চওড়া চাতাল। মাসখানেক ধরেই খুঁড়ে চলেছেন, তবু মনে হচ্ছে এখনো অর্দ্ধেকটাও খোঁড়া হয় নি। মনে সব সময়ই একটা অস্থিরভাব, শরীরে যেন কোনো মন্ত্রশক্তি কাজ করছে।

চোখের চাহনিও কেমন যেন রহস্য মাখানো। কারো সঙ্গেই খুব একটা কথা বলেন না, সব সময় যেন ধ্যানস্থ হয়ে আছেন! কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেও রেগে ওঠেন। ভাটির দিকেও খুব কম যান। বুদ্ধিমান লোক। অন্তরাত্মা বারে বারে এই কুটিল আবর্ত থেকে সরে আসে, সায় দিতে পারে না, তাই ঠিক করেন, আর ওদিকে কক্ষণো যাবো

না, কিন্তু সন্ধ্যে হতেই তাকে যেন নেশায় পেয়ে বিবেক বুদ্ধি সব অপহরণ করে নেয়। মার খেয়ে কুকুর যেমন একটু পড়ে এক টুকরো খাবারের লোভে এসে হাজির হয়, তার অবস্থাও ঠিক তেমনি। এই করেই দুটোমাস কেটে গেলো।

অমাবস্যার রাত। হরিদাস ম্লান মুখে মন্দিরের একপাশে বসে ভাবছেন—এ নিয়ে বসে থাকা যায় না, আজই এর একটা নিষ্পত্তি করা চাই। অবশ্য সে জন্যে এর পেছনে অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশী মেহনতই দিতে হবে। যাক্, আর ভেবে লাভ নেই। রাত হয়ে গেলে বাড়ীতে সবাই চিন্তা করবে। তা করুক। মাটির নীচে গুপ্ত কুঠরী পেলে তবেই বুঝবো কাগজটাতে যা লেখা আছে তাই ঠিক। আর যদি তা না হয় তাহলে ধরে নিতে হবে পুরোটাই মিথ্যে। সত্যি সত্যি যদি কিছু না পাই তাহলে এতো পরিশ্রম সব জলে যাবে! অনর্থক পণ্ডশ্রম করলাম! উঁহু, এইতো, কোদালটা যেন কিসে লেগে টং টং করে উঠলো। হ্যাঁ, একটা পাথরে লাগলো মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা তো দেখতেই হয়। একটু পরেই তার সব সন্দেহ দূর হয়ে একটা চৌকো পাথর বেড়িয়ে এলো। হ্যাঁ যা ধরেছি তাই, এটা চোরাকুঠরী ছাদ।' হরিদাস আনন্দে প্রায় নাচতে শুরু করে দেন।

অসহ্য মাথা ব্যথা নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। খুব ক্লান্ত লাগছে। রাতে ঘুমিয়েও তা কাটে না। সে রাত থেকেই তার খুব জ্বর হোলো। তিন দিন জ্বরের ঘোরে পড়ে রইলেন। ওষুধেও কোনো কাজ হোলো না।

অসুস্থ অবস্থায় হরিদাসের মনে হয়—এ হয়তো আমার লোভেরই শাস্তি। ইচ্ছে করছে মগন সিংয়ের হাতে কাগজটা দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিই। কিন্তু লোকে কি ভাববে, হয়তো একটা সোরগোল পড়ে যাবে, পুরো সম্পত্তিটা অনাথ ছেলেটার হাতছাড়া হয়ে যাবে। লজ্জা-ভয় যেন আমার গলাটাকে জাপটে ধরে আছে। জানিনা খ্রীষ্টানরা মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে পাদ্রীর কাছে কেমন করে নিজের জীবন-ভর পাপের কথা অকপটে বলে?

চার

হরিদাসের মৃত্যুর পর সেই গুপ্তধনের সংকেত লেখা কাগজ তার সুযোগ্য ছেলে প্রভুদাসের হাতে পড়ে। এটা যে মগন সিংহেরই কোনো পূর্ব পুরুষ লিখে রেখে গেছেন সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। তবু সে ভাবে—আমার বাবার মতো সৎ, ন্যায়পরায়ণ লোক খুব কমই দেখা যায়। তিনি নিশ্চয়ই অনেক ভেবে চিন্তে এ পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন। তাকে সবাই বিশ্বাস করতো। তিনিই যখন এটাকে ঘেন্নার চোখে দেখেন নি, তখন আমি তো কোন ছার। ঐ গুপ্তধন হাতে পেলে সারা জীবন আর খেটে খেতে হবে না। তিন পুরুষেরও আর কাজ না করলে চলবে।

শহুরে বড়লোকদের দেখিয়ে দেব পয়সা কি করে খর্চা করতে হয়। তখন সবাই আমাকে কুর্ণিশ করবে। আরে বাবা, এ জগতে টাকাটাই তো সব! তখন আমাকে রক্ত চক্ষু দেখায় কার বাপের সাধ্যি! তখন আমিই হবো এই সমাজের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা! উঃ! আর ভাবতে পারছি না!

সন্ধ্যে হতে না হতেই সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলো। ঠিক সেই সময়, সতর্ক দৃষ্টি আর কোদালের তেজ দেখে মনে হোলো হরিদাসের আত্মাই হয়তো নতুন রূপে এসে অসম্পুর্ণ কাজ সমাধান করতে এসেছেন।

আগে তো চাতালটা খোঁড়াই ছিলো। এখন চোরা কুঠুরীর ওপরের অংশটা কাটানোই মুশ্‌কিল। আগের দিনের আসল মশ্‌লা দিয়ে তৈরী, ওর হাতের কুড়ুল পাথরের গায়ে লেগে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। যাই হোক, কয়েকদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে মশ্‌লা দিয়ে জড়ানো জায়গাটা ফাটিয়ে দিলেও পাথরটা নাড়ায় কার সাধ্য! তখন একটা লোহার মোটা রড এনে ওটাকে সরাতে চেষ্টা করলো, তাতেও কিছু হোলো না। পাথর যেন পাহাড় হয়ে চেপে বসে আছে। সব কাজ একাই করেছে, কাউকে সঙ্গে নিলে বোধ হয় কাজটা করা সহজ হোতো। এমন কি আবার সেই অমাবস্যা রাত এলো! প্রভুদাস যথাশক্তি চেষ্টা করছে, রাত বারটা অনেকক্ষণ আগেই বেজে গেছে, কিন্তু পাথরটা তখনো ভাগ্যরেখার মতই অটল হয়ে আছে।

না, আজ এর একটা হেস্তনেস্ত করা চাই-ই। এই চোরা কুঠুরী কারো নজরে পড়লে, আর দেখতে হচ্ছে না, তখন আমার মনের ইচ্ছে মনেই থেকে যাবে।

পাথরটার ওপর বসে ভাবতে থাকে—কি যে করি? মাথায় তো কোনো বুদ্ধিই আসছে না! হঠাৎ যেন একটু আশার আলো দেখতে পায়, বারুদ নিয়ে এলে কেমন হয়। এতই অধীর হয়ে উঠেছে যে 'কাল করবো' বলে কাজটা ফেলে রাখতে মন চায় না। সোজা বাজারে চলে গেলো, দু'মাইল রাস্তা যেন হাওয়ায় উড়ে চলে এলো। এত রাতে বাজারের দোকান বন্ধ হয়ে যায়। তখন আতশবাজির সন্ধান করতে থাকে। তাছাড়া বারুদের ওপর তখন সরকারী বিধি-নিষেধ চলছিল। তাই দোকানি জিজ্ঞেস করে—এখন এই এতো রাতে বারুদে কি কাজ? না ভাই, বিয়ে বাড়ী থেকে বাজি কিনতে এলেও অনেক ভেবে চিন্তে দিই, নয়তো স্রেফ নেই বলি।

শান্ত শিষ্ট প্রভুদাসকে এর আগে কখনো এতো কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয় নি। অনেক অনুনয়-বিনয় করে হতাশ হয়ে শেষে টাকার লোভ দেখিয়ে দোকানদারকে হাত করে নিলো। ব্যস, প্রভুদাসকে আর পায় কে!

রাত দু'টো বাজলো প্রভুদাস মন্দিরের পাশে এসে পাথরের দরজার ওপরে বারুদ রেখে আগুন জেলে দিয়ে দূরে সরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে একটা ভীষণ শব্দ হয়ে

পাথরের দরজাটা উড়ে গেলো। সামনে গভীর অন্ধকার, দেখে মনে হয় কোনো পিশাচ যেন তাকে গিলে খেতে মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।

পাঁচ

ভোরবেলা। প্রভুদাস নিজের ঘরে শুয়ে আছে। সামনে রাখা লোহার সিন্দুকে পুরোনো দিনের দশ হাজার মোহর রাখা আছে। ওর মা মাথার কাছে বসে বসে পাখার হাওয়া করছে। প্রভুদাস শুয়ে শুয়ে জ্বরের ঘোরে ছটফট করছে। গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। সারা গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। কাতরাতে কাতরাতে হাত-পাগুলো আছড়াচ্ছে। কিন্তু চোখ রয়েছে সেই সিন্দুকের দিকে। যেন তাতেই ওর জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা বন্ধ করে রেখেছে।

এখন মগন সিংকে সেই ইঁট ভাঁটির সমস্ত দায়-দায়িত্ব দিয়ে প্রধান কর্মচারী করা হয়েছে। এ বাড়ীতে সে থাকে। সে এসে বলে—ভাঁটিতে চলুন, যাবেন কি? গাড়ী তৈরী করতে বলবো?

তার দিকে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে তাকিয়ে বলে—না, শরীরটা ভাল নয়, আজ আর যেতে পারবো না। শোনো, তোমারও গিয়ে কাজ নেই।

ওর অবস্থা দেখে মগন সিং ডাক্তার ডেকে আনতে গেলো।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভুদাসের মুখটাও কেমন ফ্যাকাসে হয়ে পড়ে, চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল হয়ে গেছে। ওর মাও শোক বিহ্বল হয়ে পড়েন। বাবু হরিদাসের শেষ অবস্থাটা এখনো তার চোখে ভাসছে। ভয় হয়, একি সেই শোকেরই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে! মায়ের মন, কত দেবতার নাম করে যে মানত করছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই, কিন্তু প্রভুদাসের চোখ সেই সিন্দুকের দিকে, ওখানেই যেন তার প্রাণ পাখীটাকে বন্দী করে রেখেছে।

তার স্ত্রী এসে তার পায়ের কাছে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। প্রভুদাসের চোখেও জল, হতাশা ভরা দুটো চোখ তখনো সেই সিন্দুকের দিকে।

ডাক্তার এসে রুগী দেখে ওষুধ দিয়ে গেলেন; কিন্তু ওষুধের ফল হোলো উল্টো। প্রভুদাসের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, চোখে-মুখে নিস্তব্ধভাব, নাড়ীর গতিও খুব খারাপ; কিন্তু চোখ রয়েছে সেই সিন্দুকেরই দিকে।

পাড়ার সব লোক যেন সেই ঘরে সামনে এসে ভেঙ্গে পড়েছে। আড়ালে কেউ কেউ আবার বাপ-বেটার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহও প্রকাশ করে। দুজনেই কিন্তু খুবই ভদ্র এবং বিনয়ী ছিলেন। ভুল করেও কখনো কারোর মনে দুঃখ দেয় নি। প্রভুদাসের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, চোখেই শুধু প্রাণের আভাস দেখা যাচ্ছে। এখনো সে সতৃষ্ণ

ভাবে সেই সিন্দুকের দিকে চেয়ে আছে।

বাড়ীতে সোরগোল পড়ে গেছে। শাশুড়ী-বৌ দুজনেই আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে। পাড়ার অনেক মেয়েরা এসে ওদের বোঝাচ্ছেন, সান্ত্বনা দিচ্ছেন অন্যান্য আত্মীয় পরিজনরাও চোখ মুছছে। সংসারে যৌবনে মৃত্যু সবচেয়ে করুণ, হৃদয়-বিদারক দৃশ্য। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই এ বিধাতার এক নির্দয় লীলা। প্রভুদাসের দেহে বেঁচে থাকার কোন চিহ্ন নেই, কিন্তু চোখদুটো তখনো কোনোরকমে প্রাণের সাড়া দিচ্ছে। অনিমেষ চোখে সিন্দুকের দিকে চেয়ে আছে। জীবন যেন তৃষ্ণার রূপ ধারণ করেছে। শ্বাস থাকলেও কোনো আশা নেই।

এরই মধ্যে মগন সিং তার সামনে এসে দাঁড়ালো। প্রভুদাসের দৃষ্টি তার দিকে পড়তেই শরীরে যেন একটু একটু করে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল। ইশারায় কাছে ডেকে ওর কানের কাছে মুখটা নিয়ে কিছু বলে একবার লোহার সিন্দুকটার দিকে ইশারা করলো। পরক্ষণে চোখ উল্টে গেলো, কিছুক্ষণ থর থর করে কেঁপে তারপর সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

সত্যাগ্রহ

মহামান্য ভাইসরয় বেনারসে আসছেন। তাই ছোট-বড় সব রকমের সরকারী কর্মচারী তাঁকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। অন্যদিকে কংগ্রেস দল হরতাল ডাকায় শহরে খুবই চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় উড়ছে কংগ্রেসের পতাকা আর তৈরী হচ্ছে সভা-সমিতির প্যাণ্ডেল। পুলিশ আর সৈন্যবাহিনী তৈরী হয়েই আছে। কোন রকম গোলমাল হলে গ্রেপ্তার করবে। সরকার পক্ষ হরতাল করতে দেবেন না, কিন্তু কংগ্রেস দল হরতাল করবেই। সরকার পক্ষের আছে পশুবল আর কংগ্রেসের আছে নৈতিক বলের ভরসা। উভয় দলের পরীক্ষা আগত, কে জয়ী হবে কে জানে!

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ ঘোড়ায় চড়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরের প্রতিটি দোকানে গিয়ে জানিয়ে এসেছেন, দোকান বন্ধ রাখলে জেলে যেতে হবে। দোকানদারগণ হাত জোড় করে জানিয়েছেন—হুজুর, আপনিই মালিক, আপনিই বিধাতা, যা ইচ্ছে করুন, আমরা নিরুপায়। কংগ্রেস আমাদের আস্ত রাখবে না। দোকানের সামনে তাঁরা ধর্না দিতে পারে, আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। হুজুর, আমরা পড়েছি দো-টানায়। দোকান খোলা রাখলে আমাদেরই তো ভাল, কিছু রোজগার হয়, কিন্তু কী করবো বলুন! আমরা তো কোন উপায় দেখছি না। আপনারাই বরং কংগ্রেসীদের একটু বোঝান।

রায় হরনন্দন সাহেব, রাজা লালচন্দ আর খাঁ বাহাদুর মৌলবী মহম্মদ আলী সরকারী কর্মচারীদের চেয়েও বেশী চিন্তিত। তাই, তাঁরা দল বেঁধে দোকানদারদের বোঝাচ্ছেন, অনুনয়-বিনয় করছেন, চোখ রাঙাচ্ছেন। এক্কা ও রিক্সাওয়ালাদের শাসাচ্ছেন এবং শ্রমিকদের খোসামোদ করছেন, কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন কংগ্রেসী এমন আতঙ্ক ছড়িয়েছে যে, তাঁদের কথা কেউ-ই শুনছে না। এমন সময় পাড়ার এক সব্জিওয়ালী নির্ভয়ে বলে ওঠে—হুজুর, রাখুন আর মারুন, দোকান আমরা খুলবো না। বেইজ্জতী হতে চাই না। এখন চিন্তা হলো, যারা প্যাণ্ডেল তৈরী করছে সেই সব মজুর, মিস্ত্রীরা যেন কাজ বন্ধ না করে দেয়। তাহলেই মুস্কিল হবে। দোকানদারদের মন্তব্য শুনে রায় সাহেব বললেন—আলাদা একটা বাজার বসানো দরকার।

খাঁ সাহেবের বক্তব্য—সময় কম বলে হয়তো তা সম্ভব হবে না। তারপর ম্যাজিস্ট্রেট্কে বললেন—হুজুর, ঐ কংগ্রেসীগুলোকে আগে গ্রেপ্তার করুন। ওদের জায়গা-জমি নীলেম করে দিন। দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

রাজা সাহেব বললেন—ধরপাকড় করলে হৈ-চৈ শুরু হয়ে যাবে। তার চেয়ে হুজুর

(সত্যাগ্রহ)

আপনি কংগ্রেসীদের বলে দিন, হরতাল বন্ধ করলে সবাইকে চাকরি দেওয়া হবে। ওদের মধ্যে প্রায় সবাই বেকার, প্রলোভন দেখালে নিশ্চয় কাজ হাঁসিল হবে।

এতগুলো উপদেশ ম্যাজিষ্ট্রেটের বেশ পছন্দসই হলো না। ওদিকে ভাইসরয়েরও আসতে আর দেরী নেই।

দুই

শেষে রাজা সাহেব একটা যুক্তি খাড়া করে বললেন—আমরা এ ব্যাপারে নৈতিক বল প্রয়োগ করছি না কেন? কংগ্রেসীরা তো ধর্ম আর নীতির ওপর বিশ্বাসী। আমরা সেই বিশ্বাসের ওপরেই একটা চাল চালতে পারি। তাহলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা যায়। দেখুন, এমন একটা লোক খুঁজে বের করতে হবে যিনি দোকানদারের ওপর আদেশ জারী করতে সক্ষম। তবে হ্যাঁ, তাঁকে কিন্তু ব্রাহ্মণ হওয়া দরকার এবং প্রত্যেকেই যেন তাঁকে চেনে ও সম্মান করে। রাজা সাহেবের যুক্তি প্রত্যেকেরই মনোমত হয় এবং খুশী হন। অন্যান্যদের আগ্রহ দেখে রায় সাহেব বললেন—আর যায় কোথায়, কাজ হাঁসিল আমরা করবোই। আচ্ছা, এ ব্যাপারে পণ্ডিত গদাধর শর্মাকে আনা যায় না?

রাজা—না না, তাঁকে আবার কে সম্মান করবে? তিনি তো শুধু খবরের কাগজে লেখেন। কে-ই বা তাঁকে চেনে?

রায় সাহেব—আচ্ছা, দমড়ী ওঝা কেমন হবে?

রাজা—তা কী করে হয়? কলেজের ছেলে-মেয়েরাই তো শুধু তাঁকে চেনে।

রায় সাহেব—বেশ, পণ্ডিত মোটেরাম শাস্ত্রী হলে কেমন হয়?

রাজা—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা' আপনি ঠিকই বলেছেন। এ ব্যাপারে তিনি উপযুক্ত লোক হবেন বলেই মনে হয়। তাহলে তাঁকেই ডাকা হোক। বিদ্বান আবার ধর্ম-কর্ম নিয়েই থাকেন। বেশ চালাক। তিনি এলে তো আমরা বাজীমাৎ করে দেবো বলে মনে হয়।

রায় সাহেব মোটেরামের বাড়ীতে খবর পাঠালেন। পণ্ডিতজী পুজোয় ব্যস্ত, কিন্তু প্রস্তাব তাঁর কানে পৌছালে পুজোটাও তাড়াতাড়ি সেরে নেন। তারপর মনে মনে ভাবেন—রাজাসাহেব ডেকেছেন, আহা, কী ভাগ্য! স্ত্রীকে বললেন—আজ চন্দ্রমা, তাই হয়তো কোথাও বলী-টলী হবে। আচ্ছা, কাপড়টা দাও। দেখি, একবার ঘুরে আসি।

স্ত্রী বললেন—খাবার দেওয়া হয়েছে, খেয়ে যাও। কখন ফিরবে তার ঠিক নেই।

বার্তাবহকে বেশীক্ষণ আটকে রাখা ঠিক নয়, তাই পণ্ডিতজী যাবার জন্যে তৈরী। শীতের দিন। পণ্ডিতজীর পরনে লাল চওড়া পেড়ে সিল্কের ধুতি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী, মাথায় বেনারসী পাগ্‌ড়ি, গলায় জরি বসানো চাদর আর পায়ে খড়ম। মুখে বের

হচ্ছে ব্রহ্ম জ্যোতি! দূর থেকে মনে হবে হয়তো কোন মহাত্মা পুরুষ আসছেন। পথে যার সঙ্গেই দেখা, অবনত মস্তকে প্রণাম জানায়। কত দোকানদার তাঁর পায়ের ধুলো নেবার জন্যে ছুটে আসছে। আজ শহরে তাঁর নাম সবার মুখে মুখে। কী নম্র স্বভাব, শিশুর মত হেসে কথা বলেন, তাঁর কথায় সকলেই আকৃষ্ট হয়। যা হোক, শেষ পর্যন্ত পণ্ডিতজী রাজা সাহেবের ঘরে গেলেন। তিনবন্ধু উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানান। খাঁ বাহাদুর বললেন—কী পণ্ডিতজী শরীর ভাল তো? মনে হচ্ছে, আল্লা আপনাকে ভালই রেখেছেন! তা আপনার ওজন প্রায় মণ-দশেক হবে, না কি বলুন?

রায় সাহেব—দেখো ভাই, একমণ বিদ্যের জন্যে দশমণ বুদ্ধির দরকার হয়। আবার একমণ বুদ্ধির জন্যে দশমণ দেহ দরকার, তা না হলে বিদ্যে আর বুদ্ধি কে ধরে রাখবে বলো?

রাজা সাহেব—তোমরা ঠিক বুঝতে পারছো না। বুদ্ধি হলো তরল পদার্থ, তাই মগজে যতটা ধরবার ধরে, বাকীটা দেহে চারিয়ে যায়।

খাঁ সাহেব—আমি তো ভাই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি—মোটা লোকেরা বোকা হয়।

রায় সাহেব—তোমার ধারণা ভুল। বরং একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, বুদ্ধি আর দেহের যদি এক ও দশের অনুপাত হয়, তাহলে বলতে হবে, যত মোটা দেহধারী হবেন ততই তাঁর বুদ্ধিরও ওজন বাড়বে।

রাজা সাহেব—তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, যত মোটা লোক হবেন, বুদ্ধিও হবে তত বেশী, না কি বলো?

মোটেরাম—রাজ দরবারে তো মোটা মোটা বুদ্ধিরই দরকার হয়, তবে রোগা বুদ্ধি নিয়ে কী করবে ভাই?

এইরকম হাস-পরিহাসের মধ্যে রাজা সাহেব বর্তমান সমস্যার কথা পণ্ডিতজীর সামনে তুলে ধরলেন এবং সমাধানের যে উপায় বের করেছিলেন তা' জানিয়ে বললেন—পণ্ডিতজী, এবার বুঝে নিন আপনার হাতেই সবকিছু নির্ভর করছে। হয়তো কোন লোকের ভাগ্য নির্ণয়ের এটাই গুরুত্বপূর্ণ সময়। হরতাল বন্ধ করে দিতে পারলে জীবনে আর কারোর দোরে যাবার দরকার হবে না। এমন একটা চাল চেলে দিন, যাতে সবাই ঘাবড়ে যায়। ধর্ম-ভাবাপন্ন কংগ্রেসীরাও যাতে আপনার শরণাপন্ন হয়, তার একটা ব্যবস্থা করুন।

মোটেরাম গম্ভীর হয়ে বললেন—এ এমন কি আর কঠিন কাজ! আমি এমন করে দিতে পারি, যাতে আকাশ থেকে জল নেমে আসে। মড়ক থেমে যায়, আর জিনিস-পত্রের দাম কমে। কংগ্রেসীদের শান্ত করা সে আর এমন কি কাজ? তারা ভালই

জানে, আমি যা করতে পারি তা আর কেউ পারে না। গুপ্তবিদ্যা সম্বন্ধে তাদের কি বা ধারণা আছে?

খাঁ সাহেব—তাহলে তো জনাব, এটা বলা চলে যে, আপনি অন্য একজন খোদা। আমরা কী করে জানবো যে, আপনার মধ্যে এত গুণ আছে, না হলে আমাদের এত কষ্ট করতে হয়?

পণ্ডিত মোটেরাম—মশাই, আমি গুপ্তধনের সন্ধান বলে দিতে পারি। প্রেতাত্মাকেও ডেকে আনতে পারি, অবশ্য তার জন্যে চাই গুণগ্রাহক। সংসারে পণ্ডিতের অভাব নেই, শুধু গুণ আর বিশ্বাসের অভাব।

রাজা—বেশ তো, এর জন্যে আপনার কী দরকার হবে বলুন না?

পণ্ডিতজী—আপনারা যা ভাল বুঝবেন দেবেন।

রাজা—আচ্ছা, কীভাবে কি করবেন একটু বলবেন কি?

পণ্ডিতজী—শুনুন, অনশন ব্রতের সঙ্গে চলবে মন্ত্র জপ। দেখবেন, তার ফলে গোটা শহরটায় হৈ-চৈ পড়ে যাবে। তা যদি না হয়, তাহলে আমার নাম মোটেরামই নয়।

রাজা—বাঃ, বেশ ভালই হবে। তাহলে কবে থেকে আরম্ভ করছেন?

পণ্ডিতজী—আজই করবো। তবে হ্যাঁ, পূজো-টুজো করার জন্যে, অর্থাৎ দেব-দেবীর আহ্বানের জন্যে কিছু টাকা দিয়ে দেবেন।

পণ্ডিতজী টাকা নিয়ে খুশীমনে বাড়ীতে যান। স্ত্রী সাবধান করে দিয়ে বললেন—'অকারণ এ বাঁশ কেন নিচ্ছো? খিদেতে যখন অস্থির হয়ে যাবে, তখন কী হবে? লোকেরা বদনাম করবে, হাসি-ঠাট্টা করবে। তার চেয়ে বরং তুমি টাকা ফেরৎ দাও।

পণ্ডিতজী আশ্বাস দেন—আরে ওসব কিছু ভেবো না। আমি অতটা বোকা নই। তুমি বরং আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করো। এই টাকা দিয়ে অমৃত্তি, লাড্ডু, রসগোল্লা আনাও, পেট ভরে খাই। তারপর আধসের ক্ষীর ও আধসের কাঁচা গোল্লা খেতে হবে। তাছাড়া দই তো থাকবেই। দেখবো খিদে কেমন করে পায়। তিনদিন থাকবো, তারপর নিশ্চয়ই ভাগ্যোদয় হবে। এখন টালবাহানা করলে সব ফসকে যাবে। বাজার যদি বন্ধ না হয় তাহলে আর দেখতে হবে না। দেখো, তখন কেমন আমদানী হবে। আপাততঃ শ'খানেক টাকা হাতে এসেছে।

বাড়ীতে চলছে পণ্ডিতজীর আহারের ব্যবস্থা, আর অন্যদিকে শহরে ঢেড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে, সন্ধ্যার সময় টাউন হল ময়দানে পণ্ডিত মোটেরাম দেশের রাজনৈতিক সমস্যার ওপর ভাষণ দেবেন, লোকেরা যেন জমায়েত হন। পণ্ডিতজী রাজনীতি থেকে অনেক দূরে, তবু আজ তিনি সে বিষয়ে কিছু বলবেন, নিশ্চয়ই শোনা উচিত। জনসাধারণ উৎসুক, কেননা, পণ্ডিতজীর যথেষ্ট সুনাম আছে। ঠিক সময়েই

হাজার হাজার লোক এসে হাজির হয়েছেন। পণ্ডিতজী ঘর থেকে বেশ পেট ভর্তি করেই বেরিয়েছেন, এমন খেয়েছেন যে, চলতে পারছেন না। টাউনহলে পৌছালে অধিকাংশ লোকই তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে এগিয়ে আসেন।

পণ্ডিতজী বললেন—মাননীয় নগরবাসী, ব্যবসায়ী, শেঠ মহাজনেরা, আমি শুনেছি আপনারা কংগ্রেসীদের পক্ষ সমর্থন করে মহামান্য লাটসাহেবের শুভাগমনের দিন আপনারা হরতাল করবেন। এটা কি কৃতঘ্নতা নয়? দেখুন, তিনি ইচ্ছে করলে আপনাদের তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে পারেন, শহরটাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতেও পারেন। তিনি রাজা, যে-সে ব্যাপার নয়। তিনি আপনাদের কিছুরই অভাব রাখেন না, বরং আপনাদের দারিদ্র্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি সদা জাগ্রত। তবু আপনারা অবুঝের মত কাজ করতে নামছেন? দেখুন, লাটসাহেব চাইলে রেল, ডাক, মালপত্র আনা-নেওয়া, সবই বন্ধ করে দিতে পারেন। বলি, যদি ঐসব বন্ধ করে দেন, তখন আপনারা কী করবেন? তিনি ইচ্ছে করলে শহরের সবাইকে জেলে ভরতে পারেন, তখন কী হবে? তাই বলি, রাজাকে ছেড়ে প্রজা কী করতে পারে বলুন? তাঁর অধীনে থেকে কেন আপনারা গোলমাল করতে চান? মনে রাখবেন, আপনাদের সকলের প্রাণ তাঁর হাতের মুঠোয়। শহরে একবার প্লেগ দেখা দিলে কী হবে বলুন দেখি? তাই বলি, ঝাঁটা দিয়ে কি আর ঝড় থামানো যায়? আমি আপনাদের সাবধান করে দিয়ে বলতে চাই, আপনারা যদি হরতাল করে সবকিছু বন্ধ করে দেন, তাহলে আমি আমৃত্যু অনশন করবো।

একজন হাসতে হাসতে বললেন—মহারাজজী, আপনার যা শরীর, তাতে মাস খানেক না খেলেও কিছুই হবে না।

পণ্ডিতজী গর্জ্জন করে বললেন—শুনুন, প্রাণ দেহে থাকে না, থাকে ব্রহ্মাণ্ডে। আমি ইচ্ছে করলে যোগবলে এখুনি প্রাণ ত্যাগ করতে পারি। আমি আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি, এরপর আপনারা যা ভাল বোঝেন, করবেন। আমার পরামর্শ শুনলে আপনাদেরই মঙ্গল হবে, না হলে ব্রাহ্মণ হত্যার ফল আপনাদেরই ভোগ করতে হবে। সে যাই হোক, আমি আমার এই অনশন শুরু করলাম।

তিন

পণ্ডিত মোটেরামজীর অনশন করার সংবাদে শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস মনে করলো তাঁর অনশনটা হয়তো সরকারী কর্মচারীদের একটা চাল। তাঁকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে, এটা তাঁর ভণ্ডামী। সরকারের দালালরা মোটা টাকা দিয়ে তাঁকে একাজে নামিয়েছেন। যেখানে পুলিশ, মিলিটারী, আইন, সবকিছু পিছিয়ে আসছে, সেখানে এই পথ ধরলেন? এটা নিশ্চয়ই রাজনৈতিক চাল। না হলে পণ্ডিতজী হঠাৎ এমন

দেশভক্ত হয়ে উঠবেন কেন? যিনি আমাদের মতই একজন, তিনি এমন কাজ করবেন কেন? দেখা যাক, অনশন করে তিনি কী করতে পারেন? কে জানে কাদের জয় হবে!

বণিক সমাজ সাধারণতঃ ধর্মভীরু, তাই তাঁরা একটু বিচলিত। তাঁদের বক্তব্য—পণ্ডিতজী শেষ পর্যন্ত সরকার পক্ষে গেলেন? আমাদের লোকসান করে দিতে চান? এমন পথে পা বাড়ালেন কেন? যাঁকে দেখে সকলেই সম্মান করে, তিনি আজ রাজনীতির শিকার হলেন? অফিসাররা ট্যাক্স বাড়ান, ব্যবসায়ীর প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখেন, শাসন করেন, পুলিশ পাঠান, তাতে আমাদের এমন কিছু এসে যায় না, কিন্তু বিদ্বান, কুলীন, ধর্ম-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমাদের বিরুদ্ধে আজ অন্ন-জল ত্যাগ করে বসে আছেন! এ কেমন কথা? এ কাজের পর তিনি কি আগের মত আর সম্মান পাবেন? ভগবানের কাছে তিনি কী জবাব দেবেন?

শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস দলের কেউ-ই তাঁর ধারে-কাছে এলেন না। ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে রাত ন'টার সময় পণ্ডিতজীর কাছে একটা ডেপুটেশন্ গেল। পণ্ডিতজী আজ বাড়ী থেকে অতিরিক্ত ভোজন করেই এসেছেন। অতি-ভোজন তাঁর কাছে বিচিত্র কিছু নয়, এটা সাধারণ ব্যাপার। কেননা, মাসের কুড়িটা দিনই তাঁর নিমন্ত্রণ আসে, আর সেই সব নিমন্ত্রণে খাওয়া-দাওয়ার কথা না বলাই ভাল, তাতেও যেন প্রতিযোগিতা চলে। তাছাড়া গৃহ-স্বামীদের অনুরোধে অধিক ভোজন করতেই হয়। পণ্ডিতজীর জঠরাগ্নি বড় বড় পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়ে আছে। তাই, তাঁর সব সময় খাবার দরকার হয় না। যখন খান, তখন একেবারে দু'দিনের খাবার ভরে নেন। তবে খাবার পেলে খেতে আপত্তি করেন না।

রাত ন'টা পার হলে পণ্ডিতজীর খিদে পায়। এমন অবস্থা হলো যে, কোন ফেরিওয়ালাকে দেখতে পেলে একবার ডাকেন। মুস্কিল হলো, সরকারী অফিসাররা পণ্ডিতজীর সুরক্ষার জন্যে পুলিশ পাহারা বসিয়েছেন। তারা সরবার নাম করে না। পণ্ডিতজীর এক চিন্তা—কী করে এই যমদূতগুলোকে সরানো যায়? মনে মনে বলছেন—এগুলোকে খামোকা কেন হাজির করেছে? আমাকে কয়েদী মনে করেছে নাকি? আমি কি পালিয়ে যাবো ভেবেছে?

অফিসাররা হয়তো এই জন্যেই তাদের বসিয়ে রেখেছে, যাতে কংগ্রেস কর্মীরা জোর করে পণ্ডিতজীকে তুলে না দেয়। কার মনে কী আছে কিছু বলা যায়? তাই অপমানজনক হলেও পণ্ডিতজীর প্রতি অফিসারদের এটা একটা কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়।

ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন্ এলে পণ্ডিতজী উঠে বসেন। নেতা তাঁর চরণ

স্পর্শ করে বললেন—পণ্ডিতজী, আমাদের ওপর আপনি কেন বিরূপ হলেন? আপনি যা আদেশ করবেন, আমরা মাথা পেতে নেবো। দয়া করে উঠে কিছু মুখে দিন। আমরা ধারণাই করতে পারি নি যে, আপনি অনশন করবেন। এটা জানলে আপনার কাছে আগেই আমরা যেতাম। দেখুন, প্রায় রাত দশটা বাজলো, আমাদের অনুরোধ রাখুন, আপনার আদেশ আমরা অমান্য করবো না।

পণ্ডিতজী—আরে কংগ্রেসের দল, তোমরা কি আমাকে দলে টানতে চাইছো? তোমরা ডুবছো বলে কি আমাকেও ডুবিয়ে ছাড়বে? শোনো, বাজার বন্ধ থাকলে তোমাদেরই তো ক্ষতি হবে, তাতে সরকারের কি? চাকরি ছেড়ে দিলে না খেয়ে মরবে, তাতে সরকারের কি? জেলে গিয়ে ঘানি টানবে, তাতে সরকারের কী বয়ে যাবে? তোমরা কি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে এসেছো? সাবধান করে দিচ্ছি, এমন কাজও করো না। বলি, দোকান কেন খুলে রাখবে না শুনি?

শেঠজী—পণ্ডিতজী যতক্ষণ না একটা ফয়সালা হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা কিছু করতে পারছি না। কংগ্রেসীরা লুট-পাট শুরু করলে কে আমাদের সাহায্য করবে বলুন? ঠিক আছে, আপনি উঠুন, অনশন ভঙ্গ করুন, কাল মিটিং করে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা যাবে। আপনি তখন যা বলবেন, আমরা তাই করবো।

পণ্ডিতজী—ঠিক আছে, মিটিং করে তবে এখানে আসবে।

ডেপুটেশনের দল নিরাশ হয়ে যখন ফিরছে তখন পণ্ডিতজী বললেন—আচ্ছা, কারোর কাছে খৈনী আছে নাকি?

একজন একটা ছোট কৌটা এগিয়ে দেয়।

সবাই চলে যাওয়ার পর পণ্ডিতজী পুলিশদের ডেকে বললেন—তোমরা এখনো আছো কেন?

একজন পুলিশ—কী করবো, সাহেবের হুকুম।

পণ্ডিতজী—না না, তোমরা চলে যাও।

পুলিশ—আপনার কথায় চলে যাবো? কাল যদি চাকরি চলে যায়, আপনি খেতে দেবেন?

পণ্ডিতজী—আমি বলছি তোমরা চলে যাও। যদি না যাও, তাহলে আমিই চলে যাবো। আমি কি চোর যে তোমরা আমাকে ঘিরে রেখেছো?

পুলিশ—চলে যাবেন্? আপনার এত ক্ষমতা আছে?

পণ্ডিতজী—আমাকে কি গায়ের জোরে রাখবে?

পুলিশ—আচ্ছা যান না, কেমন যেতে পারেন দেখি?

পণ্ডিতজী ব্রহ্মতেজ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একজন পুলিশকে এমন ধাক্কা দিলেন যে, সে

প্রায় দশ হাত দূরে পড়ে গেল। অপর পুলিশটি ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে যায়। পুলিশদ্বয় ভেবেছিল পণ্ডিতজীর দেহে হয়তো বল নেই, কিন্তু না, তাঁর পরাক্রম দেখে তারা চুপিচুপি সরে পড়ে।

পণ্ডিতজী এদিক-ওদিক তাকাল, যদি কোন খাবারের ফেরিওয়ালা আসে। আবার ভয়ও হয় যদি কেউ দেখে ফেলে। কানাকানি হয়ে যায়। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

সৌভাগ্যক্রমে এমন সময় একজন খাবারের ফেরিওয়ালাকে দেখা গেল। তখন রাত এগারোটা। চারদিক নিস্তব্ধ। পণ্ডিতজী ফেরিওয়ালাকে ডাকলেন।

ফেরিওয়ালা—বলুন, কী দেবো? খিদে পেয়েছে না? অনশন করা সাধু-সন্তের কাজ, আপনার আমার নয়।

পণ্ডিতজী—কী বলছিস তুই? আমাকে কি সাধুর থেকে কম ভেবেছিস্? জানিস্, ইচ্ছে করলে মাসের পর মাস অন্ন-জল ত্যাগ করে থাকতে পারি। আমি তোকে ডাকলাম শুধু তোর লম্ফটা একবার নেবো বলে। পাশে কিসের যেন শব্দ হচ্ছে। ভাবছি সাপ-টাপ নাকি! তোর আলোটা নিয়ে সেটাই একবার দেখবো।

ফেরিওয়ালা লম্ফটা দেয়। পণ্ডিতজী আলো নিয়ে মেঝের ওপর কি যেন খুঁজতে লাগলেন। এমন সময় লম্ফটা উল্টে গিয়ে নিভে সব তেলটা পড়ে গেল মেঝেতে।

ফেরিওয়ালা—(লম্ফটা উল্টে দিয়ে দেখে) হুঁজুর, একটুও তেল রাখলেন না? চারটে পয়সাও আজ লাভ হলো না, আর আপনি লোকসান করে দিলেন?

পণ্ডিতজী—কী করবো, হাত থেকে উল্টে গেল! এই নে পয়সা, একটু তেল কিনে নিয়ে আয়।

ফেরিওয়ালা—(পয়সা নিয়ে) আমি তেল নিয়ে এখুনি আসছি।

পণ্ডিতজী—হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি আসবি, না হলে অন্ধকারে সাপে কামড়ে দিতে পারে। নিশ্চয়ই এখানে কিছু আছে, না হলে এমন শব্দ হবে কেন! অন্ধকারে কোথায় ঢুকে পড়েছে। তুই কিন্তু দৌড়ে যাবি, আর ছুটে আসবি। তোর ধামাটা এখানেই রেখে যা, বিশ্বাস না হলে নিয়ে যেতেও পারিস।

ফেরিওয়ালা দো-টানায় পড়ে। ভাবে—ধামাটা যদি নিয়ে যাই, তাহলে পণ্ডিতজী হয়তো খারাপ ভাববেন, বেইমান মনে করবেন। আবার যদি রেখে যাই, তাহলে কি যে হবে কে জানে! অবশেষে ঠিক করলো রেখে যাওয়াই উচিত। যা' হবার হবে। তারপর বাজারের দিকে এগিয়ে যায়। পণ্ডিতজীর দৃষ্টি পড়লো ধামার দিকে। দেখলেন, কয়েকটা মাত্র মিঠাই পড়ে রয়েছে। ভাবলেন—দু'-একটা বের করে নিলে খিদে মিটবে

কি? কিন্তু যদি জানতে পেরে যায়? শেষ পর্যন্ত লোভ সামলাতে না পেরে ধামা থেকে দুটো মিঠাই তুলে মুখে ভরে দিলেন। এমন সময় দেখতে পান ফেরিওয়ালা লম্ফ জেলে নিয়ে আসছে। তার আসার আগেই মিঠাই দুটোকে পার করে নিতে হবে। এই ভেবে আরও দুটো মিঠাই মুখে ভরে দিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে ফেরিওয়ালা সামনে এসে হাজির। মুস্কিল হলো, পণ্ডিতজী গিলতেও পারছেন না, আর ফেলতেও পারছেন না। এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে, ধারণাই করতে পারেন নি। যাই হোক, তাড়াতাড়ি করে মিঠাইগুলো গিলে ফেলে কাশতে লাগলেন, যেন প্রাণ বেরিয়ে আসতে চায়। ফেরিওয়ালা লম্ফটা এগিয়ে দিয়ে বলে—এই নিন, দেখে নিন, আপনি তো আবার অনশন করে আছেন। অবশ্য মরে গেলেও ভয় নাই, সরকার দেখবেন। কারণ সরকারের জন্যেই তো করছেন।

ফেরিওয়ালার কথা শুনে পণ্ডিতজী তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। মনে মনে ভাবেন, বেশ করে কয়েকটা কথা শুনিয়ে দেবেন, কিন্তু গলা দিয়ে তখনো স্বর বেরুচ্ছে না। তাই লম্ফটা নিয়ে একবার এদিক-ওদিক দেখে দিয়ে দিলেন।

ফেরিওয়ালা—পণ্ডিতজী আপনি এইভাবে পড়ে আছেন? কাল মিটিং হবে, তবে ফয়সালা! চোখে তো সরষের ফুল দেখবেন মনে হচ্ছে!

এই বলে ফেরিওয়ালা চলে যায়। পণ্ডিতজীর কাশি সামলাতে অনেকক্ষণ সময় লাগলো। তারপর শুয়ে পড়লেন।

চার

পরের দিন সকাল থেকেই ব্যবসায়ীরা অসহযোগিতা শুরু করলেন। কংগ্রেস দল শহর তোলপাড় করতে আরম্ভ করেছে। সরকারী অফিসাররা সব দিক লক্ষ্য রেখেছেন। নিরীহ ব্যবসায়ীদের ওপর জুলুম করছেন। পণ্ডিত সমাজেও আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পণ্ডিত মোটেরামের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা অন্যায় হয়েছে। কেননা, পণ্ডিতের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। এই ভাবে সারাদিন শহরে সর্বত্র আলোচনা ও বাক্‌বিতণ্ডা চলে। ফলে, মোটেরামজীর খবর কেউ-ই নিতে গেলেন না। নানা জনের নানা মত। কেউ-কেউ বললেন—পণ্ডিতজী সরকারের কাছ থেকে হাজারখানেক টাকা ঘুঁস নিয়ে এই কাজে নেমেছেন।

এদিকে বেচারী মোটেরাম পণ্ডিতের অবস্থা ঘোরালো। রাতটা কোন রকম কাটিয়েছেন। সকালে ঘুম ভাঙলে দেহ নিয়ে উঠতে পারেন না, উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘোরে, চোখে ঝাপসা দেখেন। পেট খালি, যা' অবস্থা, তিনিই বুঝতে পারছেন। রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন, যদি কেউ আসে, কিন্তু না, কেউ আসছে না। এই

সময়টায় তিনি সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে জলযোগ করেন, কিন্তু আজ মুখে একটু জলও গেল না। হায়, সেই শুভ সময় কখন আসবে? তার পরই স্ত্রীর ওপর রাগ হয়। কেননা, সে নিশ্চয়ই পেট-পুরে খেয়ে ঘুমিয়েছে। এখন হয়তো জলখাবার তৈরী করছে, একবার এসে খোঁজও নিয়ে গেল না? মরে গেছি কি বেঁচে আছি, তা জানা কি তার উচিত ছিল না? একটু মোহনভোগ নিয়ে আসতেও তো পারতো। আমার চিন্তা কে আর করছে?

সারাদিনটা নানা ভাবনা-চিন্তার মধ্য দিয়ে কাটালেন। ভেবেছিলেন অনেক লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে, কিন্তু কেউ এলো না। লোকেদের ধারণা, পণ্ডিতজী তো টাকা নিয়ে স্বার্থের বশীভূত হয়েছেন, অতএব তাঁর সঙ্গে দেখা করে লাভ কি? তিনি যা ভাল বোঝেন করবেন।

পাঁচ

তখন রাত ন'টা। ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শেঠ ভোন্দুমল বললেন—পণ্ডিতজী শেষে এমন কাজ করলেন? এতে যথেষ্ট কষ্ট হয়, তা আমরা জানি। কেননা, অন্ন-জল ছাড়া প্রাণী বাঁচতে পারে না। তবে, আমাদের দুঃখ হচ্ছে, একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এইভাবে কষ্টভোগ করবেন আর আমরা সুখে নিদ্রা যাবো, তা কখনো হতে পারে না। এটা যদি ধর্মের বিরুদ্ধে কাজ হতো, তাহলে অন্য কথা। তাতে আমরা কর্তব্য বিমুখ হতাম না, কিন্তু এটা কি ধর্মযুদ্ধ?

কংগ্রেস দলের সভাপতি বললেন—আমি যা' বলার বলেছি। এখন আপনারা যা' সিদ্ধান্ত নেবেন আমরা তাই করবো। আপনারা যদি এগিয়ে যান, আমরাও আপনাদের সঙ্গে আছি। ধর্মের কথা যদি বলেন, তাহলে একটা কথা বলি—আপনারা আগে আমাকে সেখানে যেতে দিন। আমি একান্তে মিনিট-দশেক তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনারা ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমি এলে আপনারা যাবেন। বলুন, এতে আপনাদের কোন আপত্তি আছে কি?

কংগ্রেস সভাপতি পুলিশ বিভাগে অনেকদিন ছিলেন, মানব চরিত্রের দুর্বলতা সম্বন্ধে তাঁর ভালই জ্ঞান আছে। তাই প্রথমে মিষ্টির দোকানে গিয়ে পাঁচ টাকার রসগোল্লা কিনে গোলাপ জল দিয়ে চললেন রুষ্ঠ ব্রহ্মা-দেবের পুজো করতে। হাতে নিয়েছেন জলের ঘটি, তাতে আছে কেওড়া দেওয়া ঠাণ্ডা জল। তখন গোলাপ জলের গন্ধে যার খিদে পায় নি তারও খিদে পেয়ে যাবে।

পণ্ডিতজী অচৈতন্য হয়ে মেঝেতে শুয়ে আছেন। গত রাতে জুটেছে কয়েকটা ছোট ছোট মিঠাই। দুপুরে কিছুই জোটে নি। অবশ্য খিদের জালায় তিনি ব্যাকুল নন,

নিরাশায় শিথিল হয়ে পড়েছেন। শরীর, উঠতে চায় না, চোখ চেয়ে দেখতে চায় না, চাইবার জন্যে চেষ্টা করছেন, কিন্তু আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ঠোঁট শুকিয়ে গেছে, শরীর নিস্তেজ। জীবনে এমন অবস্থা তাঁর কোনদিন হয় নি।

পণ্ডিতজীর অজীর্ণ রোগটা মাঝে মাঝে দেখা দেয়, কিন্তু খাওয়া কোনদিন বন্ধ রাখেন না। আজ অনশন ব্রত ধারণ করে তাঁর এমন মনের অবস্থা হয়েছে যে, রেগে গিয়ে নগরবাসীকে, সরকারকে, কংগ্রেসকে, ধর্মপত্নীকে এবং ঈশ্বরকেও মনে মনে যথেষ্ট গালাগাল দিয়ে চলেছেন, কিন্তু সবই নিষ্ফল। তাঁর এমন অবস্থা হয়েছে যে, একটু বাজারে যাবার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন। ভেবে নিয়েছেন, আজ রাতে নিশ্চয়ই তাঁর প্রাণপাখী উড়ে যাবে।

এমন সময় কংগ্রেস সভাপতি ডাক দিলেন—পণ্ডিতজী!

পণ্ডিতজী শুয়ে-শুয়েই চোখ মেলে তাকালেন, যেন শোক-সন্তপ্ত হয়ে পড়ে আছেন।

সভাপতি পণ্ডিতজীর কাছে গিয়ে সামনে মিষ্টি ও জলের পাত্রটা রাখলেন। বললেন—আর কতদিন এভাবে পড়ে থাকবেন?

গোলাপ জলের গন্ধে পণ্ডিতজী যেন সতেজ হয়ে ওঠেন। তাই উঠে বসলেন। বললেন—যতক্ষণ না ফয়সালা হচ্ছে।

সভাপতি—ফয়সালা কি আর হবে? এই দেখুন না, সারাদিন ধরে মিটিং হলো, কিন্তু কিছুই ফয়সালা হলো না। কাল বিকালেই তো লাটসাহেব আসছেন। আপনি কি তখন পর্যন্ত এইভাবেই থাকবেন? সত্যি, আপনার এ কী দশা হয়েছে?

পণ্ডিতজী—এইভাবেই যদি মৃত্যু হওয়ার থাকে, তাহলে কে রদ করবে বলুন? ওতে কী আছে? কালাকান্দ নাকি?

সভাপতি—হ্যাঁ, ভাল মিষ্টিই আছে। অর্ডার দিয়ে তৈরী করে এনেছি।

পণ্ডিতজী—এমন সুগন্ধ? আচ্ছা, একটু খুলুন তো, দেখি!

সভাপতি একটু মুচকি হেসে ঢাকনাটা খুললেন আর পণ্ডিতজী দু'চোখ ভরে তা' দেখতে লাগলেন। এমন আগ্রহ নিয়ে তিনি আর কখনো কিছু দেখেন নি। তাই জিভে জল আসে। সভাপতি বললেন—আপনি অনশনে না থাকলে দুটো মিষ্টি আপনাকে খাওয়াতাম। ভাল মিষ্টি, পাঁচ টাকা সের নিয়েছে!

পণ্ডিতজী—তাই নাকি? তাহলে তো বেশ ভালই হবে বলে মনে হচ্ছে! এত দামী মিষ্টি অবশ্য আগে খাইনি।

সভাপতি—আপনি নিজেই তো ঝঞ্ঝাটটা পাকিয়েছেন। আচ্ছা, শরীরকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ হবে বলতে পারেন?

পণ্ডিতজী—কী করবো, পাঁচজনের অনুরোধে করতে হলো! এতগুলো মিষ্টি দিয়েই

অবশ্য আমি জল খাই! (হাতে রসগোল্লার পাত্রটা নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে) এ বোধহয় ভোলার দোকানের?

সভাপতি—খান না দু'-চারটে!

পণ্ডিতজী—কী করে খাই, মহা শঙ্কটে পড়ে আছি যে!

সভাপতি—ভাল জিনিস, তাই খেতে বলছি। সচরাচর এমন জিনিস মেলে না। খান, ভালই লাগবে! খাওয়ার কথা কেউ জানতে পারবে না, বুঝলেন?

পণ্ডিতজী—কে, কাকে ভয় করচে বলুন? এই দেখুন, এখানে অনশন করে বসে আছি, কেউ একটু খোঁজ নিতে এলো না? তাহলে ভয় করবো কেন? ঠিক আছে, দিন, কয়েকটা খাওয়া যাক। আপনি গিয়ে বলে দিন—পণ্ডিতজী অনশন ভঙ্গ করেছেন। চুলোয় যাক হাট-বাজার। বুঝলেন, "আত্মা রেখে ধর্ম তবে পিতৃকর্ম।"

এই বলে পণ্ডিতজী রসগোল্লার পাত্রটা টেনে নিয়ে মনের সুখে রসগোল্লা খেতে আরম্ভ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে পাত্রের অর্ধেকটা ফাঁকা করে দিলেন। এমন সময় সভাপতি ফটকে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জনমণ্ডলীকে বললেন—যান না, তামাশা দেখে আসুন গে। আপনাদের দোকান খুলতে হবে না, কাউকে খোসামোদও আর করতে হবে না। সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছি। সেটা কংগ্রেসের প্রতাপেই সম্ভব হয়েছে।

অপেক্ষমান জনতা পণ্ডিতজীর সামনে গিয়ে দেখে—পণ্ডিতজী তন্ময় হয়ে মিষ্টি খেতে ব্যস্ত, যেন কোন মহাত্মা পুরুষ সমাধিস্থ হয়েছেন।

ভোন্দুমল বললেন—পণ্ডিতজী প্রণাম। আমরা আপনার কাছেই আসছিলাম, কিন্তু আপনি এত তাড়াতাড়ি অনশন ভঙ্গ করলেন কেন? এমন একটা ফন্দি এঁটেছিলাম যে, তাতে সাপও মরতো আবার লাঠিও ভাঙতো না।

পণ্ডিতজী—আমার কাজ সম্পূর্ণ। এতে অলৌকিক আনন্দ মেলে, যা পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। এখন যদি আপনাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, আগ্রহ বা ইচ্ছা জাগে, তাহলে সেই দোকান থেকেই আরো কিছু মিষ্টি নিয়ে আসতে পারেন।

বিশ্বাস

বোম্বাইয়ের মিস জোশী সভ্য-সমাজের রাধিকা। বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করলে কি হবে, তাঁর ঠাঁট-বাট ও মান-সম্মান ধনী পরিবারের মহিলাদেরও লজ্জা দেয়। তিনি থাকেন এক বিরাট ইমারতে। শোনা যায়, সেটি এক সময়ে ছিল মহারানার রাজপ্রাসাদ। শহরের ধনী, রাজা-বাদশা ও রাজকর্মচারীদের প্রতিদিনই তাঁর বাড়ীতে চলে আনা-গোনা। তিনি যেন শহরের ধন ও কীর্তির উপাসকদের দেবী। কারোর খেতাবের প্রয়োজন হলে মিস জোশীর কাছেই তোসামোদ করতে আসেন। আবার নিজের বা আত্মীয়ের মন-বাসনা পূর্ণ করার জন্যেও আসেন মিস জোশীর আরাধনা করতে।

সরকারী বাড়ী তৈরীর ঠিকেদারী, নুন, মদ, আফিম্ প্রভৃতি বস্তুর ঠিকেদারী, লোহা-লক্কর, কাগজ-পত্র, ইত্যাদি ঠিকেদারীর জন্যেও ধর্না দিতে হয় মিস জোশীর কাছে। কারণ, যা কিছু করার তিনিই করেন, যা কিছু হবার তাঁর হাত দিয়েই হয়। আরবী ঘোড়ার গাড়ী চড়ে তিনি যখন বেড়াতে যান তখন শহরের সব সম্প্রদায়ের লোকই সেলাম জানিয়ে পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। তিনি রূপবতী, অবশ্য তাঁর চেয়েও শহরে অনেক সুন্দরী বা রূপবতী মহিলা আছেন। তবে, তিনি সুশিক্ষিতা, বাক্পটু ও সুগায়িকা। তিনি এমন হাসেন যা' বিরল, এমন কথা বলেন যা সকলকে মুগ্ধ করে, এমন তাকান যে লোকে মোহিত হন। তাঁর গুনগুলি একাধিপত্য বলা যায়। অবশ্য তাঁর প্রতিষ্ঠা, শক্তি ও কীর্তির পেছনে রহস্য বর্তমান।

শুধু শহরে কেন, গোটা রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা জানেন বোম্বাইয়ের গভর্ণর মিস্টার জোহরী মিস জোশীর কেনা গোলাম। মিস জোশীর চোখের ইশারাই তাঁর কাছে নাদিরশাহী হুকুম। থিয়েটারে, নিমন্ত্রণে, জলসায়, সর্বত্রই মিস্টার জোহরী মিস জোশীকে ছাড়া যেন যেতে পারেন না। মাঝে মাঝে মিস্টার জোহরী মিস জোশীর বাড়ী থেকে গভীর রাতে বেরিয়ে আসেন, সে দৃশ্য অনেকেই দেখেন। তবে, সেটা তাঁর প্রেম না ভক্তি তা কেউ বলতে পারে না। মিস্টার জোহরী বিবাহিত আর মিস জোশী বিধবা। তাই, কেউ কেউ সন্দেহ করলেও বিরুদ্ধাচরণ করেন না।

একবার বোম্বাই পৌর সভা জিনিসপত্রের ওপর কর বসিয়েছেন। তাই জনসাধারণ তার বিরুদ্ধাচারণ করে একটা সভার আয়োজন করেন। সভায় শহরের সকল সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছেন। সভাস্থলটি মিস জোশীর বিশাল

ভবনের সামনে। সেখানেই মখমলের মত ঘাসের ওপর নগরবাসী বসে আছেন, তাঁদের অভিযোগ শোনাবেন। তখনো তাঁদের সভাপতি এসে পৌছান নি। তাই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। কেউ কর্মচারীদের দোষারোপ করছেন, কেউ দেশের আইন-শৃঙ্খলার, আবার কেউ নিজেদের দারিদ্র্যের কথা শুনিয়ে বলছেন— ট্যাকে পয়সা থাকলে আমাদেরও ক্ষ্যামতা থাকতো। তখনই বুঝতে পারতো আমরা কী করতে পারি। লোকদের দুর্ব্বল আর সাদাসিধে ভেবে হাতের পুতুল করে রেখেচে। ভেবে নিয়েচে যেভাবে বসাবে, সেই ভাবেই সব বসবে, আর যে ভাবে ওঠাবে, সেই ভাবেই উঠবে! টু-শব্দটি করতে পাবে না, যেন মগের মুলুক পেয়েছে?

গোলমাল হতে পারে, এই আশঙ্কা করে সরকার সশস্ত্র পুলিশ পাঠিয়েছেন। পুলিশরা এসে সভার চারদিক ঘিরে ফেলেছে, আর পুলিশ অফিসার আছেন ঘোড়ার পিঠে। তাঁর হাতে হাণ্টার। তিনি নির্মমভাবে জনমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বার-বার ঘোড়া ছোটাচ্ছেন। অন্যদিকে মিস জোশীর উঁচু বারান্দায় বসে আছেন শহরের বড় বড় ধনী ও রাজাধিরাজ ব্যক্তিগণ। তাঁরা এসেছেন তামাশা দেখতে। মাননীয় অভ্যাগতদের আদর-যত্ন করতে মিস্ জোশী তখন ব্যস্ত। মিস্টার জোহরী একটা আরাম কেদারায় বসে জনমণ্ডলীর দিকে ঘৃণা ও ভয়ের চোখে বার-বার তাকাচ্ছেন।

সভাপতি আপটে মহাশয় একটা টাঙ্গা থেকে নামলেন। সভায় হৈ-চৈ পড়ে যায়। ব্যবস্থাপকগণ তাঁকে স্বাগত জানিয়ে মঞ্চে বসান। আপটে মহাশয়ের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। রোগা ও লম্বা। মুখমণ্ডলে চিন্তার ছাপ। কিছু-কিছু চুলও পেকেছে। মুখে সরল হাসি। গায়ে সাদা ও মোটা জামা, পা খালি, মাথায় টুপি নেই।

এই অর্ধনগ্ন রোগা নিস্তেজ প্রাণীটির মধ্যে কী এমন জাদু আছে যে, এতগুলো লোক তার জন্যে ব্যস্ত, মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কল-কারখানা বন্ধ করে দেয়, কারবারও বন্ধ করে দেয়? কিসের জন্যে অফিসাররা তাঁকে ভয় করেন? তাঁদের ঘুম হয় না? তাঁর মত ভয়ঙ্কর জন্তু অফিসাররা কি দেখেন নি? বিরাট এই শাসন শক্তি ঐ সামান্য একটা লোকের ভয়ে কেঁপে উঠবে? হ্যাঁ উঠবে, কারণ ঐ ক'খানা হাড়ের মধ্যেই আছে এক পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক বলবান ও দিব্য-আত্মা!

দুই

আপটেজী মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রথমেই জনতার উদ্দেশ্যে ধীর, স্থিরভাবে আবেদন জানিয়ে বললেন তাঁরা যেন যথাযথভাবে অহিংস-ব্রত পালন করেন। তারপর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা জানালেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো মিস জোশীর বারান্দার দিকে। তিনি ব্যথিত হলেন। কারণ, যেখানে অগণিত লোক নিজেদের

দুঃখের কথা শোনাতে এসেছে, সেখানেই চলছে চা, বিস্কুট, মিষ্টি, ফল, বরফ জল আর মদের ফোয়ারা। শুধু তাই নয়, সেই সব ভদ্রমহোদয়গণ জমায়েত হয়ে দীন-মজুরদের দিকে তাকিয়ে হাসছেন আর মাঝে-মাঝে হাততালি দিচ্ছেন। তাঁর জীবনযাত্রা ও আচরণ প্রত্যক্ষ করে আপটেজীর গা জ্বলে যায়, তাই মেঘের মত গর্জন করে বলে ওঠেন—

"একদিকে দেশের সাধারণ মানুষ খাদ্যের অভাবে তিল-তিল করে মরছে, অন্যদিকে তাদের কথা চিন্তা না করে প্রয়োজনীয় জিনিসের ওপর কর বসানো হয়েছে। এই কর কি রাজকর্মচারীদের পেট ভরানোর জন্যে আদায় করা হবে? যারা দেশের উন্নতির জন্যে দিনরাত প্রাণপাত করছে, জমিতে ফসল ফলিয়ে দেশবাসীর পেট ভরাচ্ছে তারা আজ কত বঞ্চিত। সেই সব ক্ষুধার্ত জনগণের রক্ষাকর্তা ও প্রভু যাঁরা, তাঁরাই আজ তাদের দুর্দশা দেখেও বিন্দুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করছেন না, বরং আনন্দে স্ফূর্তির জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন। কী আশ্চর্যের কথা, দেশের সেবকগণ না খেয়ে মরছে আর তাদের প্রভু মদের নেশায় মশগুল। তাদেরই জন্যে এসেছে দেশ-বিদেশের মিষ্টি ও নানা ধরণের খাবার। আপনারা কি বলতে পারেন, এর জন্য দোষী কে? রাজ কর্মচারীরা? না, তার জন্যে আমরাই দায়ী। কারণ আমরাই তাঁদের এই রকম অধিকার দিয়ে রেখেছি। তাই আজ আমরা চিৎকার করে ঘোষণা করছি যে, তাঁদের এরকম ব্যবহার আমাদের অসহ্য। আমাদের ছেলেমেয়েরা একমুঠো খাবারের জন্যে যখন লালায়িত, তখন আমাদেরি প্রভুগণ বিলাস-ব্যসনে মত্ত। দীন-দরিদ্রের কান্নাকে তাঁরা পরোয়া করেন না। আমাদের ঘরে যখন উনুন জ্বলে না, তখন এই সব ভদ্রলোকেরা থিয়েটার দেখে আনন্দ করেন, নাচ-গানের আসর বসান, বন্ধু-বান্ধবদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ান এবং বেশ্যাদের নিয়ে স্ফূর্তি করেন। পৃথিবীতে এমন দেশ আছে কি—যেখানে প্রজারা না খেয়ে মরে? রাজকর্মচারীরা প্রেম-ক্রীড়ায় মগ্ন থাকেন! আবার কোন স্ত্রীলোক রাতের অন্ধকারে গলি-গলি ঘুরে বেড়ান আর দিনের আলোয় অধ্যাপিকার বেশ ধারণ করে শিক্ষা দেন? তিনিই আবার বন্ধুদের নিয়ে নেশায় চুড় হয়ে থাকেন?

তিন

আপটেজীর বক্তৃতা শুনে উপস্থিত পুলিশ বাহিনীর মধ্যে একটা আলোড়ন পড়ে যায়। পুলিশ অফিসার হুকুম দিলেন—সভা ভেঙে দাও, নেতাগুলোকে ধরো, যেন কেউ না পালাতে পারে। ওরা বিদ্রোহী, এরকম বক্তৃতা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।

মিস্টার জোহরী পুলিশ অফিসারকে ইশারা করে ডেকে বললেন—অন্য কাউকে

গ্রেপ্তার করার দরকার নাই, শুধু আপটেকে ধরুন, ঐ-ই যত নষ্টের গোড়া।

অফিসারের আদেশ পেয়েই পুলিশরা লাঠি-চার্জ করতে থাকে এবং আপটেজীকে গ্রেপ্তার করে।

আপটেজীর গ্রেপ্তারে জনতা ক্ষুব্ধ হয়, ধৈর্য হারায় এবং হৈ-চৈ পড়ে যায়।

জনগণের আচরণ দেখে আপটেজী বললেন—আপনারা ধৈর্য হারাবেন না। মনে রাখবেন, আপনারা সব অহিংসার ব্রত ধারী। আপনারা হিংসা প্রকাশ করলে সমস্ত দোষ পড়বে আমার ঘাড়ে। আমার অনুরোধ, আপনারা শান্ত-চিত্তে নিজের নিজের বাড়ী চলে যান! আমরা যা ভেবেছিলাম অফিসারগণ তাই করছেন। সভার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে জানবেন। আমরা এখানে বিদ্রোহ করতে আসি নি। মানুষের নৈতিক সহানুভূতি পাওয়ার জন্যেই আমরা জমায়েত হয়েছিলাম, তা সফল হয়েছে।

তারপরই সভা ভেঙ্গে যায় এবং আপটেজীকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়।

চার

মিস্টার জৌহরী বললেন—বাছাধন অনেকদিন পর হাতের মুঠোয় এসেছে। দেশ-দ্রোহীর অপরাধে মামলা ঠুকে দেবো। থাক এবার দশটা বছর জেলে।

মিস জোশী—তাতে কী ফল হবে?

"কেন? যেমন কর্ম করেছে, তেমনি ফল পাবে।"

"কিন্তু ভেবে দেখুন, এর জন্যে আমাদেরও মূল্য দিতে হবে। যে ঘটনা মুষ্টিমেয় কয়েকজন জানতো, তা গোটা দেশ ছড়িয়ে পড়বে, হয়তো মুখ দেখানোই অসম্ভব হবে। আপনি কাগজের রিপোর্টারদের মুখ তো আর বন্ধ করতে পারবেন না!"

"সে যাই হোক, আমি ওকে জেলে পাঠাতে চাই। কিছুদিন তো ঠাণ্ডা থাকবে। বদনামের জন্যে ভয় পেলে চলবে না। পয়সা ছাড়লে দেখবে খবরগুলো সব পাল্টে গেছে। সত্যি ঘটনা সহজেই মিথ্যে বলে প্রমাণ হয়ে যাবে। তখন দেখবে, আপটের মিথ্যে দোষারোপ তার অপরাধ বলেই ধরা হচ্ছে।"

"আমি কিন্তু একটা সহজ উপায় বলতে পারি। ব্যাপারটাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি তার সঙ্গে দেখা করবো, তার বক্তব্য শুনবো, আন্তরিকতার সঙ্গে মিশবো, তারপর সমস্ত ঘটনা আপনাকে বলবো। আমি এমন প্রমাণ দেখাতে চাই যাতে সে যেন আর মুখ খুলতে না পারে। তখন দেখবেন, জনসাধারণ তাকে সহানুভূতি না দেখিয়ে আমাদেরই অনুরাগী হয়ে উঠেছে। লোকেরাই তখন বলবে যে, সে-ই ধূর্ত ও কপট, সরকার তার প্রতি ঠিক আচরণই করেছেন। আমার বিশ্বাস, আমি প্রমাণ দিতে পারবো যে সেই-ই দেশের একমাত্র ষড়যন্ত্রকারী ও বিদ্রোহী। আমি

তাকে জনগণের চোখে দেবতা হতে দিতে চাই না, তাকে রাক্ষস প্রতিপন্ন করতে চাই।"

"তুমি যা ভেবেছো, সেটা সহজ কাজ নয়। কেন না, আপটে রাজনীতি ক্ষেত্রে বড় চতুর।"

"জানেন, এমন কোন পুরুষ নেই, যাকে যুবতী, মোহিনী-রূপ দেখিয়ে আকৃষ্ট করতে না পারে।"

"তোমার যদি আত্মবিশ্বাস থাকে, তাহলে তা' করতে পারো, আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমি চাই, সে শাস্তি পাক।"

"তাহলে এখনি তাকে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ পাঠান।"

"ভাবছি, জনগণ হয়তো বলবে—সরকার নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গেছে।"

"না, আমার মনে হয় জনগণ খুশীই হবে। এটাই বুঝবে যে, সরকার জনমতের সম্মান দিয়েছেন।"

"কিন্তু, তোমাকে, তার ঘরে যেতে দেখলে লোকে কিছু মনে করবে না তো?"

"মুখ ঢেকে যাবো, কেউ টেরই পাবে না।"

"আমার মনে হয় সে তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে। তুমি সুবিধে করতে পারবে না। যাই হোক, তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে, চেষ্টা করে দেখো।"

এই বলে মিস্টার জোহরী মিস জোশীর দিকে প্রেমময় নেত্রে তাকিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে চলে গেলেন।

চৈত্রের সন্ধ্যা। মৃদু-মন্দ বসন্ত বায়ু বয়ে চলেছে এবং আকাশে ফুটেছে অসংখ্য তারকা। সামনে খোলা মাঠ, চারদিক নিস্তব্ধ, কিন্তু মিস জোশীর বার বার মনে হয়—আপটেজী তখনো মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাঁর শান্ত-সৌম্য ও বিষাদময় মূর্তি তাঁর চোখের সামনে বার-বার ভেসে উঠছে।

পাঁচ

সকাল বেলা। মিস জোশী একেবারে সাধারণ একখানা শাড়ী পরে ঘর থেকে বের হলেন। সাজ-গোজের কোন আড়ম্বরই নেই, যেন ভিখারিণীর বেশ। চিন্তিত মনে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। তারপর একটা টাঙ্গায় চড়ে কোথায় যেন চলেছেন।

আপটেজী থাকেন বস্তির মধ্যে। টাঙ্গাওয়ালা আপটেজীর বাড়ী চেনে। তাই, অসুবিধা নেই, টাঙ্গাটা আপটেজীর ঘরের সামনে দাঁড়াতেই মিস জোশীর বুকটা কেঁপে ওঠে। টাঙ্গা থেকে নেমে ভয়ে ভয়ে দরজার কড়া নাড়েন। এক মধ্য বয়সী স্ত্রীলোক দরজা খুলে দেন।

ঘরের আদব-কায়দা দেখে মিস জোশী অবাক হন। ঘরের এক কোণে রয়েছে একটা খাটিয়া, আর একটা ভাঙা আলমারীতে কতকগুলো দামী বই সুন্দরভাবে সাজানো। ঘরের মাঝখানে একটা ডেস্ক, যেখানে বসে লেখা-লেখির কাজ চলে। একধারে একটা ছোট আন্‌লায় আছে কাপড়-চোপড়। ঘরের একপাশে রয়েছে একটা উনুন। লম্বা ও রোগা লোকটি মনে হয় ঐ মধ্যবয়স্কার স্বামী। তিনি বসে বসে একটা ভাঙা তালা মেরামত করছেন। অন্যদিকে আপটেজীর গলাধরে বার-বার পিঠে ওঠায় চেষ্টা করছে একটি পাঁচ-ছয় বছরের চঞ্চল বালক। আপটেজী ঐ কর্মকারের বাড়ীতেই থাকেন। খবরের কাগজে লিখে যা' পান, কর্মকারের হাতে তুলে দেন, তাঁর সংসারেই খান, তাই নিজে আর সংসার করেন নি।

মিস জোশীকে দেখে আপটেজী চমকে যান। উঠে স্বাগত জানিয়ে ভাবেন, ঘরের কোন্‌খানে বসাবেন! দারিদ্র্যের জন্যে আজ মিস জোশীর কাছে যেরূপ লজ্জা পেলেন তা' ইতিপূর্বে কোনদিন ঘটে নি। মিস জোশী তাঁর সংকুচিত ভাব দেখে নিজেই খাটিয়ার ওপর বসে একটু হেসে বললেন—দেখুন, বিনা নেমন্তন্নেই এসে গেলাম, ক্ষমা করবেন কিন্তু। এমন জরুরী কাজ যে, না এসে থাকতে পারলাম না। আচ্ছা, মিনিট খানেকের জন্যে আপনার সঙ্গে একান্তে একটু কথা বলতে চাই, সম্ভব হবে কি?

আপটেজী জগন্নাথবাবুর দিকে তাকিয়ে ইশারা করে ঘর থেকে চলে যেতে বললেন। ফলে, তাঁর স্ত্রীও বাইরে যান। ছোট ছেলেটি কেবল রইলো। সে মিস জোশীর দিকে উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে বলতে চায়—তুমি আপটে কাকুর কে হও?

মিস জোশী খাটিয়া থেকে নেমে মেঝেতে বসে বললেন—আচ্ছা, আপনি অনুমান করতে পারছেন, আমি কেন এসেছি?

আপটেজী মাথা চুলকিয়ে জবাব দেন— কী করে বলবো, সবই আপনার দয়া!

মিস জোশী—না না, ও সব বলবেন না। পৃথিবীর কেউ এমন উদার নয় যে, যাকে গালাগাল দেবেন সে-ই আপনাকে ধন্যবাদ দেবে। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে গতকাল বক্তৃতা দেবার সময় আমার সম্বন্ধে কত দোষারোপ করেছেন, তাঁর প্রতিবাদ করার জন্যে আজ আমি এসেছি। আমার মতে আপনি অন্যায় করেছেন। আপনার মত সহৃদয় ও বিদ্বান লোকের কাছ থেকে এমনটি আশা করি নি। আমি অবলা, রক্ষা করার মত কেউ নেই। তাই বলতে চাই, এই অবলার ওপর মিথ্যে দোষারোপ করা কি আপনার উচিত হয়েছে। যদি পুরুষ হতাম, তাহলে duel খেলার জন্যে আপনাকে আহ্বান জানাতাম। অবলা বলেই আপনার সম্মান রক্ষা করে গেছি। আমি বলতে চাই, আপনি আমার ওপর যে দোষারোপ করেছেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যে।

আপটেজী দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—বাইরে থেকেই তো সেটা অনুমান করা যায়।

মিস জোশী—দেখুন, কারোর ওপরটা দেখে ভেতরটা তো জানা সম্ভব নয়।

আপটেজী—হতে পারে। যার ভেতর-বার সমান নয়, তাকে দেখে ভুল হওয়া তো স্বাভাবিক।

মিস জোশী—হ্যাঁ, আপনারো সেই ভুলটাই হয়েছে। আমার অনুরোধ, আপনি সেই ভুলটা সংশোধন করে নিন। প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবেন তো?

আপটেজী—তা যদি না করি, তাহলে আমার মত দুরাত্মা সংসারে আর নেই, তাই না?

মিস জোশী—আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন?

আপটেজী—আজ পর্যন্ত কাউকে অবিশ্বাস করিনি।

মিস জোশী—তাহলে কি সন্দেহ করছেন আপনার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছি?

আপটেজী মিস জোশীর দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে বললেন—বাঈজী, আমি গোঁয়ার-গোবিন্দ হলেও নারী জাতিকে সম্মান দিই, শ্রদ্ধা করি, দেবী বলে মানি। জানেন, মাকে দেখি নি। বাবা কেমন ছিলেন, তাও জানি না। যিনি আমাকে ছত্র ছায়ায় রেখে লালন-পালন করেছেন, তিনিও আজ নেই। তবু নারীজাতির প্রতি আমার ভক্তি চিরদিন সজীব হয়ে আছে। গতকাল আবেশ বশে আমার মুখ থেকে যে সব কথা বের হয়েছে এবং খবরের কাগজে তার যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে, তা' দেখে আমি দুঃখিত, তার জন্যে ক্ষমা চাইছি।

মিস জোশী এত দিন পর্যন্ত যাদের সঙ্গে মিশেছেন, তাঁরা সকলেই স্বার্থপর, মতলববাজ মনের ইচ্ছে গোপন করে কথা বলেন। আজ আপটেজীর সাদাসিধে ভাব ও আত্মবিশ্বাস দেখে তিনি আনন্দে গদ্‌গদ্ হয়ে যান। আপটেজীর ব্যবহার ও তাঁর সরল মনের পরিচয় যা পেলেন, তা অন্য কাউকে বললেও বিশ্বাস করবেন না। হয়তো হেসে ঠাট্টা করবেন। এমন লোক সৎ হলেও কপট বন্ধুদের কাছে তা' বিশ্বাস যোগ্য নয়। আপটেজীকে তিনি অন্তর দিয়ে আজ বুঝতে পেরেছেন। তাই তাঁরই অনুরাগী হয়ে উঠলেন।

মিস জোশীকে মৌণ দেখে আপটেজী ভাবছেন—উনি আমাকে ভুল বুঝলেন না তো? ক্ষমা করবেন তো?

তারপর পরিবেশটাকে হালকা করার উদ্দেশ্যে বললেন—দেখুন, আমি জন্ম থেকেই অভাগা। মা-বাবার মুখ দেখা ভাগ্যে জোটে নি। যিনি দয়াকরে আমাকে লালন-পালন করেছেন, তিনি আমাকে তেরো বছরের রেখে একেবারে স্বর্গে গেছেন। তারপর আমার ওপর দিয়ে এমন ঝড় বয়ে গেছে যে, সেটা মনে পড়লে লজ্জায় কারোর কাছে মুখ দেখাতে পারবো না। জানেন, আমি ধোবার কাজ করেছি, ঘোড়ার সহিস ছিলাম,

হোটেলে বাসনও মেজেছি, খিদের জ্বালায় অনেকবার ভিক্ষেও করেছি। কোন কাজকে ছোট মনে করি নি। তাই, আজও মজুর খাটি। বলতে লজ্জা হয়, একবার চুরি করে ছিলাম। চুরি করার অপরাধে আমি জেলও খেটেছি।

আপটেজীর কথা শুনে মিস জোশীর চোখে জল আসে। তাই সজল নয়নে বললেন—আপনি আমার কাছে এ সব কথা কেন বলছেন? এ সব শুনে আপনার কত বদনাম ছড়াতে পারি, তা জানেন? ভয় হচ্ছে না?

আপটেজী হেসে বলেন—না, আপনাকে আর ভয় করি না।

মিস জোশী—আমি যদি এর বদলা নিই, তা হলে?

আপটেজী—আমি অপরাধ করে লজ্জিত হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চেয়েছি, আর আমার অপরাধ রইলো কি করে? আপনি বদলাই বা নেবেন কেন? জানেন, যাঁরা বদলা নেন, তাঁদের চোখে কখনো জল আসে না। আপনাকে কপট মনে করারও আমি অযোগ্য। আর আপনি আমাকে কপট মনে করলে নিশ্চয়ই এখানে আসতেন না?

মিস জোশী—আপনার আচরণ দেখে আমি ঝগড়া করতে এসেছি।

আপটেজী—তা ভাল করেছেন। আমার আচরণ কী করে ভাল হবে বলুন! তবে শুনুন, আগেও বলেছি আবার বলছি, চুরি করার অপরাধে আমাকে সাজা দিয়ে নাসিক জেলে রাখা হয়। আমার শরীর তখন দুর্ব্বল, জেলের কঠিন পরিশ্রম আমার পক্ষে ছিল অসহ্য ও অসম্ভব। তাই জেলের অফিসাররা আমাকে শয়তান ভেবে বেত মারতেন। শেষে একদিন রাতে আমি জেল থেকে পালিয়ে আসি।

মিস জোশী—জেল ভেঙে পালিয়ে এলেন?

আপটেজী—এমন ভাবে এলাম যে কেউ জানতেও পারে নি। আজও পর্যন্ত আমার নামে ওয়ারেণ্ট জারি আছে। আমাকে ধরিয়ে দিতে পারলে পাঁচ শো'টাকা পুরস্কার পাবে।

মিস জোশী—তাহলে তো আমি আপনাকে ধরিয়ে দিতে পারি।

আপটেজী—তা তো পারেনই! আরো শুনুন, আমার আসল নাম হলো—দামোদর মোদী। পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমি নামটা পাল্টে নিয়েছি।

ছোট ছেলেটি এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। মিস জোশীর মুখ থেকে "ধরিয়ে দিতে পারি" কথাটা শুনেই সে রেগে গিয়ে বলে—আমাল কাকুকে কে ধরবে শুনি?

মিস জোশী—পুলিশ ধরবে, আবার কে?

(ঘরের কোনে খেলনার সঙ্গে একটা লাঠি ছিল) লাঠিটা নিয়ে এসে বীরের মত আপটেজীর পাশে ছেলেটি গিয়ে দাঁড়ায়, যেন তার বডীগার্ড।

মিস জোশী—আপনার বডী-গার্ডকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ বাহাদুর।

আপটেজী—এর সম্বন্ধেও কয়েকটা কথা বলার আছে। প্রায় বছর খানেক হলো এ রাস্তায় হারিয়ে গিয়েছিল। আমি একে রাস্তাতেই কুড়িয়ে পেয়েছি। সেইদিন থেকেই ও আমার কাছেই থাকে, আমাকে খুব ভালবাসে।

মিস জোশী—আচ্ছা, আপনি অনুমান করতে পারছেন কি যে, আপনার সম্বন্ধে এত সব কথা শুনে আমার কী মনে হতে পারে?

আপটেজী—কী আর মনে হবে! হয়তো মনে করছেন—নীচ, অভদ্র, ধূর্ত....

মিস জোশী—না-না, আপনি আবার আমাকে ভুল বুঝছেন। আপনার প্রথম ভুলের জন্যে ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু দ্বিতীয় ভুলের কোন ক্ষমা নেই। এমন প্রতিকূল আবহাওয়ায় পড়েও যার হৃদয় এত পবিত্র, এত নিষ্কপট, এত সদয়, তাকে মানুষ না বলে দেবতা বলাই উচিত। দেখুন, আপনি আমার সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তা সবই সত্যি। আমি আপনার চোখে ঘৃণ্য। আপনার সামনে দাঁড়াবার অযোগ্য। আপনি যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন ও সুমনের পরিচয় রেখেছেন, তা আমার কাছে শ্রদ্ধার বস্তু। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আপনার কাছে অতি নগণ্য।

এই বলে গদগদ হয়ে মিস জোশী জোড় হাতে আপটেজীর সামনে দাঁড়ালেন। আপটেজী তাঁর মনের পরিবর্তন লক্ষ্য করে চললেন—দেখুন, ওসব বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

মিস জোশী আক্ষেপ ও বিনীত স্বরে প্রার্থনা জানিয়ে বলেন—আপনি দয়া করে ঐসব দুষ্টপ্রকৃতির লোকেদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। তারপর এমনভাবে তৈরী করে নিন, যাতে আপনার বিশ্বাসের পাত্রী হতে পারি। আমার এই অবস্থার জন্যে আমার যে কী দুঃখ, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। আমি বার-বার নিজেকে শুধরে নিতে চেষ্টা করি। বিলাসিতার জালকে ছিঁড়ে ফেলতে চাই, কিন্তু দুর্বল আত্মা পদে-পদে বাধা দেয়। আমি যে ভাবে মানুষ হয়েছি, তাতে আমার এ অবস্থাটাই স্বাভাবিক। আমার উচ্চ শিক্ষাই আমার গৃহিনী-জীবনকে ঘেন্না করতে শিখিয়েছে। কোন পুরুষের অধীনে থাকতে হবে, এটা মন স্বীকার করে নিতে পারে না, গৃহিণী-জীবনটাকে বিষ-তুল্য মনে করে। চেয়েছিলাম তর্কযুদ্ধের মাধ্যমে স্ত্রীত্ব বজায় রাখবো, পুরুষের মত স্বাধীন থাকবো, কেন পরের আজ্ঞাবহ হবো? নিজের ইচ্ছাকে কেন পরের হাতে সোঁপে দেবো? অপরে কেন আমার ওপর খবরদারী করবে? আমার চোখে দাম্পত্য-জীবন একটা তুচ্ছ বস্তু। মা-বাবার সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত নয়, ঈশ্বর তাঁদের মুক্তি দিয়েছেন। মা-বাবার মধ্যে মতের মিল হতো না। বাবা ছিলেন বিদ্বান, আর মা "ক'অক্ষর গো-মাংস"। তাঁদের মধ্যে দিনরাত চলতো ঝগড়া। 'সেই

রকম স্ত্রী-লোকের সঙ্গে বিয়ে হওয়াটাকে বাবা নিজের জীবনের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য বলে মনে করতেন। তিনি একথাও বলতেন, "তুমি আমার পায়ের বেড়ি, না হলে আমি কোথায় যে চলে যেতাম তা ঠিক নেই।" মা শিক্ষিতা ছিলেন না বলে বাবা সব সময় তাঁর ঘাড়ে দোষ চাপাতেন। তিনি তাঁর একমাত্র মেয়েকে মূর্খ স্ত্রীর সংসর্গে থাকতে দিতেন না, সব সময় দূরে-দূরে রাখতে চাইতেন। মা আমাকে কিছু বললেই বাবা মায়ের ওপর রেগে গিয়ে বলতেন—তোমাকে কতবার বলেছি না মেয়েটাকে কিছু বলবে না, সে ভাল-মন্দ নিজেই বুঝে নেবে, তুমি বকা-ঝকা করে তার আত্ম-সম্মানে ঘা দিও না, এটা যে কত খারাপ, তা তুমি বুঝবে না। মা কী আর করেন, শেষ পর্যন্ত নিরাশ হতেন। অথবা চোখের জলে দুঃখ মেটাতেন। ঘরে অশান্তি দেখে সংসার করতে আমারও ঘেন্না জন্মায়। সেই সময় আমাকে সাহায্য করেছিলেন আমাদেরই কলেজের লেডী প্রিন্সিপ্যাল। তিনি ছিলেন অবিবাহিতা। তাঁকে দেখে আমার ধারণা হয়েছিল—ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত আদর্শ চরিত্র গঠন করা। বিলাস-বৈভবে থেকে সেটা সম্ভব নয়। দেখুন, যে সব কথা এখন আপনাকে বলছি, বাড়ী গিয়ে সব ভুলে যাবো। কেননা, যে পরিবেশে থাকি, তার জলবায়ু দূষিত। সেখানকার সবাই আমাকে পাঁকে ডুবিয়ে রাখতে চায়, আমাকে বিলাসে আসক্ত রাখলে তাদেরই বাজীমাৎ হবে। একমাত্র আপনিই আমার মনে বিশ্বাস আনতে পেরেছেন। তাই, আমার একান্ত অনুরোধ, এই অভাগিনীকে আপনি কখনো ভুলবেন না।

আপটেজী মিস জোশীর দিকে সমবেদনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—আপনার উপকার করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। মিস জোশী, আমরা সবাই মাটির পুতুল, কেউ নির্দোষ নই। মানুষ খারাপ হয় সংস্কার অথবা পরিবেশের দোষে। অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করতে পারলেই রক্ষে, আর যদি সংস্কারের মধ্যে ঢুকে যায়, তাহলে বাঁচা মুস্কিল। বুঝতে পারছি, পরিবেশ আপনাকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছে। দেখবেন, বিবেকের সূর্য উদয় হলে সে কুয়াশা নিশ্চয়ই কেটে যাবে। তাই, আমার অনুরোধ, আপনি অসৎ সঙ্গটা আগে ত্যাগ করুন।

মিস জোশী—তার জন্যে আপনাকে আমার পাশে দাঁড়াতে হবে।

আপটেজী আড়চোখে চেয়ে বললেন—এ যে ডাক্তারবাবু রোগীকে জোর করে ওষুধ খাওয়াতে চাইছেন?

মিস জোশী—যা করার আমি করবো, তবে যত তেঁতোই হোক না কেন, সে ওষুধটা আপনাকেই খাওয়াতে হবে। তাই, একটা বিশেষ অনুরোধ রাখছি যে, কাল বিকালে আমার বাড়ীতে একবার দয়া করে যাবেন।

আপটেজী—(একটু ভেবে) আচ্ছা, যাবো।

মিস জোশী যাবার সময় বললেন—ভুল হয় না যেন, পথ চেয়ে বসে থাকবো। আর হ্যাঁ, আপনার বডী-গার্ডকেও যেন নিয়ে যাবেন।

এই বলে ছেলেটিকে কোলে তুলে আদর করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিস জোশীর গর্বে যেন আর পা পড়ে না। তৃষ্ণার্ত পথিক দূরে নদী দেখতে পেলে যেমন তার মনের অবস্থা হয়, তেমনি মিস জোশীর ও অবস্থা দাঁড়িয়েছে। তাই, তিনি হাওয়ার মত উড়ে চলেছেন।

ছয়

পরের দিন সকাল বেলায় মিস জোশী পার্টি দেবেন বলে নিমন্ত্রণ কার্ড পাঠাতে আরম্ভ করলেন। এ পার্টি আপটেজীকে সম্মান জানানোর জন্যেই আয়োজন করা হচ্ছে। মিস্টার জৌহরী নিমন্ত্রণ কার্ড দেখে হাসলেন। মনে মনে বললেন বাছাধন এবার জাল ছিঁড়ে কোথায় যাবে? মিস জোশী ভাল চালটাই চেলেছে। ওকে বুদ্ধিমতীই বলতে হবে! ভেবেছিলাম আপটে চালাক, এখন দেখছি আন্দোলন করা আর বিদ্রোহ দেখানো ছাড়া তার কোন যোগ্যতাই নেই।

তখন বিকাল চারটে। অতিথিরা সব আসতে আরম্ভ করেছেন। শহরের বড় বড় অফিসার, বড় বড় ব্যবসায়ী বড় বড় বিদ্বান, মুখ্য সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, প্রায় প্রত্যেকেই সস্ত্রীক হাজির হলেন। মিস জোশী সুন্দর পোষাক ও অলংকারে সেজেছেন। ধূপের ও ফুলের গন্ধে আর মধুর সঙ্গীত ধ্বনিতে উৎসবস্থল মুখরিত।

ঠিক পাঁচটার সময় মিস্টার জৌহরী এসে পৌছলেন। মিস জোশীর হাতে হাত মিলিয়ে বললেন—(নীচু স্বরে) ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে জড়িয়ে ধরি। আমার বিশ্বাস, বাছাধন তোমার জাল থেকে বেরুতে পারবে না।

মিসেস্ পেটিট বললেন—মিস জোশীর কি আজ বিয়ে নাকি?

মিস্টার সোরাবজী—আমি তো শুনেছি, আপটে তো একটা গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক।

মিস্টার ভরুচা—কোন ডিগ্রী তো নেই, সভ্যতা কোথা থেকে শিখবে?

মিস ভরুচা—আজ তাকে সভ্যতা শিখিয়ে দিতে হবে।

মহন্ত বীরভদ্র একমুখ দাড়ি নিয়ে আস্তে-আস্তে বললেন—আমি তো শুনেছি, সেটা একটা নাস্তিক। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনই করে না।

মিস জোশী—আমিও তো নাস্তিক। ঈশ্বরের ওপর আমারও বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই।

মহন্ত—আপনি নাস্তিক হলেও অনেককে আস্তিক করে দেন।

মিস্টার জৌহরী—মহন্তজী এ আপনি যথার্থ বলেছেন।

মিসেস ভরুচা—কেন মহন্তজী আপনাকে মিস জোশী কি আস্তিক করে দিয়েছেন নাকি?

এমন সময় আপটেজী তাঁর বডি গার্ডের আঙ্গুল ধরে পার্টিতে এসে উপস্থিত হলেন। বেশ সেজে-গুজেই এসেছেন। ছেলেটিরও পোষাক দেখলে মনে হবে ধনীর সন্তান, আপটেজীকে দেখে উপস্থিত সকলেরই মনে হলো প্রকৃতই রুচি-সম্পন্ন সুন্দর পুরুষ। মুখে সৌর্যের চিহ্ন, পদক্ষেপে শিষ্টতা এবং বিনয় ভাব। সত্যিই সুসভ্য। আপটেজীর আসার আগে অনেকেই স্থির করেছিলেন, এলেই হাততালি দেবেন। আবার কেউ কেউ ভেবেছিলেন—আসা মাত্রই কটূক্তি করবেন, কিন্তু এখন ঈর্ষা করতে আরম্ভ করেছেন। নিজেদের মধ্যে কানা-ঘুঁসো করছেন। আপটেজী নির্বিকার। তাঁর কথা সরল, স্বচ্ছ, এবং মনকে প্রসন্ন করে। অন্যদিকে মিস জোশী তাঁর আগমনে আনন্দে আত্মহারা হন।

সোরাবজী—আপনি কোন্ ইউনিভারসিটি থেকে পাশ করেছেন?

আপটেজী—ইউনিভারসিটি থেকে পাশ করলে আমি নিশ্চয়ই শিক্ষা বিভাগে একজন বড় অফিসার হতাম।

মিসেস্ ভরুচা—আপনাকে তো ভয়ঙ্কর জন্তু বলে মনে করতাম।

আপটেজী হেসে বললেন—তা তো করবেনই কেননা, আমি মেয়েদের সঙ্গে খুব কমই মিশি।

ইতিমধ্যে মিস জোশী পোষাক পরিবর্তন করে অতি সাধারণ পোষাক পরে ফেলেছেন। মুখে তাঁর শুভ্র সংকল্পের তেজ। চোখে এক অদ্ভুত জ্যোতি, যেন দেবতা তাঁকে বর দান করেছেন।

মিস জোশীকে নতুন সাজে দেখে সবাই অবাক হয়ে যান। ভাবেন এমন বেশ কেন হলো? কেউ বিশ্বাসই করতে পারেন না, কিন্তু মিস্টার জৌহরী খুব খুশী। তাঁর ধারণা, এ বেশটাও হয়তো মিস জোশীর একটা নতুন চাল।

"ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের মনে আছে, গত পরশু আপটেজী কীরকম জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছেন? তিনিই আজ আপনাদের সামনে হাজির। সেদিন আমার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্যে তাঁকে আমি শাস্তি দিতে চাই। শুনুন, এনার কাজ হলো—জনগণকে খেপিয়ে তোলা আর স্বার্থপর ধাপ্পাবাজ লোকদের উদ্দেশ্যে গালাগাল দেওয়া। গতকাল ওনার বাড়ী গিয়ে আমি সব জেনে এসেছি। তাই সেই রহস্য উদ্ঘাটনে আর আমি বিলম্ব করবো না। আপনারা ধৈর্য ধরে বসুন। আমি সব দেখে শুনে যা বুঝেছি,

তাতে বলতে হয় উনি একজন পাকা বিদ্রোহী……….'

এই কথা শুনেই মিস্টার জোহরী হাততালি বাজালে সবাই তালি বাজাতে আরম্ভ করে দেন।

মিস জোশী—কিন্তু রাজদ্রোহী নন, অন্যায়ের দ্রোহী, দমনের দ্রোহী, অভিমানের দ্রোহী… ………

তারপরই সব নিস্তব্ধ। উপস্থিত ব্যক্তিগণ বিস্মিত হয়ে একে অপরের দিকে তাকান।

মিস জোশী—আরো শুনুন, আপটেজী গোপনে গোপনে অনেক অস্ত্র-শস্ত্র জমা করেছেন এবং গোপনে অনেক হত্যালীলাও চালিয়েছেন……..

মিস্টার জোহরী দ্বিগুণ জোরে হাততালি বাজিয়ে ওঠেন।

মিস জোশী—কিন্তু কার হত্যা জানেন? দুঃখের দারিদ্র্যের দেশবাসীর কষ্টের, হঠধর্মীর এবং নিজের স্বার্থের!

আবার সব নিস্তব্ধ এবং উপস্থিত সকলে চকিত হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকান, যেন কিছুই বিশ্বাস করতে পারছেন না।

মিস জোশী—জানেন, আপটেজী গোপনে গোপনে কত ডাকাতি করেছেন ও করছেন?

আর তালি বাজে না। হয়তো ভাবছেন, দেখা যাক, আর কী কী বলেন!

"উনি জেনে শুনে আমার সবকিছু অপহরণ করেছেন। তাই, ওনার চরণেই এবার আমাকে আশ্রয় নিতে হবে। ওগো আমার প্রাণেশ্বর! তোমার চরণেই স্থান দিয়ে আমাকে রক্ষা করো। আমাকে আর ডুবতে দিও না। আমার বিশ্বাস, তুমি আমাকে নিরাশ করবে না।"

এই বলে মিস জোশী আপটেজীর সামনে গিয়ে নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন। উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত হতবাক।

সাত

আজ একসপ্তাহ আপটেজী পুলিশের হেফাজতে। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সেই কারণে গোটা রাজ্যে চলছে বিশৃঙ্খলা। শহরে এখানে-ওখানে হচ্ছে সভা-সমিতি; তাই পুলিশ প্রতিদিনই দশ-পনের জন লোককে গ্রেপ্তার করছে। সংবাদ-পত্র গুলোতে চলছে নানারকম সমালোচনা ও মন্তব্য।

তখন রাত ন'টা। মিস্টার জোহরী তখন রাজভবনে নিজের অফিসে বসে ভাবছেন কীভাবে মিস জোশীকে ফিরিয়ে আনা যায়? সেদিনের ঘটনা তাঁকে অত্যন্ত আঘাত

দিয়েছে, কিন্তু মিস জোশীকে চোখ থেকে কিছুতেই সরাতে পারছেন না!

এখন তাঁর একটাই চিন্তা—এমন দাগা সে কেন দিল? তার সঙ্গে তো কোন খারাপ ব্যবহার করা হয় নি? তার মনের ইচ্ছা কি পুরণ হয় নি? তবে কেন এমন হলো? না, কিছুতেই না, আমি এর প্রতিকার করবোই, তাতে দুনিয়ার লোক আমাকে যা বলে বলুক। আমার বদনাম রটবে? খুনী বলবে? আমার চাকরি চলে যাবে? যাক, তবু আমি আপটেকে ছাড়বো না। তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবোই।

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন মিস জোশী। তাঁকে দেখে মিস্টার জোহরী চমকে যান, আশ্চর্য হন। ভাবেন, হয়তো নিরাশ হয়ে শেষে তাঁর কাছেই ফিরে এসেছে। মনে রাগ থাকলেও নম্র ভাবেই বললেন—আরে, এসো, এসো। তোমার পথ চেয়েই বসে আছি। কী দাগাই না দিলে সেদিন! আমি কিন্তু তোমাকে ভুলতে পারবো না, এটা মনে রেখো।

মিস জোশী—ওটা আপনার মুখের কথা।

মিস্টার জোহরী—কেন, বিশ্বাস করতে পারছো না? প্রমাণ চাও?

মিস জোশী—শুনুন, প্রেম প্রতিকার করতে জানে না, আর প্রেম কেউ দুরাগ্রহও হয় না। আপনি আমার সর্বনাশ করতে চান, তবুও বলছেন আমার প্রতীক্ষায় বসে আছেন? আমার স্বামীকে পুলিশ-হেফাজতে রেখেচেন কেন? এটা কি আপনার ভালবাসার প্রতীক? বলুন, আমার কাছে আপনি কী চান? যদি আপনি মনে করে থাকেন যে, আপনার ভয়ে আমি আপনার স্মরণ নিয়েছি, তাহলে সেটা ভুল। জানি, আপনি আপটেকে দ্বীপান্তরে পাঠাতে পারেন, ফাঁসীতেও ঝোলাতে পারেন, তাতে আপনার কিছুই লাভ হবে না। সে আমার স্বামী, আমি তাকে স্বামী বলেই গ্রহণ করেছি। সে উদার হৃদয় ও উদার মন নিয়ে আমাকে উদ্ধার করেছে। আর আপনি আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছেন, আমার আত্মাকে কলুষিত করেছেন। আপনি একবারও কি ভেবে দেখেছেন বা অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, তার আত্মা কত উদার? আপনি আমাকে অসহায় ভেবেছেন। ঐ দেবতুল্য মানুষটি নির্মল ও স্বচ্ছ মনে প্রথম দেখাতেই আমাকে আকর্ষণ করেছে। আমি এখন তারই এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তারই থাকবো। মনে রাখবেন, সে পথ থেকে আপনি কোন দিনই হঠাতে পারবেন না। আমি যেমন মানুষটি খুঁজছিলাম, তেমনিই পেয়েছি। তার কাছে আপনি তুচ্ছ। আমি তার জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, তবু আপনার কাছে আসতে পারবো না।

মিস্টার জোহরী—শোনো, শোনো, প্রেম কখনোই উদার বা ক্ষমাশীল নয়। আমি যতদিন তোমাকে নিজের মনে করবো, ততদিনই তুমি আমার সর্বস্ব। আর যদি তুমি

আমার না হতে চাও, তাহলে তুমি কী অবস্থায় রয়েছো তার খোঁজই বা আমি নিতে যাবো কেন!

মিস জোশী—এটা কি আপনার শেষ সিদ্ধান্ত?

মিস্টার জোহরী—যদি বলি হ্যাঁ, তাহলে কী করবে?

মিস জোশী লুকানো পিস্তলটা বের করে বললেন—তাহলে? প্রথমেই আপনার লাশটাই মাটিতে পড়ে থাকবে, তারপর আমার, বুঝলেন? বলুন, আপনার শেষ সিদ্ধান্ত কী।

এই বলে মিস জোশী জোহরীর দিকে পিস্তলটা সোজা করে ধরলেন। মিস্টার জোহরী ঘাবড়ে গিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং হেসে বলেন—তুমি এতখানি এগিয়েছো? তুমি নির্ভিক? আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আমি তোমাকে আর পাবো না। যাও আপটেই তোমার স্বামী, এটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। আজই তার বিরুদ্ধে মামলাগুলো তুলে নেবো। বুঝলাম, পবিত্র প্রেমেই সাহস এনে দেয়। আমার বিশ্বাস, তার প্রতি তোমার ভালবাসা পবিত্র। আমি পাপী হয়েও ভবিষ্যৎবাণী করছি, তুমি স্বামী নিয়ে সুখে সংসার করবে। তোমার স্বামী শুধু ভালবাসার ক্ষেত্রে নয়, রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমাকে পরাস্ত করলো। সৎলোকের সংস্পর্শে গেলে জীবন পাল্টে যায়, আত্মা জেগে ওঠে, আর অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোকময় পথ দেখতে পায়, সেইটাই আজ সত্য বলে প্রমানিত হলো।

জ্বালামুখী

বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করার পর থেকে আমি রোজই লাইব্রেরীতে যেতাম। বই ম্যাগাজিন এমন কি খবরের কাগজেও পড়তাম না। যেদিন পরীক্ষা শেষ হোলো সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আর কোনোদিন বই ছোঁবো না। তাই গেজেটে নিজের নাম আছে দেখেই ঘরে এসে মিল এবং ক্যাণ্টকে তাকে তুলে রেখেছি। লাইব্রেরীতে যেতাম শুধু ইংরেজী কাগজের 'ওয়াণ্টেড' কলমটা দেখে জীবন যাত্রার একটা হিল্লে করতে। আমার বাপ-ঠাকুর্দা যদি বিদ্রোহের কবল থেকে কোনো ইংরেজকে রক্ষা করতেন বা জমিদার হতেন তাহলে কোথাও 'নমিনেশন'—এর উদ্যোগ করতাম। কিন্তু হাতে তো আমার সে রকম কোনো সুপারিশও নেই। কুকুর-বেড়াল, মোটর-গাড়ীর জন্যে সবাই গর্ববোধ করে। দুঃখের বিষয় বি. এ. ডিগ্রির তেমন কোনো কদর

নেই কেউ ফিরেও চায় না। মাসের পর মাস ছুটোছুটি করেও মনোমত একটা চাকরী না পেয়ে নিজের নামের শেষে এই বি. এ-টার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে। ড্রাইভার, ফায়ারম্যান, মিস্ত্রী, খানসামা বা বাবুর্চি হলে আমাকে এতদিন ধরে বেকার থাকতে হোত না।

একদিন শুয়ে কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ কর্মী চাই বিজ্ঞাপনের পাতায় একটা পছন্দসই চাকরীর বিজ্ঞাপন নজরে পড়লো। কোনো এক জমিদার তার স্টেটের জন্যে বিদ্বান, সুরসিক, সহৃদয়, রূপবান প্রাইভেট সেক্রেটারী চেয়েছেন। মাইনে হাজার টাকা। আমি তো আনন্দে প্রায় নাচতে শুরু করলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে চাকরীটা যদি পেয়ে যাই, তাহলে সারাজীবন পায়ের ওপর পা তুলে রাজার হালে থাকতে পারবো। সে দিনই নিজের পার্সফোল সাইজ ছবিসহ আবেদন পত্র পাঠিয়ে দিলাম। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবার কাছেই এ ব্যাপারটা গোপন রাখলাম, কেননা হাজার টাকা মাইনের চাকরির জন্যে আবেদন পত্র পাঠিয়ে শুনলে সবাই আমাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে। তিরিশ টাকা মাইনেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। হাজার টাকা কে দেবে? মন থেকে ওটা দূর করতে পারছি না। বসে বসে নানারকম আকাশ-কুসুম কল্পনা করছি। পরে সম্বিত ফিরে পেয়ে নিজের এই অবুঝ মনটাকে বুঝিয়ে বলি, ওসব উঁচুপদ পাবার মতো কি এমন যোগ্যতা আমার রয়েছে। সদ্য কলেজের পড়া শেষ করা এক অনভিজ্ঞ ছোকড়া। দুনিয়ার হাল-চাল কিছুই জানি না। আমার চেয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞ, শিক্ষিত লোক দেশ আছে। ও চাকরি আমি কোনমতেই পাবো না। রূপবান, চৌকস হওয়া প্রয়োজন তা না হয় মেনে নিচ্ছি, কিন্তু এগুলোই কি সব? অতবড় পদে বসতে গেলে আরো যোগ্যতা চাই। বিজ্ঞাপনে এগুলো চাওয়া হয়েছে এই জন্যে যে ওসব পদাধিকারীদের দর্শনধারী হবারও প্রয়োজন আছে ঠিকই, তাই বলে অতিরিক্ত বাবুয়ানিও আবার দৃষ্টিকটু। মাঝারি ধরনের ভুঁড়ি, সুস্বাস্থ্য, ভরাট গাল আর গুছিয়ে কথা বলা এসবই উঁচু পদাধিকারীর লক্ষণ, দুঃখের বিষয়, আমার ওসব গুণের একটাও নেই। এই ভয় আশার দোলায় দুলতে দুলতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। হতাশা হয়ে ভাবলাম—আমিই বা কি ধরনের ওছা মার্কারে বাবা! একটা মরীচিকার পেছনে এভাবে ছোটার কোনো অর্থ হয়! আপনিই বলুন তো এ আহাম্মকি ছাড়া আর কি! এতক্ষণে বুঝতে পারলাম কেউ নিশ্চয়ই আজকের শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মূর্খতার পরীক্ষা নিতে এ ফাঁদ পেতেছে। হায় ভগবান! এটুকুও বুঝতে পারলাম না! কিন্তু আটদিনের দিন পিয়ন আমার নামে এক টেলিগ্রাম নিয়ে এলো। আমার যে তখন কি আনন্দ হচ্ছিল কি বলবো! ঘর থেকে বলতে গেলে দৌড়ে বাইরে এসে পিয়নের হাত থেকে কাগজ নিয়ে পড়ে দেখি, লেখা আছে—মঞ্জুর হয়েছে, যথাশীঘ্র এশগড় আসুন।

এই সুখবর হাতে পেয়ে আমার আশানুরূপ আনন্দ হোল না। বেশ কিছুক্ষণ টেলিগ্রামের কাগজটা হাতেই নিয়েই ভাবতে থাকি। বিশ্বাস করতে পারছি না। এ নিশ্চয়ই কোনো বদমায়েশের কারসাজি। তাই বলে আমিও কম যাই না, জোঁকের মুখে নুন দিতে আমিও জানি। আজই টেলিগ্রাম করে আগাম এক মাসের মাইনে চেয়ে পাঠাব। তাহলেই মুখোশটা খুলে আসল চেহারাটা বেরিয়ে আসবে! আবার ভাবছি উদ্ধতা দেখালে ভাগ্যের চাকাটা উল্টোমুখে ঘুরতে শুরু করবে না তো। যাগ্‌গে, দেখাই যাক না কি হয়! কিছু না হোক, জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ রহস্যের উন্মোচন করতেই হবে! তাই টেলিগ্রাম করে নিজের সম্মতির সংকেত জানাতে রেল-স্টেশনে গেলাম। স্টেশন-মাস্টারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম জায়গাটা দক্ষিণে। টাইমটেবিলে বিস্তৃতভাবে লেখা আছে। অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ওখানকার জলবায়ু নাকি অস্বাস্থ্যকর। তবে স্বাস্থ্যবান তরুণের ওপর তার প্রভাব পড়তে সময় লাগে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র বন্য জন্তুও যথেষ্ট আছে। প্রায় অন্ধকার, নির্জন সংকীর্ণ পাহাড়ী পথগুলো এড়িয়ে চলাই উচিৎ। এসব পড়ে আমার উৎসাহ যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। হিংস্র, বিষাক্ত জীব-জন্তু কোথায় নেই। আর অন্ধকার পাহাড়ী অলি-গলিতে না গেলেই হবে। বাড়ী এসে বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে, ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে সময় মত স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। নিজের কেমন যেন মনে হচ্ছিল, দু'চার দিন বাদে আমাকে ঠিকই ফিরে আসতে হবে, তাই বন্ধুদের কাছে এ বিষয়ে একদম মুখ খুলি নি।

দুই

সন্ধ্যেবেলা গাড়ী ছাড়ল। আরাম করে বসে সিগারেট ধরিয়ে একটা পত্রিকা পড়তে শুরু করলাম। জানি-না কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙ্গতে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতেই ভোরের মনোরম দৃশ্য নজরে এলো। দুদিকেই পর্বতের গা বেশ কিছুটা সবুজ গাছে ঢেকে আছে, গরু-ভেড়া চড়ছে, সূর্যের সোনালি কিরণ মেখে তাদের রূপ খুলে গেছে। আহা! আমার যদি এই সুন্দর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর থাকতো, বনের সুমিষ্ট ফল আর ঝর্ণার সুশীতল জল খেয়ে মনের আনন্দে গান গাইতাম! হঠাৎ দৃশ্য পরিবর্তন হয়ে একটা ঝিল দেখা গেল, তাতে অসংখ্য পদ্মফুল ফুটে আছে। নানা রকমের পাখী সেখানে মনের আনন্দে চান করছে, সাঁতার কাটছে, ছোটো ছোটো ডিঙ্গিগুলো হেলে-দুলে তরতরিয়ে এগোতে লাগল, সে দৃশ্যই বদলেই পাহাড়ের কোলে ছবির মতো একটা ছোট্ট গাঁ দেখা গেল, ঝোপ-ঝাঁড়-গাছ-পালায় ঘেরা, দেখে মনে হয় ওখানেই সব সুখ-শান্তি স্থায়ী ভাবে বসবাস করছে।

কোথাও ছোটো ছোটো শিশুরা আপন মনে খেলা করছে, কোথাও বা সদ্যজাত বাছুর তার মায়ের সঙ্গে খেলা করছে, মা তার স্নেহ উজার করে সন্তানের গা চেটে দিচ্ছে। তারপরে একটা গভীর জঙ্গল দেখা গেল। দলে দলে হরিণ গাড়ীর শব্দ শুনেই চমকে পালিয়ে যাচ্ছে। এসবই স্বপ্ন রাজ্যের ছবির মতই চোখের সামনে ফুটে উঠে, পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। এতে ছিল এক অবর্ণনীয় শান্তিদায়িনী শোভা, যা নাকি মনে আকাঙ্ক্ষার সাথে সাথে আবেগেরও সঞ্চার করছিল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এশগড় এসে যাবে। নামবার জন্যে তৈরী হয়ে নিলাম। একটু পরেই সিগনাল দেখা গেল, সেই সঙ্গে আমার বুকে ধুক-পুকানিও শুরু হোল। গাড়ী থাকতেই নেমে এসে এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে 'কুলি' বলে হাঁক দিতেই কোত্থেকে কিছু উর্দি পরা লোক এসে সেলাম করে জিজ্ঞেস করলো—আপনি⋯থেকে এসেছেন, তাই না? চলুন, বাইরে মোটর দাঁড়িয়ে আছে। আমার মনোবাঞ্ছা তাহলে পূর্ণ হয়েছে। এখনো পর্যন্ত মোটরে চড়ার সৌভাগ্য হয়নি। দৃপ্তভঙ্গীতে গিয়ে বসলাম। নিজের জামা-কাপড়ের দিকে চেয়ে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে নিজেকেই ধিক্কার দিতে থাকি। আগে থেকে যদি জানতাম, সৌভাগ্য সূর্য উদয় হবেই, তাহলে যে করেই হোক ধোপ-দুরস্ত হয়ে আসতাম। মোটর চলতে শুরু করলো। রাস্তার দুধারে বকুল গাছের সারি ছায়া বিস্তর করে আছে। লাল কাঁকড় বিছানো রাস্তা। সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে, ঝর্ণার জলের ধারার মতই এগিয়ে যাচ্ছে। দশ মিনিটের মধ্যেই এক সুবিশাল সমুদ্রের তীরে চলে এলাম। অনতিদূরেই প্রাসাদোপম সুরম্য অট্টালিকা সদর্পে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর নীচে সমুদ্র যেন তৃপ্তিতে শুয়ে শুয়েই তার বন্দনা করে যাচ্ছে। পুরো দৃশ্যটাই শৃঙ্গারাত্মক কাব্য সমৃদ্ধ।

গাড়ী ফটকের কাছে আসতেই বেশ কিছু লোক এসে আমাকে উষ্ণ অভিনন্দনে আপ্যায়িত করলো। তাদের মধ্যে একজন আবার খুবই শৌখিন, সুবিন্যস্ত চুল, চোখে সুর্মা, দেখে মনে হোল বেশ উঁচু দরের কর্মচারী। তিনিই আমাকে আমার সুসজ্জিত ঘরের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। দরজার কাছে গিয়ে বললেন—আমাদের মালিক এখন আপনাকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন। সন্ধ্যেবেলা আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

এদিকে মালিকটি যে কে তাও তো জানি না, কাউকে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হচ্ছে না। কেন-না চাকরি করতে এসে মালিকের নাম জানি না এক অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে চাই না। তবে আমার মালিক যে অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এতটা আদর-আপ্যায়ন পাবো আশা করি নি। ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতেই যেন স্বপ্নের জগতে চলে গেলাম। সামনেই খোলা

বারান্দা। দখিনা বাতাসে দেহ-মন জুড়িয়ে গেল। নীচের দিকে তাকাতেই আলো-ছায়ায় মাখামাখি ঝিলের দিকে নজর পড়লো। যে আমি এতদিন নিজেকে ভাগ্য-দেবীর সপত্নী সন্তান বলে জেনে এসেছি, আজই প্রথম নির্বিঘ্নে আনন্দ লাভের মুখ অনুভব করলাম।

সন্ধ্যের দিকে সেই শৌখিন বাবুটি এসে আমাকে জানালেন—হুজুর আপনাকে স্মরণ করেছেন।

আমিও দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে চুল আঁচড়ে তৈরীই ছিলাম। তাড়াতাড়ি সবচেয়ে ভাল স্যুটটা পরে তার সঙ্গে মালিক সন্দর্শণে চললাম। এ সময়ে একটা অজানা আশঙ্কায় আমার মনটাকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে, আমার কথাবার্তায় উনি অসন্তুষ্ট হবেন না তো? ওঁর মনোমত উত্তর না দিতে পারলে আমাকে হয়তো পত্র-পাঠ বিদায় নিতেই হবে। যাক্, ভেবে লাভ নেই, স্বীয় যোগ্যতার পরিচয় দিতে আমিও যথাসাধ্য তৈরী হয়েই এসেছি। বেশ অনেকগুলো বারান্দা পেরিয়ে অবশেষে সে দরজার কাছে এসে পৌছোলেন। সিল্কের পর্দা ঝুলছে। আমার সঙ্গী পর্দা তুলে ভেতরে যেতে ইশারা করলেন। ভয়ে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে ভেতরে পা রাখতেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম! এ-কি দেখছি! রূপ, না সৌন্দর্যের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড!

তিন

ফুল ও সুন্দর, প্রদীপ ও সুন্দর। ফুলে আছে মিষ্টি সুগন্ধ, প্রদীপের মাঝে আলোর উদ্দীপনা। ভ্রমর ফুলের সব মধুটাই নিংড়ে নিয়ে যায়, আর প্রদীপের আলোতে পতঙ্গ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দেখছি, কিংখাবের চাদরে মোড়া মসনদের ওপর এক সুন্দরী মহিলা বসে আছে, সে সৌন্দর্যে এক ধরনের মাধুর্য্যের পরিবর্তে তীব্র জ্বালা ছড়ানো। ফুলের পাপড়ি আছে, কিন্তু এ জ্বালাকে বিভক্ত করা অসম্ভব। প্রতিটি অঙ্গের প্রশংসা করা আর দহন কে কেটে টুকরো করতে যাওয়া একই কথা। পায়ের নথ থেকে মাথার চুল অব্দি আগুনের লেলিহান শিখার ঔজ্জ্বল্যের প্রকাশ, সেই চমক, সেই রং, এমন আভাটুকু পর্যন্ত! আমার মনে হয় কোনো ফটোগ্রাফারও এর চেয়ে ভাল ফটো তুলতে পারবেন না। ভদ্রমহিলার দুচোখে স্নেহের আবেগ ঝরে পড়ছে। বললে—আপনার আসতে কোনো কষ্ট হয়নি তো!

নিজেকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে উত্তর দিলাম—আজ্ঞে না, কোনো কষ্ট হয় নি!

রমণী—এ জায়গাটা আপনার পছন্দ হয়েছে তো?

সাহস সঞ্চয় করে উৎসাহ দেখিয়ে বললাম—এমন সুন্দর জায়গা পৃথিবীতে আর আছে বলে মনে হয় না। আচ্ছা, গাইড বইয়ে দেখলাম এখানকার জল-হাওয়া নাকি

খুব একটা ভাল নয়? তাছাড়া হিংস্র জীব-জন্তুও আছে বলে শুনলাম?

কথাটা শুনে মহিলার মুখটা যেন মেঘে ঢাকা সূর্যের মত ম্লান হয়ে গেল। কথাটা এজন্যে বলেছিলাম যাতে উনি বুঝতে পারেন যে আমাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেই এখানে আসতে হয়েছে। কিন্তু দেখে মনে হোল উনি কথাটা শুনে বিশেষ দুঃখিত হয়েছেন। পরক্ষণেই সব মেঘ কেটে গেল, বললেন—এ জায়গাটা তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্যে অনেকেরই কাছেই চক্ষুশূল। জানেন তো, গুণের অনাদর করার লোকেরও দুনিয়ায় অভাব নেই? আর তা ছাড়া, জল-হাওয়া একটু খারাপ হলেও আপনার মতো বলিষ্ঠ-সুপুরুষের তো তাতে ভয়ে পাবার কোনো কারণ নেই। আর হিংস্র, বিষাক্ত জীব-জন্তু, সে তো আপনার সামনেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ময়ূর, হাঁস, হরিণ হিংস্র জন্তু হলে নিঃসন্দেহে এখানে বিষাক্ত জীব-জন্তুযথেষ্ট পরিমাণেই আছে।

মনে সংশয় দেখা দিল, আমার কথা শুনে উনি অসন্তুষ্ট হন নি তো?

তাই বেশ গর্বের সঙ্গেই উত্তর দিলাম—গাইড-বইয়ের ওপর নির্ভর করে কিছু বলা ঠিক নয়।

কথাটা শুনে মহিলা খুশী হয়ে বলেন—আপনি দেখছি খুবই স্পষ্টবাদী, এটা মানুষের একটা ভাল গুণ। অবশ্য আপনার মুখ দেখে আগেই তা টের পেয়েছি। আপনি শুনে অবাক হয়ে যাবেন, যে এই পদের জন্যে প্রায় লাখ-খানেক আবেদন পত্র আমাদের হাতে এসেছে। তাদের মধ্যে এম. এ., ডী. এস. সী., পি. এইচ. ডি-এর সংখ্যা কম নয়। আমাকে দার্শনিকের দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়েই সব কিছু যাচাই করতে হয়েছে। সেই সঙ্গে এও বুঝতে পারলাম, দেশে উচ্চ শিক্ষিতের হার কিভাবে বেড়ে চলেছে! কিছু ভদ্রলোক তো আবার স্বরচিত বই-পত্তরের ক্যাটালিগও লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন, দেখে-শুনে মনে হচ্ছিল যেন জ্ঞানী লেখকদেরই আমি অগ্রাধিকার দেব। কালের যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা বোধ হয় তাদের অজ্ঞাতেই রয়ে গেছে। পুরোন দিনের নীতি বাক্য, পুরানের কাহিনী এখন শুধুমাত্র অন্ধ ভক্তদের রসা-আস্বাদনের জন্যেই, সাধারণ মানুষের এতে কোনো লাভ নেই। এটা জাগতিক উন্নতির যুগ। আজ-কাল মানুষ পার্থিব সুখ-ভোগের জন্যে জীবন-পাত করে ফেলতেও কসুর করে না। প্রার্থীদের মধ্যে কতজন যে নিজের নিজের ছবি পাঠিয়েছেন কি বলবো। আমি তো ওগুলো দেখে একা একাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেসেছি। সেগুলোকে একটা এ্যাল্‌বামে লাগিয়ে রেখেছি, সুযোগ পেলে হাসতে ইচ্ছে করলেই ওটা খুলে দেখতে লেগে যাই। যে বিদ্যা মানুষকে বনমানুষে রূপান্তরিত করে তা আমার কাছে একটা রোগেরই সামিল! সত্যি কথা বলতে কি, আপনার ছবি থেকে মুগ্ধ হয়ে সেই মুহূর্তে আপনাকে কাজে বহাল করে টেলিগ্রাম করে দিলাম।

এক সুন্দরী নারীর মুখ থেকে নিজের দেহ-সৌষ্ঠবের প্রশংসা শুনে আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বলে ফেললাম—ম্যাডাম, আপনাকে যথাসাধ্য খুশী করতে চেষ্টার কোনো ক্রটী করবো না।

মহিলা আমার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন—প্রথম থেকেই আমার এ বিশ্বাস আছে। আসুন, কিছু কাজের কথা সেরে নেওয়া যাক। এ প্রাসাদকে নিজের মনে করে নিঃসংকোচে থাকুন। আমার অনুগামীদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। আমার প্রত্যেকটা কাজেই তাদের অকৃত্রিম সহায়তা রয়েছে। ভাল কথা, প্রাসাদের বাইরেও আমার অগণিত ভক্ত রয়েছে। আজ থেকে তাদের সব ভার আপনার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। কতরকম যে মানুষ আছে কি বলবো! কেউ আমার সাহায্য চায়, কেউ বা নিন্দে করে, আবার কেউ আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, একদল আবার গালি-গালাজ করে চলেছে। এদের সবাইকে সন্তুষ্ট করাই আপনার কাজ। আজকের এই চিঠির পাহাড়ের দিকে দেখলেই আশা করি তা বুঝতে পারবেন। এক ভদ্রলোক লিখেছেন, আমার বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর আপনারই প্রেরণাতে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করে আসছি। এখন তাঁরই নাবালক ছেলে সাবালক হয়ে পৈতৃক সম্পত্তি ফিরে পেতে চাইছে। এতদিন ধরে যে সম্পত্তি নিজের মনে করে ভোগ করে চলেছি, তা ফিরিয়ে দিতে কি মন চায়? এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাই।

এঁকে উত্তর দিন, যে সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না, কূটনীতির আশ্রয় নিতে হবে। ভাইপোকে কপট স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে ভুলিয়ে সাদা কাগজে রবার স্ট্যাম্পের ওপর সই করিয়ে নিন। তারপর গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারীদের সাহায্যে সম্পত্তি বেনামে লিখে নিন। এক দিয়ে যদি দুই পাওয়া যায় তাহলে অযথা ভাবনা-চিন্তা করে সময় নষ্ট করবেন না।

এ ধরনের উত্তর শুনে আমার কৌতূহলের সীমা রইলো না। নীতি-ধর্মাধর্মের গায়ে যেন জোরালো আঘাত লাগলো। ভাবছি, মহিলা কে, আর কেনই বা এরকম কু-পরামর্শ দিচ্ছেন। কোনো উকীলও বোধহয় এরকম খোলাখুলি ভাবে তার মক্কেলকে পরামর্শ দেন না। তার দিকে সন্দেহের চোখে চেয়ে বলি—সবচেয়ে বড় কথা, এ ঘোরতর অন্যায় নয় কি!

মহিলা খিল খিল করে হেসে উঠে বলেন—ন্যায়! ওটা তো স্বার্থান্ধদের অভিধানিক শব্দ! ধর্মান্ধ লোকেরা নিজেদের মনকে প্রবোধ দিতেই তা ব্যবহার করে, বাস্তবে ওর কোনো অস্তিত্ব আছে নাকি! বাবা ঋণ করে মরে গেলে ছেলেকে সে ঋণ শুধতে সর্বশান্ত হয়ে যেতে হয়। শিক্ষিত লোকেদের মতে এটাই ন্যায় হলেও আমি একে অত্যাচারই বলি। এই ন্যায়ের পর্দার আড়ালে মহাজনদের জোরজুলুম যেন দিন কে

দিন বেড়েই চলেছে। এক ডাকাত কোনো এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে ডাকাতি করলে সকলে মিলে ধরে তাকে জেলে চালান দেয়। ধর্মাত্মাদের মতে এটাই ন্যায়, কিন্তু এখানেও সেই ঐশ্বর্য আর অধিকারের বাড়াবাড়ি করা হয় নি কি? ভদ্রলোকেরা কত সংসারকে বালির বাঁধের মত ভেঙ্গে দিয়ে, অন্যের গলা টিপে এ অর্থ সঞ্চয় করেছেন, কিন্তু তাদের কিছু বলার মতো সাহস কারোরই নেই, কেন? কারণ একটাই, তারা যে ভদ্রলোক। তাই ডাকাত গলা টিপতে এলে সে টাকা আর প্রভুত্বের জোরে তাকে বজ্রমুষ্ঠিতে কুপোকাত করে দেয়। এটাকে কিন্তু আমি কিছুতেই ন্যায় বলে মানতে পারি না। দুনিয়াটা অর্থ, ছলনা, কপটতা, ধূর্ততার বশ, এরই নাম জীবন-সংগ্রাম, এ সবের আশ্রয় না নিলে আমরা বাঁচবো কেমন করে? ওগুলো যথার্থই ন্যায়ের অনুকূলে। ধর্মযুদ্ধের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। এই দেখুন, আর একজনের চিঠি। ইনি লিখেছেন, আমি এম. এ. ও 'ল' পরীক্ষার প্রথম বিভাগে পাশ করেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার ভাগ্যের চাকা খোলে নি। ভেবেছিলাম, যোগ্যতা ও পরিশ্রম বিফলে যাবে না। এ তিনটে বছর অনেক কিছু দেখেশুনে এটাই অনুভব হোল, ও সবই কথার কথা, পুঁথিগত তত্ত্বের কথা। ঘরে যা কিছু ছিল এ তিন বছরে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থেকে সেগুলো ধ্বংস করেছি। এখন আমি অকূল পাথারে ভাসছি, এই নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে ও পরিবারকে রক্ষা করতে অগত্যা আপনার শরণ নিয়েছি। আমার মত হতভাগাকে দয়া করুণ, এ নিদারুণ দুঃখ থেকে একমাত্র আপনিই আমাকে উদ্ধার করতে পারেন। একে লিখে দিন, জাল দলিল তৈরী করে আদালতে মিথ্যে নালিশ করে তার ডিকরী করে নিন, ব্যস্ কিছুদিনের মধ্যেই আপনার সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এই দেখুন আর একটা চিঠি, লেখা আছে, মেয়ে বড় হয়েছে, যেখানেই যাচ্ছি, সকলের মুখে একটাই কথা মোটা টাকা পণ দিতে হবে। এদিকে পেট চালাবো কি করে তার ঠিকানা নেই, কোনোরকমে ছেলে-পুলে নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে টিকে রয়েছি, তার-ওপর লোক নিন্দায় তো কান-পাতা দায় হয়ে পড়েছে। আপনার মতের অপেক্ষায় রইলাম। একে লিখতে হবে, কোনো পয়সাওলা বয়স্ক শেঠের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিন, দেখবেন পণ তো দিতেই হবে না, উল্টে আপনার পকেটে কিছু আসবে। এখন আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে এদের প্রশ্নের উত্তর কি করে দিতে হবে। উত্তর সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই, খুব বাড়ানো চলবে না। কিছুদিন আপনার একটু কঠিন মনে হবে ঠিকই, তবে আপনি বুদ্ধিমান লোক, খুব তাড়াতাড়িই এ কাজে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। তখন বুঝতে পারবেন যে এর চেয়ে সহজ কাজ আর নেই। আপনার দ্বারা হাজার হাজার লোক উপকৃত হয়ে আজন্ম আপনার সুনাম করবেন।

চার

এখানে এসেছি তা মাসখানেকের উপর হয়ে গেছে, এ সুন্দরী মহিলার সঠিক পরিচয় আমার কাছে রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। তবে আমি কার অধীনস্থ কর্মচারী? অতুল ঐশ্বর্য্য, এত বিলাস-সামগ্রীই বা কোত্থেকে আসছে? যেদিকে তাকাচ্ছি, শুধু ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরই নজরে পড়ছে। এ কোন মোহিনী মায়ার রাজ্যে এলাম রে বাবা! এসব প্রশ্নকর্তাদের সঙ্গে মহিলারই বা কি সম্পর্ক, তাও তো বুঝতে পারছি না। রোজই তার সঙ্গে দেখা হয়, ওর সামনে এলেই আমার কেমন যেন বাহ্য-জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। তার কটাক্ষে তীব্র আকর্ষণ আমার মনকে বারে বারে সেদিকে টেনে নিয়ে যায়। বাক্য রহিত হয়ে আড় চোখে শুধু তাকেই দেখি, কিন্তু তার মুচ্‌কি হাসি, রসাত্মক কথাবার্তা আর কবিত্ব ভাব সব মিলেমিশে প্রেমের বদলে আমার মনে মানসিক অশান্তির ঝড় তুলতো। তার কটাক্ষ বাণ আমার অন্তর যেন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মুক্তি পেতে চাইছে। শিকারী যেমন নিজের শিকারকে খেলাতেই ভালবাসে, সুন্দরীও আমার প্রেম-আতুরতাকে নিয়ে খেলছে! সৌন্দর্য্যের গনগনে তাপে দগ্ধ করা ছাড়া সে আর কিছুই জানে না। আমিও পতঙ্গের মতো সে আগুনে নিজেকে উৎসর্গ করতে অস্থির হয়ে পড়েছি। ইচ্ছে করছে মহিলার পদ্মফুলের মতো সুন্দর পা দুটোকে বুকে চেপে রাখি। কামনা-বাসনা শূন্য উপাসকের ভক্তিতে মনটা আপ্লুত হয়ে পড়েছে।

কখনো কখনো সন্ধ্যেবেলা ঝিলের জলে মোটর-বোটে চেপে ঘুরে বেড়াতেন, দেখে মনে হোত ঠিক জ্যোৎস্নাময়ী চাঁদই হয়তো আকাশের বুকে সাঁতার কাটছে। এ অনুপম সৌন্দর্য্য দেখে আমার মন-প্রাণ কানায় কানায় ভরে উঠতো।

একাজেও বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। রোজই প্রায় এক গোছা চিঠির জবাব দিতে হয়। তবে চিঠিগুলো যে কোন ডাকে আসে তা বলতে পারবো না। খামগুলোর ওপর সীল মারাও থাকে না। পত্রদাতাদের মধ্যে বেশ কিছু লোকের চিঠি পড়লে মনটা শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। জ্ঞানী-পণ্ডিত লেখক, অধ্যাপক, ধনী-জমিদার এমন কি ধর্ম-গুরুরাও নিজেদের রাম-কাহিনী শোনাতে ছাড়েন না। তাদের অবস্থা তো আরও দুঃখজনক। সব এক একটা মুখোশধারী লেজকাটা ভণ্ড রঙ্গীন শেয়াল! যেসব লেখকদের একদিন আমি ভাষার স্তম্ভ বলে মনে করতাম, তাদেরই এখন ঘেন্না করি। সব বেটা ঠগ জোচ্চোর, চুরি করে, অনুবাদ করে নিজের নামে অন্যের লেখা চালিয়ে দিয়ে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাচ্ছে। যে ধর্মাচার্যদের মানুষ দেবতার আসনে বসিয়েছে, তাদের মনের নীচতা, ক্রূরতা, স্বার্থন্ধতা, কামনা-বাসনার দগদগে ক্ষতটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ধীরে ধীরে এটাই অনুভব হোল যে সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত কয়েক লক্ষ শতাব্দী কেটে গেছে, কিন্তু মানুষ এখনো নৃশংস, কামনা-বাসনার হাতে

পুতুল হয়েই রয়েছে। বরং সে সময় মানুষের শিশুর সারল্য ছিল, আজকের দিনের মতো এতো কুটিলতা, জটিলতা, চাতুর্য্য তাদের মধ্যে তখন কোথায়?

একদিন সন্ধ্যেবেলা মহিলা আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমার সুপ্ত দাম্ভিক মনটা ভাবলো, এসো সখী পথে এসো। অত সহজে তোমার কাছে মাথা নোয়াবো বলে ভেবো না। যাই হোক, দামী স্যুট-কোট-টাই পরে তৈরী হয়ে একটু যেন বিরক্ত ভাবেই তার ঘরে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। ভাবখানা এমন দেখাচ্ছি, তুমি আমাকে শিকার ভেবে খেলতে চাইলে, আমিও তোমায় ছেড়ে কথা বলবো না জেনো। শিকারীকে কি করে খেলাতে হয় তা আর আমার অজানা নয়।

আমি আসতেই সুন্দরী মুচ্‌কী হেসে স্বাগত জানালেন তার ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—ম্যাডামের শরীর ভাল তো?

গলায় হতাশার ভাব ফুটিয়ে বলে—না, ভাল নেই, মাসখানেক যাবৎ একটা কঠিন রোগে ধরেছে। এতদিন তো যাহোক করে চলে যাচ্ছিল, এখন দেখছি দিনের পর দিন তা বেড়েই চলেছে। এ রোগের ওষুধ একমাত্র এক নির্দয় ভদ্রলোকের হাতেই আছে। এই রোগ-যন্ত্রণায় প্রতিদিন একইভাবে ছটফট করতে দেখেও তার পাষাণ হৃদয়ে একটুও মায়া হয় না।

কথাটা যে আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইলো না। সারা শরীরে বিদ্যুতের মতো শিহরণ বয়ে গেল। শ্বাস-প্রশ্বাসের বেগও যেন একটু একটু করে বাড়তে থাকে। মনের উত্তাল উন্মত্ততা স্পষ্ট অনুভব করলাম। মনের এভাব গোপন করে বেশ নির্ভীক ভাবেই বললাম—আপনি যাকে নির্দয় বলছেন, সে-ও হয়তো আপনাকে তাই ভাবছে, ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না।

সুন্দরী—তাহলে এ আগুন কেমন করে নিভবে? একটা উপায় আপনাকেই বের করতে হবে। প্রিয়তম! আমার সারা অন্তর জুড়ে বিরহের জ্বালা, তুষের আগুনের মতো অবিরাম ধিকি-ধিকি করে জ্বলছে। আর সহ্য করতে পারছি না। এই যে কোষাগার দেখছেন, কখনো খালি থাকে না। আপনার একটু কৃপা পেলেই আপনাকে খ্যাতি-যশ-মান-সম্মানের চূড়ান্ত শীর্ষে পৌছে দেব। এ রাজ্য আপনার চরণে সমর্পণ করে নতজানু হয়ে ভিক্ষে চাইছি, নিরাশ করবেন না। রাজা-ধিরাজরাও নির্দ্বিধায় আমার আজ্ঞা পালন করেন। এক মুহূর্তে মানুষের আবেগকে মূর্ত করে ফুটিয়ে তোলার মন্ত্র ও আমার অজানা নয়। এসো হৃদয়েশ্বর, আমার এ অসহ্য দহনকে তোমার প্রেমবারি সিঞ্চনে শীতল করে দাও।

সে সময়ে মহিলার চেহারাতে একটা জ্বলন্ত আগুনের আভা ছড়িয়েছিল। কামোন্মত্ত হয়ে হাত দুটোকে সামনে বাড়িয়ে আমাকে ধরতে এলো। চোখ দুটো থেকে যেন

আগুনের ফুল্‌কি ঝরছে। পারদ যেমন আগুনের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, আমিও ঠিক তেমনি এক পা এক পা করে পিছু হটে গেলাম। কপর্দকহীন লোক যেমন কারোর হাতে সোনার তাল দেখলে আঁৎকে ওঠে, ওর প্রেম আতুরতায় আমিও তেমনি করে ভয় পেয়ে গেলাম। অজানা-আশঙ্কায় সারাটা শরীর যেন দুলতে থাকে। ক্ষুধার্ত সিংহীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে সে যেমন হিংস্র হয়ে ওঠে, ও ঠিক তেমনি করেই আগুন-ঝরা চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর রাগে গরগর করতে করতে বলে—অকারণ ভীরুতা আমি পছন্দ করি না।

আমি—আমি আপনার দীন সেবক ম্যাডাম, আপনার মত মহীয়সীর ভালবাসার যোগ্য নই।

মহিলা—বুঝেছি, আপনি আমায় ঘৃণা করেন তাই না?

আমি—এ আপনি কি বলছেন? আপনার পদ-চুম্বনের যোগ্যতা কি আমার আছে! আপনি প্রদীপ, আর আমি তো ক্ষুদ্র পতঙ্গ মাত্র! এটাই আমার কাছে অনেক!

মহিলা রাগে-হতাশায় বসে পড়ে, তারপর বলে—আপনার মত নির্দয় দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। শিক্ষিতের অহঙ্কারে আপনার মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কলুষিত, পুঁথিগত নীতি কথার বেড়িতে পা দুটো শক্ত করে বাঁধা।

তাড়াতাড়ি সেখান থেকে নিজের ঘরে এসে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে মনের অস্থির ভাবটা কেটে যেতেই ভাবলাম, কোনো অদৃশ্য শক্তিই আমাকে এ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে, নয়তো যে আগ্রাসী খিদে নিয়ে ঐ গভীর অগ্নিকুণ্ড আমাকে গ্রাস করতে চেয়েছিল সেখান থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। কি সে গোপন শক্তি?

পাঁচ

আমার ঘরের সামনেই একটা ঝিল, তার ওপারেই একটা ছোট্ট ঝুপড়ী ছিল। ওখানে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক থাকতেন। সারা দেহে বার্ধক্যের ছাপ সুস্পষ্ট, কোমর সামনের দিকে ঝুকে পড়লে কি হবে, চেহারায় সব সময় একটা তেজ-দীপ্ত ভাব ছড়িয়ে থাকতো। কখনো কখনো এ মহলেও তিনি আসতেন। তাঁকে দেখলেই মহিলা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিত, হয়তো বা কিছুটা ভয়ও পেতো, মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যেত, তক্ষুনি সেখান থেকে অন্য কোথাও গিয়ে নিজেকে এ নিদারুণ লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে দ্বিধা করতো না। তার অবস্থা দেখে ব্যাপারটা জানতে ইচ্ছে করতো। বেশ কয়েকবার বিষয়টা নিয়ে মহিলার সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছি, কিন্তু খুব অপমানিত হবার ভাব দেখিয়ে আমাকে বৃদ্ধের কাছ থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিল। তাঁর সঙ্গে কথা

বলতে দেখলেই ওর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হোত, তবু আমার কাছে কোনোদিন খুলে কিছু বলে নি।

এলোমেলো ভাবনা-চিন্তায় সে রাতে আমার অনেকক্ষণ ঘুমই এলো না। এক এক বার মনে হচ্ছে দুনিয়ায় যখন এসেছি, তখন সব রকম সুখ ভোগ করে নিজেকে তৃপ্ত করতে দোষ কি! ভবিষ্যতের চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। চোখ-কান বুজে এ মহার্ঘ প্রেম-সুধা পান করবো, এ সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। পরক্ষণেই মনটা ঘৃণায় বিষিয়ে উঠলো।

রাত দশটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। হঠাৎ আমার ঘরের দরজাটা আপনিই খুলে গেল, দেখি সেই তেজস্বী বৃদ্ধ ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছেন। মালিকের ভয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক সব সময় এড়িয়েই চলতাম, আড়াল থেকে তার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো প্রশান্ত-পবিত্র স্নেহময় ভাব দেখে একটু সঙ্গলাভের আশায় মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠতো। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে একটা চেয়ার এগিয়ে বসতে দিলাম। সহৃদয় ভাবে আমাকে বললেন—এভাবে এতরাতে তোমার ঘরে এসেছি বলে কিছু মনে করনি তো?

তাঁকে প্রণাম করে উত্তর দিলাম—আপনার মতো পুন্যবানের দর্শন পেয়ে আজ আমি ধন্য। তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে শুরু করলেন :—

শোনো, খুব সাবধান, এখানে যে আমি এসেছি একথা যেন কেউ ঘুনাক্ষরেও না জানতে পারে। তোমার সামনে খুব বিপদ, তাই সতর্ক করে দিতে এসেছি। তোমাকে এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে, এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। আমার কথা না শুনলে সারা জীবন কষ্ট পেতে হবে, এ মায়াবিনীর মায়া জাল থেকে কোনোদিন মুক্তি পাবে না। ঐ তো দেখছো আমার ঘর, ওটাই আমার আস্তানা। তবু মাঝে মধ্যে এখানে আমাকে আসতে হয়, দেখেছো নিশ্চয়ই। প্রথম দিনই যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা করার সুযোগ হোত তাহলে হয়তো এতগুলো নিরপরাধ লোকের সর্বনাশ করার অপরাধের হাত থেকে বেঁচে যেতে। যাই হোক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, যে আজ তুমি তোমার পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলেই রক্ষা পেয়েছো। এ পিশাচিনী একবার যাকে প্রেমালিঙ্গন করে তক্ষুনি তাকে ওর আজব চিড়িয়াখানায় যেতে হয়। তোমার আগে যারাই এখানে এসেছে তাদের প্রত্যেকেরই এ হাল হয়েছে। এটাই ওর ভালবাসার রীতি। চলো, ওর চিড়িয়াখানাটা একবার ঘুরে এলেই বুঝতে পারবে আজ তুমি কি বিপদের হাত থেকেই না রক্ষা পেয়েছো।

এ কথা বলেই তিনি দেওয়ালের গায়ে বসানো একটা বোতাম টিপতেই একটা দরজা খুলে গেলো। নীচে নামবার সিঁড়ি দিয়ে তিনি নামতে শুরু করলেন, সেই সঙ্গে আমাকেও নামতে বললেন। সামনে গভীর অন্ধকার, কয়েক পা যেতেই একটা বিশাল

হলঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভেতরে মিট-মিট করে একটা প্রদীপ জ্বলছে। সেদিনের সেই আবছা-আলোয় যে সাংঘাতিক, বীভৎস, হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখেছিলাম, ভাবলে আজও আমার গায়ে কাঁটা দেয়।

ইটালির অমর কবি দান্তে নরকের যে চিত্র অঙ্কন করেছিলেন বোধহয় তার চেয়েও ভয়াবহ, লোমহর্ষক নারকীয় দৃশ্য আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো। বিচিত্র দেহধারী অসংখ্য আজব মানুষ মাটিতে শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে। তাদের দেহটা মানুষের মতো হলেও মাথাটা অন্য পশুতে রূপান্তরিত হয়েছে। কারো মাথা কুকুরের, কারোটা শকুনের কারোর বা বন-বিড়ালের, কেউ কেউ আবার সাপের মাথা নিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। এক জায়গায় একটা বিকৃত-স্থূল লোক অন্য একজন রুগ্ন-নিস্তেজ লোকের গলায় মুখ লাগিয়ে রক্ত চুষে খাচ্ছে। আর এক জায়গায় দুটো শকুনের মতো মাথাওয়ালা লোক একটা পচা-গলা মৃতদেহকে খুব্‌লে খুব্‌লে খাচ্ছে। তার অনতি দূরেই একটা অজগরের মতো চেহারার লোক একটা বাচ্চা ছেলেকে গিলতে চাইছে, কিন্তু ছেলেটা ওর গলার কাছে গিয়েই আটকে গেছে। দুজনেই মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। আর এক জায়গায় একটা জঘন্য পৈশাচিক দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলাম। দুটো সাপের আকৃতি মহিলা একটা ভেড়ার মতো চেহারার লোককে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে অনবরত ছোবল মেরে যাচ্ছে লোকটা অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। আর থাকতে পারলাম না। ছুটে ওখান থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে এসে হাঁপাতে শুরু করলাম। মহাপুরুষের মত আমার উদ্ধার কর্তা বৃদ্ধও আমার পেছন পেছন এলেন। আমি একটু শান্ত হতেই তিনি বললেন—এটুকু দেখেই ভয় পেয়ে গেলে! এখনো তো এ রহস্যের এক ভাগও দেখা হয় নি, তাতেই এ অবস্থা! তোমার মহীয়সী প্রভুর এটাই বিহার-স্থান, এরাই ওর পালিত পশু। জন্তুগুলোর পৈশাচিক অভিনয় দেখে ও বিশেষ আনন্দ পায়। আজ যাদের দেখলে, তাদের সবাইকে ও নিজের কাম-চরিতার্থের প্রমোদ পাত্র করে নিয়ে ছিল। ওর বিষাক্ত প্রেমেই ওদের এ চরম পরিণতি। তুমি আর বিলম্ব না করে এক্ষুনি পালিয়ে চলে যাও, এ আমার আদেশও বলতে পার। নয়তো আর একবার মায়াবিনীর কবলে পড়লে তোমারও ঐ একই অবস্থা হবে জেনে রেখো। এখানে থাকলে ওর হাত থেকে তুমি কিছুতেই রেহাই পাবে না।

এই কথা বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বাক্সটা হাতে নিয়ে অন্ধকার গভীর রাত্রে চোরের মতো পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। ঝির-ঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। সামনের ঝিলের জলে তারাগুলো মুঠো মুঠো সোনালি চুম্‌কি ছড়িয়ে দিয়েছে। মেহেদীর সুগন্ধে দেহে-মনে মত্ততা অনুভব হচ্ছে। এ অতুল বৈভব ছেড়ে যেতে মন চায় না, কিন্তু যেতেই হবে। বৃদ্ধের উপদেশ শোনার পর থেকেই

মনটা যেন আরো বেশী করে মহিলাকে কাছে পেতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। বেশ কয়েক বার কিছুটা গিয়ে আবার ফিরে এলাম। শেষে পরাক্রান্ত মনেরই জয় হোল, লোভ রিপুকে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়ে 'চরৈবেতি' মন্ত্রকে অনুসরণ করতে শুরু করলো। সোজা পথ ছেড়ে ঝিলের পাড় ধরে হাটতে শুরু করলাম। কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত কাদা মাখা পায়ে বড় রাস্তায় উঠে এসে মুক্তির আনন্দে মনটা ভরে উঠলো। শিকারী বাজের নিষ্ঠুর থাবা থেকে যেন কোনো ছোট্ট পাখী প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে।

একমাস পর ফিরে এসে দেখি নিজের সেই পুরোনো তক্তপোষটাতেই পড়ে আছি। ঘরে ধূলো-ঝুল কিছু নেই। লোকের কাছে ঘটনাটা বলতেই সবাই হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লো, বন্ধুরা তো আমাকে এখনো প্রাইভেট সেক্রেটারী বলে ঠাট্টা করে। সবাই বলে, আমি নাকি মিনিট খানেকের জন্য ঘরের বাইরেই যাই না, সেই আমি কি করে মাসাবধি উধাও হয়ে যাবো? এ কেবল কথার কথা। তাই আমিও অগত্যা নিরাশ হয়ে বলি, হয়তো স্বপ্নই হবে! যাই হোক, এ পাপকুণ্ড থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য পরম করুণাময়কে অজস্র ধন্যবাদ। স্বপ্ন-টপ্ন যাই হোক না কেন, আমার কাছে তা জীবনের এক বাস্তব অনুভব, কেন-না এটা আমার চোখ খুলে দিয়েছে।

ডিক্রীর টাকা

পশু আর পাখির মধ্যে যেমন আকৃতি ও প্রকৃতি গত তফাৎ, তেমনি নঈম আর কৈলাসের মধ্যেও শারীরিক মানসিক ও নৈতিক দিকের তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। নঈম দীর্ঘকায় বৃক্ষ আর কৈলাস যেন বাগানের চারাগাছ। নঈম ক্রিকেট ও ফুটবলে আর ভ্রমণ ও শিকারে পটু, কৈলাস কিন্তু বইয়ের পোকা। নঈম তামাসা প্রিয়, বাক্‌পটু, নির্দ্বন্দ্ব, হাস্যরসিক, বিলাসী যুবক। কোন চিন্তাই তাকে দমাতে পারে না। বিদ্যালয় তার কাছে খেলা-ধূলার জায়গা। তাই বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে তার বেশ মজা লাগে, অন্য দিকে কৈলাস একান্তপ্রিয়, অলস প্রকৃতির খেলা ধূলায় বিমুখ, আমোদ-প্রমোদে অনাগ্রহী, চিন্তাশীল ও আদর্শবাদী ব্যক্তি। ভবিষ্যৎ চিন্তায় সে সব সময় থাকে ডুবে।

নঈম সুসম্পন্ন ও উচ্চ পদাধিকারী পিতার একমাত্র পুত্র। কৈলাস অতি সাধারণ ব্যবসায়ীর পুত্রদের মধ্যে একজন। বই কেনার টাকা না পাওয়ায় অপরের বই চেয়ে নিয়ে পড়ে। তাই, একজনের জীবন আনন্দময় আর অপর জনের দুঃখে ভরা। এত

তফাৎ থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা। কৈলাস নঈমের কাছে কোন সময়েই অনুগ্রহের পাত্র নয়। আবার নঈম মরে গেলেও কৈলাসকে বিরক্ত করে না। নঈমের জন্যেই কৈলাস মাঝে মাঝে আনন্দ উপভোগ করতে পারে। তাই, কৈলাস মনে মনে ভাবে—নঈম প্রচুর সম্পত্তির মালিক হবে। তাই, তার ভবিষ্যৎ ভালই বলে মনে হয়। অন্যদিকে সে নিজে অতি সাধারণ পরিবারে জন্মেছে. সারা জীবনই কষ্ট করতে হবে, যেন সংগ্রামের জন্যেই সে এ পৃথিবীতে এসেছে। ভবিষ্যতে কী হবে কে জানে।

দুই

কলেজ পরীক্ষায় নঈম তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং শাসন বিভাগের একটি উচ্চ পদে চাকরি পেয়েছে, কিন্তু কৈলাস উক্ত পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে অনেক চেষ্টা, অনেক দৌড়-ঝাঁপ করেও শেষ পর্যন্ত একটা চাকরিও পেল না। অবশেষে নিরাশ হয়ে লেখালেখির কাজ শুরু করে দেয় এবং একটা পত্রিকা বের করে। অর্থ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মান-সম্মান এবং প্রতিপত্তি লাভ হবে, এই আশা নিয়েই সে এই কাজে নেমেছে।

নঈম অফিসের কাজে বেশ পটু। বাংলোয় থাকে, গাড়ী চেপে হাওয়া খায়, থিয়েটার দেখে এবং গ্রীষ্মের দিনে হাওয়া পরিবর্তনের জন্যে নৈনীতালে বেড়াতে যায়। অন্যদিকে কৈলাস সংসারে জড়িয়ে পড়েছে। মাটির ঘর, গাড়ী না থাকায় পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করে। বাচ্চাদের দুধের পয়সাও জোটাতে পারে না। শাক-ভাত জোটাতেই হিম-শিম খায়। নঈমের সৌভাগ্যে তার একটি মাত্র ছেলে, আর কৈলাসের দুর্ভাগ্য বলে অনেক গুলি সন্তানের পিতা হয়েছে।

বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে পত্র আদান-প্রদান চলে। মাঝে মাঝে তাদের দেখাও হয়। নঈম বলে—বেশ আছো, দেশ ও জাতির সেবা করে চলেছো। আমি তো পেট পুজো করা ছাড়া আর অন্য কোন কাজেই লাগলাম না। শুধু "পেট পুজোর" জন্যেই এতদিন এত কিছু করে এলাম। জীবনে কী বা আর করতে পারলাম, বলো?

কৈলাস নঈমের কথা শুনে মনে করে—এটা তার বিনয়-ভাব নয়। আমার দৈন-দশা দেখে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই এমন উক্তি করছে। তার ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ গোপন করাই তার উদ্দেশ্য।

বিষ্ণুপুর একটি দেশীয় রাজ্য। রাজ এষ্টেটের ম্যানেজার থাকতেন একটা বাংলোয়। একদিন শত খানেক লোক বাংলোতে চড়াও হয়ে দিন-দুপুরে ম্যানেজারকে খুন করে দিয়ে যায়। খুনী ধরা পড়ে নি, কিন্তু রাজকর্মচারীদের সন্দেহ—নাবালক রাজকুমারের

চেষ্টাতেই এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে। ম্যানেজার রাজকুমারকে দেখাশোনা করতেন। বিলাসপ্রিয় নাবালক রাজকুমার কিন্তু ম্যানেজারের কাজে মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। সেই কারণে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হতো। বছর খানেক ম্যানেজারের সঙ্গে রাজকুমারের ঝগড়া চরম আকার ধারণ করে। তাই ম্যানেজারের হত্যার পিছনে যে রাজকুমার আছে, তা সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধানের জন্যে জেলার হাকিম মির্জা নঈমকে ভার দিলেন। পুলিশ দিয়ে অনুসন্ধান চালালে রাজকুমারের সম্মান হানি হতে পারে, সেটা হাকিম ভালই বুঝে ছিলেন।

অনুসন্ধানের ভার পেয়ে নঈম ভাবে—এটা একটা স্বর্ণ সুযোগ। কারণ, সে ত্যাগীও নয়, আবার জ্ঞানীও নয় তার চারিত্রিক দুর্বলতা সম্বন্ধে শাসন বিভাগের লোকেরা বিশেষ ভাবে পরিচিত। রাজকুমারও যেন হাতে চাঁদ পায়। নঈম বিষ্ণুপুর এলে রাজকুমার তার অসাধারণ আদর-আপ্যায়ণ ও যত্ন করে। রাজবাড়ীর আর্দালী, চাপরাসী, পেশকার, সহিস, রাঁধুনি, চাকর, সবার যেন আনন্দের দিন, তারা যেন উৎসবে মেতে উঠেছে। তাই, রাজকুমারের লোকেরা দিনরাত নঈমকে ঘিরে রেখেছে, কোন ত্রুটি হতে দেয় না. যেন জামাই শ্বশুর বাড়ী এসেছে।

একদিন সকালে রাজমাতা অর্থাৎ রাজকুমারের মা নঈমের কাছে এসে জোড় হাত করে দাঁড়ান। নঈম তখন তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ধূমপানে ব্যস্ত। তপস্যা, সংযম আর বৈধব্যের তেজস্বিনী সেই অপূর্ব সুন্দর নারী মূর্তি দেখে সে উঠে বসে।

রাণীমা বাৎসল্য পূর্ণ নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—হুঁজুর, আমার একমাত্র ছেলের জীবন-মরণ আপনার হাতেই নির্ভর করছে। আপনিই তার ভাগ্য বিধাতা। আপনি আপনার মায়ের সুযোগ্য পুত্র হয়ে আমার সন্তানকে আশা করি রক্ষা করবেন। আমি আমার মন, প্রাণ ও সম্পদ আপনার চরণে অর্পণ করে দিতে চাই, শুধু আমার ছেলেকে আপনি বাঁচান।

রাণীমার অনুনয় মিশ্রিত কথা ও স্বার্থের প্রলোভনে তদন্তকারী নঈম মুহূর্তের মধ্যে বশীভূত হয়ে যায়।

তিন

সেই দিনই কৈলাস নঈমের সঙ্গে দেখা করতে যায়। অনেকদিন পর দেখা হওয়ায় বন্ধুদ্বয় বড় খুশী হয়। কথা প্রসঙ্গে নঈম খুনের সমস্ত ঘটনা বলে এবং তার বক্তব্য সম্বন্ধে কৈলাসের পরামর্শ চায়।

কৈলাশ বলে—আমি মনে করি পাপকে যে ভাবেই ঢাকা দেওয়া হোক না কেন, সে সব সময়ের জন্যে পাপ হয়েই থাকে, সে প্রকাশ পাবেই।

নঈম—আমার মতে যুক্তি দিয়ে যদি কারোর দোষ ঢেকে দেওয়া যায়, তাহলে সেটা উচিত কাজই হবে। রাজকুমার এখনও নাবালক। সে কিশোর, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বুদ্ধিমান, উদার এবং সহৃদয়! আমার বিশ্বাস, তুমি তার সঙ্গে পরিচয় করে নিশ্চয়ই খুশী হবে। সভাবটা তার বড় নম্র। ম্যানেজার ছিল একটা শয়তান। সব সময় রাজকুমারকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। জানো, একটা মোটর গাড়ী কেনার জন্যে তদ্বির তো করেই নি, উপরন্তু টাকাগুলো আত্মসাৎ করে। আমি অবশ্য বলছি না রাজকুমার কাজটা ভাল করেছে, তবে, তর্কের খাতিরে বলতে হয় এই সময় তাকে বিপদে না ফেলে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারলে তার প্রাণটা রক্ষা হয়। তোমার কাছে আমি কিছু গোপন করছি না। দেখো, আমি যদি রিপোর্টে তাকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করে দিতে পারি, তাহলে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার পাবো। আমাকে শুধু লিখতে হবে, ঘটনাটা ম্যানেজারের ব্যক্তিগত ব্যাপার, এর সঙ্গে রাজকুমারের কোন সম্পর্ক নেই। সাক্ষী-সবুদে যা পেয়েছি, সব গায়েব করে দেওয়া যাবে। ম্যাজিস্ট্রেট আগে থেকেই স্থির করেছিলেন যে, এই খুনের তদন্ত কোন হিন্দুকে দেওয়া হবে না, কেননা, রাজকুমার হিন্দু। তাই অফিসাররা সুনিশ্চিতভাবেই আমার ওপর এই তদন্তের ভার অর্পণ করেছেন। এতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। জানো, আগে দু'চারটে ঘটনায় আমি ইচ্ছাকৃত মুসলমানের পক্ষে পক্ষপাত-দুষ্ট হওয়ায়, ওপর মহলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আমি হিন্দুদের একজন কট্টর শত্রু। আর অন্য দিকে হিন্দুরাও আমাকে পক্ষপাতের পুতুল বলে মনে করে। এটা আমার জীবনে একটা আক্ষেপও বলতে পারো। এবার বলো, আমি কী ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি?

কৈলাস—আর আসল ঘটনা যদি ফাঁস হয়ে যায়?

নঈম—তাহলে বুঝবো কপালের ফের, আমার তদন্তের ত্রুটি, এবং তখনই বুঝবো মানব-প্রকৃতির এটা একটা অটল নিয়মের উজ্জ্বল উদাহরণ। আমি তো আর সর্বজ্ঞ নই। অবশ্য আমি ভাগ্যের কথা মানি না এবং আমার এই ঘুঁসের সম্বন্ধেও কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। তুমি ভাই এর ব্যবহারিক দিকটায় যেও না, কেবল নৈতিক দিকে তাকাও এবং বলো, এ কাজটা নীতির অনুকূল হবে কি না? আধ্যাত্মিক দিকে না গিয়ে নীতির দিকটা একটা বিবেচনা করো, কিন্তু।

কৈলাস—এর অনিবার্য ফল দাঁড়াবে এই যে, পয়সাওয়ালা লোক এই ধরণের দুষ্কর্ম করতে দ্বিধা করবে না। অর্থের বলে তারা পাপকে সহজেই ঢেকে দিতে পারবে। সেটা যে কী বিষময় ও ভয়ঙ্কর ফল দাঁড়াবে, তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারো।

নঈম—নানা, আমি সেরকম কিছু অনুমান করতে পারছি না। কেননা, মানুষ মাত্রই তো পাপের ভয় করে।

তারপর দুই বন্ধুর মধ্যে অনেকক্ষণ তর্ক-বিতর্ক চলে, কিন্তু কৈলাসের ন্যায় বিচারের যুক্তিকে নঈম মন থেকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না।

চার

বিষ্ণুপুরের খুনের বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রে যথেষ্ট আলোচনা চলে। প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রেই একই বক্তব্য—সরকার ম্যানেজার সাহেবকে দোষারোপ করে রাজকুমারকে রক্ষা করতে চাইছেন, এটা পক্ষপাত ছাড়া আর কিছুই নয়। যাই হোক, মামলাটা যখন বিচারাধীন, তখন রায় বের হওয়ার আগে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করাই ভাল।

মির্জা নঈম ওদিকে তদন্ত করে প্রায় মাস খানেক পর রিপোর্ট দেয়। রিপোর্টটা প্রকাশিত হলে রাজনৈতিক মহলে সাড়া পড়ে যায়। কেননা, জনগন যা সন্দেহ করেছিল, তাই হলো।

কৈলাসের সামনে এলো জটিল সমস্যা। এতদিন পর্যন্ত এ ব্যাপারে সে মৌণ ছিল। কারণ, তার চিন্তা কী লিখবে? সরকারের পক্ষ নিলে অন্তরাত্মাকে পদদলিত করা হয় এবং আত্মস্বাতন্ত্র্যের বলিদানও বটে। আবার মৌণ থাকাটাও অপমানজনক। অবশেষে সহকর্মীদের অনুরোধে এবং তাদের মন্তব্য শুনে শেষ পর্যন্ত মৌণ থাকতে পারলো না। ভাবলো, সাংবাদিক হিসাবে তার একটা জাতীয় কর্ত্তব্য রয়েছে। সেই বন্ধুত্ব, যা পচিশ বছর আগে অঙ্কুরিত হয়েছিল, এখন সেটি বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। সেই বন্ধু, যে তার দুঃখে দুঃখী, ও সুখে সুখী ছিল, যার উদার হৃদয় তাকে সাহায্য করার জন্যে সব সময় এগিয়ে আসতো, যার ঘর তার নিজের ঘর বলে মনে হতো, যার প্রেমালিঙ্গনে তার সমস্ত কষ্ট দূর করে দিতো, যাকে দেখা মাত্র আশার আলো দেখতে পেতো, মনোবল বেড়ে যেতো, সেই বন্ধুকে কি ধরাশায়ী করা চলে? তাই, মনে মনে বলে—সম্পাদকের জন্ম মুহূর্তটা হয়তো শুভ ছিল না, না হলে আজ এমন সঙ্কটে পড়তে হয়? বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না কি? কেননা, বিশ্বাসই তো হলো বন্ধুত্বের মুখ্য অঙ্গ। নঈম তাকে একমাত্র বিশ্বাসের পাত্র বলে জেনেছে, তাই কখনো দূরে সরিয়ে রাখে নি। সেই গুপ্তরহস্য যদি আজ প্রকাশ করে দেওয়া হয়, তাহলে কি ঘোর অন্যায় করা হবে না? নানা, আমি বন্ধুত্বকে কলঙ্কিত করতে চাই না, তার সম্মানে আঘাত দেওয়া ভাল হবে না, বন্ধুত্বের মাথায় বজ্রাঘাত আনা মহাপাপ। ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা, নঈমের যেন আমি কখনো ক্ষতি না করি। আমি জানি, আমার বিপদে নঈম ঝাঁপিয়ে পড়বে, প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। সেই বন্ধুকে দেশবাসীর সামনে অপমান করবো? জেলে পাঠাবো? ভগবান যেন আমাকে সেরকম বুদ্ধি না দেন।

অন্যদিকে জাতীয় কর্ত্তব্য বলেও কিছু আছে। পত্রিকার সম্পাদক হলে, সমগ্র

জাতির প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। তাই সব কিছুকে সামগ্রীক ভাবেই বিচার করতে হবে। কেননা, সম্পাদকের লেখনী থেকে বেরিয়ে আসে দেশবাসীর বক্তব্য। সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের কোন স্থান নেই। সেখানে ব্যক্তি হয়ে যায় ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, নগণ্য। ব্যক্তিকে তখন জাতির স্বার্থে বলিদান দিতে হয়। সেটাই হলো মনুষ্যত্বের প্রকৃত প্রকাশ। সম্পাদক হলে সব সময় জাতির মঙ্গল ও অমঙ্গলের কথা চিন্তা করতে হয়, তা না হলে দেশসেবায় সম্পাদকের ভূমিকা তুচ্ছ হয়ে যাবে। দেশের কথা, দশের কথা, সর্বোপরি রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করাই হলো পত্রিকা সম্পাদকের ধ্যান ও জ্ঞান, দেশ ও জাতির মুখে কালিমা লেপন যাতে না হয়, সে দিকটাও লক্ষ্য রাখতে হবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কৈলাসের যথেষ্ট সুনাম। তার মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচার অত্যন্ত নির্ভীক, মন্তব্য পক্ষপাত হীণ। তাই, পত্রিকা সম্পাদক মণ্ডলী তাকে নেতা নির্বাচিত করেছেন। অতএব বন্ধুত্বের ওপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে নীতি ও আদর্শের ওপরই তার জোর দেওয়া উচিত। মান সম্মান, ভীরুতা, কর্তব্য, দেশসেবা এ সব বিবেচনা করে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি কেন, নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও দেশের কাছে তাকে তুচ্ছ মনে করতে হবে। নঈমের ব্যক্তিগত ক্ষতি হলে দেশের কিছুই এসে যাবে না। তাই দেশের শাসন ব্যবস্থা ও ন্যায় নীতির কথাই ভেবে তাকে কাজে নামতে হবে।

কৈলাস কোনদিন ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির কথা চিন্তা করে না। তার বলিষ্ঠ লেখা দেশের শাসন ব্যবস্থাকেও কাঁপিয়ে দিতে পারে, এমন কি বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। সে জানে, তার নিরপেক্ষ মন্তব্য প্রকাশিত হলে দেশে হৈ-চৈ পড়বেই। সে মনে করে নঈম তার বন্ধু হলেও দেশ হলো তার কাছে ইষ্ট। তাই বন্ধুকে রক্ষা করতে গিয়ে কি ইষ্টের প্রাণঘাতক হবে?

সম্পাদকের কর্তব্য বিষয়ে কৈলাসের মনে বেশ কিছুদিন দ্বন্দ্ব চলে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়—রহস্যের যথার্থ স্বরূপ উদঘাটন করতেই হবে। শাসনের অনুত্তোর দায়িত্বকে জনতার সামনে প্রকাশ করে এবং শাসন বিভাগের কর্মীদের স্বার্থ লোলুপতার নমুনা জনগণের সামনে তুলে ধরে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, সরকার চোখ ও কান বন্ধ করে বসে আছেন। তাঁর অক্ষমতা, অযোগ্যতা ও দুর্বলতা প্রমান করতে আর কী-বা প্রয়োজন? নঈম আমার বন্ধু হতে পারে, কিন্তু সমগ্র জাতির কাছে সে কে? তার ক্ষতি হবে ভেবে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য থেকে বিমুখ হলে তো চলবে না? নিজের আত্মাকে কেন কলঙ্কিত করবো?

আহা! নঈম আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়! বন্ধু, কর্তব্যের খাতিরে আজ তোমাকে আমি কাঠগড়ায় তুলতে চলেছি, আমাকে ক্ষমা করো। দেখো, তুমি না

হয়ে যদি আমার ছেলেও হতো, তাহলে তাকেও আমি সেই চোখেও দেখতাম।

পরের দিন থেকেই কৈলাস খুনের ঘটনার বিবরণ লিখতে সুরু করে। নঈমের মুখ থেকে যা শুনেছে- তাই ধারাবাহিক ভাবে লিখে যায়। তাই কাজটা "ঘর ভেদী বিভীষণের মত" দাঁড়ায়। অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদকেরা সম্পাদকীয় কলমে অনুমান, যুক্তি, তর্ক এবং নিজস্ব মতামতের উপর ভিত্তি করে লিখেছেন, কিন্তু কৈলাস তার সম্পাদকীয় কলমে দ্বিধাহীন ভাষায়, বলিষ্ঠ যুক্তি ও বীরোচিত ভাবে যেসব লিখে মন্তব্য প্রকাশ করছে, তা দেখে সকলেই অবাক হয়ে যায় এবং তাদের কৌতুহলও বাড়ে। অন্যান্য পত্রিকার বিষয়-বস্তু অপেক্ষা বিবরণ বেশী, কিন্তু কৈলাসের বিবরণ কম, বিষয়-বস্তু যেন সঠিক।

কৈলাস নঈমকে ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয়। তাই তার স্বার্থ ও লোভের কথা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করে দিতে চায়। এমন কি কত টাকা ঘুঁস, তাও প্রকাশ করেছে। সবচেয়ে মজার কথা কৈলাস নঈমকে দেশের গুপ্তচর বলেও আখ্যা দিয়েছে। শেষে সরকারকেও চ্যালেঞ্জ দেয়। শুধু তাই নয়, নঈমের সঙ্গে তার কথাবার্তাটিও অবিকল তুলে দেয়। যেমন—রাণীমা নঈমের কাঁছে এসে তার হাত দুটো ধরেছেন। রাজকুমার উপহার এনে দিয়েছে, ইত্যাদি।

কৈলাসের লেখা আড়োলন সৃষ্টি করে। নানা জায়গায় সভা-সমিতি হয়, আলোচনা চলে। অবশেষে সরকারী অফিসারগণ নিজেদের মানসম্মান বজায় রাখার জন্যে মির্জা নঈমকে কৈলাসের বিরুদ্ধে মান-হানির মামলা করতে পরামর্শ দেন।

পাঁচ

কৈলাসের নামে আদালতের শমন জারী হলো। মির্জা নঈমের পক্ষে ওকালতি করছেন সরকার স্বয়ং। কৈলাস কিন্তু নিজেই নিজের ওকালতি করছে। কেননা, উকিল বা ব্যারিস্টার কেউ কোন অজ্ঞাত কারণে তার পক্ষে যেতে রাজী হন নি। অবশেষে বিচারকের পরামর্শেই কৈলাস নিজের ওকালতির ভার নিজেই নেয়। মামলাটা মাস খানেক ধরে চলছে। ফলে জনগণের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে চলে। শুনানীর দিন হাজার হাজার লোক আদালতে হাজির হন। এমন কি মামলার ঘটনা জানার জন্য পত্রিকাও লুট হতে থাকে। দু'গুণ বা তিনগুণ দাম দিয়েও পাঠক পত্রিকা কিনে পড়ে। মামলা বিষয়ে মতামত জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে পত্রিকায় পাঠকদের চিঠি-পত্র প্রকাশিত হয়।

ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, আনাচে-কানাচে নঈমের সুনাম যথেষ্ট, তাই তখনো পর্যন্ত নঈমকে হেয় করা যায় নি। আদালতে দুই বন্ধুর মধ্যে যেদিন শুনানী ও বাক-বিতণ্ডা চলে, সেই দিনটি জনগণের কাছে একটি স্মরণীয় দিন বলেই মনে হয়। কৈলাস

সেদিন নঈমের সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক প্রশ্ন করে, যেন নঈমের অগ্নি-পরীক্ষা। নঈম অবশ্য তার মাঝেই হাসবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বেচারী কৈলাসের কী অবস্থা! তার মনের খবর কে আর বুঝবে!

কৈলাস জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা, তুমি আমার সহপাঠী এটা তো স্বীকার করো?

নঈম—হ্যাঁ, স্বীকার করছি।

কৈলাস—আমাদের দু'জনের মধ্যে কত ঘনিষ্ঠতা ছিল, তা তোমার মনে আছে?

নঈম—হ্যাঁ, আছে।

কৈলাস—তুমি যখন তদন্ত করছিলে তখন আমার সঙ্গে তোমার কথাবার্তা হয়। সেটাও স্বীকার করো তো?

নঈম—হ্যাঁ, স্বীকার করছি।

কৈলাস—রাজকুমারের ষড়যন্ত্রে এই খুন হয়েছে তুমি বলো নি?

নঈম—না, কখনোই না।

কৈলাস—আচ্ছা, তুমি একথা বলো নি যে বিশ হাজার টাকা ঘুস মিলবে?

নঈম বিন্দুমাত্র সংকুচিত হয় না। কোনরূপ বিরক্তি ভাবও প্রকাশ করে না। সে যেন অচল-অনড়। মুখে কোন অশান্তি বা অস্থিরতার চিহ্নই দেখা যায় না অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে। কৈলাস কিন্তু প্রশ্নটা করে ভয় পেয়ে যায়। প্রথমে ভেবেছিল নঈম তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না। নঈম কিন্তু নিঃসংকোচে বলে—মনে হচ্ছে, তুমি স্বপ্ন দেখে উঠে আমাকে এ সব প্রশ্ন করছো।

নঈমের কথা শুনে কৈলাস স্তব্ধ হয়ে যায়। বিস্ময়ে নঈমের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—তুমি কি একথা বলো নি যে, দু-চারবার মুসলমানদের ওপর পক্ষপাত করায় তোমাকে হিন্দু বিরোধী মনে করে ঐ তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে?

নঈম তখনো অবিচল। ধীর ও শান্ত স্বরে বলে—তোমার কল্পনা শক্তি অসাধারণ দেখছি, সুন্দর সুন্দর ঘটনাও আবিষ্কার করতে পারো, তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হবে।

কৈলাস আর কোন প্রশ্ন করে না। পরাভবে সে দুঃখিত নয়; কিন্তু নঈমের চারিত্রিক অধঃপতন দেখে অবাক হয়। কল্পনাই করতে পারে না যে, মানুষ মুখে যে কথা বলে লোক সমক্ষে তা অস্বীকার করে কী করে? একই মুখে কী করে দু'রকম কথা বলে? এটা দুর্বলতার পরাকাষ্ঠা ছাড়া আর কি? সেই নঈম যার অন্তর-বাহির একই রকম ছিল, যার ন্যায় ও নীতির তফাৎ ছিল না, যার কথা ছিল আন্তরিক ভাবের দর্পণ, সেই সরল, আত্মাভিমানী, সত্যনিষ্ঠ নঈমের এত ধূর্ততা, এত অধঃপতন? দাসত্ব করে মানুষ এই ভাবে মনুষ্যত্ব হারায়? এটাই কি দিব্য গুণকে রূপান্তরিত করার মন্ত্র?

অবশেষে বিচারের রায় বের হয়। নঈম বিশ হাজার টাকার ডিক্রী পেয়েছে। অন্য দিকে কৈলাসের মাথায় বজ্রাঘাত নেমে এলো।

ছয়

আদালতের রায় জেনে দেশবাসী স্তব্ধ। সরকারী গেজেটে বলা হয় কৈলাসই ধূর্ত। সংবাদ পত্রে জনগণের পক্ষ থেকে বলা হলো নঈম একজন শয়তান প্রকৃতির লোক। তার দুঃসাহসীকতার জন্যেই তাকে নির্দোষ প্রমাণ করেছে। ফলে, কৈলাসের কাছে সহানুভূতি মিশ্রিত চিঠি-পত্র ও টেলিফোন আসতে থাকে। পত্র-পত্রিকায় তার নির্ভীকতা ও সত্য নিষ্ঠার প্রশংসা হয়। শহরের বিভিন্নস্থানে সভা-সমিতিতে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে নিন্দাও করা হয়, কিন্তু শুধু মেঘে কি আর পৃথিবীর তৃপ্তি মেটে? এখন চিন্তা, কৈলাস ঐ বিশ হাজার টাকা কী ভাবে জোগাড় করবে।

আদর্শের পথে দেশ সেবা অসম্ভব, বড় কঠিন। বিশ হাজার টাকা। এত টাকা কৈলাস স্বপ্নেও দেখে নি তাহলে সে দেবে কি করে? শুধু তাই নয়, এতগুলো টাকার সুদও গুনতে হবে। পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে সাহায্য চাওয়া ঘৃণ্য কাজ। তাছাড়া আগে পাঠকবর্গকে কিছুই জানানো হয় নি। পত্রিকার ম্যানেজারই বা তার হয়ে ওকালতি করবে কেন? তাই যা করণীয়, তাকেই করতে হবে। সে নিজেই দায়ী অতএব সে পাঠকদের টানবে কেন? তাতে অন্যায় হবে না কি?

জনগণ চেষ্টা করলে দু'চার হাজার টাকা সংগ্রহ করতে পারেন, কিন্তু সেটা সম্পাদকীয় আদর্শ বিরুদ্ধ কাজ, আত্মসম্মানে লাগা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে অপরকে বিরক্ত করাই বা দরকার কি? যাঁরা নীতিগত ভাবে আমার পক্ষ সমর্থন করেছেন তাঁদের অন্য ভাবে বিরক্ত না করাই ভাল। ফলে হয়তো পত্রিকারই ক্ষতি হবে। অন্যদিকে টাকাটা দিতে না পারলে জেলে পাঠাবে, বিষয়-সম্পত্তিও ক্রোক করে নীলাম হতে পারে। তা হোক, তবু কারোর কাছে হাত পাতা উচিত হবে না।

সূর্য তখনো উদিত হয় নি। পূর্ব-গগনে রক্তিম আভায় বন্যা এসেছে। মৃদু-মন্দ ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে চলেছে। তারই মাঝে ভেসে আসে কার যেন ক্রন্দন ধ্বনি। সামনে উন্মুক্ত প্রান্তর, দুঃখে জরাজীর্ণ। চারদিক নিস্তব্ধ, সবাই যেন গৃহ-স্বামীর দুঃখে কাঁদছে। ছেলেমেয়েদের নেই কোন হৈ-চৈ, নেই মাতার শাস্তি-প্রসারিণী শব্দ-তাড়না। কেন না, যে ঘরে আলো নিভে গেছে, সে ঘরে কিছু কি আর দেখা যায়! সেথানে নেই কোন আশা, শুধু শোকের প্রভাব বিদ্যমান। আমীনের আজই কৈলাসের বিষয়-সম্পত্তি ও জিনিসপত্র ক্রোক করতে আসার কথা।

কৈলাস ভোর থেকেই মানসিক চিন্তায় মুহ্যমান। মনে মনে বলে—হায়, আজ

আমার কী পরিণতি হবে! যে বাড়ীটা তৈরী করতে পঁচিশটা বছর লেগেছে, সেটা আজ বেহাত হয়ে যাবে? পত্রিকা অফিসে চাকরিটাও চলে যাবে? লোকে পরিহাস করবে? অপমানের বেড়ি পরে আর মুখে কালি মেখে কি ঘুরতে হবে? শেষ পর্যন্ত সংসারটা নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো কে জানে! আমার দুঃখে কে-ই বা আজ এগিয়ে আসবে? সহানুভূতি দেখানোর জন্যে কে-ই বা আছে?

কৈলাসের হঠাৎ মনে পড়ে যায়, সেই লেখাটা তো শেষ হয় নি। আজই পাঠকদের পত্রিকা মারফৎ জানিয়ে দিতে হবে। "আজই আমার শেষ দিন, আপনাদের সেবা করার সৌভাগ্য হয়তো আর পাবো না, তাই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনারা আমার প্রতি যে সমবেদনা ও সহৃদয়তা দেখিয়েছেন, তার জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। কারোর প্রতি আমার ক্ষোভ নেই। আমাকে অসময়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত নই, কেন না, আমি সেই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি নি যে, নিজের কর্তব্য পথে অবিচল থাকবো। তবে দুঃখ হলো, জাতির জন্যে আত্মবলিদান দিতে পারলাম না।"—পাঠক বর্গের উদ্দেশ্যে এইরূপ নিবেদনটা লিখে চেয়ার থেকে উঠতে যাবে এমন সময় কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল। মুখ তুলে দেখে মির্জা নঈম। আগের মতই হাসি-খুশি ভাব। মুখে মৃদু হাসি আর সেই উজ্জ্বল চোখ। নঈম ঘরে ঢুকেই কৈলাসকে আনন্দে জড়িয়ে ধরে।

কৈলাস আশ্চর্য ও বিরক্ত হয়ে নঈমের হাত সরিয়ে দেয় এবং বলে—কি কাটা ঘায়ে আবার নুনের ছিটে দিতে এসেছো নাকি?

নঈম কৈলাসের কাঁধে হাত রেখে বলে—বুঝলে, এটা হলো ভালবাসার টান।

কৈলাস—আর ঠাট্টা করতে হবে না। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে লাভ কি?

নঈমের চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে। বলে—বন্ধু, তোমার কাছ থেকে এই প্রথম এই রকম কথা শুনে আমি অবাক হলাম। তুমি যত খুশী আমাকে মারো, গালমন্দ দাও না কেন আমি তাতেও আনন্দ পাবো।

কৈলাস—আদালতের আদেশে আজ আমার সব নীলাম হয়ে যাবে। কী হবে বলতে পারো? তোমার আর কি বলো?

নঈম—আমরা দু'জন তখন হাততালি বাজিয়ে সেই নীলাম-কর্তাকে বাঁদরের মত নাচাবো, তাহলে খুশী হবে তো?

কৈলাস—কী যে বলছো তার ঠিক নেই, আমি নিজের জ্বালায় মরছি।

নঈম—তুমি তো আগে আমার সঙ্গে বেশ বাজী রাখতে আর জিতেও যেতে। এখন আমার পালা। সেই সুযোগটা এখন আমার এসেছে।

কৈলাস—দেখো, সত্যকে উপেক্ষা করতে আমি কোনদিনই শিখিনি।

নঈম—আর সত্যর গলা টিপে ধরাই হলো আমার কাজ।

কৈলাস—তাই তো আজ গোটা সংসারটা তোমার হাতের মুঠোয়। একটু কাঁদবারও সুযোগ নেই।

নঈম—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আগে কিছু খাবার নিয়ে এসো, খাই। ভাগ্যে যা আছে হবে। সত্যি কথা বলছি, খুব খিদে পেয়েছে। ঘর থেকে না খেয়েই বেরিয়েছি।

কৈলাস—আজ তো ভাই আমাদের একাদশী। তাই সবাই আমরা উপবাসী। আজ আমার সব নীলাম হবে বলে সেই আমীনের পথ চেয়ে বসে আছি। খাবার আর কী করে তৈরী হবে! তোমার ব্যাগে যদি কিছু থাকে, বের করো, খেয়ে নিই, পরে কিছু জুটবে কি না কে জানে!

নঈম—আবার শয়তানী করছো না তো?

কৈলাস—তুমি তো তা হাড়ে-হাড়ে জানো। সরকার যতদিন আমাদের ওপর পশুবল প্রয়োগ করবেন, আমরা ততদিনই তার বিরোধীতা করবো। দুঃখ হলো, সেই বিশ হাজার কেন, হয়তো বিশটা টাকাও তুমি আমার কাছ থেকে পাবে না।

নঈম—বন্ধু, আমি তোমার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকার পাঁচগুণ উশুল করে ছাড়বো, সেটা মনে রেখো।

কৈলাস—সেই আশা করেই থাকো।

নঈম—ঠিক আছে। তাহলে এসো সন্ধি করি।

কৈলাস—রাজকুমারের কাছ থেকে বিশহাজার টাকা পেয়েও তোমার আশা মেটে নি?

নঈম—বুঝলে, টাকার আশা কখনো মেটে না। যাই হোক, কিছু দিয়ে মিটমাট করে নাও। সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে ঝামেলা করলে পেরে উঠবে না।

কৈলাস—কী করে মিটমাট করবো! আমার তো কাগজ-পত্র ছাড়া আর কিছুই নেই।

নঈম—ঋণ শোধ করার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। ঠিক আছে। বলো, আমি যা চাইবো দেবে?

কৈলাস—কী আর দেবো, আমি তো আজ ভিখিরী ভাই।

নঈম—না না, ভিখিরী হলেও সেটা তুমি দিতে পারবে। বলো, দেবে কি না?

কৈলাসের কৌতুহল বেড়ে যায়। মনে মনে ভাবে, আমার কাছে কী এমন বস্তু আছে, যা ওর দরকার। তাহলে কি আমাকে মুসলমান হতে বলছে না কি? দেখা যাক, কী বলে। তাই বললে—কী জিনিস বলো?

নঈম—মিসেস্ কৈলাসের সঙ্গে আমি একান্তে এক মিনিট কথা বলতে চাই, কী অনুমতিটা দেবে তো?

কৈলাস নঈমের মাথায় একটা চাটি মেরে বলে—হাজারবার তো দেখেছো, কী এমন রূপসী যে আবার দেখতে হবে!

নঈম—সে তুমি যাই ভাবো আর যাই বলো, আমি একান্তে কথা বলতে চাই।

কৈলাস—আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। তবে তাকে যদি টাকাটা চেয়ে বসো, তাহলে কিন্তু ভাল হবে না।

নঈম—আচ্ছা, ঠিক আছে।

কৈলাস—(মৃদু স্বরে) বড্ড লাজুক, দেখো একটু সাবধানে কথাবার্তা বলো।

নঈম—ঠিক আছে, এ ব্যাপারে তোমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না। তিনি কোন্ ঘরে আছেন একবার বলে দাও।

কৈলাস—মাথাটা নীচু করে থেকো কিন্তু।

নঈম—তাহলে চোখে একটা কাপড় বেঁধে দাও না।

কৈলাসের ঘর অবারিত দ্বার। স্ত্রী উমা চিন্তায় ভারাক্রান্ত মনে বসে আছে। তাই নঈম ও কৈলাসকে দেখে চমকে যায়। বললে—আসুন মির্জাজী, অনেকদিন পর মনে পড়লো বুঝি?

কৈলাস নঈমকে রেখে ঘরের বাইরে আসে, কিন্তু আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতে খুবই আগ্রহী। অবশ্য সেটা তার কৌতূহল মাত্র।

নঈম—আমাদের মতো সরকারী কর্মচারীদের বেড়াতে আসার সময় কোথায়? ডিক্রীর টাকাটা আদায় করতে হবে তাই আসতে হলো।

উমা নঈমের কথা শুনে হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। তাই তার মুখ শুকিয়ে যায়, আর বুকটাও কেঁপে ওঠে। বিষন্ন হয়ে উত্তর দেয়—আমরা সেটার জন্যে তো চিন্তা করছি। টাকা জোগাড় করার কোন আশাই দেখছি না। লোকের কাছে হাত পাততেও লজ্জা হচ্ছে।

নঈম—ও সব কী বলছেন? শুনে রাখুন, আমি সব টাকা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিয়েছি।

নঈমের কথা শুনে উমা চমকে গিয়ে বলে—সত্যি বলছেন? ও টাকা কোথায় পেল?

নঈম—আরে আপনি ওকে চেনেন না, ও বরাবরের এইরকম? সব জোগাড় করে রেখে ছিল, আর আপনাকে বলেছে, একটা পয়সাও নেই, কিন্তু আমি আদায় করে ছেড়েছি। যাই হোক, আপনি তাড়াতাড়ি কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করুন।

উমা—টাকা কি করে দিল আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

নঈম—আপনি সরল, সাধাসিধে মানুষ, আমি তো ওকে চিনি। ও আপনার কাছে কাঁদুনী গেয়েছে।

খুশী-খুশী ভাবে কৈলাস ঘরে ঢুকে বলে—খুব হয়েছে, এবার বেরিয়ে এসো। এখানেও ফক্করি করতে আরম্ভ করেছো?

নঈম—দাঁড়াও টাকা দিয়েছো তার রসিদটা দিতে হবে না।

উমা—তুমি টাকা মিটিয়ে দিয়েছো? অত টাকা কোথায় পেলে?

কৈলাস—দেখো ভাই, এবার যা-তা বলে ফেলবো। ঘর থেকে বেরিয়ে এসো।

উমা—টাকা কোথায় পেলে বলছো না যে? মির্জাজীর কাছে গোপন করে কী লাভ?

কৈলাস—নঈম, তুমি উমার সামনে আমাকে অপমান করতে চাইছো, কেন বলো তো?

নঈম—তুমি আমাকে সারা দুনিয়ার সামনে অপমান করো নি?

কৈলাস—সে অপমানের জন্যে তোমাকে তো আর বিশ হাজার টাকা দিতে হবে না?

নঈম—শোন ভাই, আমি ডিক্রীর টাকাটা আসল জায়গা থেকেই পেয়ে গেছি। আর শুনুন উমা দেবী, আমার টাকা পাওয়ার কথাটা আপনাদের বলতে এসেছি, তবে টাকা কোথা থেকে পাওয়া গেছে, সেটা আর নাই বা শুনলেন?

আদর্শ বিরোধ

স্যার দয়াকৃষ্ণ মেহতার গর্বে আর যেন মাটিতে পা-ই পড়ে না। এতদিনের সঞ্চিত বাসনা সুমধুর স্বপ্ন আজ সার্থক হয়েছে। ভারতবাসীর কাছে যা' স্বর্গ-স্বরূপ সেই রাজপদ তিনি লাভ করেছেন। স্বয়ং ভাইসরয় তাঁকে কার্যকরী সভার সভ্য নির্বাচন করেছেন।

বন্ধু-বান্ধব সবাই একে একে এসে তাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সম্মানে চারিদিকে আনন্দ-উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে। কোথাও ডিনার পার্টির আয়োজন করা হয়েছে, কোথাও বা প্রশংসা পত্র দিয়ে সম্মানিত করা হচ্ছে। এতো আর তার ব্যক্তিগত সম্মান নয় এ যে জাতীয় মর্যাদা। ইংরেজ সরকারের উচ্চ পদাধিকারী অফিসারেরাও তাকে অভিনন্দন জানালেন।

স্যার দয়াকৃষ্ণ লখ্‌নউয়ের একজন নামকরা ব্যারিষ্টার। তাঁর মত উদার হৃদয়, কুশল রাজনীতিবিদ নাগরিক দেশের গৌরব। সব সময়ই একটা না একটা জনহিতকর কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখেন। দেশে এ রকম নির্ভীক তত্ত্বান্বেষী, নিস্পৃহ সমালোচক, নাগরিকদের বিশ্বস্ত সহৃদয় বন্ধু বিরল। তারাই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, তাদের সুখ-দুঃখের বিষয়গুলো সুক্ষ-অনুভূতি দিয়ে বিচার করেন।

তাঁর এই পদে নিযুক্ত হওয়াটাই খবরের কাগজগুলোর মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিক থেকে শোনা যাচ্ছে—আমরা সরকারের এ জয়কে কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। কিছু নাগরিকের মতে—এ সরকারের ঔদার্য ও নাগরিকদের সর্বাঙ্গীন হিত সাধনের সর্বোত্তম প্রমাণ। আর একদল ততটা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে না উঠলেও বলতে ছাড়ছে না—রাষ্ট্রের আর একটা স্তম্ভের পতন ঘটলো।

সন্ধ্যেবেলা। কেসরপার্কে লিবারেল পার্টির পক্ষ থেকে মিঃ মেহতার এই সাফল্যে এক সভার আয়োজন করা হয়েছে! বিশিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিরা এসেছেন। খাওয়া-দাওয়ার পর সভাপতির ভাষণ শুরু হোল। তিনি বললেন—মাননীয় মিষ্টার মেহতা, আমাদের পুরো বিশ্বাস যে আপনার এই পদাধিকারের ফলে রাষ্ট্রজীবনের প্রতিবন্ধকতা-গুলো সরে গিয়ে প্রজাদের উন্নতির পথ সুগম হোল।

মিঃ মেহতা উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বললেন—রাষ্ট্রের আইন-কানুন সবই বর্তমান পরিস্থিতির অধীন। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন না করলে আইনের সুব্যবস্থা কিছুতেই সম্ভব নয়।

সভা ভেঙ্গে গেল। একদল বলছে—সত্যি, ওঁর মত ন্যায়পরায়ণের উপযুক্ত কথাই হয়েছে বটে, এ ধরনের রাজনৈতিক বিধান প্রশংসনীয়। অপরদল বললো—বলেছিলাম না, ধরা তোমায় দিতেই হবে। আর এক দল নীরবে হতাশায় মাথা নাড়তে থাকে।

দুই

মিঃ দয়াকৃষ্ণ দিল্লীতে এসেছেন মাস খানেক হোল। ফাল্গুন মাস। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তিনি বাগানে চৌবাচ্চার পাশে একটা মখমলের ইজি-চেয়ারে বসে আছেন। মিসেস রামেশ্বরী মেহতা পিয়ানো বাজাচ্ছেন আর মিস মনোরমা চৌবাচ্চায় মাছগুলোকে বিস্কুটের টুকরো ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছেন। হঠাৎ বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন—একটু আগে যে সাহেব এসেছিলেন উনি কে বাবা?

মেহতা—কাউন্সিলের মেম্বার।

মনোরমা—ভাইসরয়ের নীচে না-কি গো বাবা?

মেহতা—ভাইসরয়ের নীচে তো সবাইরে পাগলী। মাইনে সব্বাইকারই এক

হলেও যোগ্যতা-সম্মান-মর্যাদায় কেউই তার ধারে কাছে ঘেষতে পারে না, বুঝলি। আচ্ছা রাজেশ্বরী, ইংরেজদের ভদ্রতা, নম্রতা দেখে তোমার কি মনে হয় ?

রাজেশ্বরী—তা যা বলেছো। সত্যিই শিক্ষা-দীক্ষা-ভদ্রতা-সভ্যতায় আমাদের অনেকের চেয়েই ওপরে, তবু সব সময় কি নম্রভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। ঐ ভদ্রলোকের মিসেস্‌ও খুব ভাল, জান তো! আমাকে দেখলে তো আনন্দে প্রায় জড়িয়েই ধরেন!

মনোরমা—ইচ্ছে করে ওঁর পায়ের তলায় পড়ে থাকি।

মেহতা—এতো উদার, ভদ্র, বিনয়ী, সরল লোক আমি এর আগে দেখেছি বলে তো মনে হয় না। আর গুণের কথা না-ই বা বললাম! আমাদের দয়া-ধর্ম সবই মুখে মুখে। সত্যিই, এই মিথ্যে অহঙ্কারের জন্যে দুঃখ হয়। পারস্পরিক সম্মেলন হলে হয়তো নিন্দে, অভিযোগ, অনুযোগ শুনতে হোত না। একে অন্যের স্বভাব-প্রকৃতি সম্বন্ধে অপরিচিত থাকার ফলেই এই বৈষম্য।

রাজেশ্বরী—এই মিথ্যে দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ মিটিয়ে ফেলার একটাই রাস্তা, তা হোল একটা ক্লাব ইউনিয়ন গড়ে তুলতে হবে, যেখানে সবাই অবাধে মেলা-মেশা করতে পারবে।

মেহতা—আমিও তাই ভাবছিলাম। (ঘড়ির দিকে চেয়ে) সাতটা বাজতে চললো। ব্যবসায়ী সমিতির মিটিংয়ে যাবার সময় হোল। ভারতবাসীদের বিচিত্র দশা। তারা ভাবে একজন ভারতীয় প্রতিনিধি কাউন্সিলে আসা মানেই বোধ হয় সমগ্র ভারতে স্বাধীন ভাবে শাসন কর্তা হয়ে বসা। আশাবাদী জাতি, ভাবছে শাসন ধারা পাল্টে দিয়ে নতুন আকাশে নব-সূর্যের উদয় ঘটাবে। মেম্বারদের যে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কাজ করতে হয় এটা বোঝে না।

রাজেশ্বরী—ওদের কি দোষ বল ? এটাই নিয়ম, ঐ যে বলে না, আশায় চাষা বাঁচে, এদেরও ঠিক সেই অবস্থা। এখন তো কাউন্সিলের মেম্বারদের মধ্যে ফিফ্‌টি পার্সেন্ট ভারতীয়। এতগুলো লোকের মতামত কি সরকারী নীতিতে কোনো ছাপ ফেলবে না বলছো ?

মেহতা—না, না, তা কেন ? হচ্ছে, আর হবেও। তাই বলে নিয়মের পরিবর্তন ঘটাতে পারবে বলে মনে হয় না। মেম্বারদের মধ্যে সব্বাই ভারতীয় হলেও আইনের হের-ফের কিছুতেই ঘটাতে পারবে না। এটা ভুললে চলবে না যে সরকারের অনুগ্রহেই তারা কাউন্সিলে সিট পেয়েছে। সব চেয়ে বড় কথা হোল ওখানে যোগদান করলে তবেই আসল অবস্থাটা টের পাওয়া যায়, তখন জনগনের আশঙ্কাগুলোর বেশীর ভাগই অমূলক মনে হয়, এ ছাড়া পদের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দায়িত্বের বিশাল বোঝাও কাঁধে এসে চেপে বসে। কোনো নতুন আইন তৈরী করার আগে তার ফলটা আশানুরূপ হবে

কি-না এ চিন্তা হওয়াটাও স্বাভাবিক। সত্যি কথা বলতে কি, অবস্থাটা ঠিক হাত-পা বাধা বলির পাঁঠার মতই হয়। স্বাধীনতা বলতে কিছু থাকে না। যারা আগে ওঁর সহকারী ছিলেন এখন তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করতেই সঙ্কোচ বোধ করেন; ওদিকে সরকার বিরোধী চিন্তাধারার জন্যে সরকারেরও চক্ষুশূল হয়ে উঠেছেন। ভাষণ দিতে উঠেও যা ন্যায়-সত্যি তাই বলেন, সরকারী নীতিগুলো ক্ষতিকর জেনেও নীরবে সমর্থন করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। ওগুলোর বিরুদ্ধে যখন কিছু করতেই পারবেন না, তখন বিরুদ্ধতা করে অপমানিত হবেনই বা কেন? এ অবস্থায় লম্বা-চওড়া কথা বলে কাজ হাসিল করে নিজেকে রক্ষা করাই উচিৎ। কথায়ই তো আছে চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা। সবচেয়ে বড় কথা কি জানো, এ রকম ভদ্র উদারচেতা, ন্যায়-নীতি পরায়ণের বিরুদ্ধে যেতেও বিবেকে লাগে। যাক্ তোমরা সব তৈরী। মোটর এসে গেছে। চলো, ওদিকে মিটিংয়ে সবাই হয়তো এতক্ষণে এসে গেছেন।

সপরিবারে মিঃ মেহতা ওখানে পৌছোতেই সবাই হাত-তালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। সভাপতি তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে যা বললেন, তার বিষয়বস্তু হোল, অন্য দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে সব শিল্প নিঃশেষ হতে চলেছে, সেগুলোকে রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। রাষ্ট্রের উন্নতি কল্পে নতুন নতুন কল-কারখানা চালু করতে হবে, সফল হলে তবেই তার ভার কোনো ব্যবসায়ী সংস্থার হাতে তুলে দিতে হবে। সদ্যজাত অথবা শৈশব অবস্থায় আছে এমন শিল্পগুলোর প্রতি যাতে জনগণের উৎসাহ বাড়ে এবং আর্থিক সাহায্যও সরকারকেই করতে হবে।

মেহতা সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সরকারী উদ্যোগের নিয়মগুলো ঘোষণা করে বলেন—আপনাদের এই নির্দোষ সিদ্ধান্তকে কার্যে রূপ দেওয়া খুবই কঠিন। গভর্ণমেন্ট আপনাদের সম্মতি দেবেন ঠিকই, তবে ব্যবসায়ীক কাজে অগ্রসর হওয়াটা কিন্তু জনতারই কাজ। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, যে নিজেকে সাহায্য করে ঈশ্বরও তাকে সাহায্য করেন। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। আপনাদের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস, সাংগঠনিক উৎসাহের বড়ই অভাব। পদে পদে সরকারের সামনে হাত-পাতাটা আমার মনে হয় নিজেদের অযোগ্যতা ও অকর্মণ্যতারই পরিচয়, তাই নয় কি!

পরদিন এ বক্তৃতার বিষয় নিয়ে খবরের কাগজে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথা বেরুলো। একদল বলছে—মিষ্টার মেহতা তাঁর স্পীচের মাধ্যমে সরকারী নীতিকে স্পষ্ট ও নিখুত ভাবে তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয়দল লিখেছেন—মিষ্টার মেহতার ভাষণ পড়ে আমরা স্তম্ভিত। 'সব শিয়ালের এক রা' একথা উনিই আর একবার প্রমাণ করে দিলেন।

তৃতীয় দল লিখেছেন—মাননীয় মেহতা মহোদয়ের এই কথার সঙ্গে আমরা একমত যে প্রতি পদে পদে আমরা সরকারের করুণা ভিক্ষে করে নির্লজ্জের মতো হাত পেতে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হই না। যারা একদিন বলেছিলেন যে উপযুক্ত লোককেই কাউন্সিলে পাঠানো হয়েছে, আশা করি এবার তাদের ঘুম ভেঙেছে। আর ব্যবসায়ী মণ্ডলের সদস্যদের প্রতি এই ভেবে মনটা ভরে ওঠে যে তারা আত্ম-বিশ্বাসের উপদেশামৃত গ্রহণ করতে কানপুর থেকে দিল্লী এসেছেন।

তিন

চৈত্র মাস। সিমলায় গ্রীষ্ম কালীন অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে।

মিঃ মেহতা রীডিংরুমে বসে মন দিয়ে কিছু পড়ছিলেন, রাজেশ্বরী এসে জিজ্ঞেস করলেন—কি পড়ছো গো?

মেহতা—এটা একটা আয়-ব্যায়ের খসড়া। সামনের সপ্তাহেই কাউন্সিলে পেশ করতে হবে। যে ভয়টা করছিলাম ঠিক তাই, বুঝতে পারছি না যে এটাকে কি করে মেনে নেবো। এই দেখ না, তিন কোটি টাকা উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীদের মাইনে বাড়ানোর জন্যে রাখা হয়েছে, এদিকে কর্মচারীদের মাইনে আগের চাইতে যে অনেক বাড়ানো হয়েছে সে খেয়াল কারোর আছে? কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু বলবোটা কি করে? রোজ যারা তদ্‌বির করতে আসছে তারাই লাভবান হবে। 'সৈনিক-ব্যয়-খাতে' বিশ কোটি বাড়ানো হয়েছে। আমাদের সেনা-বাহিনীকে অন্য দেশে পাঠানো হলে ধরে নিতে হবে আমাদের চেয়ে তাদের প্রয়োজনটা বেশী। কিন্তু এ মতের বিরুদ্ধতা করে কাউন্সিলের বিরাগ-ভাজন হতে চাইনে।

রাজেশ্বরী—সে ভয়ে চুপ করে থাকলে তো চলবে না। তাহলে এখানে এসে তোমার কি লাভ হোল?

মেহতা—মুখে বলতে খুবই সোজা, করতে গেলে তখন বোঝা যায়, কত ধানে কত চাল। এখানে এতো আদর যত্ন পাচ্ছো, ঐ হ্যাঁ-হুজুর তাল মেলাচ্ছি বলেই। ভাইসরয় একটু বেঁকে বসলেই আর দেখতে হচ্ছে না, 'প্রাউড' বলে সবাই ট্যাঁরা চোখে দেখবে। এই নাও, ধরো, রাজা ভদ্র বাহাদুর সিং আমাদের এখানে আসছেন।

রাজেশ্বরী—শুনেছি শিবরাজপুর নাকি খুব বড় ইস্‌টেট।

মেহতা—হ্যাঁ, বার্ষিক আয় পনর লাখ টাকার কম তো নয়ই, তাছাড়া স্বাধীন রাজ্য।

রাজেশ্বরী—জানতো রাজা-সাহেবের কিন্তু আমাদের মনোরমাকে ভারি পছন্দ। মনে হয় মনুও ওঁকে খুব ভালবাসে।

মেহতা—দুজনের মধ্যে একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠলে তো সোনায় সোহাগা। রাজা-সাহেবকেও তখন এদিকে টানতে কোনো বাধা থাকবে না। তাছাড়া লখ্‌নউতে এ সুযোগ কোথায়? ঐ দেখো, অর্থসচিব মিষ্টার কাক এসে গেছেন।

কাক—(মেহতার সঙ্গে করমর্দন করে) নমস্কার মিসেস মেহতা, ভাল তো! আপনার এই ড্রেস আমার ভীষণ ফেভারিট, দুঃখের বিষয় আমাদের সোসাইটির ভদ্র-মহিলারা শাড়ী পরেন না।

রাজেশ্বরী—ওহো মিস্টার কাক, আমার কিন্তু ঐ গাউন ভারী পছন্দ! ভাবছি এবার থেকে গাউনই পরবো।

কাক—না-না-না মিসেস মেহতা, আর যাই করুন ঐ কর্ম করবেন না। মিস্টার মেহতা, আজ কিন্তু আমি আপনার জন্যে একটা খুব ভাল খবর এনেছি। আপনার সুযোগ্য ছেলে এখন আসছে তো? মহারাজ ভিন্দ চাইছেন তাকে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী করে নিতে। আপনি আজই একথা জানিয়ে তাকে টেলিগ্রাম করে দিন।

মেহতা—আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো!

কাক—ওসব পরে, আগে টেলিগ্রাফ তো করে দিন। কাবুলের রিপোর্টটা পড়েছেন নিশ্চয়ই। মহামান্য আমীর আমাদের সঙ্গে সন্ধি করতে চাইছেন। তিনি বলশেভিকের দিকে ঝুঁকেছেন। অবস্থাটা বেশ চিন্তাজনক। কি যে হবে বুঝতে পারছি না।

মেহতা—আমি তো বিশ্বাস করতেই পারছি না। গত শতাব্দীতে কই ভারতকে আক্রমণ করার সাহস তো কাবুলের হয় নি! ভারতও যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। তবে হ্যাঁ, ওখানকার লোক নিজেদের দেশকে রক্ষা করতে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

কাক—ক্ষমা করুন, আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন যে ইরান, আফগানিস্থান আর বলশেভিকের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে। আমাদের দেশের চারধারে এতগুলো শত্রুর সমাবেশ কি উদ্বেগের কারণ নয়? এথেকে সতর্ক থাকাই তো উচিৎ।

এরই মধ্যে লাঞ্চের সময় হয়ে গেলো। সবাই টেবিলে এসে বসলেন। ঘোড়দৌড়, থিয়েটার সংক্রান্ত কথাবার্তাই এ সময় বেশী উপাদেয়।

চার

মেহতার বাজেট দেখে সারা দেশে সোরগোল পড়ে গেল। একদল তাঁর এই সুবিচারকে দৈববাণী বলেই মনে করছে। আর একদলও কিছু কাটছাঁট করে তাঁর এই বাজেট প্রসঙ্গে একমত। কিন্তু তৃতীয় দলের প্রতিটি কথায় হতাশা ঝরে পড়ছে, ভারতের অধোগতির কথা ভেবে চোখের জল ফেলছে। তারা বিশ্বাসই করতে পারছে না যে মিঃ মেহতার মত বিচক্ষণ লোকের মুখ থেকে একথা বের হোল কি করে?

এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি যে এক বেসরকারি সদস্য প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ের এদিকটা ঠিক মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। দেশের শান্তি-উন্নতি তথা রক্ষণাবেক্ষনও এর ওপরই নির্ভরশীল। নিজে একজন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, তাই জনগণের শিক্ষার দিকে বেশী জোর দিতে হবে' এ কথা বহুবার তাঁর মুখে শোনা গেছে, তাদের স্বাস্থ্য, নগর উন্নয়ন প্রকল্প, জলের সুব্যবস্থা করা বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে ভেবেছেন। স্বল্প বেতন ভোগী কর্মচারীদের প্রতি তাঁর দুর্বলতার কথা কারোই অজানা নয়। তার রাজনৈতিক জ্ঞান সুবিদিত। শাসনের প্রধান কর্তব্য ভেতর ও বাইরের অশান্তিকর শক্তি থেকে দেশকে বাঁচানো। শিক্ষা-চিকিৎসা-প্রকল্প-শিল্পে-বাণিজ্যে উন্নয়ন সাধন এ সবই গৌণ কর্ম। দেশের সমগ্র জনসাধারণকে অজ্ঞান-সাগরে ডুবতে দেখতে পারি, প্লেগ, ম্যালেরিয়ায়গ্রস্থ হয়েছে সেও সহ্য করতে পারি, স্বল্প বেতনকারী কর্মচারীদের ঠিক মতো অন্ন জুটছে না তাও সওয়া যায়, কৃষকদের প্রকৃতির অনিশ্চিত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াটাও এমন কিছু নয়, কিন্তু দেশের সীমানায় শত্রু দাঁড়িয়ে আছে, তা কিছুতেই দেখতে পারব না। আমাদের আয়ের পুরোটাই দেশ রক্ষার জন্য সমর্পন করতে দ্বিধা নেই। আপনারা বলছেন, এ সময়ে কোনো আক্রমণের সম্ভাবনা নেই। আমি কিন্তু বলবো সংসারে কিছুই অসম্ভব নয়। শূন্যে রেলগাড়ী চলতে পারে, জলে আগুন লাগতে পারে, গাছে গাছে কথা-বার্তা হয়। জড় পদার্থের মধ্যেও চেতনার সাড়া পাওয়া যায়। কেন, এ রহস্য কি প্রতিনিয়ত আমাদের নজরে পড়ছে না? আপনারা বলবেন রাজনীতিজ্ঞদের কাজ সম্ভাবনার পেছনে অনর্থক না ছুটে বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতের সমস্যাগুলোর সমাধান করা। যাক্‌, রাজনৈতিকদের ক্রিয়া-কলাপ নিয়ে তর্কে যেতে চাই না। কিন্তু আশা করি আপনারা সবাই একমত হবেন যে উপযুক্ত পথ্য ও ওষুধ পেলে সব রোগেরই মুক্তি ঘটে। আপনার সরকারের এই সৈনিক ব্যয়কে শুধু সমর্থনই করবেন না, এই মন্তব্যকে আপনাদের পক্ষ থেকে পেশ হওয়া চাই। হ্যাঁ, এটা আপনাদের ধর্ম। আপনারা বলবেন স্বয়ংসেবক সৈনিক বাড়াতে। বর্তমানে বিশ্বযুদ্ধের বাজারে একথা শুনে সরকার স্তম্ভিত। শিক্ষিত-শ্রেণী বিলাসী, ভীরু ও স্বার্থপর। অপরদিকে গ্রামের লোকও শান্তি-প্রিয়, সঙ্কীর্ণমনা (আমি তাদের ভীরু বলতে চাইছি না) ও গৃহস্থ। তাদের মধ্যে সেই আত্ম-ত্যাগ, বীরত্ব তথা পৌরুষত্ব কোথায়? আশা করি এ কথা মনে করিয়ে দিতে হবে না যে কোনো শান্তি-প্রিয় জাতিকে দু-চার বছরে রণ-নিপুন করে গড়ে তোলা যায় না।

পাঁচ

জ্যৈষ্ঠ মাস। তবু সিমলাতে যন্ত্রনাদায়ক লু বা রোদের প্রখর তাপ নেই। মিঃ মেহতার নামে বিলেত থেকে চিঠি এসেছে, চিঠি খুলে বালকৃষ্ণের নাম দেখেই আনন্দে

প্রায় লাফিয়ে উঠে পরক্ষণেই তা পড়ে কেমন যেন উদাস হয়ে যান। চিঠিটা হাতে নিয়েই তিনি রাজেশ্বরীর কাছে এলেন। রাজেশ্বরী উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করেন—হ্যাঁ গো, বালার চিঠি এসেছে?

মেহতা—হুঁ, এই দেখো না।

রাজেশ্বরী—কবে আসবে টাসবে লিখেছে কিছু?

মেহতা—আসা-যাওয়া ব্যাপারে কিছু লেখেনি। চিঠি জুড়ে শুধু আমার দেশ-দ্রোহিতা আর দুর্গতির নাকে কাঁদুনি কেঁদেছে। ওর চোখে আমি জাতির শত্রু, ধূর্ত, স্বার্থান্ধ, দুরাত্মা, কি নই! বুঝতে পারছি না, ও কি ছিল, আর কি হয়ে গেলো? ওকে তো আমি শান্ত, ধীর-স্থির, সচ্চরিত্র যুবক বলে মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করতাম। এ চিঠি লিখেই ক্ষান্ত হয় নি, আমার সেদিনের স্পীচটাকে একটা প্রসিদ্ধ ইংরেজী কাগজে ছেপে সমালোচনা করেছে। আবার এতো চালাক, লেখাটা নিজের নামে লেখে নি, তাহলে তো আমি আর লোক-সমাজে মুখ দেখাতে পারতুম না। জানি-না এতসব কুপরামর্শ ওকে দিচ্ছেটা কে? মহারাজ ভিন্দের আণ্ডারে চাকরী করা নাকি গোলামী করার সামীল। আর রাজা ভদ্র-বাহাদুর সিংহের সঙ্গে মনোরমার বিয়ে দেওয়াটা নাকি ঘেন্নার, অপমানের। হতচ্ছাড়ার কি সাহস, আমাকে ধূর্ত, বেইমান, বংশের কলঙ্ক বলে! আমি নাকি মান-সম্মান বিকিয়ে দিয়ে বসে আছি! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! নিজের ছেলের কাছে এত অপমান! ওর মুখ দেখতে চাই নে……….

রাজেশ্বরী—দেখি, দাও তো চিঠিটা! এতটা বাড়াবাড়ি করার ছেলে তো ও নয়।

একথা বলে তিনি স্বামীর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়ে বললেন—কি বলছো তুমি? আমি তো একটাও খারাপ শব্দ খুঁজে পেলাম না।

মেহতা—শব্দ দেখে কি হবে, ভাবটা অনুভব করেছ!

রাজেশ্বরী—তোমার আর ওর আদর্শের মধ্যে আসমান-জমীন-ফারাক, ও তোমাকে কি করেই বা শ্রদ্ধা করবে বলো!

মিঃ মেহতা রাগে গজ গজ করতে করতে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। রাজেশ্বরীর সহিষ্ণুতা মাখা কথাগুলো শুনে তিনি আরও বেশী জ্বলে উঠেছেন। অফিসে পৌঁছেই ছেলেকে চিঠি লিখতে শুরু করলেন। চিঠির এক-একটা শব্দ ছুরি-কাটারির চেয়েও তীক্ষ্ণ ধারালো।

এ ঘটনার দু-সপ্তাহ পর মিঃ মেহতা বিলেত থেকে আসা চিঠির গোছা খুলে বালকৃষ্ণের কোনো চিঠি না পেয়ে ভাবলেন—কথাগুলো তাহলে কাজে লেগেছে, আমার সঙ্গে চালাকি, এমন জব্দ করেছি যে উত্তর দেবার সাহসটুকুও উবে গেছে। 'লণ্ডন-

টাইমস' খুলে (এ পত্রিকাটা তিনি গভীর আগ্রহেই পড়েন) দেখতে থাকেন। হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে 'আহা' শব্দ হোল। হাত থেকে কাগজটাও সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেলো। প্রথম পাতায় বড় বড় করে লেখা—

লণ্ডনে ভারতীয় দেশপ্রেমীদের সভা, অনারেবল
মিস্টার মেহতার ভাষণ নিয়ে অসন্তোষ,
মিস্টার বালকৃষ্ণ মেহতার
বিরোধ ও আত্মহত্যা—

গত শনিবার বেকস্টনে ভারতীয় যুবক ও নেতাদের এক বিরাট সমাবেশে সভাপতি মিঃ তালিবজী বলেন—কাউন্সিলের কোনো ইংরেজ সদস্যের বক্তৃতায়ও এতো কঠোর, মর্মভেদী শব্দ বাণের প্রয়োগ এর আগে আমাদের আর কেউ করেছেন বলে জানা নেই। আমার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক জীবনে কোনো রাজনীতিজ্ঞের মুখ থেকে এ রকম ভ্রান্তিজনক, নিরঙ্কুশ বিবৃতি শোনা এই প্রথম। তাঁর বক্তৃতায় এটাই প্রমাণিত হয় যে ভারতকে উদ্ধার করার একটাই পথ তা হোল পূর্ণ স্বরাজ—আত্মিক ও বাক্ স্বাধীনতা। 'ইভোলিউশন' অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে উন্নতির প্রতি আমাদের যেটুকুওবা বিশ্বাস ছিল আজ সেটুকুও উঠে গেলো। আমাদের এ কঠিন ব্যামো ট্যাবলেট মিক্‌চারে কমবে না। অপারেশন করতে হবে। উচ্চ রাজপদ দিলেই আমাদের স্বাধীনতা চলে আসবে না, বরং আধ্যাত্মিক পরাধীনতা আরও জোরদার হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মহামান্য মিষ্টার মেহতা সর্বান্তকরণে মিথ্যে জেনেও কেবলমাত্র সম্মান-লালসায়, পদানুরাগের বশে এ বিচারের পক্ষে রায় দিয়ে স্বীয় আত্মার গলা টিপতে বাধ্য হয়েছেন……… ….[কেউ উচ্চ স্বরে বলে ওঠে : না, এ মিথ্যে দোষারোপন।]

উপস্থিত সবাই বিস্মিত হয়ে দেখেন মিঃ বালকৃষ্ণ নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। রাগে সারাটা শরীর কাঁপছে। কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু সবাই তাকে ঘিরে নিন্দে-অপমানের গুলি বর্ষণ করছেন। সভাপতি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে জনতাকে শান্ত করেন, কিন্তু মিঃ বালকৃষ্ণ মেহতা সেখান থেকে উঠে চলে যান।

পরদিন বন্ধুরা বালকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখেন তাঁর লাশটা মেজেতে পড়ে আছে। পিস্তলের দুটো গুলি তাঁর বুকটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। টেবিলে খোলা ডাইরীতে লেখা রয়েছে—

আমার বহুদিনের সঞ্চিত গর্ব আজকের সভায় ধুলোতে মিশে গেছে। এ অপমান অসহ্য। জানি-না নিজের পূজনীয় পিতৃদেবের প্রতি এ রকম নিন্দনীয় দৃশ্য আরও কত দেখতে হবে। এ আদর্শ বিরোধের অবসান করাই উচিৎ। মনে হয়, আমার জীবনটাই তাঁকে তাঁর নির্দিষ্ট পথে যেতে বাধা দিচ্ছে। ভগবান, তুমি আমায় ক্ষমতা দাও!

বদনামের ভয়

দামী আসবাব-পত্রে সজ্জিত ঘরের সর্বত্রই একটা উন্নত মানের সুরুচির ছাপ। কৃশাঙ্গী এক মহিলা গালে হাত রেখে টেবিলের সামনে বসে আছেন। দেখে মনে হচ্ছে গভীর চিন্তায় মগ্ন। চোখে-মুখে গভীর হতাশার ভাব সুস্পষ্ট। ক্লান্তির ব্যাকুল নিস্তেজ ছায়ায় তার ফুটন্ত গোলাপের মতো মুখটা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।

সরলা কলকাতার নামকরা ব্যারিষ্টার ধীরেন চৌধুরীর স্ত্রী। তাঁর মতো সজ্জন, গরীবের বন্ধু খুব কমই দেখা যায়। অভিজাত সমাজের গণ্য-মান্য একজন হয়েও খুব সাধারণ ভাবেই জীবন-যাপন করতেন। কোনো নেশা-টেশাও করেন না। আর রেসের মাঠেও কোনো দিন যান নি। থিয়েটার বা কোনো রাজনৈতিক মিটিংয়েও তিনি খুব কমই যেতেন। সময়ের বেশীর ভাগটাই কাটাতেন মক্কেল বা মামলা সংক্রান্ত নথি-পত্র নিয়ে। বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও কম। বাহ্যিক ঠাঁট-বাটের বদলে তাঁর অনাড়ম্বর জীবন বন্ধু ও হিতৈষীবর্গকে প্রভাবান্বিত করতো। ফ্যাসানের নামে আধুনিক উগ্রতাকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। তামাম কলকাতা জুড়ে যখন রাজনীতির বাঘা বাঘা নেতাদের আনা-গোনায় সকলেই তটস্থ, তিনি কিন্তু সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীনই ছিলেন, খবরের কাগজ পড়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। মোট-কথা রাজনীতিকে তিনি বরাবরই এড়িয়ে চলতেন। বন্ধুদের কাছে তিনি শান্ত-ভদ্র-ধীর-স্থির, সদাহাস্যময়-সরলতার প্রতীক বলেই পরিচিত। স্ত্রী সরলা কিন্তু স্বামীর বিপরীত, জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও ভারতভূমিকে সে নিজের মায়ের মতই ভালবাসতো। কলেজে পড়ার সময় ভারতবর্ষের মেয়েদের সম্পর্কে কিছু অপমানজনক উক্তি করাতে কলেজের লেডী প্রিন্সিপালকে বেশ একহাত নিয়েছিলো। নারী-স্বাধীনতা সম্পর্কে অনেক রকম আকাশ কুসুম কল্পনা করতো। প্রাচুর্যে, শিক্ষা-দীক্ষায় কেতা-দুরস্ত হয়েও মনে-প্রাণে খাঁটি ভারতীয় রমণী ছিল। স্বামীই ছিলেন তার ইহকাল-পরকাল, এককথায় পরম গুরু।

সরলা ভাবছিল, "এও কি সম্ভব? এসব তো তিনি একদমই পছন্দ করেন না। এ নিশ্চয়ই কোনো বদ লোকের ষড়যন্ত্র। শয়তানেরা ওঁর মতো দেবতার গায়ে কাদা ছোটাতেই এই কর্ম্ম করেছে। না. এ কক্ষনো হতে পারে না।"

দুই

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলা যাক, আজ পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেট কয়েকজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে এসে ধীরেন বাবুর বাড়ী তল্লাশি করে গেছেন। মঙ্গলবার

বিকেল চারটে নাগাদ হ্যারিসন রোডের ওপরে এক বাঙালী যুবক কোনো এক ইংরেজ অফিসারকে উদ্দেশ্য করে বোমা ছুড়ে পালিয়ে যায়। এ ভয়ানক ঘটনায় সারা শহর জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়, সেই সঙ্গে ধর পাকড়ও। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হোলো এ খুনের ঘটনায় জড়িত বলে ধীরেনবাবুকে সন্দেহ করা হচ্ছে। যে শুনছে সেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। ধীরেনবাবু! না, না, না, উনি এ ধরণের কাজ কিছুতেই করতে পারেন না। সাদা-সিধে, শান্তি প্রিয় লোক, রাত-দিন নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত, তাঁর মতো লোকের পক্ষে এ ধরণের জঘন্য কাজ! এ কেউ বিশ্বাস করতে, পারছে না, এ নিশ্চয়ই তাঁকে নাস্তানাবুদ করার জন্য কোনো ধূর্ত লোক ফাঁদ পেতেছে। গোয়েন্দাতো পরিষ্কার বলেই দিয়েছেন মঙ্গলবার বিকেল চারটের সময় ধীরেনবাবু হ্যারিসন রোডেই দাঁড়িয়ে থেকে নিজে খুনীর হাতে বোমা তুলে দিয়েছেন। সে কারণেই তো আজ ধীরেনবাবুর বাড়ী তল্লাসি করা হোল। পুলিশ অফিসার তো সিন্দুক, আলমারী, ফাইল পত্র তন্ন তন্ন করে ঘেটেও সন্দেহজনক এমন কিছু পেলেন না যাতে ধীরেনবাবুকে প্রকৃত দোষী বলে সাব্যস্ত করা যায়। তাহলে সুপারিন্টেণ্ডেট সাহেব তাঁকে কেন জেল হাজতে আটকে রেখেছেন, সরলা ব্যারিস্টার সাহেবকে এই অযথা হয়রানির ঘটনায় খুব বিচলিত হয়ে পড়েছে। তাই ভাবল—পুলিশ, সুপারিন্টেণ্ডেটকে ভুল খবরই দিয়েছে। ওঁকে ধোকা দিয়ে হয়তো আসল ব্যাপারটা চেপে দিয়ে ধীরেনের মতো দেবতুল্য লোকের গায়ে কাদা ছেটাতে চাইছে। এ কার কারসাজি! যাক্ গে, কোর্টে গেলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে যে মঙ্গলবার বিকেল চারটের সময় উনি ওখানেই ছিলেন। ওঁর মক্কেল ও বন্ধুরাই সঠিক সাক্ষী দিতে পারবেন, কিন্তু ধীরেনই বা কেন সুপারিন্টেণ্ডেটর সামনে এসব প্রমাণ পেশ করে নিজেকে জেল হাজত থেকে বেকসুর খালাস করছে না? তখন হয়তো ঘাবড়ে গিয়ে সে সব কথা ওঁর মাথায় আসে নি। এবার নিশ্চয়ই ওঁকে সসম্মানে ছেড়ে দেবে, আর দেরী করবে না, এবারে এসে যাবে।

সাত-পাঁচ ভেবে সরলার চিন্তান্বিত মনের বোঝাটা যেন একটু হালকা হোল। ইতিমধ্যে একটা মোটর তাঁর বাড়ীর সামনে এসে থামলো। সরলার বুকটা ধক্ ধক্ করছে। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ছে। অব্যক্ত আনন্দে হাত-পাগুলো অবশ হয়ে গেছে, আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো। এতো তাঁদের নিজেদেরই গাড়ী কিন্তু তাতে ধীরেনবাবুর বদলে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু জ্যোতিন্দ্র সেন বসে আছেন।

সরলা জিজ্ঞেস করলো—ধীরেন কোথায়? পুলিশের বে-আক্কেলপনাটা দেখলে তুমি তো নিশ্চয়ই জান যে, মঙ্গলবার বিকেল চারটের সময় তিনি হাইকোর্টে ছিলেন ছাড়া পেয়ে গেছেন তো? কখন আসবেন? তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে?

সরলার চিন্তাধারার ঠিক উল্টো ভাবটাই জ্যোতিন্দ্রের চোখে মুখে ছড়ালো। চিন্তান্বিত ও ব্যথিত দৃষ্টিতে সরলার দিকে চেয়ে থাকেন। সরলার অন্তরাত্মা যেন অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে, বলে—জ্যোতিন, তোমাকে এতো ক্লান্ত লাগছে কেন! অমন চুপ করে আছো কেন? আমাকে সব খুলে বল?

জ্যোতিন্দ্র একটু ভেবে নিয়ে বলেন—আজ রাতে ধীরেন হয়তো আসতে পারবে না। যদ্দূর সম্ভব, পুলিশের লোক হয়তো আর এক প্রস্থ জিজ্ঞেসা-বাদ করবে। সন্দেহজনক কিছু না পেলে ছাড়া পেয়ে যাবে, চিন্তা করো না, তাড়াতাড়ি চলে আসবে। তবে আমার মনে হয় ওর একবার যে করেই হোক তোমার সঙ্গে দেখা করা দরকার। অনুমান করছি……। কথাটা বলতে গিয়েও জ্যোতিন্দ্রবাবু বললেন না, চেপে গেলেন।

সরলা ভাবল ইনি হয়তো কোনো খারাপ খবর নিয়ে এসেছেন। তাই ভয় পেয়ে বললে—জ্যোতি, দোহাই তোমার, এ সময়ে আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিও না, তুমি কি যেন লুকোবার চেষ্টা করছো, সব কথা খুলে বলো। আর ধৈর্য্য ধরা যায়। তুমিই বলো। তাহলে কি ধীরেন এখন ছাড়া পাবে না? কেন বলছে না, যে মঙ্গলবার চারটের সময় সে কোর্টেই ছিল? এটাই তো সবচেয়ে বড় প্রমাণ, তাহলে ওকে আটকে রাখে কার সাধ্যি!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জ্যোতিন্দ্র বলেন—মঙ্গলবার দিন ও সময়ে তো সে কোর্টে ছিল না।

সরলা—সে কি? কোর্টে ছিল না? তাহলে কোথায় গিয়েছিল?

জ্যেতিন্দ্র—সেটা বললে তো সব ঝামেলা চুকেই যেতো, বলছেই না।

সরলা—কিন্তু কেন? নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারছে কেন?

জ্যোতিন্দ্র—কি বলবো! মুখে যেন কুলুপ এঁটে বসে আছে। তবে এটা জানা গেছে যে, ঐদিন দু'টো পর্যন্ত কোর্টে ছিল, তারপর একটা ভাড়াটে গাড়ীতে চেপে কোথায় যায়, কিন্তু তিনটে থেকে ছটা, এই তিন ঘণ্টা যে ও কোথায় ছিল তা বলছে না।

সরলার মাথা ঘুরতে থাকে, দেয়াল ধরে কোনরকমে পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলে—বুঝতে পারছি না ওর কি হোলো? অসম্ভব, এ কিছুতেই হতে পারে না! ওর মতো লোক, না-না-না! ও যদি নিজের মুখেও আমাকে বলে, যে ও এই হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাহলেও আমি বিশ্বাস করবো না। তোমরা তো ওকে জানো জ্যোতিন, কি নরম মন ওর! ও কি কখনো এরকম জঘন্য কাজ করতে পারে, বলো! কিন্তু, আসল কথাটা ও কেন বলছে না? তোমরা সবাই ওকে বুঝিয়ে বলছো না কেন?

জ্যোতিন্দ্র—ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কত রকমে যে চেষ্টা করলাম, কি বলবো। কিন্তু

কে শোনে কার কথা। তাছাড়া ওর মতো বুদ্ধিমান লোককে আর কিভাবে বোঝাবো বলো। ও কি জানে না, যে এ সময়ে সব কথা খুলে না বললে এর পরিণাম কত সাংঘাতিক হতে পারে। কিন্তু সেই এক গোঁ ধরে বসে আছে, কারোর কোন কথাই শুনছে না। বলছে, "বরং কিছুদিনের জন্যে দ্বীপান্তরে বাস করে আসবো সেও ভাল।" শোনো কথা, দ্বীপান্তরে যাবে, জেলের ঘানি টানবে, তবু বলবে না যে মঙ্গলবার চারটের সময় কোথায় গিয়েছিল। তাই তো তোমার কাছে এলাম, তুমি জান কিছু? ও প্রায়ই কোথায় যায়-টায়?

সরলা মাথা নেড়ে জবাব দিলেন—কোথাও তো বড় একটা যেতে আসতে দেখি না। আমি তো ভেবেছিলাম মঙ্গলবার চারটের সময় কোর্টেই ছিল। বুঝতে পারছি না চুপ করে আছে কেন? কি ভেবেছেটা কি? আমাকে ওর কাছে নিয়ে চলো তো। আমাকে নিশ্চয়ই ওর মনের কথা বলবে। ও নিজের মুখে সব কথা আমায় খুলে বলবেই, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার কথা কিছুতেই ফেলতে পারবে না। তুমি শুধু আমাকে ওর কাছে নিয়ে চলো।

সরলার বুকের ভেতর থেকে চাপা কান্না যেন গলা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। জ্যোতিন্দ্র সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—আমিও তাই ভেবেছি, ও হয়তো তোমাকে কিছু বলবে। তাইতো তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তবে আজ তো অনেক রাত হয়ে গেছে, এখন ওর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করা বৃথা। ম্যাজিস্ট্রেটের পারমিসন্ পাওয়া মুশকিল। কাল তোমাকে নিয়ে যাব। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে, কোনো চিন্তা নেই। আর আমরা তো রয়েছি, ভয় কি! মনকে শক্ত করো। ভেঙ্গে পড়লে চলবে!

সরলা চোখের জল গোপন করে জ্যোতিন্দ্রকে হ্যাণ্ডশেক করে বলেন—জ্যোতিন তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না, তবে তোমার এ দয়ার কথা আমি কোনদিন ভুলবো না।

সরলা চুপ করে গেল। কত আশা নিয়ে বেচারী সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসেছিল। হয়তো ভেবেছিল ধীরেন ফিরে এসেছে তাই তার চোখ-মুখে যেন ঊষার আলো ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু এখন হতাশায় কেমন যেন পাংশুটে-ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। জ্যোতিনবাবু আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছেন। ভাবখানা এই—হতভাগিনী হয়তো জানেই না, ওর ভাগ্যে কি ঘটতে চলেছে। হায় ভগবান! ধীরেন শয়তানটা নিজের মুখে যদি সব কথা খুলে বলতো, কিন্তু তাহলেও তো গোলমাল হোত, ঝঞ্ঝাট বা[illegible] মঙ্গলবার

দশটা বে[illegible] গেছে। সরলা কিছুই খেল না, শুকনো মুখে এঘর ওঘর করে ঘুরে

বেড়াচ্ছে। বিছানায় গিয়ে শুলো, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। খবরের কাগজটা নিয়ে টেবিলের সামনে গিয়ে বসলো, কিন্তু তাও ঐ হাতেই ধরা রয়েছে, চোখ দুটো রয়েছে সেই জানালার দিকে। কাগজ রেখে দিয়ে বারান্দায় পায়চারী করছে। তার ইচ্ছে করছে—এক্ষুণি—ধীরেনের কাছে গেলে কেমন হয়। গিয়ে যদি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলি তাহলে কি উনি অস্বীকার করবেন? হায় ভগবান, ও এখন জেলখানায় বসে কি করছে কে জানে। আমি তো ওর স্ত্রী। আমাকেও কি তিনি তাঁর মনের গোপন কথা বলবেন না? আমাকেও কি ভুলে গেছেন।

কখনো কখনো স্বামীর এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে মনটা তিক্ততায় ভরে উঠলো। বুঝতে পারছে না নাকি, ওর কিছু হলে আমি কত অস্থির হয়ে পড়ি। এতদিন একসঙ্গে থেকেও ও আমার মন, আমার ভালবাসাকে ঠিক চিনতে পারলো না। তাহলে সব কথা খুলে বলছে না কেন? কি জন্যে?

ধীরেনের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়। ফাইল-পত্র, খবরের কাগজগুলো সব যেন ক্লান্ত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সরলা ব্যাকুল হয়ে সে সব গোছাতে শুরু করে।

হঠাৎ টেবিলের নীচে পড়ে থাকা এক টুকরো কাগজের দিকে তার চোখ পড়ে। ওটাকে তুলে ফাইলে ঢুকিয়ে রাখতে যাবে, কিন্তু ওপরের লেখা দেখে তো চক্ষু স্থির। এখুনি হয়তো তার উৎকণ্ঠার অবসান হবে। কথাগুলোর আড়ালেই সব গোপনতা লুকিয়ে আছে। 'মঙ্গলবার বিকেল চারটের সময়'—সরলা চমকে উঠল। হাতের লেখাটা তার খুবই চেনা চেনা লাগছে। এ কাগজের টুকরোটার সঙ্গে ও ঘটনার কি কোনো সম্পর্ক আছে? পড়লে কেমন হয়, না থাক্, হয়তো কোনো গোপন চিঠি। অন্যের চিঠি, পড়বো? সরলা মনে প্রাণে স্বামীকে ভালবাসলেও ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতা মহিলা অন্যের চিঠি পড়াটা গর্হিত কাজ বলেই মনে করেন। কিন্তু মন যে কিছুতেই মানছে না। ভাবছে, পড়লে কি উনি অসন্তুষ্ট হবেন। আমার বিশ্বাস এটা থেকে ওই ঘটনার বিষয়ে অনেক গোপন তথ্য জানা যেতে, পারে। এমন কোনো কথা নিশ্চয়ই এতে লেখা নেই, যা আমার স্বামী আমার কাছেও গোপন করতে চাইবেন। পড়ে দেখতে দোষ কি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো গোপনীয়তা থাকতে পারে না। আধুনিক সভ্যতার দোহাই দিয়ে এমন সুযোগকে হাতছাড়া করা উচিৎ হবে না। এখানে আমাদের দুজনেরই জীবন মরণের প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। তার মনের গোপন কথা জানার কোনো অধিকার কি আমার নেই? আমিও প্রমাণ করে দেব যে তার হৃদয়ের মতো আমার হৃদয়েও সেই কথা একই ভাবে সুরক্ষিত

থাকতে পারে। আমার তোমার একই পথ। তুমি ছাড়া আমি আর কিছু জানি না, চিনি না। দেবতা আমার!

সরলা চিঠিটা খুলে ফেললো। বয়ান খুবই সংক্ষিপ্ত। পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আঙ্গুলে ধরা সেই কাগজের টুকরোটা হাওয়ায় কাঁপছে, দু-চোখের পলকহীন দৃষ্টি দরজার দিকে। মুখটা কেমন যেন নিষ্প্রাণ, হলদেটে হয়ে গেছে। চিঠির বিষয়বস্তুটা কিছুতেই বুঝতে পারছে না। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ তার চোখের সামনে থেকে রহস্যের পর্দাটা সরে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের চেয়ারটায় কোনো রকমে ধপ্ করে বসে ভাবলে—হায়! তাই ভদ্রলোক কিছুতেই মুখ খুলছেন না, মুখে কুলুপ এটে বসে আছেন। কিন্তু এখন আমার কি করা উচিৎ!

অবশ্য ধীরেনকে এই অপরাধ থেকে বাঁচাতে চিঠিটাই যথেষ্ট। কাউকে কিছু জানাবার দরকার নেই। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গিয়ে এটা দিলেই তিনি পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ওকে খালাস করে দেবেন, কিন্তু তারপর কি হবে! এরপরও আমরা দুজনে দুজনকে আগের মতো ভালবাসতে পারবো?

আবার ভাবে এটা কি উচিৎ হবে! ধীরেন যে কথাকে গোপন রাখতে বিনা দোষে এতবড় শাস্তি মাথায় তুলে নিতে চাইছে, সেই গুপ্ত রহস্যকে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরাটা কি ঠিক হবে? কিন্তু তাই বলে কি এটা সম্ভব! কোনো স্ত্রী কি পারে যে তার স্বামী বিনা দোষে শাস্তির বোঝা বয়ে বেড়াবে, আর সে নীরব দর্শক হয়ে দেখে যাবে। ও সম্পূর্ণ নির্দোষ, ওকে বাঁচানো স্ত্রী হিসেবে আমার কর্তব্য।

মনে মনে যাওয়া স্থির করে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে চারদিকটা ভাল করে দেখে ঘরে গিয়ে একটা চাদর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে সবার অলক্ষ্যে বাইরে বেরিয়ে এলো। চাকর-বাকরেরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। গভীর রাতে জন-মানব হীন গলিগুলোওতেও নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে আছে।

একটু পরে সরলা একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে, একজন মহিলাকে টেবিলের সামনে বসে কিছু লিখতে দেখা যাচ্ছে। সরলাকে দেখেই মহিলা ভুত দেখার মতো চমকে উঠে বললেন—কি ব্যাপার সরলা! তুমি এতো রাতে! কি মনে করে? ধীরেনের শরীর ভাল তো?

সরলা টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বলে—কেন, সেদিনের সেই বোমা-দুর্ঘটনার মামলায় ধীরেনকে মিথ্যে জড়িয়ে যে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে তা শোনো নি নাকি? গোয়েন্দাদের বক্তব্য, সেদিন ঠিক সেই সময় ধীরেনও অকুস্থলে উপস্থিত ছিল। ঘটনাটা ঘটেছে মঙ্গলবার বিকেলে চারটে নাগাদ। ধীরেন পুলিশকে বলেছে, "আমি সে সময়

ওখানে থাকা তো দূরের কথা ঐ দুর্ঘটনার বিষয়ে বিন্দু-বিসর্গও জানি-না।" কিন্তু তখন কোথায় ছিল তা কিছুতেই বলছে না। তাই তোমার কাছে জানতে এসেছি, মঙ্গলবার বিকেলটা ও কোথায় ছিল ?

মহিলা চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। "মঙ্গলবার চারটের সময়! সেদিন তো ও·······।" কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন, তারপর আমতা আমতা করে বললেন, "কেন, ও কিছু বলে নি ? অফিস ছাড়া আর কোথায় যাবে ?"

সরলা—না, ওদিন সে কোর্টেও যায় নি। চুপ থাকার কারণ একটাই তার মান-মর্যাদা-প্রতিষ্ঠা সব ধূলোয় মিশে যাবে তাই। সাধু সাজবার চেষ্টা করো না। তুমি ভেবেছো আমি জানি না ? এই দেখো।

একথা বলেই সরলা চিঠিটা তার দিকে ছুড়ে দিলেন।

মহিলা প্রায় ঝাপিয়ে পড়ে চিঠিটা হাতে তুলে নিয়ে প্রায় এক নিশ্বাসে পড়ে নিলেন। তারপর একটু বেপরোয়া ভঙ্গীতেই বললেন—আমি বদনামের ধার ধারি না। হ্যাঁ, ধীরেনকে আমি ভালবাসি। আমাদের এ প্রেম বহুদিনের।

দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সরলাই প্রথম মুখ খুললো তাচ্ছিল্যের সুরে বল্লে তাহলে ওকে রক্ষা করছো না কেন! এ চিঠিটা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দিলেই ও এখুনি ছাড়া পেয়ে যাবে।

একথা বলেই ওখান থেকে ক্লান্ত পায়ে সোজা নিজের শোক-আলয়ে ফিরে এলো।

ভোর হয়ে এসেছে, সরলা তবু দুচোখের পাতা এক করে নি। ধীরেনের জন্য আর তার কোনো চিন্তা নেই। সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু এখন আরও একটা প্রাণঘাতী চিন্তায় সে হাবু-ডুবু খাচ্ছে।

"আর একটু পরেই ও আসবে। তখন আমি কি করবো। ওর সঙ্গে দেখা করবো কি-না ভাবছি! কি লাভ। যখন জেনেই গেছি ও আমাকে কোনো দিনই ভালবাসে নি, আর আজও বাসে না। তাহলে, কোন মুখে ওর সামনে যাব ? যদ্দিন ভালবাসার স্বপ্নে বিভোর ছিলাম, তদ্দিনইওকে বিশ্বাস করতাম। আজ সব শেষ হয়ে গেছে। এখন আমার বেঁচে থেকেই বা কি লাভ। কিসের আশায় বাঁচবো! আমার মনের প্রেম-ভালবাসা, আনন্দ-স্ফূর্তি সবই তো ওকে ঘিরেই ছিল। স্বামীর সুখেই স্ত্রীর সুখ। স্বামী-সোহাগিনী হওয়া তো স্ত্রীর পরম সৌভাগ্য। আজ আমি তো সে সুখ হতে বঞ্চিত, তাই না ?"

সরলা জানালা দিয়ে বাইরে বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন একপা-দুপা করে অন্ধকার ভবিষ্যতের বিশাল প্রান্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মনের যত অনুভব শক্তি সব যেন হারিয়ে ফেলেছে। খিদে-তেষ্টা, ঘুম-ক্লান্তি সব কিছুর প্রয়োজন যেন

চিরতরে তার শরীর থেকে কোথায় উধাও হয়ে গেছে! ঢিমে তালে বেলা বেড়ে চলেছে, তখনো সরলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন। এখনো ধীরেনের কোনো খবর পাওয়া যায় নি, কিন্তু তাই বলে সরলা সেজন্য খুব একটা চিন্তিত নয়। সে শুধু ভাবছে মনের কথা কাউকে বলবেন বলে মনে হয় না। সেদিক থেকে একেবারেই কাণ্ডজ্ঞানহীন। এই যেমন আমার কথাই ধরা যাক্—আমি কোথায় যাচ্ছি, কি করছি, কেমন আছি, কি ভালবাসি ভুলেও কখনো জিজ্ঞেস করেন নি। টাকা দিয়েই খালাস। সংসারের দিকে কোনো দিনই ফিরে দেখার ফুরসত হয়নি। ভাবখানা এই, 'যা করবে তুমি করো,' তারজন্যে কোনো দিন কোন কৈফিয়ৎ চান-নি। জগৎ-সংসার সম্পর্কে সব সময় কেমন যেন উদাসীন-অবহেলা। এমন কি দুর্গা পুজোর সময়ও নিজের হাতে কোনো উপহার এনে সরলাকে দেন নি। সরলা ভাবতো ওর সময় কোথায়? মামলা-মোকদ্দমা-নথি-পত্রেই সব সময় ডুবে আছেন! নয়তো সরলা যে তার কাছে কি তা একমাত্র সরলাই জানে! প্রেমের প্রতিমা বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আজ স্বামীর এই উদাসীন ভাব তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। অন্য মহিলার প্রতি প্রেম-পাশে আবদ্ধ। ভালবাসাই যেখানে নেই, সেখানে শুধু সামাজিক সম্পর্কের কি দাম? এত উদাসীনতা, নির্দয়তা নীরবে সহ্য করে আজও স্বামীর জন্যেই তার হৃদয়ে আসন পাতা আছে। সেখানে আর কারোর স্থান নেই। কেটে ফেললেও তাদের দুজনের আত্মাকে আলাদা করা যাবে না। মনে হয় এই বহুমুখী ঈর্ষার লেলিহান শিখা অন্তরের তীব্র জালার ঘৃতাহুতি পেয়ে বেড়ে চলেছে, প্রতিহিংসার শক্তির কাছেই হবে তার উৎকট ভালবাসার পরীক্ষা।

অনেকক্ষণ ধরে ভাবনা-চিন্তা করার পর সরলা স্থির করলো—জানি স্বামী ছাড়া আমার আর কেউ নেই, তবু তাকে আর আমার সঙ্গে জড়িয়ে রাখবো না। এতদিন না জেনে তাকে জোর করে ধরে রেখেছিলাম। আর নয়, এবার ওকে মুক্তি দেব, মিথ্যে বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তো লাভ নেই। বাকী জীবনটা যাতে আরামে কাটাতে পারে তা দেখা তো আমার কর্তব্য। ওর সুখের পথে কাঁটা হয়ে বাঁচতে চাইনে। ওর তৃপ্তিতেই আমার তৃপ্তি।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে দশটা বেজে গেছে তা খেয়ালই করে নি। সেই থেকে সরলা ওখানেই বসেই আছে। হঠাৎ একটা গাড়ীর শব্দ শুনতে পেয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে, ধীরেন বসে আছেন। সরলার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পেটা হচ্ছে, নিষ্প্রাণ মড়ার মতো বসেই আছে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল, একটু বাদেই ধীরেন ঘরে এসে দাঁড়ালো। সরলা চুপ-চাপ পুতুলের মতো বসে আছে, কোন সাড়া-শব্দ নেই। ধীরেন পাশে এসে দাঁড়িয়ে দুহাতে সরলাকে জড়িয়ে ধরে বলেন—

সরলা তোমায় আমি খুব কষ্ট দিয়েছি তাই না!

সরলা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে স্বামীর কাছ থেকে একটু তফাতে সরে গেল। ধীরেন যেন একটু অবাক হয়ে বললেন—পুলিশের বোকামিটা দেখলে! যাক্‌গে বাবা, যা হবার হয়ে গেছে। বাড়ীতে এসে যে আমার সরলা-সুন্দরীর মুখ দেখতে পেলাম আমার সব ক্লান্তি দূরে সরে গেছে। সারাটা রাত যা করে কাটলো কি বলবো!

সরলা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি ধোকাবাজ! ধীরেনের চোখ-মুখে কিন্তু কোনো পরিবর্তনের ছাপ পড়েনি। আগের মতই বেপরোয়া স্বাধীন ভাব, যেন কিছুই হয়নি। সরলার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

কঠোর স্বরে বলে—তুমি ওখানে না গিয়ে এখানে কেন?

ধীরেন আশ্চর্য হয়ে বলেন—সে কি সরলা? তোমার কাছে না এসে আর কোথায় যাব! আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না! কি হোল! মনে হচ্ছে আমাকে দেখে তুমি খুশী হও নি?

সরলা—ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে, না-কি না?

ধীরেন—কার কথা বলছো বলতো? তোমার কথার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

সরলা—শোনো, সব জেনে-শুনেও না জানার ভান করো না। চালাকি করে এখন আর কোন ফল হবে না। গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢেলে কি লাভ বলো? আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাওয়াই বোধ হয় ঠিক হবে। পুরো ব্যাপারটাই আমায় কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। হ্যাঁ তোমার টেবিলের নীচে পড়ে থাকা একটা চিঠি থেকেই সব জেনেছি। চিঠিটা তোমার প্রেমিকার হাতেই তুলে দিয়েছি, সে বোধহয় ওটা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সামনে পেশ করেছে। যাক্ গে আমার সঙ্গে ছল-চাতুরী করার কোন দরকার নেই। স্বেচ্ছায় তোমাকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি। তুমি সুখী হও। আফশোষ একটাই, আরও আগে একথা জানতে পারলে তোমাকে অনেক আগেই আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে যেতাম। মনের বন্ধনই যেখানে নেই, সেখানে সামাজিক বন্ধনকে জোর করে ধরে রেখে কি লাভ?

ধীরেন সরলার কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চান। কিন্তু না, পালিয়ে গেলে চলবে না, ওর ভুল ভাঙিয়ে দিতে হবে। তিনি ভাবতে থাকেন,—"চিঠিটা নষ্ট না করে ফেলে যে কি বোকামিই করেছি!" তাই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সেই চিঠিটা দেখে তিনি ভাবছিলেন, "এটা এখানে কি করে এলো?" এখন বুঝতে পেরে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে সরলাকে প্রায় খোশামদ করে বলেন—সরলা, প্রিয়তমা! আমি সত্যিই খুব লজ্জিত, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে, ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! কিন্তু তুমি

আমাকে ক্ষমা করো সরলা! যে শাস্তি তুমি আমাকে দেবে তাই মাথা পেতে নেবো, শুধু তুমি আমায় ছেড়ে চলে যেও না! লক্ষ্মীটি! কি গো, আমায় ক্ষমা করবে না? আর কারো কানে এ কথা গেলেই চাউর হয়ে যাবে, তখন আমারই বিপদ। এতদিন যা হোক করে চাপা ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খুবই বুদ্ধিমান লোক। চিঠিটা দেখে তিনি আমাকে খালাশ করে দিলেন, তবে ওটা কোর্টে পেশ করেন নি। কিন্তু জান তো, দেয়ালেরও কান আছে। এককান, দুকান থেকে পাঁচকান হবেই, ব্যস সবাই তো এই সুযোগেই রয়েছে! পাব্‌লিক তো অন্যের দোষ বের করতে পা বাড়িয়েই আছে, তখন আমায় দেখবে আর দাঁত বের করে হেসে আঙ্গুল তুলে দেখাবে। আমার মুখ চেয়ে ও কথা আর কোন দিন তুমি মুখে এনো না। মানুষেরই তো ভুল হয় বলো! এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, তুমি চাইলে আর কোনদিন ওর ত্রিসীমানায় যাব না।

সরলা—কেন, ওকে তুমি ভালবাস না? ওর জন্যে তো তুমি মিথ্যে অপবাদ নিয়ে জেলে এমন কি দ্বীপান্তরে যেতেও রাজী ছিলে, আর এখন বলছো ওর ত্রিসীমানায় যাবো না। কেন, এত তাড়াতাড়ি প্রেমের নেশা কেটে গেলো। না, না, ওসব কথায় আর আমি ভুলছিনে। তুমি মনের আনন্দে থাক। পথের কাঁটা হয়ে কারোর পায়ে বিঁধতে চাইনে। কোনো বাঁধা আমার কাছ থেকে পাবে না। এ ঘর সংসার সবই তো তোমার! তুমি যাতে সুখী হও তাই করা উচিৎ।

ধীরেন চেয়ারে বসে পড়ে করুণা ভিক্ষা করে বলেন—সরলা, আর সহ্য করতে পারছি না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি ওসব কথা আর বলো না! লজ্জায়, অনুশোচনায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। কথা দিলাম, ওর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না। আর আমায় তুমি দুঃখ দিও না সরলা। তুমি তো সবই জান, যে এ কথাকে গোপন রাখতে নিজের কতদূর ক্ষতি স্বীকার করতে রাজী ছিলাম! যদিও মঙ্গলবারের ঐ দুর্ঘটনার সঙ্গে মিথ্যে আমার নাম জড়ানো হয়েছিল, কিন্তু কোনো রকম প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তবু দ্বীপান্তরে চালান করা হবে শুনেও আমার মনে দুঃখ বা ক্ষোভ কিছুই হয় নি। এখন কত রকম গুজব ছড়াবে কে জানে! এর চেয়ে দ্বীপান্তরে যাওয়াই ভাল ছিল। কোনো কিছু শুনতে হোত না।

সরলা—সাগরে পেতেছ শয্যা শিশিরের কিবা ভয়! জেনে-শুনে নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছো, বদনামের ভয় তো তোমার মতো বীরপুরুষের শোভা পায় না! সত্যিকারের ভালবাসা তো সমাজ-টমাজের তোয়াক্কা করে না!

ধীরেন—কি বলছো সরলা? সামাজিক ভর্তি স্বয়ং ঈশ্বরের ভয়ের চেয়েও সাংঘাতিক! তুমি এরকম করলে আমার প্রেস্‌টীজ ধূলোয় মিশে মুখে-চূণকালি পড়বে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। তখন সমাজের কাছে কি জবাব দিহি করবো সরলা!

তুমি রেগে গেছো, তাই রাগ পড়লে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবে। সংসারে এরকম মহিলা খুব কমই আছেন, যাকে এ রকম ঝড়-ঝঞ্ঝার মোকাবিলা করতে হয় নি। হ্যাঁগো, বিশ্বাস করো, একটুও বাড়িয়ে বলছি না। ভবিষ্যতে সমাজের অনেকেই এ নিয়ে নানান কথা বলবে, কিন্তু সবই পর্দার আড়ালে। অন্যে যাই বলুক না কেন, তুমি তো আমায় ভালবাস, না-কি? সেই ভালবাসা দিয়ে আমার সব কলঙ্ক মুছে দিয়ে আবার কাছে টেনে নাও সরলা। ভুলে যাও, সব ভুলে যাও! কথা দিলাম সরলা, এমন সুযোগ আর আসবে না।

একথা বলে ধীরেন বাইরে পা বাড়ালেন। সরলা ওখানেই চুপচাপ বসে ভাবছে— এই তো আমাদের সমাজ ব্যবস্থার হাল, বজ্র আটুনি, ফস্কা গেঁরো।

অদ্ভুত প্রতিশোধ

প্রায় বিশ বছর আগে বুন্দেল-খণ্ডের কোনো এক জেলায় শিবনাথ নামে একজন বিশ্বস্ত খঙ্গার থাকতো। কুস্তি-লাঠিখেলা-তরোয়াল চালাতে তার জুড়ি মেলা ভার। থানার চৌকিদার, মাস গেলে মোটে তিনটে টাকা মাইনে পেতো। সস্তা-গণ্ডার দিন, তাই ও টাকাতেই তার হেসে-খেলে চলে যেতো।

শিবনাথের গাঁয়ের নম্বরদার লম্পট লালসিংহ, চোখে-মুখে শেয়ালের ধূর্ততা। গাঁয়ের বৌ-ঝিয়েরা ওর নাম উঠলেই থু-থু ফেলতো, 'চোখ-দুটো পচে-গলে পড়ুক' এই কামনাই করতো। তার জ্বালায় তারা স্বস্তিতে ঘাটে-পথেও যেতে পারতো না। একদিন ঘুরতে ঘুরতে শিবনাথের বাড়ীর কাছে আসতেই তার নজর গিয়ে পড়লো শিবনাথের বৌয়ের দিকে। শিবনাথ তো থানায় চলে যায়, এই সুযোগে নারীমাংস ললুপ নম্বরদারও নিজের কাজ গুছিয়ে নেয়। হতভাগিনী খঙ্গারিনও একটু একটু করে লালসিংয়ের জালে ফেঁসে গেল।

বেশ কিছু দিন ধরেই কথাটা চাপা রইলো, কিন্তু কথায়ই আছে যে খারাপ কথা হাওয়ার আগে দৌড়োয়। গাঁয়ে কানা-ঘুষা হতে থাকে। ক্রমে শিবনাথের কানেও যায়। সে বেচারাও কিছুদিন ধরে বৌয়ের তিরিক্ষি মেজাজ দেখে সমস্যায় পড়ে-গিয়েছিল। ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হোল। লালসিংহের কাছে গিয়ে হাত

জোড় করে বলে—ঠাকুর সাহেব, আপনি গরীবের মা-বাপ হুজুর, আমার মান-সম্মান সবই আপনার হাতে। গাঁয়ের পাঁচজনে নানান কথা বলছে, আমার তো তিষ্টোনোই দায় হয়ে উঠেছে। এমন কিছু করুন যাতে আমিও থাকতে পারি আর আপনার গায়েও কাদা না লাগে।

কিন্তু লালসিংহ তখন খঞ্জারিনের প্রেমে পাগল। শিবনাথকে গালাগাল, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল।

শিবনাথের তো মাথায় খুন চড়ে গেলো, তবু নিজেকে কোনো রকমে সামলে নিয়ে থানার দারোগার কাছে সব কথা জানালো। দারোগা সাহেবও লালসিংকে থানায় ডেকে পাঠালেন, সন্ধ্যেবেলা তাকে গোঁফে তা দিয়ে ফিরতে দেখা গেলো। শ' খানেক টাকা দিয়ে সে দারোগার মুখ বন্ধ করে দিতেই তিনি তাকে নির্দোষী বলে সাব্যস্ত করলেন। গরীব শিবনাথ নিরাশ হয়ে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হোল। এ ছাড়া অন্য পথ নেই। এমন শাস্তি দিতে হবে যাতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

আরও কিছুদিন কেটে গেলো। শিবনাথ নিজের ঘরেই অপরিচিত মেহমানের মতো থাকে। আসে যায়, কিন্তু পারত পক্ষে কারো সঙ্গেই কোনো কথা বলে না। এই ঘর-দোর মায় ঘরণীটিকে পর্যন্ত লালসিংহ দখল করে বসে আছে।

এক'দিন শিবনাথ বৌকে ডেকে বলে—আপিসের কাজে মৌদহা যাচ্ছি গো, ফিরতে দু চার দিন দেরী হবে, সাবধানে থেকো।

বোকা বৌটা স্বামীর মনোভাব বুঝতেই পারলো না, কথা শুনেই খুশীতে চোখ দুটো চকচক করে উঠলো, সেই সঙ্গে ঠোঁটের কোণে মুচ্‌কি হাসি। হাসিটা শিবনাথের কল্‌জেতে বরশির মতো গিয়ে বিঁধলো। যাই হোক, দু-চার দিনের মতো চাল-ডাল বেঁধে নিয়ে রওনা হোল, ওদিকে লালসিংহের তো পোয়াবার। চার-পাঁচদিন মহা আনন্দে কাটানো যাবে।

গভীর রাত পর্যন্ত শিবনাথ তার বাড়ীর পেছনের ঘন জঙ্গলটাতে আত্মগোপন করে রইলো। ভোজালিটাকে আগে থেকে খুব ভাল করে শান দিয়ে রেখেছিল। দু-চারবার তা পরখ করেও দেখে নিলো। রাত দুপুরে ডাহুক ডেকে উঠলো শিবনাথও ভোজালিটা হাতে নিয়ে বাড়ীর পথে পা বাড়ালো। গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। হনুমানের মতো লাফিয়ে ঘরের চালে চেপে বসলো, তারপর উঠোনে লাফিয়ে পড়লো। ভেতরে গিয়ে দেখলো, লালসিংহ আর তার বৌ স্বপ্ন সাগরে সাঁতার কাটছে। কোনো রক্ত-মাংসের মানুষ কি এ দৃশ্য দেখে নিজের মাথা ঠিক রাখতে পারে? চীৎকার করে ওঠে—শয়তান লালসিং! দেখি তোকে কে বাঁচায়?

পুরো ব্যাপারটা বোঝবার আগেই লালসিংহের ঘাড়ে এসে পড়ে ভোজালির এক কোপ, মাথাটা আলাদা হয়ে যায়। খঙ্গারিন তো ভয়ে শিবনাথের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে।

শিবনাথ তাকে শুধু এই কথা বলে—লজ্জা থাকলে গলায় কলসী বেঁধে মরগে যা!

একটা মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলতে তার মন সায় দিল না।

রাতটা তো যাই হোক করে কাটলো। ভোর হতেই একহাতে কাটা মুণ্ডুটা আরেক হাতে রক্ত মাথা ভোজালিটা নিয়ে থানায় এসে দারোগা সাহেবের সামনে মুণ্ডুটা রেখে বলে—ভোজালিটা কিন্তু আমার সঙ্গে বেইমানি করেনি। নিন, ধরুন। আজ থেকে খঙ্গার শিবনাথ পুলিশের শত্রু। আসুথ দেখি কার হিম্মত আছে। পরে বলবেন না যে শিবনাথ চৌকিদার চোরের মতো এসেই চলে গেছে। কে আসিস, আয়, দেখে নেবো সব বেটাদের!

জনা কুড়ি তাগড়া জোয়ান ঘরের মধ্যে বসেই রইলো, এক শিবনাথকে মোকাবিলা করার সাহস তাদের কারোরই হোল না।

দুই

ওদিকে শিবনাথ তো চারদিকে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিলো, তার নাম করে এখন মায়েরা ছেলেদের ঘুম পাড়ায়, 'ঐ ডাকাত শিবে এলো বলে।' আশে-পাশের গাঁয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। একের পর এক গাঁয়ে লুটতরাজ, খুন-খারাপি, অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে। কত নম্বরদারের বংশ যে নির্বংশ হোল তার লেখাজোখা নেই। টাকা-পয়সা নয় শুধু নম্বরদারের লাল তাজা রক্ত দেখলেই তৃষ্ণার্ত বুকটা ঠাণ্ডা হয়। সে যেন লোকের কাছে সাক্ষাত যম, তার নাম শুনেই লোক থর থরিয়ে কাঁপতে থাকে। একটা শিবনাথই জেলা জুড়ে সোরগোল তুললো। সন্ধ্যে হতে না হতেই সবাই যে যার দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকে, জনমানবহীন রাস্তা যেদিকে তাকান যায় সেদিকেই শিবনাথ। আজ এ গাঁয়ে ডাকাতি করে তো কাল যায় পঞ্চাশ মাইল দূরে গাঁকে আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দিতে। বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের তো মাথা নীচু হয়ে গেল। দিন-দুপুরে ওর হুকুম আসতো যে আজ শিবনাথ সিংহ ওমুককে স্মরণ করেছেন, তার আসতে যেতে ত্রুটি ঘটলে অনর্থ ঘটবে। যে তার আজ্ঞা লঙ্ঘন করবে, তার ঘাড়ে আর মাথাটা থাকবে না। ওর শক্তি আর সাহসের কথা শুনে লোকের গায়ে কাঁটা দিতো। দু-পাটি দাঁত দিয়ে খোলা তলোয়ার চেপে হাতীর মাথায় চড়ে বসাটা তো ওর কাছে জল-ভাত, এছাড়া চোরের মতো লুকিয়ে বেড়ায় না। রাত্রিতে কোনো মাঠে তার মেহফিল বসতো, সারা রাত ধরে পাহাড়ী গানের সুর ভেসে আসতো।

তিন টাকার কেরাণী শেঠ-শাহুকার বড় বড় জমিদারদের কাছ থেকেও খাজনা আদায় করতো।

একদিন শিবনাথ এক সম্পন্ন গয়লার ঘরে ডাকাতি করে যথাসর্বস্ব নিয়ে যাবার সময় গয়লা তার পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে বলে—গুরু, যখন আমার সবকিছুই তোমার সঙ্গে যাচ্ছে তখন এ অধমকেও নিয়ে চলো!

শিবনাথ তার শরীরের বাঁধন দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো। মরদ তো নয়, যেন বাঘ। বাঘের মতো ঘাড়, গণ্ডারের মতো চওড়া বুক, টকটকে ফর্সা রং। কিছুক্ষণ পর সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে—ঠিক বলছো?

গয়লা—হ্যাঁ।

শিবনাথ—তোমার নাম?

গয়লা—দঙ্গল।

শিবনাথ—আজ থেকে তুমি দঙ্গল সিং

গয়লা—আশীর্বাদ করো, যেনো এ নামের মর্যাদা রাখতে পারি।

শিবনাথ—দেখে তো তোমায় সাচ্চা মরদ বলেই মনে হচ্ছে। বেইমানি করবে না তো?

দঙ্গল—জাত মরদ কি কখনো বেইমানি করে? মারলে, বলে কয়েই মারবো।

শিবনাথ দঙ্গলের সব জিনিস-পত্র ফিরিয়ে দিয়ে তক্ষুনি বন্ধুত্ব পাতিয়ে প্রতিজ্ঞা ভিত্ত স্থাপন করলো, মৃত্যু ছাড়া আর কেউই তাদের সে বন্ধুত্বে চির ধরাতে পারেনি। যাই হোক, আগে একা রামেই সবাইকে অস্থির করে তুলেছিল, তার আবার সুগ্রীব দোসর হোলো। শিবনাথের জ্বালায় তো এতদিন ধরে জেলার লোকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, এখন তারা দু'জনে মিলে প্রচণ্ড তুফানের তাণ্ডব তুললো। শিবনাথ আর দঙ্গলের নাম শুনলেই লোকের বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

তিন

এভাবে তিনটে বছর কেটে গেলো। দুই ডাকাতের বীরত্ব ভোজ-বাজির সমান। শ'য়ে শ'য়ে লোকের মাঝখান থেকে বিদ্যুতের চমকের মতো চক্ষের নিমেষে উধাও হয়ে যায়। ওদের অত্যাচার পুলিশের লোকের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। স্বয়ং দারোগা ও ইন্সপেক্টর সাহেবও ওদের নজরানা পাঠান।

একদিন সন্ধ্যেবেলা দুজনেই একটা টিলার ওপরে বসে আছে। হঠাৎ ওখান থেকে নজরে এলো, একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে আগে চলছে, পেছনের পালকীতে তার স্ত্রী ও বাপের বাড়ী থেকে ফিরে যাচ্ছে।

দঙ্গল বলে ওঠে—ওস্তাদ, দেখে মনে হচ্ছে বেশ মালদার শিকার। শিকারটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

পরামর্শ করে দুজনেই টিলা থেকে নেমে এসে ঘোড়-সওয়ারীকে জিজ্ঞেস করে—ঠাকুর সাহেবের কোত্থেকে আসা হচ্ছে? আর এগিয়ে যাওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না। সামনেই ডাকাতের আস্তানা। সন্ধ্যে হতে না হতেই তাদের উৎপাতও বেড়ে চলে, তখন যাওয়াই মুশকিল হবে। তাই বলছিলাম কি....।

ভদ্রলোকের নাম ধনীসিং। সে বলে—যেতে কি আর আমারও মন চাইছে ভাই, কিন্তু থামবার মতো কোন জায়গা তো নজরে পড়ছে না।

দঙ্গল—কেন? এ গাছের নীচে কুঁয়ো রয়েছে, কেমন পাতার ছাউনি রয়েছে, আর কি চাই!

ধনীসিং—তোমরা কে ভাই?

দঙ্গল—তোমার মতো আমরাও পথিক, ভাই। আজ রাতটা এখানেই কাটাবো ভাবছি।

ধনীসিং—বেশ। তা এর কাছে-পিঠেই একটা গাঁ আছে না?

দঙ্গল—আরে ভাই, আগে ঘোড়া থেকে তো নামো। তোমার থাকবার কোনো অসুবিধে হবে না, এক্ষুনি সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বাঃ! তোমার বন্দুকটাতো বেশ! দাও, আমার হাতে দিয়ে তুমি নেমে পড়ো।

ধনীসিং না বুঝে ওর ফাঁদে পা দিয়ে ফেললো। বন্দুকটা দঙ্গল সিংয়ের হাতে দিয়ে দিতেই তারা অন্য মূর্তি ধরলো! শিবনাথ ধনী সিংকে ঘোড়া থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেললো, বেহারারা এ দৃশ্য দেখে পাল্‌কী নামিয়ে রেখে যে যেদিকে পারলো পালিয়ে গেল। ওদিকে পাল্‌কীর পর্দা উঠিয়ে বাইরের দিকে উঁকি দিয়ে তো ধনীসিংয়ের স্ত্রীর চক্ষুস্থির! বাইরে বেরিয়ে এসে কুঁয়োতে লাফিয়ে পড়লো। ধনীসিংয়ের চোখদুটো ভাঁটার মতো জলছে। বলে—আমার সঙ্গে বেইমানি করলে ইয়ার!

দঙ্গল—মুখের কথায় কাজ হলে ভাল, তবে, এটা জেনে রেখো, মেয়েদের গায়ে আমরা কখনো হাত দিই না।

ধনীরাম—আমাকেই বা বাঁচিয়ে রাখছো কেন?

দঙ্গল—কেন? বিশ্রাম করবে বলেছিলে না? তাই করো।

ধনীরাম—জেনে রাখিস শয়তান, আমিও ঠাকুরের বেটা ঠাকুর। কি করে বদলা নিতে হয়, তা আমিও জানি।

দঙ্গল—আরে যা যা! লাখ লাখ দুশমন্ নিয়ে আমাদের কারবার। জানবে

আজ থেকে আর একটা বাড়লো। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ! ছোঃ!

ধনীরাম—ঠিক আছে, সাবধানে থাকিস। আমার সঙ্গে বেইমানির প্রতিশোধ বেইমানি করেই তুলবো। তুমি ঘুঘু দেখেছো, এখনো ফাঁদ দেখোনি!

চার

এ ঘটনার প্রায় মাসখানেক পর, তারা খবর পেল যে জগত সিং নামে আর এক ডাকাত চারদিকে রাহাজানি শুরু করেছে। তার বুদ্ধির কাছে শিবনাথ ও দঙ্গলসিং নাকি এখনো শিশু। কিন্তু তাই বলে খুন-জখম, লুটতরাজ এসব কিছুই করতো না। ঝড়ের মতো হা-রে-রে শব্দে এসে হয়তো গোটা গ্রামটাকে ঘিরে ফেললে তারপর বন্দুকের শব্দে, বারুদের গন্ধে গোটা এলাকাটায় সন্ত্রাসের সৃষ্টি হোত। দু-চারটে পুরোনো ঝুপরীতে আগুন লাগিয়েই ক্ষান্ত হোত। কারো কোনো ক্ষতি করেছে বলে কেউ শোনেনি। এ উঠতি ডাকুর টাকা-পয়সা বা রক্তের পিপাসার বদলে 'ডাকাত' খ্যাতি লাভের ইচ্ছাটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল।

একদিন শিবনাথকে ডেকে দঙ্গল বলে—ওস্তাদ্, আর এক নতুন খেলোয়াড়ের পয়দা হয়েছে, শুনেছো তো!

শিবনাথ—হু! পাক্কা খেলুড়ে! বুকে পাটা আছে বলতে হয়!

দঙ্গল—ওর সঙ্গে হাত মেলালে কেমন হয়?

শিবনাথ—লুট-তরাজ তো শুনছি ভালই করছে। তা মন্দ হয় না!

দঙ্গল—বলতো আজই খবর পাঠাই।

শিবনাথ—পাঠাতে পারো, কিন্তু সাবধান!

শিবনাথের চর জগৎ সিংয়ের কাছে গেলে সে তো খুশীতে ডগমগ। কথায় বলে, মনের হাসি চোখে খেলে। এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, মনের ইচ্ছে পুরণ হয়েছে। যাই হোক মনের ভাব গোপন রেখে চরকে বলে—ওস্তাদকে আমার সেলাম জানিয়ে বলো, আমি তার দীন সেবক, হুকুম করলেই হাজির হবো। তার মতো গুরু পাওয়া তো সৌভাগ্যের কথা! জীবনভর তার সেবা করে যাব।

তিন দিনের দিন তারা দুজনে কোনো এক নদীর ধারে জগত সিংয়েয় সঙ্গে দেখা করতে এলো। ওকে দেখে দঙ্গলের তো প্রায় মাথা ঘুরে যাবার জোগাড়, শিবনাথ মনে মনে চমকে উঠলেও হাব-ভাবে তা প্রকাশ করলো না। এ জগত সিং আর কেউ নয়, এ সেই ঠাকুর ধনীসিং।

ধনীসিং—ওস্তাদ নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পেরেছেন?

শিবনাথ—হ্যাঁ। তা কবে থেকে তুমি……?

ধনীসিং—সেই যেদিন আপনার দর্শণ পেয়েছিলাম সেদিন থেকেই।

শিবনাথ—পুরোনো কথা মনে রেখো না, যা হবার হয়ে গেছে, ভুলে যাও।

দঙ্গল—হ্যাঁ ভাই, সব ভুলে না গেলে তো আমাদের সঙ্গে তোমার মনের মিল হবে না। সাচ্চা দোস্তের মতই আমরা তোমার সাহায্য চাই।

ধনীসিং গম্ভীর ভাবে বলে—ওস্তাদ সিংহের মনে কখনো কোনো প্রতিহিংসা জমা থাকে না।

শিবনাথ—আজ থেকে তাহলে তুমি হলে আমাদের ভাই। হাত মেলাও।

ধনীসিং—হ্যাঁ ওস্তাদ, তোমার যোগ্য সাকরেদ হলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। পুরোনো দিনের কথা ভুলে আমাকে তুমি তোমার দলে নাও ওস্তাদ।

তিনজনেই একে অন্যকে আলিঙ্গন করে। তারপর সারারাত ধরে খুশীর ফোয়ারায় নিজেদের মনটাকে ভিজিয়ে নিলো।

পাঁচ

বছর খানেক কেটে গেলো। তিন ডাকাতে মিলে সারা জেলাকে প্রায় তছ্‌নছ করে দিল। রাত-দিন, অন্ধকার-আলো বলে কিছু নেই! দিন-দুপুরে গৃহস্থের যথা সর্বস্ব লুট-পাট করে নিয়ে যায়, তাও আবার আগে থেকে খবর দিয়ে। প্রলয়ের তাণ্ডবের সঙ্গে যেন কাল ব্যাধিরও আবির্ভাব। ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডবের সঙ্গে যেন বজ্রপাতের গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছে।

দোলের দিন এক শেঠের বাড়ীতে ডাকাত পড়লো। বাড়ীতে সেদিন সবাই আনন্দে মশ্‌গুল। তার আবার রংয়ের সঙ্গে ভাঙের নেশা একাকার হয়ে গিয়েছে। ডাকাতদের আর আনন্দ দেখে কে! গৃহস্থের যথাসর্বস্ব ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল।

দঙ্গল সিং বলে—গুরু, আজকের দিনটায় বেশ জমাটি হোলীর আসর বসালে কেমন হয়?

শহরের নামকরা বাইজি এলো। দামীমদ-পেয়ালা সব আনা হয়েছে, আয়োজনের কোনো ক্রটী নেই। সন্ধ্যেবেলা মদের বন্যা বয়ে গেল সেই সঙ্গে তবলায় বোল যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শীশমহলে বাইজিদের মিষ্টি সুর আর নুপুরের ঝনক্ ঝনক্ শব্দ যেন তাদের প্রাণে খুশীর ঢেউ তুললো। চোখে আবেশ, ঠোঁটে পেয়ালার আলতো ছোঁয়া। এভাবে কতক্ষণ কাটলো কে জানে? দঙ্গলের দুচোখ জুড়ে নেশার ঘোর। বলে—আমি এখন শোবো। আমায় ধরে নিয়ে যায় কার বাপের সাধ্যি!

হালকা নেশা হলেও শিবনাথ কিন্তু মাতাল হয়ে পড়েনি। ধনীসিংকে বলে—ভাই, দঙ্গল তো কাল ভোরের আগে উঠবে বলে মনে হয় না। তুমিও তো দেখছি ঢুলছো।

আর কাউকে তো বিশ্বাস করা যায় না। তুমি বরং একটু ঘুমিয়ে নাও। তারপর তুমি জেগে পাহারা দেবে, তখন আমি না হয় ঘুমোবো।

একথা বলে সে বন্দুকটা হাতে নিয়ে পাহাড়ের আশে-পাশে পায়চারী করতে থাকে। রাতের ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় নেশাটা যেন জাঁকিয়ে এলো। একটা বড় পাথরের গায়ে হেলান দিয়েই ঝিমুতে শুরু করে। ধনীসিং উঠে বসে। সেও জাত খেলুড়ে, সে দিনের সেই কথা সে ভুলে যায়নি। বন্দুকে গুলি ভরে দঙ্গল সিংয়ের শিয়রের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গর্জন করে ওঠে—এবার যাবি কোথায়? দেখি, কে তোকে বাঁচায়।

দঙ্গল সিং কোনরকমে উঠে দাঁড়ায় কিন্তু তৎক্ষণে একটাগুলি তার বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। সে পাথরের ওপর পড়ে কিছুক্ষণ ছটফট করে, তারপরই সব শেষ হয়ে যায়। এদিকে বন্দুকের শব্দ শুনতে পেয়ে শিবনাথ সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে ধনীসিং বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে! সে একটা পাথরের আড়ালে গিয়ে বলে—বেইমান! শেষে তুই-ই ··· ····।

ধনীসিং—হ্যাঁ, বেইমানের বদলা বেইমানি।

শিবনাথ—আমি তখনই তোকে সন্দেহ করেছিলাম, শুধু ঐ দঙ্গলটার জন্যে·······।

ধনীসিং—বুঝতে পারলে আর এভাবে ধরা দিতে না শয়তান।

দুজনেই দুজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু দুজনেই অক্ষত থাকে। হঠাৎ দুদিক থেকে অনেক লোক হৈ-চৈ করতে করতে এসে হাজির হয়। ধনীসিং শিবনাথকে ধরতে চেয়েছিল, কিন্তু সে সবায়ের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল।

এভাবে ধনীসিং তার সযত্নে লালিত প্রতিশোধকে চরিতার্থ করলো, সেই সঙ্গে সকলেই সস্তির নিশ্বাস ফেললো। এরপর বেশ কয়েক বছর ধরে ধনীসিংয়ের বাড়ীতে পুলিশ পাহারা বসলো, সে কোথাও গেলে পুলিশই তার দেহরক্ষীর কাজ করতো। তবু শিবনাথ হাল ছাড়েনি। দিনান্তে অন্তত একবারও সে ধনীসিংয়ের বাড়ীর চারধারে চক্কর দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তো, কিন্তু একটাও কাজে লাগে নি।

ধনীসিংকে সরকারের তরফ থেকে জায়গীরদার করা হয়েছে। তার ছেলেই এখন তা ভোগ করছে। কিন্তু শিবনাথের যে কি হোলো তা কেউই বলতে পারে না। তবে সে যে ডাকাতি ছেড়ে দিয়েছে এ বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ। কেউ কেউ এখনো বলে সে নাকি বৈষ্ণব হয়ে পুরী চলে গেছে। কারো মতে সে আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু সঠিক করে কেউ কিছুই বলতে পারছে না।

নম্বরদার লাল সিংয়ের নামে একটা বেদী করা হয়েছে, গাঁয়ের সবাই এখনো তার উদ্দেশ্যে সেখানে পুজো দেয়। বেঁচে থেকে যে লোক কারোর উপকারেই এলো না, মৃত্যুর পর সে মানুষের কাছে আশীর্বাদ রূপে অনাবিল আনন্দের গোঁসাই হয়ে উঠলো।

যোগ-বিয়োগ

বি. এ. পাশ করার পর বাবু দয়ানাথের মনে দেশ আর স্বার্থের সংঘাত শুরু হয়। তিনি ভারতীয় সেবক সমিতিতে নাম লেখাতে চান, কিন্তু স্বার্থ চিন্তা দেশের মাথায় চেপে বসলো। আইন পড়তে শুরু করলেন। দেশভক্তি বলছে, দুর্বলের পাশে এসে দাঁড়াও, তাদের সেবা করো। অপরদিকে স্বার্থের মত, টাকা-পয়সা, মান-সম্মান অর্জন করো। দেশ আর অর্থ, দুয়ের টানাপোড়েনে অর্থেরই জয় হোল। ছাই চাপা আগুনের মতো দেশসেবার চিন্তাও অর্থ লালসার তলায় চাপা পড়ে গেল। কিন্তু সেই চাপা আগুনের মত দেশভক্তিও মনের ভেতর ধিকিয়ে ধিকিয়ে জ্বলছে। এভাবে বছর পাঁচেক কেটে গেল, তার নৈতিক জ্ঞান আর সত্যনিষ্ঠার খ্যাতি সরকারের কানে পৌছোতে দেরী হোল না, সরকারী উকীল রূপে তার নামটাও তালিকাভুক্ত হোল। এরই মধ্যে দেশে হোমরুল আন্দোলন শুরু হোল। দয়ানাথের মনে সেই পুরোনো দ্বন্দ্বটা ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, দক্ষ, সুবক্তা, সুলেখকও বটেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সাহসের অভাবটা বড্ড চোখে পড়তো। তবে ইদানীং সহযোগী ও বন্ধুবর্গের উৎসাহে সে ভাবটাও প্রায় কাটিয়ে উঠেছেন। তিনি হোমরুল আন্দোলনে যোগ দিলেন এবং প্রথম অধিবেশনেই সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদকের গুরু কার্যভার মাথায় তুলে নিলেন। তবে দয়ানাথ তার সমস্ত কাজ-কর্ম গোপনে চালিয়ে যেতে চান, এজন্যে তাকে ভীরু বললে ভুল করা হবে, পূজনীয় পিতৃদেব যাতে অসন্তুষ্ট না হন তাই এ পথ বেছে নিয়েছেন। সভা শেষ হলে বাড়ী ফিরে সবেমাত্র জামা-কাপড় খুলছেন, হঠাৎ শহর থেকে পুলিশ ইন্সপেক্টর দুজন দারোগা ও দশ-বারজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে এসে সদর দরজার সামনে তার নাম ধরেই ডাকাডাকি করছেন।

দয়ানাথের বাবা লালা জানকীনাথ তার বাড়ীর সামনে পুলিশ দেখেই ঘাবড়ে যান, আশু অমঙ্গলের আশঙ্কায় মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তবু যদ্দুর সম্ভব সেভাব গোপন রেখে বলেন—আসুন, আসুন ইন্সপেক্টর সাহেব, তারপর, কেমন আছেন বলুন? আরে ভগেলু, পান-তামাক দিয়ে যা তো রে।

ইন্সপেক্টর সাহেব ঘোড়া থেকে নেমে হাতের ছড়ি দিয়ে পায়ের জুতোয় ঠক্ ঠক্ করতে করতে বলেন—মাফ করুন, এখন হাতে একদম সময় নেই বলে আপনার কথা রাখতে পারছি না, সরকারী হুকুমতো মানতে হবে। বাই দি বাই, দয়ানাথ বাবু আছেন?

কাঁপা কাঁপা গলায় জানকীনাথ বলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, এইতো মাত্র কোর্টথেকে এলো। (আস্তে আস্তে) ভগবানের কৃপায় আর কয়েক মাসের মধ্যেই সহকারী উকীল হয়ে যাচ্ছে, জজসাহেব নিজে মুখে আমাকে বলেছেন।

ইন্সপেকটর সাহেব সে সব কথা কথা শুনেও না শোনার ভান করেন। বোধ হয় তিনি জানকীনাথের মনের ভাব বুঝতে পেরে গেছেন, তাই বলেন—আপনার ছেলেকে একবার ডাকুন তো, ওর বয়ানটা লিখে নিই।

একথা বলেই তিনি পকেট থেকে একটা ডাইরী ও কলম বের করলেন। দেখেতো জানকীনাথের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার উপক্রম। তবু কোনরকমে বলেন—ব্যাপারটা একটু জানতে পারি কি ?

ইন্সপেকটর—হ্যাঁ। হ্যাঁ। আপনারও জেনে রাখা দরকার। আজ কিছু লোক মিলে হোমরুলের খুব বড় মিটিং করেন। সেখানে গভর্ণমেণ্টের নামে ভুরি ভুরি মিথ্যে অপবাদ দিয়ে অপমান করা হয়। স্বয়ং দয়ানাথবাবু সেই মিটিংয়ের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। আমরা তো আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে তার মত বিচক্ষণ লোকের সাক্ষাতে এ ধরনের সরকার বিরোধী মিটিং হয় কি করে। যাই হোক, আপনাকে এই শেষ বারের মতো সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি, এ রকম হলে তখন কিন্তু আমাকে অন্য পথ নিতেই হবে। আগুন নিয়ে ছেলেখেলা করা তার মতো লোকের পক্ষে শোভা পায় কি ?

জানকীনাথের পায়ের তলা থেকে যেন একটু একটু মাটি সরে যাচ্ছে। প্রায় ছুটে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে রাগে ফেটে পড়লেন—এ সব কি হচ্ছে ? তুমি বাইরে গিয়ে কোথায় কি অপকম্মো করে বসে থাকবে, আর আমরা তার হেপা পোয়াবো ! বাড়ীতে পুলিশ ইন্সপেকটর এসেছেন কি জন্যে শুনি ? যা এ বাড়ীতে কোনোদিন হয় নি, আজ তোমার মতো গুণধরের জন্যে তাও দেখতে হচ্ছে।

দয়ানাথ বাইরে বেরিয়ে এলেন। ইন্সপেকটর তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন—আজ আপনি হোমরুলের মিটিংয়ে ছিলেন ?

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"শুনলাম আপনিই নাকি তার সেক্রেটারীও নির্বাচিত হয়েছেন ?"

"ঠিকই শুনেছেন।"

"ওখানে কারা কারা এসেছিল জানতে পারি কি ?"

"ঠিক মনে নেই।"

"তবু আসল দু-চার জনের নাম বলতে পারেন ?"

"হোমরুলের অফিসে গিয়ে মেম্বার লিস্ট দেখলেই পেয়ে যাবেন।"

দুই

লালা-জানকীনাথ শহরের বেশ একজন নামকরা লোক। প্রচুর টাকা রোজগার করে আজ কয়েক বছর হোল ওকালতি ছেড়ে দিয়েছেন। তার মক্কেলদের মধ্যে বেশীর ভাগই আশে-পাশের গাঁয়ের জমিদার। এছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হোল, সরকারী অফিসারদের।

নজরে পড়ে গিয়েছিলেন। তাই তার চেয়ে বেশী অর্থশালী লোকেদেরও যে তার মতো মান-সম্মান, প্রতিপত্তি ছিল না, একথা বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। দয়ানাথের যোগ্যতার চাইতেও জানকীনাথের নম্রতা-আনুগত্যই এর একমাত্র চাবি-কাঠি। যৌবনে তিনিও রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু বাবা পণ্ডিত অযোধ্যানাথের মৃত্যুর পর আর কোনোদিনই ওমুখো হন নি। এখন সময়ের বেশীর ভাগটাই নিজের বিষয়-আশয় দেখে কাটান। দয়ানাথ তার একমাত্র সন্তান। কিসে তার ভাল হবে এখন এ চিন্তাই তার ধ্যান-জ্ঞান। তবে মাঝে মাঝে অধিকারী বর্গের বিদায় অথবা অভিনন্দন উৎসবে যোগদান করে তার বাক্ চাতুর্যের পরিচয় দিতে ছাড়েন না। বক্তৃতার ভাব-ভাষা দুটোই শোনবার মতো! বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও স্বাস্থ্য এখনো অটুট রয়েছে। দয়ানাথের মিতাহারীর জন্যে কখনো কখনো লজ্জা দিয়ে বলেন—সাহস-শক্তি এখনো কোনটাই তোমার চেয়ে কম নেই।

রোজই দু-তিন ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটেই বেড়িয়ে আসেন। পরলোকের পুণ্য লাভার্থে মাঝে মাঝেই পূজা-আর্চার কথা মনে উঁকি দেয়, কিন্তু বৈষয়িক কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকার দরুণ তা আর হয়েই ওঠে না।

ইন্সপেক্টর চলে যেতেই দয়ানাথকে বলেন—তুমি কি ভেবেছো বলতো? নিজেকে খুব বেশী বুদ্ধিমান ভাবছো, তাই না? পস্তাতে হবে, এই বলে দিলুম, হ্যাঁ! সুযোগ আছে, করে নে, তা নয়, উনি চল্লেন রাজনীতি করতে! কত গণ্ডাকে তো দেখলুম, রাজনীতির পেছনে নিজের যথাসর্বস্ব খুয়ে বসলো, তারপর অসময়ে কেউ ফিরেও দেখে না! তখন মুখে থু থু দেয়! আগেও বলেছি এখনো বলছি ভাল চাস্তো এসব ফালতু কাজে সময় নষ্ট করিসনে। আমি মরে গেলে যা খুশী তাই করিস. বারণ করতে আসবো না। কিন্তু যতক্ষণ বেঁচে রইছি, এটুকু দয়া আমাকে কর।

দয়ানাথ শান্তভাবে বলেন—আমি কি করবো? সবাই টেনে নিয়ে গিয়ে সেক্রেটারী করে দিল। অস্বীকার করলে সবাই ভাববে কাপুরুষ। তাছাড়া ভয়ের কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। দেশভর সবাই তো এক কথাই বলছে।

জানকী—তবু কখন কি হয় কিছু বলা যায় না। আমি বলি কি তুমি বরং একটা

রেজিগ্‌নেশন লেটার দিয়ে সব কথা জানিয়ে দাও।

দয়ানাথ— না, তা হয় না।

জানকী—আমার কথা তুমি শুনবে কি না?

দয়ানাথ—এতদিন তো আপনার সব কথা শুনেছি। কিন্তু এখন দেশের এই দুর্দিনে অকর্মণ্যতা শোভা পায় না বাবা! এ সময় চুপচাপ বসে থাকলে দেশবাসীর প্রতি ঘোর অন্যায় করা হবে।

জানকী—বেশ, তোমার যা খুশী তাই করো। আমি ভাল করেই বুঝতে পারছি যে তোমাকে কিছু বলার অধিকার আর আমার নেই। কিন্তু তাই বলে বাড়ীর দোর-গোড়ায় রোজ রোজ পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, এ দেখতে পারবো না। রাজনীতির আতস বাজি পোড়াতে ইচ্ছে হয় আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যাও। এখানে আগুন লাগাবার চেষ্টা করো না।

বাবার মুখ থেকে এ ধরণের নিষ্ঠুর কথা এর আগে দয়ানাথ কখনো শোনেন নি। কথাটা তার মনে কাঁটার মতোই খচ্‌খচ করতে থাকে। অব্যক্ত ব্যথায় মনটা গুমড়ে ওঠে। বলেন—আপনার যেমন ইচ্ছে।

একথা বলেই দয়ানাথ সে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে এসে স্ত্রী শ্যামাকে বলেন—বাবা আমাকে তাঁর বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছেন। সব কিছু গুছিয়ে নাও। আমি বাড়ী খুঁজতে চললাম।

শ্যামা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে—কেন? একথা কেন বললেন?

দয়ানাথ—কিছুই নয়, আজ ঐ হোমরুলের মিটিংয়ে গিয়েছিলুম না! তাই। সেজন্যে পুলিশ ইন্সপেকটর এসে জিজ্ঞাসাবাদ করাতেই নাকি বাবার মান-সম্মান সব ধুলোয় মিশেছে। বলছেন, হয় হোমরুল, নয় এ বাড়ী, যে কোনো একটা আমাকে ছাড়তেই হবে। এ ঘরে থাকবো না সেও ভাল, তবু হোমরুলের ডাকে সাড়া না দিয়ে কিছুতেই থাকতে পারবো না। আজ রাতটা অন্য কোথাও কাটিয়ে দেব। বেশ বুঝতে পারছি আমাকে আর নিজের কাছে রাখতে চান না, নয়তো এভাবে আমাকে 'বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও'—কিছুতেই বলতে পারতেন না। তুমি সব ঠিকঠাক করে রাখো, এসেই তোমাকে নিয়ে যাব।

শ্যামা—তোমার জিনিস-পত্র তো সব বাইরের ঘরেই রয়েছে।

দয়ানাথ—আর তোমার?

শ্যামা—(একটু ভেবে) আমি যাব না।

দয়ানাথ স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন—সে কি? তুমি আমার সঙ্গে যাবে না?

শ্যামা—না।

দয়ানাথ আর কিছু না বলে রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শ্যামা অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। ওদিকে শ্যামার এই নিষ্ঠুরতার কথা কাঁটার খোঁচার মতো দয়ানাথের মনকে আহত করে তুলতো। পথে যেতে যেতে ভাবছেন—ওকে নিয়েই আমার যত আশা-আকাঙ্ক্ষা, ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছি। ভাবতাম, যতই বিপদ আপদ আসুক না কেন, ও ঠিক একই রকম থাকবে। কিন্তু হায়! আজকে এই জীবন যুদ্ধের শুরুতেই ও আমার এতদিনের গর্ব ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে।

তিন

দয়ানাথ এখন আলাদা বাড়ীতে থাকেন। মাসিক আয় তিনশ' টাকার কম তো নয়ই। তার এই নতুন সংসারে কোনো অসুবিধেই হয় না। গৃহিনীহীন গৃহে ঠাকুর-চাকরেই যা হোক করে চালিয়ে নিচ্ছে। ঘোড়ার গাড়ী এখনো কেনেন নি, পা-গাড়ী করেই কোর্টে যান। সেদিনের পর থেকে দয়ানাথ আর পৈতৃক ভিটেতে পা রাখেন নি। বা জানকীনাথও ছেলের কোনো খবর নেন নি। আরও আশ্চর্যের কথা, শ্যামাও কেমন নিশ্চিন্তে বসে আছে। খবর-টবরও পাঠায় না, ভাবখানা এমন যেন স্বামীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রথমদিকে তো, বাবার এ রকম ব্যবহারে দয়ানাথ কেমন যেন মন-মরা হয়েই চলতেন। সেই রাগে হোমরুল লীগের কাজে আরও বেশী করে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। শহর জুড়ে এখন একটাই আলোচনা তা হোল যে করেই হোক, স্বাধীনতা আমাদের চাই-ই। অল্পদিনের মধ্যে পুরো শহরের রূপ আমূল পাল্টে গেলো, একটা আলোড়ন উঠলো! হোমরুলের কার্য-বিবরণী ছেপে, সেই পেম্পলেট জনসাধারণের মধ্যে বিলোনো হতে থাকে। পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট মিটিং করিয়ে জনগণের মনে স্বাধীন চেতনা জাগাতে 'হোমরুল'-এর সঠিক অর্থ উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিতে সচেষ্ট হলেন। ফলে শহরে নতুন জাগরণের ঢেউ উঠলো, যেদিকে যাওয়া যায় সেদিকেই শুধু দয়ানাথের নাম, প্রশংসা। বন্ধু-বান্ধব সকলেই পিতা-পুত্রের সেই ঝগড়ার কথা উল্লেখ করে দয়ানাথের আত্মিক সত্তাকে উদ্‌জীবিত করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু দিনের পর দিন তিনি কেমন যেন মুষড়ে পড়েন। কোনো কাজেই আর আগের মতো উৎসাহ পান-না। প্রাণের আবেগের তাগিদে যে স্বপ্ন তিনি গোড়াতে দেখেছিলেন, তা কেবল স্বপ্নই রয়ে গেল।

সারাদিন ওকালতি করেন, এরপর আবার স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় কাজকর্মের পর বাড়ী এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে ক্লান্ত দেহে অবসন্ন মনে বিছানায় গিয়ে শুলেও কিছুতেই ঘুম আসে না। যত রাজ্যের চিন্তা এসে মনটাকে আরও উত্তেজিত করে তোলে। বর্তমান

অবস্থার কথা, পুরোনো দিনের সুখ-স্মৃতি সবই একে একে মনে পড়ছে। বাবা এখন আর আমাকে আগের মতো দেখেন না। এরই নাম ভাগ্য! কি দিনই না ছিল! বাবাই ছিলেন আমার সারাক্ষণের খেলার সাথী! খাওয়া, ঘুম, একসঙ্গে উঠা-বসা সব কিছু বাবা। বাবার হাত ধরে স্কুলে যাবার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। যৌবনেও বাবার সহায়তা ছাড়া একপা-ও এগোইনি, বাবাই ছিলেন তার একমাত্র আশ্রয়। তখন কোনো রকম চিন্তা-ভাবনা, ভয় কিচ্ছু ছিল না। তিনি আমাকে আমার মায়ের অভাব কোনোদিনই বুঝতে দেন-নি। মায়ের কথা একটু একটু মনে পড়ছে, মুখটা ছিল ঠিক দেবীর মতো, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি আমাকে আমার বাবার কোলে তুলে দিয়ে চোখের জল ফেলে বলেছিলেন "আমার নয়নের মণিকে তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, কথা দাও, ওকে কখনো কাছ-ছাড়া করবে না।" বাবা আমাকে কোলে নিয়ে মায়ের হাত দুটোকে চেপে ধরে নীরবে চোখের জল ফেলছিলেন।

বিধির সূক্ষ্ম বিচার কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। সে জন্যে দয়ানাথের এ অবস্থা, কপাল পুড়েছে। সাত-পাঁচ ভাবনাতে তার হৃদয় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার উপক্রম। যতই হোক্‌, তিনি আমার বাবা, রাগ করলেও আমার মেনে নেয়াই উচিৎ ছিল। বড্ড ভুল হয়ে গেছে। এ সংসারে আমি ছাড়া তাঁর আর কেই বা আছে, আমার ভালর জন্যেই তো বলেছেন। তখন পারিনি তো কি, এখন পারতেই হবে। কিন্তু বিচারের গাড়ী এখানে এসেই থেমে যায়। তা কি করে সম্ভব। এখন আমাদের দুজনের চিন্তা-ভাবনায় আসমান-জমীন ফারাক। এমন একদিন ছিল যখন আমরা দুজনে একই পথের পথিক হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। এখন আর ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই, সবাই আঙ্গুল দেখিয়ে হাসবে, না-না, পুরোনো ছক বাঁধা জগতে আর ফিরতে চাইনে।

এদিকে চিন্তা-ভাবনার সাংঘাতিক ঝড় লালা জানকীনাথের মনটাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। দয়ানাথ সেদিন ওভাবে চলে যাওয়াতে তিনি খুব ভেঙ্গে পড়েছেন। ভেবেছিলেন ছেলের রাগ কমলেই এসে নিশ্চয়ই বাপের কাছে ক্ষমা চাইবে, তারপর সে যা চায় তাই হবে। কিন্তু যখন শুনলেন যে সে অন্য বাড়ীতে চলে গেছে ব্যস, আর যায় কোথায় আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়লো!

"এই কি সেই দয়ানাথ! ও এতো নীচে নেমে গেছে! বাবাকে এতটা অশ্রদ্ধা ভাল নয়। এই বাপের কাছে তো তুই অন্ধের যষ্টির মত, তোর সুখের জন্যে রাতকে রাত, দিনকে দিন মনে করিনি। তোকে কেন্দ্র করেই তো আমার যত আশা-আকাঙ্ক্ষা। সেই তুই কি-না............?

ক্রোধের মাত্রা বেড়েই চলে, পিতৃ-সত্তার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা, সে কি কম কথা!!

স্নেহময় বাবার অন্তর থেকে সে অস্থিরতার মেঘ একটু একটু করে কেটে গেছে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কারো কোনো কথাই কানে তুললেন না। তার সেই এক কথা—এতদিন বাপের ছাতার তলায় বসে সুখ করেছে, গায়ে কুটোর আঁচড়টুকুও লাগেনি। এখন দুদিন দুনিয়ার রূপটা দেখুক, খুঁটে খেতে হবে না। বাপ কি চিরকাল ধরেই খাইয়ে যাবে না-কি?

ক্রমে বুড়োর রাগ পড়ে আসে। গরম লোহাটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। জানকীনাথের মনেও একটু একটু করে পশ্চাত্তাপের উদয় হয়। অহেতুক রাগের জন্যে অনুশোচনার সীমা রইলো না। রাগের চোটে মুখ দিয়ে কি যা-তা বলে ফেলেছেন শুধু তাই ভেবে চলেছেন—কাজটা সত্যিই অন্যায় হয়েছে, এতটা রাগ দেখানো ঠিক হয় নি। ও ছাড়া আমার আর কে-ই বা আছে? ও আমার একমাত্র সন্তান, ওর সুখের জন্যে একদিন হাসিমুখে মরতেও রাজী ছিলাম, তাহলে সেদিন কেন অমন আজে-বাজে কথা বাপ হয়ে তাকে বলতে গেলুম? দিনের পর দিন এভাবে অনুতাপের জ্বালায় দগ্ধ হতে থাকেন। এ চিন্তা তাঁর দিনের খাওয়া, রাতের ঘুমটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। ঘরে টিকতে পারছেন না। যতক্ষণ থাকেন, ছেলের জিনিষপত্র নিয়েই নাড়াচাড়া করেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছেলের কথা মনে করে চোখের জল ফেলেন। চিন্তায়-ভাবনায়, দুঃখে জানকীনাথের অবস্থা কাহিল।

তিনি নিজেকে দোষারোপ করে ভাবেন—আমি বাপ নই, রাক্ষস, এ ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে আমি কি করবো? মরবার সময় কি এগুলো সঙ্গে নিয়ে যাব? মান-সম্মান-প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য, এসব আমার আর কোন্ কাজে লাগবে শুনি? এ বয়সে সংসারের এই মায়াজালে নিজেকে আর জড়িয়ে কি লাভ? ও যদি এসব দুপায়ে দলে চলে যেতে পারে, তখন এসব আগলে আমারই বা কি লাভ।

তবু শ্যামার মুখের দিকে তাকালে তিনি একটু ধৈর্য্য ধারণ করতে চেষ্টা করে ভাবেন—আমার মন রাখতেই তো দয়ানাথ বৌমাকে এখানে রেখে চলে গিয়েছে।

ছেলে-বৌমার এই বিরহ ব্যথায় তিনি আরো বেশী বিচলিত হয়ে ভাবতে থাকেন, সে সময় বাছাকে হাতছাড়া করাটা ঠিক হয়নি, এতদিন তাহলে কি আর রাগ করে বসে থাকতো।

পিতৃ-স্নেহ বেগে প্রবাহিত হতে গিয়ে মানের বিশাল শিলাখণ্ডে বাধা পেয়ে পিছিয়ে আসে। জানকীনাথের আহত পিতৃসত্তা জেগে ওঠে—বাপ হয়ে আমি কি তার কাছে মাথা নোয়াবো নাকি?

দিনের পর দিন জানকীনাথের অশান্তি বেড়েই চলে। একদিন কালেক্টর সাহেবের কাছ থেকে চিঠি এলো, রাজভক্তির জন্য অভিনন্দন জানিয়ে জানকীনাথকে তিনি এই

চিঠি পাঠিয়েছেন। উত্তর দেওয়া দূরে থাক, চিঠিটা পড়েই তিনি তা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। একদিন পুলিশ ইন্সপেক্টর সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে চাকরকে দিয়ে বলে পাঠালেন—আমি ভীষণ অসুস্থ, তাই দেখা করতে পারছি না।

চার

আরো কিছুদিন কেটে গেলো। জানকীনাথের সময় যেন কাটতেই চায়-না। প্রতিটি মুহূর্ত তার কাছে এক এক যুগের মতো মনে হয়। নিজের অন্যায় আচরণ তীব্র শরের মতোই তাঁর হৃদয়ে বিঁধতে থাকে। স্বার্থপরতার যে মোটা পর্দাটা এতদিন চোখে ঢাকা পড়েছিল, এখন তা একটু একটু করে সরে যাচ্ছে। দয়ানাথের উচ্চভাব এখন তাঁর কাছে দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অন্তরের ব্যথাটা বেড়েই চলে—দেশের মঙ্গল করতে সে নিজেকে দেশ-মায়ের পায়ে সঁপে দিয়েছে, এজন্যে আমি আমার ছেলেকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছি? সে আমার মতো স্বার্থ-সেবী হতে চায়নি শুধু এই অপরাধে? ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! এজন্যে কোথায় নিজেকে ধন্য মনে করবো তা নয়! হায়রে মূঢ় মন! তোর এই অর্থ লোলুপতার তৃপ্তি সাধন করতে আমি তার ওপর এ-অত্যাচার করেছি। আজ আমি তার কাছে কি নই! দেশদ্রোহী। বিভীষণের মতো দেশের শত্রু! ও দেবতা। আর আমি রাক্ষস! ওর বাবা বলে নিজেকে পরিচয় দেবার যোগ্যতা আমার নেই। যে অন্যায় তার সঙ্গে করেছি, তার ক্ষমা নেই। আমার মতো বাপের আর মান-অপমান শোভা পায় না। গিয়ে ওর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলবো—তুমি নারায়ণ, কৃপা করে আমার ঘরে এসে ছেলে হয়ে জন্মেছো ঠাকুর! তোমাকে না দেখে আমি জল ছাড়া মাছের মতো ছটফট করছি। আমার মতো অধমের সব অপরাধ ক্ষমা করে, চোখের জল মুছিয়ে দাও! আমি আর পারছি না, ধৈর্য্য দাও, মনে শক্তি দাও ঠাকুর!

সন্ধ্যেবেলা ম্লান মুখে মনক্ষুন্ন হয়ে সূর্যদেব আকাশের বুক থেকে চলে গেছেন, তাঁর মান ভঞ্জন করতে তারারা সব একজোট হয়ে বেরিয়ে এসেছে। জানকীনাথবাবুও ছেলেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনতে গেলেন। হৃদয়-দরিয়ায় স্নেহের প্লাবন সব গ্লানি ভাসিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। যতই এগোতে থাকেন, লজ্জা যেন তার পা চেপে ধরে। এভাবে দোনা-মোনা করতে করতে দয়ানাথের বাড়ীর কাছে এসে পড়েন। বাড়ীর দোর-গোড়ায় দয়ানাথকে চিঠি পড়তে দেখে ওখানেই তার পাদুটো আটকে যায়। মনে মনে বলতে থাকেন—এভাবে বলে কয়ে ছেলেকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাবার মধ্যে বড়াই বা গর্ব কোনটাই আছে বলে তো মনে হয় না। ও যে আমার কথা ফেলবে না, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বাবার প্রতি ছেলের যতটা ভক্তি, শ্রদ্ধা থাকা

উচিৎ, তা কি ফিরে পাবো? কক্ষনো না। তাহলে আমাকে এমন কিছু করতে হবে যাতে সে শ্রদ্ধা-ভক্তি, সম্মানে বশীভূত হয়ে স্বেচ্ছায় আমার কাছে ফিরে আসবে। নিজেকে আমার ছেলে বলে পরিচয় দিতে গর্বে মাথাটা উঁচু হয়ে যাবে, দুচোখে গৌরবের আলো চক্‌চক্ করবে। হ্যাঁ, আমাকে সেই অসাধ্য সাধন করতে হবে। পরম করুণাময় ঈশ্বর! আমাকে শক্তি দাও, আমার দুর্বল আত্মাকে আবার জাগিয়ে তোলো।

ছেলে বাবাকে জয় করতে পারলো না, জয়ী হোল ছেলের আদর্শ।

একদিন সকালে বুড়ো-চাকরটা শ্যামাকে এসে বলে—লালাজী তো তাঁর ঘরে নাই, জুতো-কাপড়-চোপড় এসব কিছুই তো দেখছি না বটে। আইজ্ঞা বৌরাণী, আপুনি কিচু জানো?

শ্যামা—ঠিক বলতে পারছিনে, বোধ হয় একটু বেড়াতে বেরিয়েছেন।

ন'টা বেজে গেলো, অথচ তখনো জানকীনাথ ফিরলেন না। তারপর দুপুর হয়ে এলো, তখনো শ্বশুরমশাই ফিরছেন না দেখে শ্যামা চিন্তায় পড়ে গেল। কোন্ কোন্ জিনিষ নিয়ে গেছেন তাই দেখতে তাঁর ঘরে ঢুকলো। প্রথমেই নজরে এলো টেবিলে চাপা দেওয়া একটা চিঠির দিকে। শ্যামা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলো, চিঠি পড়েতো তার মাথা ঘুরে গেলো, ধপ্ করে মাটিতেই বসে পড়লো। লেখা আছে—স্নেহের বৌমা,

সংসারে থাকতে আর মন চাইছে না, তাই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেলাম দয়ানাথকেও খবরটা দিও, ও বাড়ীতে ফিরে না এলে ওর কাছে গিয়েই থাকবে, তোমার প্রতি এ আমার নির্দেশও বলতে পারো। বাড়ীতে আর ফিরবো না। কে জানে, হয়তো এটাই আমার শেষ চিঠি। দয়ানাথকে বলো, সে যেন তার অযোগ্য বাবার সব অপরাধ ক্ষমা করে।

শ্যামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওখানেই চুপচাপ বসে রইলো। শ্বশুরের কষ্ট লাঘব করতেই সে স্বামীর বিদ্রোহী মনোভাবকে নীরবে সহ্য করেছে, ভেবেছিল, হয়তো কয়েকদিনের মধ্যেই ওদের দুজনের মনের মিলও হবে। কিন্তু এ চিঠি তার সব আশাকে ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছে।

পাঁচ

এ ঘটনায় দয়ানাথের মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। বাবার এই বৈরাগ্যের জন্যে তিনি নিজেকেই দায়ী করেন। দয়ানাথ ও শ্যামা শত চেষ্টা করেও জানকীনাথের কোনো সন্ধান পেলেন না। তাতে দয়ানাথের মনের গ্লানি বাড়লো বৈ কমলো না। ভাবতে থাকেন—"আমার মতো কুলাঙ্গারের জন্যেই এ দুর্ঘটনা ঘটলো।" স্বরাজের কাজে কর্মেও

আর আগের মতো উৎসাহ নেই। যেদিন থেকে তিনি নিজেকে এই কর্মযজ্ঞে আহুতি দিয়েছেন, সেদিন থেকেই তার মনের শান্তিও নষ্ট হয়ে গেছে। তবু স্বরাজের সভা-সমিতির কাজ পুরো উদ্যমেই চলছে। আগে অর্থের অভাবটাই তাদের কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিল। চাঁদা যাও বা উঠতো, তাতে অনেক জরুরী কাজও করা যেত না। শহরের পয়সাওয়ালা লোকেরা তো ভুলে কেউ এপথ মাড়াতেন না। কিন্তু এখন আর সে অভাব নেই। প্রতি মাসের পয়লা তারিখেই সভার সম্পাদকের নামে রেজিষ্ট্রিতে দু'শ করে টাকা আসছে। প্রেরকের নামের জায়গায় লেখা আছে 'ভারত-দাস'। টাকাটা কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে আসে না, বেশীর ভাগই ক্ষেত্রেই কোনো তীর্থ স্থানের সীল মারা থাকে। টাকার সঙ্গে একটা করে চিঠি থাকতো, চিঠিতেই লেখা থাকতো টাকাটা কি করে খরচা করতে হবে। প্রথম চিঠিতে লেখা ছিল, এ টাকায় স্বরাজ-সম্বন্ধীয় ছোট ছোট পুস্তিকা বের করে, সভা চলাকালীন উপস্থিত সকলের মধ্যে তা বিক্রী করে টাকাটা গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে। পরের মাসের চিঠিতে লেখা ছিল, "জেলার প্রতিটি গ্রামে স্বরাজ-ভাবনার কথা প্রচার করতে টাকাটা খরচ করলে বাধিত হবো।"

তিন নম্বর চিঠিতে ছিল, গ্রামে গ্রামে স্বরাজের লাইব্রেরী করতে হবে, এবং এ-টাকায় বিভিন্ন ধরণের পত্র-পত্রিকা কিনে রাখতে হবে। যাতে সকলেই সে সব পড়ে স্বরাজের যথার্থ অর্থ বুঝতে পারে। এভাবে প্রতিমাসেই দু'শ টাকা স্বরাজ অফিসে যথা নিয়মে আসতে লাগলো। এ টাকায় সভার কাজ-কর্মও খুব সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকে। দেশের অন্যান্য স্বাধীনতা কার্য-নির্বাহক কমিটিগুলোও 'স্বরাজ-সভার' কর্মকাণ্ডকে অনুকরণ করতে শুরু করেছে। এ গুপ্ত সাহায্যে সভার কর্মকর্তা খুবই খুশী, সেই সঙ্গে দাতার সঠিক নাম ঠিকানা জানতেও উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও বিফল হলেন। কলকাতার একটা প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রিকায় গরীব দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশার কথা উল্লেখ করে, সেই সঙ্গে উন্নতির সূচনা দিয়ে এক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ বের হয়। তার সহজ-সরস ভাব, সজীব ভাষা পড়ে মনে হোল, গরীব দেশবাসীর জীবন্ত চিত্র যেন সকলের চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তাদের উন্নতি-কল্পে এমন মহৎ-মধুর ইঙ্গিতে পাঠক-বর্গ আপ্লুত। লেখক—'ভারত-দাস'। শহরের 'স্বরাজ-সভা'র সদস্যবৃন্দর লেখাটা পড়েই সেই দৈনিক পত্রিকায় একটা 'আবেদন' ছাপানোর জন্যে পাঠিয়েছিলেন। "দয়া করে 'ভারত-দাস' মহাশয় নিজের ঠিকানা জানালে চির-কৃতজ্ঞ থাকবো।" সপ্তাহ খানেক পরই সভার সম্পাদকের নামে পাঁচশো টাকা এলো, সেই সঙ্গে চিঠিও। লেখা রয়েছে—দেশব্যাপী আমার ঠিকানা, দেশের প্রতিটি ঘরেই আমার আস্তানা। এ টাকায় দেশের ঘরে ঘরে স্বরাজের বাণী পৌছে দিলেই আমাকে পাবে।

'স্বরাজ সভার' সামনে আজ কঠিন সমস্যা উপস্থিত হয়েছে, লখ্‌নউ অধিবেশনের পর ফেরার পথে লোকমান্য তিলক নাকি এ শহরের ষ্টেশনে অবস্থান করছেন। 'স্বরাজ-সভা'র মেম্বাররা তাঁকে এখানে আসতে নেমন্তন্ন করে এসেছেন। তিনিও তাদের কথা দিয়েছেন। আগামী কাল দুপুরেই আসবেন, সন্ধ্যেবেলাতেই তিনি ভাষণ দেবেন, কেননা রাতের ট্রেনেই পুনা চলে যাবেন। মেম্বাররা তো তিলক মহারাজকে নেমন্তন্ন দিয়ে এলেন, কিন্তু তারপর যে এত রকম ঝুট-ঝামেলা পোয়াতে হবে তা তারা ভাবতেও পারেন নি। তিলক মহারাজের থাকার কি ব্যবস্থা হবে? বেচারা দয়ানাথ শহরের যত মান্য-গণ্য আছেন তাদের সবার কাছেই গিয়ে সাহায্য চেয়ে হাতে-পায়ে ধরেছেন, কিন্তু তারা কেউ লোকমান্য তিলককে থাকতে দিতে রাজী নয়। তবে মুখে না বললেও হাবে-ভাবে তা প্রকাশ করেছেন। দেশভক্তি করতে অথবা দেশভক্ত হতে কে না চায় বলুন? তবে কি না ঘর খালি নেই। কারো বাড়ীতে অতিথি এসে গেছে, কারোর ঘরে বৌদি, কারোর বা শালী অসুস্থ। যাই হোক অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে লোক-মান্যজীর থাকার ব্যবস্থা হলেও তাঁর বক্তৃতার জন্য জায়গা পাওয়া মুশ্‌কিল। ছোট-মাঠ হলে চলবে না, বেশ বড় জায়গা চাই, কিন্তু দেবেটা কে? শ্রীরাম মন্দিরের বড় মাঠটায় মন্দির কর্তৃপক্ষ করতে দিতে রাজী নয়। বড় মস্‌জিদের জমিটাও পাওয়া গেল না। বনমালীবাবুর বাড়ির সামনে ঘেরা লম্বা-চওড়া মাঠে তো শহরের অনেক বড় বড় মিটিং জলসা, উৎসব এমন কি রাম-নবমীর মেলাও হয়ে গেছে। ওটা পেলে কেমন হয়? বনমালীবাবু পুরোনো দিনের বনেদী লোক, এসব স্বরাজ-টরাজ নিয়ে মাথা না ঘামালেও বিশিষ্ট ভদ্রলোক, কাউকে কক্ষনো ফেরান না। দয়ানাথ আর তার সঙ্গী-সাথীরা সেখানে ছুটে গিয়ে জানতে পারলেন তিনি কার্যোপলক্ষে দু-চার দিনের জন্যে শহরের বাইরে গেছেন। তাদের তো মাথায় হাত। যাই হোক তারা বাবুর নায়েবমশাইকে বাবুর মতো খাতির করে বলেন—আমাদের কাছে বাবু আর আপনি দুজনেই সমান। আপনার পারমিশন্ পেলেই আজ সন্ধ্যেবেলা আমরা আপনাদের বাড়ীর সামনের এই মাঠে মিটিং করবো।

নায়েব মশায় তো বেশ ভয়ে ভয়েই বলেন....বাবু হলেই বা কি, আর না হলেই বা কি, আজ পনর দিন হলো এই মাঠটাতো বিক্রী হয়ে গেছে। মাথা কুটে মরলেও আমাদের কিছু করার নেই।

প্রায় সবাই সমস্বরে বলে ওঠেন—বিক্রী হয়ে গেছে? কে কিনেছে?

নায়েব বললেন—ওদের নাম-ধাম সব আমাদের বাবুই জানেন, আমি বলতে পারবো না, তবে যদ্দুর শুনেছি উনি এখানকার লোক নয়। প্রয়াগ থেকেই তার চিঠি-পত্তর আসে।

শুনে তো তাদের মাথায় হাত।

ছয়

সভার কর্মকর্তা তো ভেবেই পাচ্ছেন না কি করবেন আর কি-না করবেন। দয়ানাথের অবস্থা আরও শোচনীয়। এ সমস্যার আশু বিপদের কথা চিন্তা করে তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। কোনো কাজেই মন বসছে না। 'কি কুক্ষনেই না এ পথে পা বাড়িয়ে ছিলাম' এই ভেবে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন। থেকে থেকেই বাবার কথা মনে পড়ছে। বাবার সঙ্গে সেই উদ্ধত ব্যবহারের কথা ভাবলেই বুকটা কেমন যেন মোচড় দিতে থাকে। বাবার স্মৃতি, গ্লানি, অনুশোচনায় মনটা উথাল-পাথাল করছে। ভাবছেন —কালকের দিনটা কোনরকমে কাটলেই এসব কাজের বোঝা মাথা থেকে নামিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এখনো মিটিংয়ের জন্যে কোনো জায়গা পাওয়া যায় নি। দিনভর দৌড়-ঝাঁপ করে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়েই দয়ানাথ বাড়ী ফিরে আসেন। বৈঠকখানায় টেবিলের ওপর লণ্ঠনটা টিম্‌টিম্ করে জ্বলছে। ক্লান্ত দয়ানাথ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আলোর সামনে এসে বসেন। টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে দুহাতে মাথাটা ধরে আধ খোলা চোখে স্তিমিত আলোর দিকে চেয়ে আছেন। নিশ্চল শরীর, কিন্তু মনে সংকল্পের গনগনে তাপ। ভাবতে ভাবতে দেশের লোকের মানসিক অবস্থাটা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মানুষ আজ কত ভীরু হয়ে উঠেছে। দেশভক্ত, স্বদেশ প্রেমকে ভাল মনে করলেও মুখে ভাল বলার সাহস নেই। বড লোকদের কপট-আচরণ তো আরও সাংঘাতিক। লাভের গন্ধ পেলেই রাতারাতি দেশপ্রেমিক বনে যায়, তাও আবার কি রকম, গায়ে কোনো রকম আচড় যেন না লাগে। নিজের সবদিক বাঁচিয়ে তবেই। দেশটা উচ্ছন্নে গেছে, এতে কি কাজ করা চলে। ধ্যুত্, এসব ঝুট-ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলাই ভাল।

হঠাৎ কারো গলা পেয়ে তার ধ্যান ভাঙ্গে। মাথা তুলে দেখেন, হোমরুল—লীগের চাপরাশি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেলাম জানিয়ে তার দিকে একটা চিঠি বাড়িয়ে দেয়। সভাপতির চিঠি। লেখা আছে—শীগ্‌গির আসুন, সুসংবাদ আছে, আমরা সবাই আপনার অপেক্ষায় বসে আছি।

দয়ানাথবাবু 'স্বরাজ-সভা'র অফিসে এলে সভাপতি আনন্দে প্রায় চীৎকার করে ওঠেন—এই নাও, স্বরাজেরেই জয় হোল, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, জায়গা পাওয়া গেছে। আমাদের শহরে খুব বড় কাজ হতে চলেছে রে ভাই। আজ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, কি বলবো। কথাগুলো বলেই তিনি তার দিকে একটা চিঠি এগিয়ে দিলেন। তাতে লেখা আছে—কাল থেকে এ শহরেই আছি। শুনলাম, মহামান্য

লোকমান্য তিলক আপনাদের অতিথি হয়ে এসে সকলের উদ্দেশ্যে তাঁর অমৃতময় বাণী শোনাবেন, কিন্তু সেইজন্য আপনারা কোনো জায়গা পাচ্ছেন না যে মিটিং করবেন। জায়গার জন্যে ভাববেন না। বনমালীবাবুর বাড়ীর সামনের মাঠেই আয়োজন করুন। এ শহরের বুকে একটা টেক্‌নিকেল ইনস্টিটিউশন স্থাপন করবো বলে আমিই ও মাঠটা পনর হাজার টাকায় কিনেছি। আজ সন্ধ্যে আটটার সময় আপনাদের অফিসে আপনাদের দর্শন করে ধন্য হবো—'ভারত দাস।'

চিঠি পড়ে দয়ানাথের মন খুশীতে ভরে উঠলো। অন্যান্য মেম্বাররাও 'ভারত-দাস' মহাশয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁকে দেখার জন্যে সকলেই উদগ্রীব হয়ে ঘন ঘন ঘড়ির দিকে দেখছেন। আটটা বাজতেই ঢিলে-ঢালা গেরুয়া আলখাল্লা গায়ে, খালি পা, নেড়া মাথার সৌম্য দর্শন ভদ্রলোক ঘরে এসে ঢুকলেন। সকলেই তাকে দেখে চমকে উঠলেন। 'আরে, এ যে লালা জানকীনাথ!' কয়েক মুহূর্তে কারোর মুখেই কোনো কথা সরলো না তারপরই সবাই দ্বিগুণ উৎসাহে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে জানকীনাথকে অভিবাদন করলেন।

পিতৃভক্তি ও দেশপ্রেমের উন্মাদনায় দয়ানাথের দুচোখে ভালবাসা আর সম্মানের অশ্রু ধারা, জানকীনাথের পাদুটো জড়িয়ে ধরে পায়ের ওপর মাথা রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন, তখন জানকীনাথও সজল চোখে ছেলেকে বুকে তুলে নেন।

দুই সমাধি

সে যৌবন আর নেই। নেই মাদকতা, নেই উন্মাদনা। সে রকম জলসাও আর হয় না। আলোর রোশনাই নিভে গেছে, যে আলো জলসাকে উজ্জ্বল করে রাখতো। সে সবই আজ কবরের তলায়। তবে তার ভালবাসার আকর্ষণ আজও হৃদয়ে জাগুরুক। আর তার অমর স্মৃতি চোখের সামনে ভাসমান। বীরাঙ্গনার এমন রূপ, এমন প্রেম, এমন আকর্ষণ, এমন ব্রত আজ দুর্লভ। ধনী পরিবারের রাজকীয় বিবাহ-উৎসব, এমন আত্ম সমর্পণ, এমন ভক্তি-ভাব আজকাল আর দেখাই যায় না।

রাজকুমার রণবীর সিংহ আজও প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর বা গোধুলি বেলায় নগ্নপদে জুহারার কবর দর্শন করতে যান। অশ্রু দিয়ে কবরটিকে ধুয়ে ফুল ও মালা দিয়ে সুন্দর

করে সাজান। তাঁর এই তপস্যা পনের বছর ধরে একই ভাবে চলে আসছে, কোন দিন বন্ধ যায় নি। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যই হলো, প্রেমের উপাসনা। সেই প্রেম, যে প্রেমে তিনি যা' চেয়েছেন পেয়েছেন, আর যা' অনুভব করতে চেয়েছেন তা' আজও তাঁকে মাতিয়ে রেখেছে। তাঁর উপাসনার সঙ্গী সুলোচনা, যে জুহারার প্রসাদ ও রাজকুমারের অভিলাষের কেন্দ্রবিন্দু।

রাজকুমারের দু'বার বিয়ে হলে কি হবে, কোন সন্তান হয় নি। কুমার সাহেব অবশ্য আর বিয়ে করতে চান নি। তিনি একদিন জলসায় জুহারাকে দেখলেন। সেখানেই অতৃপ্ত যুবতীর প্রতি আসক্ত হলেন। দেখে মনে হয়েছিল তাঁর যেন চির-কালের পরিচিত। তখনই জীবনে বসন্ত-বিকাশ-সঙ্গীত আর সৌরভে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আপসোসের কথা, পাঁচ বছর পরই জুহারাও সংসার থেকে বিদায় নেয়, মধুর স্বপ্ন নিরাশায় পরিণত হয়, এবং মাত্র তিন বছরের সুলোচনাকে স্বামীর কোলে সোঁপে দিয়ে চিরকালের জন্যে চলে যায়।

সেই দিন থেকে কুমার সাহেব তার প্রেমাদেশ এমন অনুরাগের সঙ্গে পালন করছেন যে, দর্শক মাত্রই আশ্চর্য হয়। কেউ কেউ আবার তাকে পাগলও মনে করেন। সুলোচনাকে তিনি নিজের কাছে শোয়ান, ঘুম পাড়ান, ঘুম থেকে জাগান, খাওয়ান ও পরান এবং বেড়াতে নিয়ে যান। বিধবা যেমন তার অনাথ শিশুদের পালন করেন, কুমার সাহেবও অনুরূপ একাগ্রতা নিয়েই তাঁর সন্তানকে পালন করছেন।

অবশেষে সুলোচনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে কুমার সাহেব নিজে গাড়ী করে তাকে কলেজে পৌঁছে দেন, আবার নিয়ে আসেন। কুমার সাহেবের উদ্দেশ্য সুলোচনার কলঙ্ক মোচন করা। সে কলঙ্ক ধন-সম্পদের দ্বারা দূর হওয়া সম্ভব নয়, তার জন্যে চাই বিদ্যা।

দুই

একদিন বিকালে কুমার সাহেব জুহারার সমাধিটি ফুল ও মালা দিয়ে সাজাচ্ছেন। সেখান থেকে কিছুটা দূরে সুলোচনা তার কুকুরের সঙ্গে একটা বল নিয়ে খেলা করছে। এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রামেন্দ্র সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সুলোচনা তাঁকে দেখতে পেয়ে লজ্জিত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, না দেখার ভান করে। ভয় হয়, সমাধির কথা যদি জিজ্ঞেস করে, তাহলে কী বলবে?

সুলোচনা বছর খানেক হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। এর মধ্যেই সে প্রেমের বিবিধ রূপ প্রত্যক্ষ করেছে। কোথাও দেখেছে খেলা, কোথাও তামাসা, কোথাও কুৎসা, কোথাও লালসা, আবার কোথাও উচ্ছৃঙ্খলতা। সহৃদয়তা কোথাও দেখতে পায় নি, যেটা প্রেমের আসল রূপ। ডঃ রামেন্দ্রকে অবশ্য সে অন্য চোখে দেখে, কারণ, তাঁর

মধ্যে দেখতে পেয়েছে সজ্জনতা, ভদ্রতা, মৃদুভাষণ, জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব। তাই, তাঁকে দেখেই সুলোচনার মন বিকশিত হতে চায়, চোখ কিছু বলতে চায়, কিন্তু কে যেন তাকে পরাজিত হতে দেয় না, লুকিয়ে রাখতে চায়।

ডঃ রামেন্দ্র দাঁড়িয়ে কুমার সাহেবের দিকে তাকিয়ে সুলোচনাকে বললেন—তোমার বাবার কবর-স্থানে কী করছেন ?

অধ্যাপকের কথায় সুলোচনার চোখ, মুখ, কান সব লাল হয়ে ওঠে। মৃদু স্বরে উত্তর দেয়—ওটা বাবার অনেক দিনের অভ্যেস।

রামেন্দ্র—কোন মহাপুরুষের সমাধি নাকি ?

সুলোচনা অধ্যাপকের কথাটা উড়িয়ে দিতে চায়। রামেন্দ্র জানতেন যে, সুলোচনা কুমার সাহেবের দাসী কন্যা। সমাধিটি যে সেই দাসীরই তা অবশ্য তিনি জানতেন না। কুমার সাহেব যে এখনো বিগত প্রেমের স্মৃতি-পূজারী, তা তাঁর অজানা। অধ্যাপকের প্রশ্নের স্বরটি মৃদু না থাকায় কুমার সাহেবের কানেও পৌছায়। তিনি তখন জুতোটা পরছিলেন। তাই, তাড়াতাড়ি জুতোটা পরে কাছে এসে বললেন—সাধারণের চোখে সে মহান নারী না হলেও আমার চোখে মহিয়সী। ওটা আমার প্রেমের সমাধি।

সুলোচনার ইচ্ছে, সেই মুহূর্তে কিছুটা দূরে সরে যায়, কিন্তু কুমার সাহেব যে জুহারার যশোগানে আত্মিক আনন্দ লাভ করেন, তাই যাওয়া সম্ভব হলো না। রামেন্দ্রের বিস্ময় দেখে কুমার সাহেব বললেন—ওর মধ্যে সেই দেবী শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, যে একদিন আমার জীবনে স্বর্গ-সুখ এনে দিয়েছিল। আর এই সুলোচনা হলো তারই প্রসাদ।

রামেন্দ্র সমাধির দিকে একবার তাকিয়ে বললেন—তাই নাকি ?

কুমার সাহেব গদ্‌গদ্ হয়ে বললেন—প্রফেসার সাহেব, সে জীবনটাই ছিল অন্য রকম। এমন তপস্যা আমি আর কোথাও দেখি নি। হাতে সময় থাকলে একবার আমার সঙ্গে চলুন, আপনাকে সেই যৌবন-স্মৃতি ....

সুলোচনা বলে ওঠে—বাবা, সে সব এখন থাক।

কুমার সাহেব—আমি রামেন্দ্র বাবুকে মিথ্যে বলছি না।

রামেন্দ্রবাবু কুমার সাহেবের কথার মধ্যে মনো-বিজ্ঞানের যথেষ্ট পাথেয় মিলতে পারে, এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁর বাড়ীতে গেলেন এবং বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে বসে বসে সেই প্রেমের স্মৃতি-কাহিনী শুনলেন।

বছর খানেক ধরে চেষ্টা করেও যে বর তিনি লাভ করতে পারেন নি, দো-টানায় পড়ে ছিলেন, সাহস হয় নি, অবশেষে সেই বর তিনি লাভ করে ফিরলেন।

তিন

সুলোচনার সঙ্গে রামেন্দ্রের বিয়ে হলো। বিয়ের পর কিন্তু রামেন্দ্র এক নতুন সমস্যায় পড়লেন। আজকাল সুলোচনার কাছে মহিলা বন্ধুর পরিবর্তে পুরুষ বন্ধুর যথেষ্ট আগমন ঘটছে। দিনরাত চলছে হাসি-ঠাট্টা। সুলোচনাও তাদের আদর যত্নে ব্যস্ত থাকে। মাস দুয়েক রামেন্দ্র ভ্রুক্ষেপ করলেন না, কিন্তু যখন অসহ্য হয়ে উঠলো, তখন একদিন সুলোচনাকে বললেন—আচ্ছা, ওরা কি ইচ্ছে করেই আসে?

সুলোচনা মৃদুস্বরে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়।

রামেন্দ্র—ওঁদের স্ত্রী-রা কি তোমার ওপর রাগ করে না?

সুলোচনা—হয়তো করে।

রামেন্দ্র—ওঁরা সকলেই তো বিচক্ষণ, স্ত্রীরাও নিশ্চয়ই শিক্ষিতা। তবু এমন করে কেন?

সুলোচনা গম্ভীর হয়ে বলে—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

রামেন্দ্র ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন—আচ্ছা, আমরা যদি অন্য কোথাও চলে যাই তাহলে কেমন হয়?

সুলোচনা স্বামীর কথায় রেগে গিয়ে বলে—অন্য কোথাও কেন যাবো? আমরা তো কাউকে ডাকছি না বা কারোর ক্ষতিও করছি না। যে যা করছে করুক না। ওদের জন্যে আমরা নিজেদের লুকিয়ে রাখবো কেন?

রামেন্দ্রের মনে ধীরে ধীরে সুলোচনা সম্বন্ধে গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে, যা ঘৃণাস্পদ ও অপমান জনক। তিনি বুঝতে পারেন, যে সব ব্যক্তি সুলোচনার কাছে আসেন, তাঁরা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেন, কিন্তু আসল লক্ষ্য রূপের উপাসনা করা। তাঁদের চোখ সুলোচনাকে দেখতে চায়, আর কান চায় তার কথা শুনতে। তার রূপ-মাধুরীর আনন্দ উপভোগই হলো তাদের অভীষ্ট। সে যে পরস্ত্রী, সে জ্ঞানও তাঁদের নেই। হয়তো ভেবেছেন, তাঁদের বাধা দেবারও কেউ নেই।

রামেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে কোন মহাশয় এলে সুলোচনাকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর মনের ভাব, কুৎসিৎ সঙ্কেত, রহস্যমাখা কথা, দীর্ঘশ্বাস, এ সবই বলতে চায়—তোমার কৃপাপ্রার্থী, যদিও তুমি রামেন্দ্রের ষোলআনা, তবুও আমরা তোমার কিছুটা দাক্ষিণ্য তো পেতে পারি। তখন সুলোচনা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়।

রামেন্দ্র ও সুলোচনা দু'জনেই ক্লাবে যায়। সেখানে উদার মানুষের অভাব নেই। তাঁদের সম্বন্ধে রামেন্দ্রের মনে কোন সন্দেহ নেই, তাই সুলোচনাকেও সঙ্গে নিয়ে যান।

কয়েকদিন পর দেখা গেল, সুলোচনা ক্লাবে পৌছাতেই অন্যান্যদের যেন স্ফূর্তি বেড়ে যায়। যে টেবিল-চেয়ারে সুলোচনা বসে, সেখানটা বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। কোন-কোনদিন সুলোচনা গানও গায়। তার গান শুনে সবাই যেন উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

ক্লাবে মহিলা সদস্য সংখ্যা কম। বড় জোর পাঁচ-ছয় জন। সকলেই ভদ্র পরিবারের। তাঁরা সুলোচনার কাছ থেকে দূরে থাকেন। তাঁদের ভাব-ভঙ্গী ও বক্তব্য হলো— আমরা কুল-বধূ, পরস্ত্রী, যদি স্বামীকে খুশী করতে পারি, তাতেই স্বর্গ-সুখ মিলবে।

রামেন্দ্রের চোখের সামনে যেদিন কটু-সত্য প্রকাশিত হলো, তার পরদিন থেকেই তিনি ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করলেন। কোন বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীও যান না এবং তাঁর বাড়ীতে যাঁরা আসেন, তাঁদেরও উপেক্ষা করেন। একান্তে থাকাই উচিত বলে মনে করলেন। অবশেষে বাড়ী থেকেও আর বের হন না। তাঁর ধারণা জন্মেছে যে, তাঁর চারপাশে রয়েছে ছল আর কপটের দল, তারা জাল বিছিয়ে রেখেছে, কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না, তাদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহারের আশাও কম। অতএব তাদের থেকে দূরে থাকাই ভাল।

রামেন্দ্রবাবু বেশ জনপ্রিয়। বন্ধু-বান্ধবও পছন্দ করেন যথেষ্ট। তাই, একান্তবাস তাঁর পক্ষে অসহ্য। কোথাও বেড়াতে যান না, কারোর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করেন না, দিন-রাত ঘরে বসে থাকেন, এ যেন তাঁর কারাবাস। সুলোচনার সঙ্গে কথাবার্তা হয়, সংসারের কাজ করেন। স্বামীর মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে সুলোচনা মনে মনে বলে—আমার জন্যেই ওর এই অবস্থা, আমিই ওর জীবনে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছি।

সুলোচনা একদিন রামেন্দ্রকে বললে—আজকাল ক্লাবে যাও না কেন? বেশ ক' সপ্তাহ ঘর থেকেও বের হও নি, কেন?

রামেন্দ্রবাবু নিরাশ কণ্ঠে উত্তর দেন—মন কোথাও যেতে চায় না, নিজের ঘরই ভাল।

সুলোচনা—এতে তোমার শরীর খারাপ হবে যে, আমার জন্যেই কি তোমার এই অবস্থা? ঠিক আছে, আমিও আর যাবো না। ওখানে যে বউগুলো যায়, তারা কেউ ভাল নয়, মুখে সবাই সতী, তাদের মুখ দেখতেও ঘেন্না হয়। আচ্ছা, তুমি যাও না কেন বলো তো?

রামেন্দ্র—হৃদয়টা পাথর হতে পারছে না। ভেতরে যেখানে আগুন জ্বলছে, বাইরে শান্তি মিলবে কী করে?

স্বামীর কথায় সুলোচনা চমকে যায়। রামেন্দ্র আজ প্রথম এই ধরনের কথা বললেন। সুলোচনা নিজেকে সমাজের বহিষ্কৃত বলেই মনে করে। তার অনাদর সে নিজেই বোঝে। রামেন্দ্রের জন্যে তো দরজা খোলা, বাধা কিসের? যেখানে খুশী যেতে পারে, যার সঙ্গে খুশী মিশতে পারে, কে তাকে বাধা দিচ্ছে? কিন্তু না,

তা হতে পারে না। ও যদি কুলীন বংশের মেয়েকে বিয়ে করতো, তাহলে ওর অবস্থা কি এমন হতো? নিশ্চয়ই আনন্দে ও সুখে দিন কাটাতো। এমন দো-টানায় পড়তে হতো না। আমি এসেই ওর সব নষ্ট করেছি, ওকে উদাস করে দিয়েছি।

রামেন্দ্র ঐরূপ উক্তি করেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন, তাঁর কথায় দু'রকম অর্থ হয়ে যাবে। পরক্ষণেই বললেন—তুমি কি ভাবছো, আমরা দু'জন আলাদা? মনে রেখো, তোমার ও আমার জীবন এক। যখন দেখলাম, সেখানে তোমার সম্মান নষ্ট হচ্ছে, তখন গিয়ে কী করবো? তাছাড়া, সমাজের সব জিনিস তো সকলের সমান পছন্দ-সই নয়। আমি সকলকেই ভাল বলে জানতাম। দেখো, পদ, উপাধি ও ধন-সম্পত্তি কারোর আত্মাকে শুদ্ধ করতে পারে না। যারা নিম্নমানের লোক, তাদের কাজ-কর্মও নিম্ন-মানের হয়। ওদের কাজ হলো শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। তাই, ওদের কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল।

সুলোচনা স্বামীর কথায় স্বস্তি পায়।

চার

পরের বছর সুলোচনার কোলে এলো চাঁদের মত ফুট-ফুটে একটি মেয়ে, নাম রাখলো শোভা। ইতিমধ্যে কুমার সাহেবের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় তিনি হাওয়া বদলের জন্যে মুসৌরী চলে যান। নাতনি হওয়ার সংবাদ পেয়ে তিনি জামাই রামেন্দ্রকে টেলিগ্রাম করে জানালেন—নবজাত শিশু ও প্রসূতিকে এখানে নিয়ে এসো।

রামেন্দ্র টেলিগ্রাম পেয়ে চিন্তা করলেন, এই অবস্থায় ওদের সেখানে নিয়ে যাওয়া সমীচীন নয়। তাছাড়া, বন্ধু-বান্ধব ও সমাজবাসীদের একটা পরীক্ষা নেওয়াও দরকার। তাই, একটা পরিকল্পনা করলেন। স্থির হলো—একটা বিরাট ভোজের আয়োজন করা হবে। তাতে থাকবে—গান, বাজনা ও নাচ! দেশের নামী-দামী গায়ক ও শিল্পিগণ উপস্থিত থাকবেন। খ্রীষ্টানদের, হিন্দুদের ও মুসলমানদের জন্যে আলাদা খাদ্যেরও ব্যবস্থা করা হবে।

অসুস্থ শরীর নিয়ে কুমার সাহেবও মুসৌরী থেকে উৎসবের দিন এসে হাজির হলেন। নিমন্ত্রিতদের একে একে অনেকেই এলেন। কুমার সাহেব নিজে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। খাঁ সাহেবগণ এলেন, মির্জা সাহেব এলেন, মীর সাহেব এলেন, কিন্তু পণ্ডিতজী, বাবুজী, লালা সাহেব, চৌধুরীসাহেব, মহাজনেরা, মেহেরা, চোপড়াজী, সমাজপতি মশাই, শ্রীবাস্তবজী এবং কুলীনরা তখনো পর্যন্ত এসে হাজির হলেন না।

উল্লেখিত ব্যক্তিগণ হোটেলে মদ ও মাংস খেতে খুবই অভ্যস্ত, কিন্তু আজ নিমন্ত্রণে কেন এলেন না সেটাই বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কুমার সাহেব এবং রামেন্দ্র এই

চিন্তাই করছেন—ওঁরা বিয়েটাকে বৈধ বলে মনে করেন কি? এখনো ছুত-অচ্ছুত্ বলে মনে করছেন না তো? দেব-শিশুর প্রতিও কি তাঁরা বিবেকশূন্য।

রাত দশটা পর্যন্ত কুমার সাহেব ফটকে বসে রইলেন। তখনো পর্যন্ত কেউ এলেন না দেখে কুমার সাহেব রামেন্দ্রকে বললেন—তাঁদের জন্যে আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। মুসলমানদের সব খাইয়ে দাও, বাকী খাবার গরীবদের ডেকে বিলিয়ে দিতে হবে।

রামেন্দ্র হতবুদ্ধি হয়ে একটা চেয়ারে বসে ছিলেন। কুন্ঠিত স্বরে বললেন—হ্যাঁ, আমিও সেটাই ভাবছি।

কুমার সাহেব—এরকম হতে পারে, তা' আমি আগেই ভেবেছি। তাদের বিবেকের কোনদিন পরিবর্তন ঘটবে না।

রামেন্দ্র—যাক, পরীক্ষা তো নেওয়া হলো। চলুন, এবার গিয়ে তাঁদের খবর নিয়ে আসি।

কুবার সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন—কী বলছো, তাদের ঘরে যাবে?

রামেন্দ্র—হ্যাঁ, আমি গিয়ে তাঁদের জিজ্ঞেস করতে চাই—আপনারা কিসের অধিকারে আর কিসের বলে সমাজ-সংস্কার করতে চান? এটাই কি আপনাদের সমাজ-সংস্কারের পথ?

কুমার সাহেব—বিফল হবে। তার চেয়ে বরং শুয়ে পড়ো। আত্মা ও হৃদয়ের কাছে পবিত্র জিনিস আর কিছু নেই। আমাদের আত্মা যদি এ কাজটাকে পবিত্র বলে মনে করে, সেটাই ঠিক। তাতে দুনিয়ার কে কী করলো, তা আমাদের দেখার প্রয়োজন নেই।

রামেন্দ্র—কিন্তু আমি বলে রাখছি, সমাজের এই ধরনের লোকগুলোকে কোনদিন ছেড়ে কথা বলবো না।

এই বলে তিনি খাবার ভর্তি পাত্রগুলো এনে কাঙালীদের হাতে তুলে দিলেন।

পাঁচ

একদিন বিকালে রামেন্দ্র বাড়ী ফিরে দেখেন পতিতাদের একটি দল সুলোচনাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে গুলনার নামে একটি মেয়ে জুহারার আপন ভাইঝি। আগে সে সুলোচনার কাছে যাতায়াত করতো। বিগত দু'বছর আসে নি। সে সুলোচনার সমবয়সী। রামেন্দ্র দেখলেন দরজায় বেশ ভীড়। তাদের মধ্য থেকে গুলনার বেরিয়ে এসে নমস্কার জানিয়ে বললে—বাবুজী, আপনার মেয়েকে দেখতে এসেছি।

তার কথা শুনে রামেন্দ্র চমকে যান। মাথা নত হয়ে আসে। মুখ শুকিয়ে যায়।

কিছু বলতে পারেন না। বসতেও বলেন না। মূর্তিমানের মত দাঁড়িয়ে থাকেন। পতিতারা তাঁর মেয়েকে দেখতে আসবে এটা তাঁর ধারণার অতীত, লজ্জার ব্যাপার, জঘন্য কাজ বলে তিনি মনে করেন। তাঁর যে যথেষ্ট অধঃপতন ঘটেছে তা মরমে মরমে অনুভব করলেন। একদিকে বন্ধু-বর্গের কুটিলতা, আর অন্য দিকে পতিতাদের আগমন এ দু'ই তিনি অপমানজনক ব্যাপার বলে মনে করেন। তাই তিনি রাগে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

সুলোচনা যে পরিবেশে লালিত-পালিত সেটা প্রতিষ্ঠিত ভদ্র পরিবেশ। তাছাড়া সুলোচনা প্রতিদিনই জুহারার সমাধি দর্শন করতে যায়, সেটিও একটি পবিত্র কাজ। কেননা, সেটি দুনিয়ার মলিনতা ও কলুষতা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। তাই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, গুলনারের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিশ্চয়ই অন্য ব্যাপারে। যে ছবির সামনে অবনত মস্তকে দাঁড়ায়, ফুল ও মালা দেয়, সে কী করে মূর্তি পূজার নিন্দা করে? তাই, এখানেও গোপন রহস্য বিদ্যমান।

সুলোচনা ঘরে বসেই চিকের আড়াল থেকে রামেন্দ্রের ক্ষোভ ভরা মুখখানা প্রত্যক্ষ করে। যে সমাজকে সে উপাস্য বলে জেনেছে, যেখানে যাওয়ার জন্যে আজ কয়েক বছর চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে, তাকে পাওয়ার জন্যে সে আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। গুলনারকে ডেকে জড়িয়ে ধরে মনের দুটো কথা বলার জন্যে সে আজ বড় উৎসুক। মনে মনে বলে—যে আমার ভাল-মন্দ চিন্তা করে না, কুশল জিজ্ঞাসা করে না, তার খোসামোদ করবো কেন? আহা বেচারীরা কত দূর থেকে এসেছে। নিজের বলেই তো এসেছে। প্রাণের টানে তারা আমার সুখ-দুঃখের ভাগী হতে চায়।

অবশেষে রামেন্দ্র মাথা তুলে শুষ্ক হাসি হেসে গুলনারকে বললেন—আসুন, ঘরের ভেতরে আসুন। এই বলে তিনি বৈঠকখানার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় বাড়ীর ঝি সুলোচনার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গুলনারের হাতে একটা চিঠি দিয়ে যায়। গুলনার চিঠিটা পড়ে রামেন্দ্রের হাতে দেয়। রামেন্দ্র চিঠিটা দেখেন, লেখা আছে—ভাই গুলনার, তুমি আমার এখানে এসো না। এতে আমাদের বদনাম ছড়াবে। তোমার উপহার ফিরিয়ে নিয়ে যাও। যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও, তাহলে গভীর রাতে এসো, আর একা আসবে। ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার গলা জড়িয়ে ধরে মনের কিছু কথা বলি, কিন্তু সে উপায় নেই।

রামেন্দ্র চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দেন। রেগে চিৎকার করে বলেন—যা লিখেছে লিখুক, আমি কিছুতেই ভয় পাই না, তোমরা ভেতরে এসো।

গুলনার অস্বীকৃত হয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলে—না বাবু সাহেব, আমাদের চলে যেতে হবে।

রামেন্দ্র—ঠিক আছে, কয়েক মিনিট তো বসো।

গুলনার—না না, আর এক সেকেণ্ডও বসবো না।

ছয়

গুলনার চলে যাওয়ার পর রামেন্দ্র নিজের ঘরে গিয়ে বসলেন। আজ তাঁর যে পরাজয় ঘটলো এ রকমটি জীবনে কোনদিন ঘটেনি। যে আত্মাভিমান, যে ক্রোধ, যে ন্যায় বিচার তিনি দেখাতেন, তা আজ দেখাতে পারলেন না। তার পরিবর্তে পেলেন লজ্জা আর গ্লানি। তাঁর জিজ্ঞাস্য—হঠাৎ উপহার দিতে এলে কেন? কুমার সাহেব উদার, তাই তিনি জুহারার সবকিছু আব্দার সহ্য করতে পেরেছেন, কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। সুলোচনা কি গোপনে ওদের কাছে যাতায়াত করতো? তাহলে লিখেছে কেন, রাতে আসবে, একা আসবে। ব্যাপারটা কী? তার কি এমনি মনোবৃত্তি? এমনি বিচার? এমনি আদর্শ? জানি সে কুমার সাহেবের কাছে লালিত-পালিত, তবু রক্তের প্রভাব কি এত তাড়াতাড়ি দূর হতে পারে? আচ্ছা, ওদের দু'-বোনের মধ্যে দেখা হলে কী কথা হতে পারে? ইতিহাস বা নীতিশাস্ত্র নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হবে না। নিশ্চয়ই নির্লজ্জ কথাবার্তা হবে। গুলনার নিশ্চয়ই খোদ্দেরের গুণ-দোষ নিয়ে কথা বলবে। এ সব না হলে গুলনার ওর কাছেই বা আসবে কেন? লোকে খেতে না পেয়ে এঁটো-কাঁটাই খায়, সুলোচনার ক্ষেত্রে সেই রকম হবে নাকি? কেননা গুলনারের সঙ্গে তো তার কোন কথাই হলো না। তাই, অতৃপ্ত বাসনা তার কী করে মিটবে? এখন কাকে দোষ দেবো? নিজের ভাগ্যকেই দোষারোপ করি।

রামেন্দ্র বসে বসে এই সব চিন্তা করছেন, এমন সময় কুমার সাহেব এসে কটু-স্বরে বললেন—শুনলাম, গুলনার উপহার এনেছিল, সেটা তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো?

রামেন্দ্রের মৃদুস্বর হঠাৎ সজীব হয়ে ওঠে। বললেন—আমি তো ফিরিয়ে দিই নি, সুলোচনাই ফিরিয়ে দিয়েছে। মনে হয় ভালই করেছে।

কুমার সাহেব—তোমারও নিশ্চয়ই সম্মতি ছিল। দেখো, ঐ পতিতাদের সংশোধন করার অনেক সুযোগ তোমার ছিল, হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলে। সুলোচনাকে তো তুমিই সংশোধন করেছো। এক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নিমন্ত্রণ পেয়ে গর্বে ওরা নিজেদের জীবনকে ধন্য করতে চেয়েছিল, আর তুমি সেটা নষ্ট করে দিলে, একটু নজরও দিলে না?

রামেন্দ্র যেন উত্তর খুঁজে পান না। কুমার সাহেব আবার উত্তেজিত হয়ে বললেন—এটা তোমরা বুঝতে পারো না যে বাধ্য হয়ে অনেকে খারাপ কাজে নামে। চোর আনন্দ পাওয়ার জন্যে চুরি করে না সে বাধ্য হয়েই ঐ কাজ করে। তবে ভেবে দেখতে

হবে সেটা বাস্তাবিক না কাল্পনিক। অনেক সময় স্ত্রীর বাপের বাড়ী যাওয়ার সময় গয়না তৈরী করে দিতে হয় কিন্তু সেটা অন্য জনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে কোন লোক যখন অসৎ পথ ধরে অপর জন তখন মরে, তবু কারোর কাছে হাত পাতে না। এ সব তোমাদের মত বিদ্বান লোকদের বোঝাবার কিছু নেই। দেখো বেঁচে থাকার জন্যে মানুষ সব কিছু করতে পারে। এমন কি জঘন্য কাজ করতেও ভয় বা লজ্জা পায় না। আবার জীবনের সমস্যা কমলে আস্তে-আস্তে খারাপ কাজ থেকেও সরে আসে এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চায়। রামেন্দ্র তুমি ওদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করবে ওরাও তোমার সঙ্গে সেই রকমই ব্যবহার করবে। এই জন্যেই তুমি অশান্তি ভোগ করছো।

কুমার সাহেবের লম্বা-চওড়া বক্তৃতাটি শুনে রামেন্দ্র মনে মনে বললেন—পাগলের প্রলাপ। কেননা তিনি তো পতিতাদের সমবেদনা জানিয়েছেন সাহায্য করেছেন কিন্তু কী ফল পেয়েছেন? তাই তাঁর ধারণা তাদের পরাভূত করে কিছুই তিনি ভুল করেন নি। সেই কারণে বললেন—আমি ওদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে চাই না। আমি ঘরে বিষ ছড়াতে নারাজ।

সুলোচনা হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে! উত্তেজনায় তার মুখ চোখ লাল। রামেন্দ্র সুলোচনাকে দেখে বললেন—আমি কোন পতিতা মেয়েকে ঘরে স্থান দিতে চাই না। যারা রাতের অন্ধকারে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক, তাদের আমি ভাল চোখে দেখি না। সমাজের দণ্ডকে আমি ভয় পাই না, ভয় পাই নৈতিক অধঃপতনকে।

সুলোচনা মর্যাদা রক্ষার জন্যে অনেকবার আত্মসমর্পণ করেছে, কিন্তু এবার সে আর তা পারছে না। তাই তীব্র স্বরে বলে ওঠে—তুমি কি মনে করো, আমি এই কয়েদ খানায় সারাজীবন পড়ে থাকবো? আর সকলে তো কেমন হেসে-খেলে দিন কাটায়।

রামেন্দ্রও উত্তপ্ত স্বরে বলেন—এত যদি হেসে-খেলে বেড়াবার সখ, তাহলে বিয়ে করতে গেলে কেন? বিবাহ-বন্ধন ত্যাগ করা যায় না, তা জানো? মানুষ যতদিন সমাজ-বদ্ধ হয়ে বসবাস করবে, ততদিন পুরুষেরই প্রাধান্যই থাকবে। আমার স্ত্রী খারাপ কাজ করুক এবং কু-সংসর্গে যাক, সেটা কেউ কোনদিন স্বীকার করে নেবে না।

কুমার সাহেব বাদ-বিবাদ শুনে বুঝলেন যে, রামেন্দ্রের জয় নিশ্চিত এবং আসল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাবে তাই নম্রস্বরে বললেন—দেখো বাবা, উচ্চ শিক্ষিতরা কিছুটা অপরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। আর তাছাড়া তারা নিজের প্রভাব কিছুটা খাটাবে না কি?

রামেন্দ্র—এটা আমি সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারলাম না। আপনিই বলুন না, শিক্ষা কি রীতি-নীতি ত্যাগ করতে শেখায়? পা ভেঙে গেলে কি আমরা পা-টা কেটে বাদ

দেবো? আপনার ঐ analogy-তে আমার বিশ্বাস নেই। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাইছি যে, আমার সঙ্গে থাকতে পেলে পুরনো সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হবে। যদি তা' সম্ভব না হয় তাহলে সমাজ থেকে দূরে চলে যেতে হবে। সমাজে বাস করতে হলে সামাজিক অনুশাসন মানতে আমরা বাধ্য।

সুলোচনা উদ্ধত স্বরে বলে—স্ত্রী স্বামীর সব কথা শুনতে বাধ্য থাকবে কেন? তারও তো স্বাধীনতা থাকা উচিত। তারও তো ভাল-মন্দ বোঝার অধিকার আছে।

কুমার সাহেব ভয়ে ভীত হয়ে বললেন—সিল্লো, তুই ভুলে যাচ্ছিস, কথাবার্তার মধ্যে মোলায়েম শব্দ ব্যবহার করা উচিত। আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছি না, নিজের নিজের অভিমত ব্যক্ত করছি মাত্র।

সুলোচনা নির্ভীক হয়ে জবাব দেয়—না বাবা, আমি বেড়ি পরে থাকতে পারবো না। পুরুষের মত আমাদেরও স্বাধীনতা আছে বলে আমি মনে করি।

রামেন্দ্র নিজের কঠোরতায় লজ্জিত হয়ে বললেন—তোমার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার মত বিবেকহীন তো আমি নই, আর সে ইচ্ছাও আমি পোষণ করি না। তবে তুমি বিপথগামী বলে বোঝাবো বৈকি!

সুলোচনা—হ্যাঁ বোঝাতে পারো, তবে, বাধ্য করতে পারো না।

রামেন্দ্র—সেটা মেনে নিতে পারছি না।

সুলোচনা—আমি কোন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তোমার ইজ্জতে বাধে। আমারও কি ইজ্জত বলে কিছু নেই?

রামেন্দ্র—তা থাকবে না কেন।

সুলোচনা—তোমার যদি কোন ব্যভিচারী ভাই আসে, তাকে কি তুমি দরজা থেকেই তাড়িয়ে দেবে?

রামেন্দ্র—আমাকে তার জন্যে বাধ্য করতে পারো না।

সুলোচনা—বাধ্য করার ক্ষমতা শুধু তোমারই আছে?

"নিশ্চয়ই।"

"কেন?"

"কেন না, আমি পুরুষ, ছোট পরিবারের প্রধান। সেই জন্যেই তোমার………

রামেন্দ্র বলতে বলতে থেমে গেলেন।

সুলোচনা রামেন্দ্রের মুখের বাকী কথা গুলো কী তা বুঝে ফেলে। তার মন-প্রাণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তার ইচ্ছে করে তখনই ঘর ছেড়ে চলে যায়, আর মুখ দেখাতে কখনো আসবে না। ভাবে—এর নাম বিয়ে? সারাজীবনই অপরের দাসী হয়ে

থাকতে হবে? অপমান সইতে হবে? এমন বিবাহ-বন্ধনকে দূর থেকে সেলাম জানানোই উচিত।

সুলোচনা ঘর ছেড়ে চলে যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় কুমার সাহেব এসে তার হাতটা ধরে বললেন—কী করছিস্ মা, ঘরের বাইরে যাস্ না। কাঁদছিস কেন? আমি তো এখনো বেঁচে আছি, তোর ভাবনা কেন? রামেন্দ্র তো এমন কিছু অন্যায় কথা বলে নি মা! নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় রাগ করলে চলে? ঠিক আছে, পরে তোর অভিমত বলিস্, শুনবো!

এই বলে কুমার সাহেব সুলোচনাকে নিরস্ত্র করেন। বাস্তবে সুলোচনা কিন্তু গুলনারের সঙ্গে দেখা করতে চায় না। সে পালিয়ে যেতে চায়। ক্ষনেক আবেগে গুলনারকে চিঠি লিখেছিল। পতিতাদের সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি বলে রামেন্দ্রের প্রতি রাগ এবং মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ভাবে—দেখা করতে দিল না কেন? একটু চিন্তাও করলো না? আমাকে এত সন্দেহ করে? আমি কুলীন নই বলে এত অবজ্ঞা? আমি গুলনারের সঙ্গে দেখা করবোই, দেখি কী করতে পারে।

সুলোচনা অত্যন্ত আদরে পালিত হয়েছে বলে কারোর লাল চোখ সহ্য করতে পারে না। কুমার সাহেবও মা-মরা মেয়ে বলে কিছু বলেন না। রামেন্দ্রও এতদিন তাকে কিছু বলেন নি। রামেন্দ্রের হঠাৎ তিরস্কার শুনে সে অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। সে সবকিছু সহ্য করে নিতে পারে। শুধু সহ্য করতে পারে না—শাসন, তিরস্কার ও অবদমন।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সুলোচনা কোচোয়ানকে ডেকে বলে—গাড়ী নিয়ে এসো, তাড়াতাড়ি বেরুবো।

কুমার সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—মা সিল্লো, কী করছিস্, আমার কথা একটু শোন। দেখ্, এখন চলে গেলে পরে আপশোষ করতে হবে। রামেন্দ্র বড় রাগী মানুষ। সে তোর চেয়ে বড় বিচক্ষণ। আর কথাও তো চিন্তা করতে হবে। জানিস্, রাগের মাথায় তোর মাকেও আমি কয়েকবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছি, কিন্তু সে কোন দিন বাড়ীর বাইরে যায় নি। তাই বলি, ধৈর্য ধরে কাজ করতে হয়। আমার বিশ্বাস, রামেন্দ্র নিজের ভুল বুঝতে পারবে; তোকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করে কাছে টেনে নেবে।

রামেন্দ্র হঠাৎ এসে জিজ্ঞেস করলেন—গাড়ী এলো কেন? কোথায় যাচ্ছো?

রামেন্দ্রের ক্রোধোন্মত স্বর শুনে সুলোচনা ভয় পেয়ে যায়। চোখ দুটো জলে ওঠে, ঠোঁট কাঁপে, মুখটা লাল হয়ে যায়। তবু বলতে পারলো না যে, গুলনারের বাড়ী যাচ্ছি। আত্মরক্ষার ভাব প্রবল হয়ে ওঠায় বললে—মায়ের সমাধিতে একটু যাবো।

রামেন্দ্র রাগ মিশ্রিত স্বরেই বললেন—সেখানে যাবার দরকার কি ?

সুলোচনা কাতর স্বরে জিজ্ঞেস করে—কেন, মায়ের সমাধিতে যাওয়াও নিষেধ নাকি ।

রামেন্দ্র পূর্ববৎ স্বরেই বললেন—হ্যাঁ ।

সুলোচনা—তাহলে রইলো তোমার সংসার আমি চললাম ।

রামেন্দ্র—যাও না, কে বাধা দিচ্ছে, যেখানে খুশী চলে যাও ।

সংসারের মায়া, মমতা, ভালবাসা, আকর্ষণ ও প্রেম বলতে যা, তা' সেই মুহূর্তেই বুঝি সব ছিন্ন হতে চলেছে। রামেন্দ্র ভাবলেন, সুলোচনা হয়তো কুমার সাহেবের বাড়ীতে যাচ্ছে। দু'চার দিনের মধ্যেই রাগ পড়ে গেলে বুঝিয়ে নিয়ে আসবেন, কিন্তু তা' হলো না। সুলোচনা ফটক পর্যন্ত গিয়েই মূর্তির মত দাঁড়িয়ে, যেন কোন ঋষির শাপে প্রাণহীন। তারপর সেখানেই বসে পড়ে। কিছু বলেও না, কাঁদেও না, যেন তড়িতাহত। কারণ রামেন্দ্রের কথাটা তাকে বজ্রাহত করেছে ।

সুলোচনা কতক্ষণ বসেছিল, তা কেউ জানে না। তবে যখন ঘরে ঢোকে তখন গভীর রাত্রি। দেওয়াল ঘড়িতে একটা বাজলো। একঘরে কুমার সাহেব তার নাতনিকে নিয়ে শুয়ে আছেন, আর অন্য ঘরে পালঙ্কে নিদ্রা যাচ্ছেন রামেন্দ্র। সুলোচনা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে মনে মনে বলে—এখন ওরই সামনে যদি গলায় ছুরিটা বসিয়ে দিই, তাহলে ছট্‌ফট্ করে মরার দৃশ্যটা ও নিজের চোখে দেখতে পাবে। ও তো আমার মৃত্যুই চায়, না হলে এমন কথা বলবে কেন! এমন চতুর, এমন উদার, এমন বিচক্ষণ হয়েও মুখে এমন কথা আনলো কী করে ?

সুলোচনার সতীত্ব, ভারতীয় আদর্শের কোলে লালিত, আবার ভারতের মাটিতেই আহত হয়ে ডুগরে ডুগরে কাঁদছে। তার দুঃখ সে যদি উচ্চ বংশে জন্মাতো, তাহলে এমন আচরণ কি করতে পারতো ? আজ সে যেন অচ্ছুত, দলিত, ত্যাজ্য, সবকিছু বলা চলে, তাই না ? ওঃ এমনি কঠিন হৃদয় ওর !

এখন তার মরা ছাড়া আর কোন উপায় নেই !

বারান্দায় জ্বলছে বিদ্যুতের আলো। রামেন্দ্রের মুখ-মণ্ডলে নেই তখন ক্ষোভ বা গ্লানির চিহ্ন। তবে কাঠিন্য মুখটাকে বিকৃত করে রেখেছে। তার চোখে জল দেখতে পেলে হয়তো সুলোচনার মনটা কিছুটা শান্ত হতো, কিন্তু তার হাতে তখন উন্মুক্ত ছোরা, সংসার তার কাছে তুচ্ছ ।

সুলোচনা নিজের ঘরে ঢোকে। কুমার সাহেব এবং তার মেয়ে ঘুমাচ্ছে। কুমার সাহেবের তেজস্বী মুখখানা ক্লান্তিহীন। গালে শুকনো অশ্রুধারা চোখে পড়ে। পায়ের নীচে বসে সুলোচনা কেঁদে ফেলে, আর মনে মনে বলে—এই অভাগিনীর জন্যে কত না

কষ্ট পেয়েছেন, কত না অপমান সহ্য করেছেন, সারা জীবনটা আমারই জন্যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করলেন।

তারপর মেয়ের দিকে তাকায়। প্রস্ফুটিত গোলাপের মত মুখখানা দেখেও তার হৃদয় গলে না। মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ভাবে—ওর জন্যে আমি কেন বেঁচে থাকবো? ওর বাবার জন্যেই যখন আমার এত দুর্দশা, তখন সে-ই ওকে পালন করুক, আমার কী দায় পড়েছে? আজ আমার বাবা যেমন আমার জন্যে কাঁদছেন, ওর বাবাকেও একদিন তেমনি করেই কাঁদতে হবে! হে ঈশ্বর, আমাকে যদি আবার জন্ম দাও, তাহলে যেন ভাল মানুষের ঘরে এবং কুলীনের ঘরে পাঠিয়ো।

* * * *

জুহারার সমাধি যেখানে, ঠিক তার পাশেই আর একটি সমাধি নির্মিত হয়েছে। জুহারার সমাধির চারপাশে ঘাস জন্মেছে, স্থানে-স্থানে চূণ-সুরকী খসে গেছে, কিন্তু নতুন সমাধিটি বেশ পরিচ্ছন্ন এবং ফুল ও মালা দিয়ে সাজানো। নতুন সমাধির চারপাশে আছে অসংখ্য ফুলের টব আর সমাধি স্থলে যাবার রাস্তার দু'ধারে লাগানো হয়েছে গোলাপ ফুলের চারা গাছ।

তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়। অস্তগামী সূর্যের ক্ষীণ আলো সমাধির ওপর যেন অশ্রু ঝরাচ্ছে। সেই সময় এক ভদ্রলোক বছর তিনেকের একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে সেখানে এসেছেন এবং রুমাল দিয়ে সমাধির ধুলো ঝেড়ে দিচ্ছেন। শুকনো পাতাগুলো সরিয়ে আতর ছিটাচ্ছেন আর মেয়েটি প্রজাপতি ধরবার জন্যে ছুটোছুটি করছে।

সেই সমাধিটি সুলোচনার। তার শেষ নিবেদন ছিল—আমার মৃতদেহটি না পুড়িয়ে মায়ের কবরের পাশেই যেন শুইয়ে রাখা হয়। সুলোচনা চলে যাওয়ার ছ'মাসের মধ্যেই কুমার সাহেবও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। রামেন্দ্র অবশ্য নিজের কর্মের জন্য মাঝে-মাঝে অনুশোচনা করছেন।

শোভা এখন তিনবছরের মেয়ে। তার বিশ্বাস তার মা সমাধি থেকে একদিন নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে।

তামাশা

ছাত্র জীবনের ঠাট্টা-তামাসা এমন একটি বস্তু যা জীবনে অন্য কোন সময় আর মেলে না। মেলা সম্ভবও নয়। অধিকাংশ ছাত্রকে সেটি চিন্তামুক্ত রাখে এবং আনন্দ যোগায়। এমন কি পরীক্ষার চিন্তা থেকেও তাদের দূরে রাখে। ছাত্র জীবনে বেশীর ভাগ সময় বই পড়ে, বেড়িয়ে, গল্প করে, হাসি-ঠাট্টা করে বা খেলা করেই কাটে। তাছাড়া ছাত্র ছাত্রীদের নাট্যাভিনয় ও উৎসব-অনুষ্ঠান তো আছেই। এ সবই হলো তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আনন্দ-স্ফূর্তি করা। বন্ধুদের মধ্যে যদি কেউ (ক্রিকেট, হকি, ফুটবল ছাড়া) বিশেষ কাজে উৎসাহী হয়, তাহলে অন্যদের কাছে সে তামাসার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। আবার যদি কেউ ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়, বা নিয়মিত সন্ধ্যা-আহ্নিক করে বা, নিয়মিত নমাজ পড়ে, তাহলে অন্যদের কাছে সে হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। যদি কেউ সব সময় হাতে বই নিয়ে ঘোরে বা পরীক্ষার জন্যে দিন-রাত পড়ে, তাহলে সেও অন্য বন্ধুদের হাত থেকে রেহাই পায় না। মোট কথা, নির্দ্বন্দ্ব, নিরীহ ও সরলমনা বন্ধুদের কোন বাধা আসে না, একথা বলতে পারা যায়! মুস্কিল হলো, মোল্লা আর পণ্ডিত জাতীয় বন্ধুদের। তাদের কিন্তু দুর্গতির সীমা থাকে না।

মহাশয় চক্রধর এলাহবাদের একটি সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। শান্ত-শিষ্ট স্বভাবের জন্য সে হাসি-ঠাট্টা বা তামাসা থেকে সব সময় দূরে থাকে। বলা যায় গোঁড়া হিন্দু। তাই আচার বিচারে ও পবিত্রতায় সব সময় সজাগ। বিদেশী পোষাকের প্রতি তার যথেষ্ট ঘৃণা। পরনে তার সাদাসিধে মোটা জামা আর কাপড়, পায়ে চামড়ার চটি। সকাল-সন্ধ্যায় আহ্নিক ও হোম করে আর কপালে চন্দনের তিলক কাটে। ব্রহ্মচর্য নেওয়ায় মাঝে মাঝে মস্তক মুণ্ডন করে, কিন্তু মাথায় রাখে লম্বা মোটা শিখা। তার বক্তব্য—আর্য ঋষিগণ মনে করতেন, শিখা দেখেই অনুমান করা যায় সর্বজ্ঞ এবং ব্যক্তিসম্পন্ন পুরুষ। তাছাড়া শিখার দ্বারা শরীরে অনাবশ্যক উষ্মতাও বাইরে বেরিয়ে আসে এবং শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, ঋষিগণ বলে গেছেন, শিখাই হলো প্রকৃত হিন্দুর লক্ষণ। চক্রধর নিজেই রান্না করে খায়। স্বল্প আহারই তার বেশী পছন্দ। কেন না, সে মনে করে, আহার দেখে মানুষের নৈতিক বিকাশ বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। সে বিদেশী জিনিসকে অবজ্ঞা করে, ক্রিকেট বা হকি খেলায় অনাগ্রহী এবং পাশ্চাত্য সভ্যতাকে শত্রু মনে করে। ইংরাজী ভাষা বলতে বা লিখতে তার সংকোচ হয়। ফলে ইংরাজীতে একেবারে পিছিয়ে আছে। তার সখ বলতে একটাই, পান খাওয়া। কেন না, কবিরাজগণ বলেন—পানের অনেক গুণ, হজম শক্তিও বাড়ায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্ররা এমন শিকার দেখে কি ধৈর্য রাখতে পারে? তাই নিজেদের মধ্যে কানাকানি চলে। এই রকম জংলীটাকে সোজা রাস্তায় আনার সংকল্প নেয়। তাদের বক্তব্য—কেমন পণ্ডিত সেজে আছে দেখো না, নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই আমল দেয় না? এমন ব্যবস্থা একটা নিতে হবে, যাতে ভণ্ডামী ছাড়তে বাধ্য হয়।

সৌভাগ্যক্রমে সুযোগটাও এসে যায়। ক্লাস আরম্ভ হওয়ায় কয়েকদিন পরই একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান লেডী দর্শন ক্লাসে ভর্তি হলো। মহাশয়া কবি কল্পিত সব উপমারই আগার। আপেলের মত রং, সুকোমল দেহ, সহাস্য মুখ মণ্ডল, তার ওপর মনোহরণকারী ও মনোমহিনী বেশভূষা। ছাত্রদের আমোদ-আহ্লাদের আর সীমা থাকে না। দেখা গেল, অনেকে ইতিহাস ও ভাষা সাহিত্য ছেড়ে দর্শন ক্লাসে এসে ভর্তি হয়েছে।

সবার দৃষ্টি সেই চন্দ্রমুখীর দিকে। তার কৃপা-কটাক্ষের জন্যে সকলেই অভিলাষী, তার মধুর বাণী শোনার জন্যে সকলেই লালায়িত, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই প্রেমের উৎপত্তি হয়, আর সেখানেই জাদু। তাই শত চেষ্টা করলেও বিফল মনোরথ হতে বাধ্য। অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মনোভাব ও আগ্রহ অপেক্ষা চক্রধরের আগ্রহের অনেক তফাৎ। সে লেডীকে প্রথম দিন থেকেই যেন অন্য দৃষ্টিতে দেখে ফেলেছে। তার প্রেমে পড়তে চায়। প্রেম বেদনায় সে উন্মত্ত হয়। লেডীর দিকে তাকাতেই তার শরীরে যেন শিহরণ জাগে। ভাবে অন্য আর কারোর দৃষ্টি যেন তার ওপর না পড়ে। তবে শিখা ও তিলক নিয়ে হলো তার মুস্কিল। সেই কারণ, সুযোগ পেলেই অত্যন্ত বিনয়, সচেতন, আতুর ও অনুরক্ত নেত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে তার দিকে তাকায় এবং মনে মনে বলে—কেউ যেন টের না পায়।

ধর্মের ঢাক কি আর বাজাতে হয়? তাই তো বলে—যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। তাই সহপাঠীদের কাছে চক্রধরের প্রেম বাসনা গোপন থাকে না। তারাও যেন হাতে চাঁদ পায়। এই রকম সুযোগ খুঁজছিল। তাদের মধ্যে দু'জন চক্রধরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব করতে থাকে এবং কয়েক দিনের মধ্যে বিশ্বাস জমিয়ে ফেলে। শিকার হাতে পেয়ে দু'জনে পরামর্শ করে স্থির করে যে, লেডীর নাম দিয়ে চক্রধরকে একটা প্রেমপত্র লিখতে হবে। তাই একদিন একটা চিঠিতে লেখা হলো—

"মাই ডিয়ার চক্রধর,

অনেক দিন ভোরে ভাবছে আপনাকে চিঠি লিখিবে, বাট্ ভোয় হোয়েছে। কারণ আন্‌নোন্ বোলে। এখোন অনেকটা সংকোচ কাটিয়েছে। সত্যি,

আপনি হামাকে জাদু করেছেন। এখোন আপনার মুখ দেখিতে না পাইলে চঞ্চল হয়ে ওঠে। চোখ বন্ধ করিলেই আপনার ফেস্ চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে। আপনার সৌমমূর্তি, প্রতিভাশালী গাম্ভীর্য এণ্ড ড্রেস হমার মাইণ্ডকে বোড়ো আকৃষ্ট করে। ইউ নো, হামি আড়ম্বরকে ঘৃণা করে। এক্সসেপ্ট ইউ, বাকী সোব কৃত্রিমতায় ভরা। উহাদের মনোভাব সম্বন্ধে হামি সুপরিচিত। উহাদের আচরণ লাইক লম্পট এণ্ড শয়তান। ওন্‌লি আপনি একজন ভদ্র, সদানুরাগ এণ্ড সজ্জন। আপনার সঙ্গে কোথা বোলার জন্যে হামি উৎকণ্ঠিত, বাট, আপনি হামার কাছ থেকে এতো দূরে বোসেন যে কোথা বোলার চান্স মেলে না। সো, আই প্রে টু ইউ, কাল ঠেকে আপনি হামার কাছে বোসিবেন। হামার আত্মা তৃপ্ত হোবে।

একটা কোথা লেটারের রিপ্লাইটা লাইব্রেরীর থার্ড আলমারীর নীচে রাখিয়া দিবেন এণ্ড হামার চিঠি ছিঁড়িয়ে ফেলবেন, মাইণ্ড দ্যাট্!

ইয়োর—

লুসী।"

চিঠিটা ডাকে পাঠিয়ে বন্ধুরা উৎসুক হয়ে থাকে, কিন্তু বেশী দিন তাদের অপেক্ষা করতে হলো না। দেখে, পরের দিনই চক্রধর কলেজে এসে লুসীর কাছে বসার চেষ্টা করছে। যে দু'জন চক্রধরের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তারা লুসীর কাছেই এতদিন বসে আসছে। তাদেয় মধ্যে একজন হলো নঈম আর অপর জন গিরিধর সহায়। চক্রধর গিরিধরকে বললে—ভাই, তুমি আমার জায়গায় নিয়ে বসো না। আমি এখানেই বসি।

নঈম—কেন, তোমার ওখানে কী অসুবিধা হচ্ছে?

চক্রধর—না না, অসুবিধা কিছু হয় নি, তবে প্রফেসারের লেকচার বেশ ভাল শুনতে পাই না। কেন না, আমি কানে একটু কম শুনি।

গিরিধর—আগে তো তোমার ও রোগটা ছিল না ভাই?

নঈম—দেখো না, এখান থেকে প্রফেসার আরো দূরে হয়ে যাবেন।

চক্রধর—না না, এমন কিছু দূর হবে না। কী বলবো ভাই, আমার মাঝে মাঝে তন্দ্রা এসে যায়। সামনে বসলে যদি কেউ দেখে ফেলে, তাই এখানে বসতে চাইছি।

গিরিধর—কী বললে, তন্দ্রা আসে? এটা কি ঘুমানোর জায়গা? ঘরে ঘুমাতে পারো না?

নঈম—ঠিক আছে, ছেড়ে দাও। বন্ধুলোক বলছে, আপত্তি করছো কেন?

গিরিধর—বেশ ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু মনে রেখো, এটা সাধারণ ত্যাগ নয়। তুমি বায়না করছো বলেই ছাড়ছি। অন্য কেউ হলে লাখ টাকা দিলেও ছাড়তাম না।

নঈম—তা তো বটেই। তুমি ওর বড় উপকার করলে। নাও ভাই এখানেই বসো।

চক্রধর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নতুন জায়গায় বসে। কিছু পরেই লুসীও এসে তার নিজের জায়গায় বসলো। তারপর প্রফেসার ক্লাসে এলেন। চক্রধর বার বার লুসীর দিকে আক্ষেপের ভঙ্গীতে তাকায়, কিন্তু লুসী প্রফেসারের কথা তন্ময় হয়ে শোনে। চক্রধর ভাবে—লজ্জায় হয়তো কথা বলতে চাইছে না। কেন না, লজ্জাই নারীর অলংকার, তবু সে লুসীর দিকে তাকানোর লোভ ছাড়তে পারে না। লুসী বার বার মুখ ঘুরিয়ে নেয়, বিরক্ত বোধ করে। হয়তো পান চিবানোর লোকের কাছ থেকে দূরে থাকতে চায়। তবু চক্রধরের অবুঝ মন লুসীর কাছে বসতে পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পায়। অন্য সকলকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে, আর মনে মনে ভাবে—তার মত সৌভাগ্যশালী আর ক'জন আছে? এমন প্রতাপী আজ কে?

সন্ধ্যার সময় চক্রধর নঈমের ঘরে এসে বলে—ভাই একজন Letter writer (পত্র ব্যবহার শিক্ষক) দরকার। এ ব্যাপারে কে ভাল হবে বলো তো?

নঈম গিরিধরের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নেয় তারপর বলে—Letter writer নিয়ে কি হবে?

গিরিধর—দরকার আছে বই কি। শোনো, এ ব্যাপারে নঈমই ভাল হবে।

চক্রধর কিছুটা শঙ্কিত হয়ে বলে—আচ্ছা, কাউকে যদি প্রেমপত্র লিখতে হয়, তাহলে প্রথমে কী বলে আরম্ভ করতে হবে বলো তো?

নঈম—'ডার্লিং' লিখতে পারো। আর যদি খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়ে আসে, তাহলে 'ডিয়ার ডার্লিং' লিখতে পারো।

চক্রধর—কী ভাবে শেষ করা উচিত?

নঈম—সব ঘটনাটা যদি বলে দাও, তাহলে চিঠিটা লিখে দিতেও অসুবিধা হবে না।

চক্রধর—না না, একটু বলে দাও, আমিই লিখে নিতে পারবো।

নঈম—দেখো, যদি প্রেমিকা খুব লাজুক হয়, লিখবে—your dying lover, আর যদি সাধারণ প্রেমিকা হয় তাহলে লিখতে পারো—yours forever.

চক্রধর—কিছুটা শুভ কামনা করার মত ও তো থাকা উচিত।

নঈম—কি বেরসিকরে বাবা, বিনা শুভ কামনায় কোন চিঠি হয়? তাতে আবার প্রেমপত্র? বুঝলে, প্রেমিকাকে ভালবাসা জানানো আর গরীবের প্রতি দয়া করা, দুটো একই জিনিস। তুমি লিখতে পারো—God give you everlasting grace and beuty, অথবা May you remain happy in love and lovely.

চক্রধর—কথা গুলো একটু কাগজে লিখে দাও না।

গিরিধর বন্ধুর অনুরোধে একটা কাগজে কয়েকটা কথা লিখে দেয়। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর চক্রধর দরজায় খিল এঁটে চিঠি লেখে। চিঠির ভাব ঠিক মত প্রকাশ না হওয়ায় বেশ কয়েকটা কাগজ নষ্ট হয়। তারপর চিঠিটা শেষ করতে ভোর হয়ে যায়।

পরের দিন চিঠিতে আতর মাখিয়ে লাইব্রেরীর সেই নির্দ্দিষ্ট আলমারীর নীচে রেখে দেয়। বন্ধুরা ওৎ পেতেই আছে, তাই চিঠি বের করে এনে পড়ে আর আনন্দে লাফায়।

দুই

তিনদিন পর চক্রধর আবার একটা চিঠি পায়। লেখা আছে—

"মাই ডিয়ার চক্রধর,

টুমার চিঠি মিলেছে। রিপিটেড্‌লী পড়িয়েছে এণ্ড কিস্‌ করিয়েছে। কী সুন্দর সেণ্ট! গড্‌ হামাদের লাভ এই রকম সুরভী-সিঞ্চিত করুণ এই প্রেয়ার করছে। টুম নালিশ করেছে, হামি টুমার সাথে কথা বলি না কেনো। ডিয়ার একটা কোথা, প্রেম কোথায় হোয় না, হৃদয় দ্বারা হোয়। যোখন টুমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই, তোখন হার্টে কি যে দুখ্‌ হয় তো হামি ওন্‌লী জানে। একটা আগুন তোখন হামার হার্টকে পুড়িয়ে ভষ্ম কোরে দেয়। টুম জানে না কোত আঁখে হামার দিকে তাকিয়ে থাকে। হামার তোখন ডয় হোয়, যদি বিপত্তি ঘটে যায়। ফর দিস্‌। হামি সদা সাবধান হোয়ে থাকি। হামার একটা প্রেয়ার। টুমার কাছে রাখছে কি, টুমাকে হামি ইংলিশ ড্রেসে দেখতে চাই! যদিও টুমাকে ধোতি ও শার্টে বিউটিফুল লাগে তো ভী একটা কোথা রয়ে যায় কি, হামি চাইলহুড্‌ থেকে ইংলিশ ড্রেস দেখে আসছে, তাই সেটার ওপরই হামার বেশী অনুরাগ। আই হোপ, টুমি হামাকে নিরাশ করবে না। আই হ্যাব মেড এ জ্যাকেট ফর ইউ। ওটাকে টুমি হামার প্রেম কা তুচ্ছ উপহার বলেই মাইণ্ড কোরবে।

টুমার

"লুসী"

লুসীর চিঠির সঙ্গে একটা ছোটমত প্যাকেট এলো, জ্যাকেট-টা তারই মধ্যে ছিল। বন্ধুবর্গ চাঁদা তুলে সেই জ্যাকেটটি তৈরী করিয়েছে। তাদের ধারণা, সেটা দিয়েই আসল উদ্দেশ্যটা সফল হবে। চিঠি ও উপহার পেয়ে চক্রধর আনন্দে আট-খানা হয়। জ্যাকেটটা ছাত্রাবাসের প্রত্যেককে দেখায়। বন্ধুগণ জ্যাকেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, এবং সকলের অনুমান, সেটি অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। কেউ কেউ বলে—মনে হয় প্যারিস থেকেই সেলাই হয়ে এসেছে, না হলে ও জিনিষ তৈরী করার এখানে মিস্ত্রী কোথায়?

এখানে ঐ রকম জ্যাকেট কেউ তৈরী করে দিতে পারলে একশো টাকা পুরস্কার দেবো। বাস্তবে, জ্যাকেট-টা এমন গাঢ় রং যে কোন সুরুচি সম্পন্ন মানুষ সেটা পরতেই চাইবে না। অবশেষে চক্রধরের বন্ধুবর্গ তাকে পূর্ব্বমুখে দাঁড় করিয়ে শুভ-মুহূর্তে জ্যাকেট পরানোর শুভকাজ সম্পন্ন করে। জ্যাকেট পরিয়ে সকলেই আনন্দে নাচতে থাকে। কেউ চক্রধরের সামনে এসে বলে—তোমাকে তো দেখছি চেনাই যায় না। চেহারাই পাল্টে গেছে। তোমার সময়টা বেশ ভালই যাচ্ছে। এ না হলে ঠাট-বাট? দেখছো না, এটা পরে রূপটা কেমন খুলেছে। দেখো ভাই, শুধু জ্যাকেট পরলে জীবন সার্থক হয় না, এর সঙ্গে সঙ্গে চাই ইংলিশ সুট। আহা, তখন আমরা তোমার কী রূপই না দেখবো! তখন টেনে ছাড়ানোই দায় হবে।

শেষ পর্যন্ত বন্ধুরা এই পরামর্শ দিলো যে খুব তাড়াতাড়ি একটা ইংলিশ সুট তৈরী করিয়ে নেওয়া উচিত। এই সুযোগে বিশেষজ্ঞরা চক্রধরকে সুট তৈরী করানোর জন্যে বাজারে নিয়ে যায়। চক্রধরের বাড়ীর আর্থিক অবস্থা ভালই, তাই এক সাহেবের দোকান থেকে অনেক দাম দিয়ে একটা সুট কেনে। সে রাতটা গান, বাজনা এবং নাচে ছাত্রাবাসটি উৎসব মুখর হয়ে ওঠে। পরের দিন বেলা দশটার সময় বন্ধুরা চক্রধরকে সুট ও জ্যাকেট পরায়। চক্রধর উদাসীনতা দেখানোর জন্যে বলে—কই, আমাকে তো একেবারেই ভাল লাগছে না! তোমাদের কাছে জ্যাকেটের কাপড়টা এত ভাল লাগছে কেন?

নঈম—আরে আয়নায় গিয়ে দেখো, তবে বুঝতে পারবে। ঠিক যেন শাহাজাদা! বুঝলে, তোমাকে দেখে আমাদের হিংসে হচ্ছে। আহা, খোদা তোমাকে কত সুন্দর চেহারাই না দিয়েছেন! সেটাকে তুমি একটা মোটা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চাও?

চক্রধর নেকটাই বাঁধতে জানে না। তাই বললে—ভাই, এটা বেঁধে দাও তো।

গিরিধর নেকটাইটা চক্রধরের গলায় এমন কোষে বাঁধলো যে, চক্রধর নিশ্বাসই নিতে পারছে না। বলে—এ কী করলে? এমন করে বাঁধলে কেন?

গিরিধর—ওই ভাবেই তো বাঁধার নিয়ম। ঢিলে করে বাঁধলে দেখতে খারাপ লাগবে।

নঈম—ঢিলেই তো হয়েছে। আচ্ছা, আমি এবার বেঁধে দিচ্ছি।

চক্রধর—ভাই, দম আটকে যাচ্ছে।

নঈম—তাহলে টাইয়ের মর্যাদা থাকবে কি করে? ঘন-ঘন যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস না হয় তার জন্যেই তো লোকে টাই বাঁধে।

চক্রধরের প্রাণ-সংশয়। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে, শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ছে,

কিন্তু টাইটা ঢিলে করে নেওয়ার মত সাহস তার আর হচ্ছে না। তারপর কলেজের দিকে পা-বাড়ায়। বন্ধুরাও তার পিছনে পিছনে যায়, যেন বরের পিছনে বরযাত্রীর দল। তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসে আর মুখে রুমাল চাপা দেয়। চক্রধর সে সবের কিছুই বুঝতে পারে না, নিজের বশেই মত্ত। গম্ভীর হয়ে ক্লাসে এসে বসে। একটু পরেই লুসীও এলো। নতুন বেশভূষা দেখে সে চকিত হয়, মুখে অঙ্কিত হয় মৃদু হাসির এক অপূর্ব রেখা। চক্রধর ভাবে, তাকে দেখেই সে হয়তো পুলকিত! তাই সেও হাসি-হাসি মুখ করে তার দিকে রহস্য পূর্ণ ভাবে তাকায়, কিন্তু লুসী ভ্রুক্ষেপই করে না।

চক্রধরের জীবন থেকে ইতিমধ্যে ধর্মোৎসাহ ও স্বদেশ প্রেম কমতে আরম্ভ করেছে। প্রথমেই সে শিখাটাকে কেটে ফেলে। ইংরাজী কায়দায় চুলটা কাটিয়ে নিয়েছে দেখে বন্ধুরা বলে—কি ব্যাপার? তুমিই তো একদিন বলেছিলে শিখার সাহায্যে শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে। এখন কোন পথ ধরলে ভাই?

চক্রধর মৃদু হেসে দার্শনিক ভাব নিয়ে বলে—বুঝলে, আমি তোমাদের বোকা বানিয়ে ছিলাম। ওসব ভণ্ডামীতে আমার বিশ্বাসই ছিল না। তাই অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারনি। তাই তোমাদের একটু চমকে দিতে চেয়েছিলাম মাত্র।

নঈম—হায় আল্লা, তুমি তো বেশ গুলবাজ। আমরা তোমাকে বলদ বলেই জানতাম, এখন দেখছি তুমি ডাঁহা ধম্মের ষাঁড়।

চক্রধর—পরীক্ষা করে দেখছিলাম, তোমরা সব কী বলো।

চক্রধরের শিখার সঙ্গে সন্ধ্যা-আহ্নিক ও হোম করা ডকে উঠেছে। শুধু তাই নয়, হোম করার পাত্রটাও স্থান পেয়েছে তক্ত-পোষের নীচে। কিছুদিন পর সেটি সিগারেট ফেলার এ্যাসট্রেতে পরিণত হলো। যে আসনটায় বসে হোম করতো সেটা আগেই পা-পোষে পরিণত হয়েছে। আজকাল প্রতিদিনই গন্ধযুক্ত সাবান মাখে, মাঝে মাঝে চুল আঁচড়ায় আর সব সময় সিগারেট মুখে লেগেই আছে। বন্ধু-বান্ধবও জুটেছে অনেক। তাদের ধান্ধা, জ্যাকেট তৈরীর টাকাটা সুদ সমেত যেমন করে হোক আদায় করে ছাড়তে হবে। ইতিমধ্যে লুসীর আরও একটা চিঠি এসে গেছে। তাতে লেখা—"টুমার পরিবর্তন দেখে হামি খুব আনন্দ পাচ্ছে। কত না আনন্দ, তা ভাষা দ্বারা প্রকট করতে পারছে না। হামি এই রকমই আশা করছিলো। টুমি একুন যোগ্য হয়েছে। কোন ইউরোপীয়ান লেডী টুমার সাঠে সহবাস করতে অপমান মনে করবে না। একুন টোমাকে একটা প্রেয়ার করছে কি হামাকে একটা প্রেমের কোন চিহ্ন প্রদান করো, যেটা অলওয়েজ নিজের কাছে রাখতে পারিবে। হামি বহুমূল্য বস্তু চাইছে না, প্রেম উপহার ওনলী।"

চক্রধর বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা, ভাই, যদি কেউ স্ত্রীকে উপহার দিতে চায়, তাহলে কী পাঠানো উচিত ?

নঈম—বুঝলে ভাই, তাকে এমন জিনিস দিতে হবে, যাতে সে বেশ খুশী হয় এবং তোমার প্রতি চির অনুগত থাকে। যদি কোন হালফ্যাশানের লেডী হয়, তাহলে ভাই বেশ দামী এবং চটকদার জিনিস পাঠাতে হবে। যেমন ধরো—রুমাল, রিস্টওয়াচ, সুগন্ধ তেলের শিশি, দামী চিরুনী, আয়না, চকলেট, ব্রুচ, এই সব। আর যদি গাঁয়ের মেয়ে হয় ; তাহলে ভাই অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করো। কেন না, গাঁয়ের মেয়েদের সম্বন্ধে আমি ভাল বলতে পারবো না।

চক্রধর—না না, গাঁয়ের নয়, ইংরেজী পড়া জানা মেয়ে, তাছাড়া খুব নামী-দামী বংশের।

নঈম—তাহলে ভাই আমি যা বলছি তাই করো।

সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুরা চক্রধরকে নিয়ে বাজারে যায়। অনেক ঘোরাঘুরি করে পছন্দমত অনেক জিনিস নিয়ে আসে। প্রত্যেকটা জিনিসই বেশ দামী। তাই পঁচাত্তর টাকারও বেশী খরচ হলো। এত গুলো টাকা খরচ করেও চক্রধরের কোন আপশোষ হয় না, বরং সে খুব খুশী। ফেরার সময় নঈম বললে—কি দুঃখের কথা বলো দিকি, আজও পর্যন্ত আমি এই ধরণের একটা বিবি পেলাম না।

গিরিধর—বিষ খাও ভাই, বিষ খাও।

নঈম—আচ্ছা ভাই, তোমার বিবিজানকে একবার দেখাবে ?

চক্রধর—না-বাবা না থাকলে কোন অসুবিধা হতো না। কেন না, এখনো তো স্বাধীন নই।

নঈম—(স্বাগত) খোদা, তাঁদের তাড়াতাড়ি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিন।

রাতের মধ্যেই প্যাকেট তৈরী করে সকাল বেলায় চক্রধর সেটা লাইব্রেরীতে রেখে আসে। লাইব্রেরী সকালেই খোলে তাই অসুবিধা নেই। প্যাকেটটি রেখে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধুর, প্যাকেটটি হাওয়া করে দেয় তারপর চাঁদার হিসেবে মত জিনিস-গুলো সব ভাগ হয়ে যায়। কেউ পায়, ঘড়ি, কেউ পায় রুমাল ইত্যাদি। এক এক-টাকার বিনিময়ে কারোর হাতে আসে পাঁচ-সাত টাকার জিনিস।

তিন

প্রেমিকরা সাধারণতঃ অপার ধৈর্যশীল হয়। নিরাশার ওপর আশা রাখে। তাই ধৈর্য হারায় না। চক্রধর এতগুলো টাকা খরচ করলে, কিন্তু প্রেমিকাকে একটা সম্ভাষণ করারও সৌভাগ্য হলো না। প্রেমিকাটিও অদ্ভুত ধরনের। কারণ সে চিঠিতে মিষ্টি

মিষ্টি কথা পাঠায়, কিন্তু সামনা-সামনি একবারও তাকিয়ে দেখে না। বেচারী চক্রধর অনেক বার এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সাহস হয় নি, যেন বিরাট সমস্যা। অবশ্য সে নিরাশ হয়নি। ইতিমধ্যে সে সন্ধ্যা-আহ্নিক ও হোম করা ছেড়ে বসে আছে, নতুন ফ্যাশানে চুল কেটেছে, প্রায় সময়ই ইংরাজীতে কথা বলার চেষ্টা করে এবং সেটা ভুল না ঠিক তা গ্রাহ্য করে না। রাতে পড়ার বই ছেড়ে ইংরাজী উপন্যাস নিয়ে পড়ার ভান করে। এর আগে জীবনে এত পরিশ্রম করে নি। ইংরাজী পড়ার এত চেষ্টা কখনো করে নি। লুসীর সামনে নিজের যোগ্যতা প্রকাশ করার জন্যেই তার এত চেষ্টা।

দুঃখের কথা, বন্ধুরা তার প্রতি বড় নির্দয়। তাই, আবার একদিন চক্রধরের কাছে লুসীর আর একটা চিঠি এলো। তাতে অনেক অনুনয়-বিনয় করে লেখা আছে—"হামি টুমাকে ইংলিশ গেম্ প্লে করতে দেখতে চাই। টুমাকে ফুটবল অর হকি প্লে করতে কখনো দেখে নাই। ইংলিশ ম্যান অলওয়েজ হকি; ক্রিকেট এ সবে সিদ্ধহস্ত হওয়া নেশেসারী মনে করে। আই হোপ, টুমি হামার দিস্ প্রেয়ার রাখবে। আই ক্যান সি, টুমার মত ইংলিশ ড্রেস, বার্তালাপ, ফ্যাশানদ্বার কলেজে আর কাউকে দেখছে না। আই ওয়াণ্ট, টুমি প্লে-গ্রাউণ্ডে সেটা প্রুফ্ করবে। ওয়ান থিং, আই লাইক টেনিস ভেরী মাচ্চ, রিমেম্বার।"

চক্রধর বেলা দশটার সময় চিঠিটা পায়। তাই দুপুরে টিফিনের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে নঈমকে বলে—ভাই ফুটবলটা একবার দেবে?

নঈম কলেজ টিমের ক্যাপ্টেন, অবাক হয়ে হেসে বলে—এই ভর-দুপুরে বল নিয়ে কী করবে? তুমি তো কোন দিন খেলার মাঠেই যাও না। এখন আবার বল নিয়ে কোথায় যাবে?

চক্রধর—সেটা তোমার জেনে কি হবে? বলটা দিতে বলছি, দাও। তোমাদের দেখাবো খেলতে পারি কি-না।

নঈম—কী যে করবে কে জানে! পায়ে চোট-ফোট লেগে যাবে হয়তো! তখন আমাদেরই তো সব দেখতে হবে! খোদা তোমাকে কী মতি দিলেন কি জানি! শোনো, ওসব করে কাজ নেই।

চক্রধর—আচ্ছা, আমার চোট লাগবে তাতে তোমার কী? তোমাকে বলটা একবার দিতে বলছি, আপত্তি করছো কেন বলো তো?

নঈম বলটা বের করে দিলে চক্রধর সেই প্রচণ্ড রোদে বল নিয়ে খেলার মাঠে যায়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘেমে ওঠে, বার-বার মাটিতে পড়ে যায় বলের পিছনে দৌড়ায়, কোন কিছু ভ্রুক্ষেপই করে না। এমন সময় লুসীকে মাঠের পাশ দিয়ে যেতে দেখে। মনে আনন্দ ও উৎসাহ আসে, তাই প্রাণপণ বল মারার চেষ্টা করে। বলে লাথি না

লাগলেও মারা চাই-ই! আবার জোরে বল মারতে গিয়ে পড়েও যায়। বন্ধুদের মধ্যে দু'একজন খুব উঁচু করে বল মেরে দেখিয়ে দিলে চক্রধর হাঁপাতে-হাঁপাতে বলে—ঐ রকম আমিও মারতে পারি, কিন্তু কী লাভ? লুসীও দু'তিন মিনিট দাঁড়িয়ে তার ছেলে-মানুষী দেখে হেসে চলে যায়। যাবার সময় নঈমকে বলে—ওয়েল নঈম, পণ্ডিতজীর কী হলো? এভরী ডে একটা না একটা চাইলডিস্ করিতেছে? উহার ব্রেন ঠিক আছে তো?

নঈম—আমাদেরও তাই সন্দেহ হচ্ছে।

সন্ধ্যার সময় ছাত্রাবাসে বন্ধুরা একত্রিত হয়ে চক্রধরকে অভিনন্দন জানিয়ে বলে—বন্ধু, তুমিই ভাগ্যবান, তুমিই ধন্য! আমরা এতদিন ধরে খেলছি, কেউ কোনদিন তারিফ করে নি। আর তুমি একদিন খেলা দেখিয়েই প্রশংসা পেলে, স্বয়ং লুসীও দাঁড়িয়ে তোমার খেলা দেখে তারিফ করে গেল! তোমার খেলার কায়দা দেখে সে অবাক হয়ে গেছে। বলছে কি জানো? —মনে হচ্ছে, অক্সফোর্ডে প্রাকৃটিশ করেছে।

চক্রধর—(খুশী হয়ে) আর কী বলেছে ভাই? সত্যি করে বলছো?

নঈম—সব কথা কি আর বলা যায়? আমরা এত কিছু করেও মন পেলাম না, আর তুমি একদিনেই কিস্তি মাৎ করে দিলে? তাই তো বলি তোমার মত আর ভাগ্যবান কে আছে বলো?

চক্রধর—খেলার বইতে যেমন লেখা আছে, আমিও ঠিক তেমনি করেই বল মারছিলাম দেখেছো তো?

নঈম—তাই তো তোমার এত সুনাম, না হলে আমাদের কথা কে আর বলছে বলো? তোমার খেলা দেখতে কত লোক জমায়েত হয়েছিল বলো তো?

চক্রধর—কী সব বানিয়ে বলছো, আমি যা নই, তাই বলছো কেন?

নঈম—বন্ধু, সবই ভাগ্য! তাছাড়া, দৈনিক সাবান মেখে মেখে রংটা কেমন করেছো বলো তো? সেই জন্যেই তো অনেকে তোমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

চক্রধর—আচ্ছা ভাই, আমার পোষাক দেখে ও কিছু বলছিল নাকি?

নঈম—না না, সে রকম কিছু বলে নি। তবে, যতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, দেখলাম, চোখ ফেরাতে পারে নি!

চক্রধরের হৃদয় পুলকিত হয়ে ওঠে। চক্রধরের তথনকার ভাবটা যদি কেউ দেখে থাকে, তাহলে বলা যায়, সে দৃশ্য সে জীবনে ভুলতে পারবে না। অবশ্য তার জন্যে চক্রধরকে খেসারৎও দিতে হয়। কারণ, কলেজের শিক্ষাবর্ষ তথন সমাপ্ত প্রায়। বন্ধুবর্গ চক্রধরের কাছে আব্দার করে বলে, তারা পেট-পুরে একদিন খেতে চায়। এই প্রস্তাব

দেওয়ার দু'দিন পরই লুসীর আবার একটা চিঠি এলো। লেখা আছে—

"বিদায়ের দিন এসে গেল। জানি না, এর পর কে কুথায় থাকিবে! হামি চাইছে কি হামাদের প্রেমকে লিভিং রাখিতে একটা পার্টি (আই মিন্ প্রীতিভোজ) দিলে ভালই হোবে। পার্টির এক্সপেন্স যদি টুমার পক্ষে দেওয়া ইম্‌পসেবল্ হয়, তাহলে হামি দিতে পারে। একটা কুথা, পার্টিতে ইন্‌ভাইট্ করিতে হোবে হামার এণ্ড টুমার ফ্রেণ্ডস্ ছাড়া প্রফেসর গণকে। আপ্‌টার পার্টি হামি টুমার সাটে একবার মিলতে চায়। অবশ্য টুমার ধরম এণ্ড হামার মাতা-পিতার বাধা যদি না থাকে তাহা হইলে অপার আনন্দ মিলিবে। তোখন হামি অন্য কোন বাধা মানিবে না।"

লুসীর চিঠি পড়ে চক্রধরের আনন্দ আর ধরে না। বন্ধুদের বলে—ভাই, তোমাদের প্রস্তাবে আমি রাজী আছি। তবে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সব তোমাদেরই করে নিতে হবে। দেখো, লুসী যেন বাদ না পড়ে!

চক্রধরের বাড়ীর আর্থিক অবস্থা সেই সময়টা বেশ ভাল যাচ্ছিলো না, সেটা কয়েক-বারই বন্ধুদের বলেছে। তবুও তার ইচ্ছে পার্টি দেবে। লুসী অবশ্য চিঠিতে জানিয়েছে প্রয়োজন হলে সেও খরচ দিতে পারে, কিন্তু তার কাছ থেকে কি খরচ নেওয়া উচিত? কেন না, লুসীর জন্যে সে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। তাই শেষ পর্যন্ত জরুরী কারণ দেখিয়ে শ্বশুর বাড়ী থেকে টাকা ধার করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছে। নিমন্ত্রণ কার্ড ছাপানো হলো। পরিবেশনকারীদের জন্যে কয়েকটা পোষাকও তৈরী করানো হয়েছে। ইংরেজ ও ভারতীয় উভয় দেশের খাবার রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইংরেজ খাবার এসেছে রয়েল হোটেল থেকে। যদিও তাতে খরচ বেশী পড়েছে, তবু ঝামেলা এড়ানো গেছে! তা না হলে নঈম আর গিরিধরকেই ঝামেলাটা পোয়াতে হতো। ভারতীয় খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে গিরিধরের তত্ত্বাবধানে।

প্রীতি-ভোজের সব কিছুর ব্যবস্থা করতে প্রায় দু'সপ্তাহ সময় লেগে যায়। নঈম আর গিরিধর কলেজের শুধু মনোরঞ্জনের বস্তু, কারণ তারা কোনদিনই বই নিয়ে বসে না। আমোদ-আহ্লাদের দিন কাটানোই হলো তাদের লক্ষ্য। প্রীতি-ভোজের দিন তারা কবিসম্মেলনেরও ব্যবস্থা করেছে। তাই, কবি ও জ্ঞানী-গুণীদেরও কার্ড পাঠানো হয়। সেটা প্রীতি-ভোজ নয় যেন বিরাট ভোজ। কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা রান্না করে। তাই, কলেজ ইতিহাসে সেটি একটি নতুন ঘটনা এবং চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। চক্রধরের বন্ধুরাও পরিশ্রম করে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছে! বন্ধুদের সঙ্গে কয়েকজন বান্ধবীও আসে। তাছাড়া মির্জা নঈম অনেক কায়দা করে লুসীকেও নিয়ে আসায় প্রীতি-ভোজটি অতি রসময় হয়ে ওঠে।

চার

হায়, প্রীতি-ভোজের কী নির্মম পরিনতি! যে ভোজ দিল, তার বিন্দুমাত্র কল্যাণ হলো না, বরং প্রতি পদক্ষেপে লজ্জিত ও অপমানিত হতে হয়! মন তবু খুশী, বন্ধুদের কথা রাখতে পেরেছে এবং সকলকে খাইয়ে আনন্দ পেয়েছে। বিদায়ের দিন আসন্ন, কবে কার সঙ্গে আবার দেখা হবে কে জানে! তাই ভাবে, বিদায়ের আগে আনন্দ করবে দোষ কিসের? আর কী ভাবেই বা মনোভিলাষ পূর্ণ হবে? তবে কেন আত্ম-দমন করবে? লজ্জা কিসের? বিরক্তই বা হবে কেন? গুপ্ত রোদনেরই বা কারণ কি? মৌন-মুখাপেক্ষী কীসের জন্য? অন্তর্বেদনাই বা কেন? এই সব ভেবে চক্রধর বসে বসে প্রেমকে ক্রীড়াশীল করার উদ্দেশ্যে মনে বল ও সাহস সঞ্চার করে। ওৎ পেতে থেকে—যেন বক মাছ ধরার জন্যে বসে আছে। খাওয়া-দাওয়ার শেষে পান-মসলা নিয়ে অনেকেই বিদায় নিয়েছে। মিস লুসীর বিদায় বেলায় শ্রবণ-মধুর বাণীতে হৃদয়টা তার হা-হাকার করে ওঠে। ভোজনশালা থেকে বেরিয়ে বাড়ী যাবার জন্যে লুসী সাইকেলটা নেয়। অন্য দিকে কবি-সম্মেলন থেকে ভেসে এলো কবিতার একটা পঙ্‌তি—"কেউ প্রেম-পাগল করে কেউ প্রেম-পাগল হয়।"

এমন সময় ঘটলো আর এক ঘটনা। লুসী সাইকেল চড়ে বাড়ী ফিরছে, আর চক্রধর সাইকেলের পিছনে পিছনে প্রাণ-পণ দৌড়ে চলেছে। প্রায় অর্ধেক পথ গিয়ে লুসীকে ধরে ফেলে। লুসী ভাবে—চক্রধর তার পিছনে দৌড়ে আসছে কেন? কোন দুর্ঘটনা হলো নাকি? তাই, সাইকেল থেকে নেমে জিজ্ঞেস করে—কী হইয়াছে পণ্ডিতজীর কী বেপার? আপনি এতো দৌড়াচ্ছেন কেনো? কোনো এক্সীডেণ্ট হইয়াছে কি?

চক্রধরের গলা শুকিয়ে যায়, কথা বলতে পারে না। কম্পিত স্বরে বলে—লুসী, তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে, আমি যে তা সহ্য করতে পারবো না। তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমি হয়তো পাগল হয়ে যাবো।

লুসী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে—আপনার মট্‌লবটা কী বলুন তো? আপনি কি আন্‌ওয়েল আছে।

চক্রধর—কী বলছো ডার্লিং? আমি অসুস্থ? আমি তোমাকে পাবার জন্যে মরে যাচ্ছি, তুমি বিমুখ হয়ো না লুসী!

এই বলে চক্রধর লুসীর হাতটা ধরতে যায়। লুসী তাকে উন্মাদ ভেবে ভয় পেয়ে রেগে বলে ওঠে—আপনি নির্জনে হামাকে অপমান কোরিতে আসিয়াছে? রিমেম্‌বার আপনি শাস্তি পাইবেন।

চক্রধর—লুসী, এতটা নিষ্ঠুর হয়ো না। আমি সত্যি বলছি, বিরহটা সহ্য করতে পারবো না। আমার মনের কথা তুমি বুঝতে পারছো না। তোমার চিঠিগুলোই আমাকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে।

লুসী—হামার চিঠি, কই দেখি? হামি আপনাকে কবে চিঠি লিখিয়াছে? দেখুন; আপনি drink করেন নি টো?

চক্রধর—ডিয়ার ডার্লিং; এত তাড়াতাড়ি ভুলে যেও না, এতখানি নির্দয় হয়ো না। জানো তোমার প্রেম-পত্রগুলো আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে থাকবে। তোমাকে খুশী করতেই আমার জীবনে এত পরিবর্তন। সন্ধ্যা, আহ্নিক ও হোম করা ছেড়েছি। পোষাক ও চালচলনের পরিবর্তন ঘটিয়েছি তোমারই জন্যে। আমার বুকে হাত দিয়ে একবার দেখো তাহলে বুঝতে পারবে তোমার জন্যে আমি কতখানি পাগল! তুমি আমাকে বিমুখ করো না ডার্লিং।

লুসী—দেখুন পণ্ডিতজী হামার মনে হোয়, আপনি নেশা করিয়েছেন, অথবা কেউ আপনাকে ধোকা দিয়াছে। আপনি বলিটেছেন হামি আপনাকে চিঠি লিখিয়াছে? হায় হায়! এটা আপনি বিলিভ করছেন? শুন্থন আপনি শুয়োর হতে পারেন বলে কি হামাকেও তাই মনে করিতেছেন?

লুসীর কথা ঠাট্টা ভেবে চক্রধর তার হাতটা ধরার চেষ্টা করে বলে—প্রিয়ে, অনেধ দিন পর স্থযোগ পেয়েছি, আজ পালাতে দেবো না।

লুসী ভীষণ রেগে যায় এবং চক্রধরের গালে সজোরে একটা চড় মেরে গর্জন করে বলে—ব্লাডী রাস্তা ছেড়ে দে, না হইলে পুলিশ ডাকিবে। রাস্কেল কুথাকার!

অকস্মাৎ চড় খেয়ে চক্রধরের মাথা ঘুরে যায়। চোখে অন্ধকার দেখে আর মানসিক আঘাতে হয়ে পড়ে নিস্তেজ ও নিস্তব্ধ। এমন বিপদ তার আর কখনো আসেনি। অন্যদিকে লুসী চড় মেরে হাওয়া। চক্রধরের মাথা ঘুরে যায় এবং মাটিতে বসে পড়ে। বসে বসে ভাবি—কেন এমন হলো? এর জন্যে কি সত্যই সে দায়ী? হঠাৎ চোট খাওয়ায় তার বাইরের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসে আর অন্তর-চোখ খুলে যায়। মনে মনে বলে—সহপাঠিরা শেষ পর্যন্ত ধোকা দিলো? তাছাড়া আর কি? বদমাশ-গুলোর সঙ্গে মেলামেশা করা কি ভুল হলো? তারা কি আমাকে ঠকানোর জন্যেই হাসাহাসি করতো? আমার বোকামীর জন্যেই কি তারা এই স্থযোগটা পেলো? বড় দাগা দিয়েছে, সারা জীবন মনে থাকবে! তারপর সেখান থেকে উঠে এসে গম্ভীর হয়ে নঈমকে বলে—তুমিই যত নষ্টের গোড়া। পাজী, বদমাশ, শয়তান, গাধা কোথাকার!

নঈম—আরে বাবা কী ব্যাপারটা আগে বলবে তো তারপর গালাগাল দিও।

গিরিধর—কী ব্যাপার? লুসী কিছু বলেছে না কি?

চক্রধর—হ্যাঁ, তোমাদের জন্যেই তার চড় খেয়ে আর মুখে চুণকালি মেখে এলাম। তোমরা দু'জনেই আমাকে বোকা বানিয়েছো। এর প্রতিশোধ না নিই তো আমার নাম-ই নয়। আমি আগে বুঝি নি যে তোমরা বন্ধু সেজে আমার এতখানি সর্বনাশ করবে। আচ্ছা একবার ভেবে দেখো তো রেগে-মেগে যদি পিস্তলের গুলী ছুড়ে দিতো; তাহলে কী হতো ?

নঈম—বুঝলে বন্ধু প্রেমিকার চড় দুর্লভ!

চক্রধর—থামো, থামো, তোমার মাথা আর মুণ্ডু! প্রেমিকা কখনো চড় মারে ? চোখ রাঙায় ? মুষ্টি প্রহার করে ?

গিরিধর—ঠিক আছে। বলো না, সে কী বলেছে ?

চক্রধর—কী আর বলবে! নিজের দুঃখের কথা বলছিলাম, এমন সময় রেগে গিয়ে তার পাথরের মত হাত দিয়ে গালে মারলো একটা চড়। এখনো কানটা ভোঁ-ভোঁ করছে।

গিরিধর—সর্বনাশ করেছো ভাই! তুমি এমনি ছেলে মানুষ ? এমনি বোকা ? তোমার এত বুদ্ধি কম ? আগে জানলে কে তোমার সঙ্গে তামাসা করতো ? তোমার পাল্লায় পড়ে আমাদেরও সর্বনাশ হলো। সে যদি প্রিন্সিপলকে নালিশ করে তাহলে কী যে হবে তার ঠিক নেই। তাছাড়া ইংরেজ জাত-ভাইদের বললে তো সমূহ বিপদ, তা জানো ? ভীষণ বোকামীর কাজ করেছো, বুঝলে ? তুমি বুঝতেই পারলে না যে আমরা তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি ? আর তুমি নিজেকে সুপুরুষ বলে মনেই বা করলে কী করে ?

চক্রধর—দেখো ভাই তোমাদের যেটা ঠাট্টা আমার সেটা মৃত্যুর সমান। সে যাই হোক, এখন আমার যে পাঁচশো টাকা খরচ হোল, সেটা তোমরা দিয়ে দাও। টাকা না দিলে কিন্তু ছেড়ে কথা বলবো না।

নঈম—শোনো, টাকার বদলে তুমি যা চাইবে তাই পাবে। যেমন ধরো, যদি বলো—চুলকেটে দিতে হবে, দেবো। জুতো সাফ্ করে দিতে হবে, দেবো। মাথা টিপে দিতে বললে, দেবো কিন্তু টাকা কী করে দেবো বলো ? বাড়ীতে মা-বাবা রয়েছেন, মাথার ওপর সংসারের বোঝা! একটু ভেবে বলতে হবে তো ?

চক্রধর—এ যেন কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে। তোমরা ডুবলে, আমাকেও ডুবিয়ে ছাড়লে। এরপর দেখবো তোমরা যা হোক করে পেরিয়ে গেলে, কিন্তু আমি তো পাশই করতে পারবো না। বদনাম হলো, আবার পাঁচশো টাকা ঋণে পড়লাম। এর চেয়ে আমার মরণ ভাল ছিল। তোমরা যতই বোঝাবার চেষ্টা করো, ভগবান সব বিচার করবেন।

নঈম—হয়েছে ভাই; আমারাও আপশোষ করছি।

গিরিধর—শোনো কান্নাকাটির অনেক সময় পাবে। এখন লুসী যদি প্রিন্সিপলকে নালিশ করে; তার পরিণতিটা কি হবে, ভেবেছো? তিনজনকেই তাড়িয়ে দেবেন, এটা বলে রাখলাম। ভবিষ্যতে চাকরিও জুটবে না। তখন কী হবে বলো তো?

চক্রধর—আমি নিজেই প্রিন্সিপলকে তোমাদের কু-কীর্তির কথা বলে আসবো।

নঈম—কেন ভাই, সেটা কি বন্ধুর মত কাজ হবে?

চক্রধর—আজ্ঞে হ্যাঁ, তোমরা যেমন বন্ধু. তেমনি সাজা পাওয়াই উচিত।

একদিকে কবি সম্মেলনের বাজার গরম, অন্যদিকে তিনটি প্রাণী প্রাণ বাঁচাতে সচেষ্ট। উক্ত ঘটনাটি ইতিমধ্যে প্রিন্সিপলের কানে পৌঁচেছে। ইংরেজ সম্প্রদায় কী করছে কে জানে! শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে সকাল হলেই নঈম আর গিরিধর মিস লুসীর বাড়ীতে যাবে, ক্ষমা চাইবে এবং প্রায়শ্চিত্তের জন্যে যা করতে বলবে, তাই করবে।

চক্রধর—আমি বলে রাখছি, আর একটা পয়সাও দেবো না!

নঈম—না দিতে পারো, তবে জানটাতো বাঁচাতে হবে!

গিরিধর—ও সব ছাড়ো, আগে টাকার যোগাড় করো। দেখবে, জরিমানা না নিয়ে ছাড়বে না।

নঈম—শোনো ভাই চক্রধর, খোদার নাম নিয়ে বলছি, শেষ মুহূর্তে তুমি আর নিজেকে ছোটা করো না। মনে রেখো, এ বিপদ আমাদের তিন জনেরই। যা ঘটবার ঘটেছে। আমি কথা দিচ্ছি আর এমনটি হবে না।

চক্রধর—না, না সেটি আর হচ্ছে না। আমি কি দোকান খুলে বসে আছি ভেবেছো? অনেক দাগা দিয়েছো; আর ভুলছি না।

অনেক তোসামোদ, খোসামোদও আরাধনা করে দেবতা শেষ পর্যন্ত তুষ্ট হয়।

সকাল হলেই নঈম লুসীর বাড়ীতে যায়। মনে মনে বলে—ইয়ে অলী; তুমিই মুস্কিল আসান করতে পারো, জান বাঁচাও হজরৎ। প্রিন্সিপাল যদি শোনে তো আস্ত রাখবে না, কাঁচাই খাবে, নূনেরও দরকার হবে না। ঐ কম্বক্ত পণ্ডিতটার জন্যে আমার আজ এই অবস্থা। শেষ পর্যন্ত কী যে হবে কে জানে! জানি না সুন্দরীর মন কী ভাবে পাওয়া যাবে! শেষে সব দায়িত্ব আমার ওপরই পড়বে? নিজে ডুবে আমাদেরও ডোবালো? লুসীর সঙ্গে যদি রাস্তায় দেখা হয়ে যেতো, তাহলে ভালই হতো, ঘরেতে পেয়ে কী বলবে কে জানে!

এইসব ভাবতে ভাবতে নঈম গুটি-গুটি পা চালায়। তার দৃষ্টি প্রিন্সিপলের বাংলোর দিকে, কারণ লুসী সেখান থেকে বের হচ্ছে কিনা দেখতে হবে। মনে মনে ভাবে

যদি লুসীর সঙ্গে দেখা না হয়। তাহলে কী করবে? ঘরে ঢুকতে না হলে ভালই হয়। লুসীর সঙ্গে বাইরে দেখা হবে না কি?

এমন সময় লুসীকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি পা চালায়। লুসী প্রিন্সিপলের বাংলোর দিকেই যাচ্ছে। একটু দেরী হলেই নৌকা ডু:ব যেতো! চিৎকার করে ডাক দেয়—মিস টরনর; হ্যালো মিস টরনর; একটু দাঁড়াও।

লুসী পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে নঈম। বললে—হামার কাছে পণ্ডিতের হোয়ে সুপারিস করিতে আসনি তো? হামি প্রিন্সিপলের কাছে সেই বেপারে যাইর্তেছি।

নঈম—শোনো; তুমি আমাকে আর গিরিধরকে আগে শাস্তি দাও; তারপর যেও।

লুসী—বেহায়া লোকদের শাস্তি দিয়ে কি লাভ হোবে? জানো; সে হামাকে কিরূপ ইন্‌শাল্ট্ করিয়েছে?

নঈম—জানো; সমস্ত দোষ কিন্তু আমাদের দু'জনের। সত্যি কথা বলতে কি, পণ্ডিতের কোন দোষ নেই। তাকে বোকামত দেখে আমরা তাকে হাতের পুতুল করে রেখে ছিলাম। তাই তার দোষের জন্যে আমরা অনেকখানি দায়ী।

লুসী—**you naughty boy!**

নঈম—আমরা দু'জন তাকে মজা করার জন্যে বোকা বানিয়ে ছিলাম। তবে এটা ভাবতে পারিনি যে, সে তোমাকে ঐ ভাবে বিরক্ত করবে। আমরা ভাবছি সে এ রকম সাহস পেলো কী করে! খোদার কসম, তুমি ক্ষমা করো, না হলে আমাদের দু'জনের ইজ্জত নষ্ট হবে।

লুসী—টুমি প্রে করিতেছে বলিয়া হামি প্রিন্সিপলের কাছে যাইবে না, বাট্ একটা শর্ট রাখিতেছে—পণ্ডিতকে হামার সামনে কান পাকড়ে বিশবার বৈঠক কোরতে হোবে এণ্ড টু হাণ্ডেড্ রূপীজ ফাইন দিতে হোবে।

নঈম—লুসী, এতখাথি স্ট্রিক্ হয়ো না। গরীব লোক, ওর কথাটাও তো একটু ভাবতে হবে!

লুসী—খুসামোদ কেমন কোরে কোরতে হোয়, তা টুমার কাছে শিখিতে হোবে, ভাই না?

নঈম—সে যাই হোক, তুমি আর প্রিন্সিপলের কাছে যেও না।

লুসী—ঠিক আছে আমার শর্ট মঞ্জুর হোবে তো?

নঈম—তোমার দ্বিতীয় শর্তটি আমরা সবাই মিলে পূরণ করে দিতে পারি, কিন্তু প্রথম শর্তটা বড় কঠিন। বেচারী লজ্জায় হয়তো বিষ খেয়ে মরবে। অবশ্য তার পরিবর্তে আমি তোমার সামনে পঞ্চাশবার কান ধরে বৈঠক করতে পারি।

লুসী—টুমি তাহার হয়ে শাস্তি নিবে কেনো? হামি তাহাকেই শাস্তি দিতে চাই। বদমাশ, পাজী। জানো, হামার হাত ধরিতে চাহিয়াছিল।

নঈম—একটু দয়া দেখাবে না?

লুসী—নো, নো।

তারপর নঈম লুসীকে নিয়ে আসে। চক্রধর নিরুপায় হয়ে লুসীর পায়ের কাছে বসে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। নঈম ও গিরিধর নিজেদের কু-কীর্তির জন্যে লজ্জিত। অবশেষে দয়াময়ীর দয়া হয়। বলে—ঠিক আছে, একটা শর্ট, হামি মাফ্ করিতেছে।

উপস্থিত সকলেই মনে করেছিল—চক্রধরের বাড়ীর অবস্থা ভাল, টাকা দিয়েই হয়তো খালাস পেয়ে যাবে, কিন্তু না, তা হলো না। তার বক্তব্য—টাকার পরিবর্তে বিশবার কেন, চল্লিশবার কানধরে বৈঠক করবে! তার কথা শুনে সকলেই নির্বাক ও অবাক হয়।

নঈম বলে—ভাই, টাকা দিলেই ভাল হতো!

চক্রধর—অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। এখন হাতে একটা কানা-কড়িও নেই। আমার পক্ষে দুশো টাকা দেওয়া অসম্ভব। টাকা নিয়েই তো তোমরা আবার ফুর্তি করবে, সেটি আর হতে দিচ্ছি না। দেহে যতক্ষণ বল থাকবে, শেষ চেষ্টা করে যাবো।

এই বলেই সে জামাটা খুলে এবং ধুতিটা তুলে মালকোঁচা মেরে দোতলা থেকে নেমে সামনের উঠানে এবং কান ধরে উঠ-বোস করতে থাকে। মুখটা তার রাগে লাল হয়ে উঠেছে। লোকে দেখে মনে করবে কোন পালোয়ান হয়তো নিজের কেরামতি দেখাচ্ছে। চক্রধর বুদ্ধিমত্তার কিছু পরিচয় দিয়ে থাকলে তখনই দিলো। তার চারপাশে তখন অনেকে দাঁড়িয়ে কারোর মুখে হাসির রেখা পর্যন্ত নেই। সকলেই যেন একটা অব্যক্ত বেদনায় ভুগছে। এমন কি লুসীও অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে, মাথা তোলার সাহসই পাচ্ছে না। হয়তো ভাবছে, এই রকম শাস্তি দেওয়া কি ঠিক হলো?

চক্রধর উচ্চস্বরে গুনে গুনে বিশবার উঠ-বোস সেরে সগর্বে নিজের ঘরে চলে যায়। লুসী তাকে অপমান করতে চেয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল, শেষ পর্যন্ত সেটা যেন লুসীরই অপমান হলো।

এই ঘটনার সপ্তাহ খানেক পর কলেজ খোলে। সেদিন চক্রধরকে দেখে কেউ আর হাসে না। সে নিজেও চুপচাপ। লুসীর কথা আর মুখেও আনে না; বরং লুসীর নাম শুনলে জ্বলে ওঠে।

অবশেষে ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল বের হয়। চক্রধর ফেল করেছে। পরীক্ষার ফল জানতে সে আর কলেজে আসে নি, হয়তো আলিগড় চলে গেছে।

মেকী ব্রহ্ম

আমার মত পোড়াকপালীর কেন মরণ হয় না! তাই ভাবি, পোড়াকপালী নাহলে কি আর রোজ রোজ অমন দৃশ্য দেখতে হয়! মাগো মা, কি ঘেন্নার কথা! শুধু কি দেখা! আমার জীবনের সিংহভাগটাই যেন দখল করে বসে আছে! সদ্‌বংশজাত ব্রাহ্মণ কন্যা আমি, বাপ-ঠাকুর্দা পূজো-আচ্চা, যাগ-যজ্ঞ, নানারকম ধর্মগ্রন্থ পড়েই সময় কাটাতেন, সবাই তাঁদের মুখের কথাকে বেদবাক্য বলেই মেনে নিতেন। কখনো তো মনেই পড়ে না যে বাড়ীতে চান-পূজো না করে এক ফোঁটা জলও খেয়েছি! একবার খুব অসুখ করাতে চান না করেই ওষুধ খেতে হয়েছিল, সে দুঃখ আমার এখনো রয়েছে। বাপের বাড়ীতে ধোপা-চামার কখনো বাড়ীর ভেতরে ঢোকে নি! কিন্তু এখানে এসে মনে হচ্ছে, যেন নরকে বাস করছি। আমার স্বামীর মতো দয়ালু চরিত্রবান লোক খুব কমই দেখা যায়! বাবা তো তাঁর জামাইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু! তিনি কি জানেন, যে এখানকার সবাই অঘোর পন্থী? সন্ধ্যে আহ্নিক করা দূরে থাক, রোজ ভাল করে চানই করে না। রোজই মুসলমান-খ্রীষ্টান নানান জাতের লোকের আসা-যাওয়া তো লেগেই আছে, আর আমার পতিদেব তাদের নিয়ে বৈঠকখানায় বসে চা-জল খান। শুধু কি তাই দোকান থেকে কচুরি-মিষ্টি-টিষ্টি কিনে এনে নির্বিকারে ওখানেই বসে খেয়ে নেন। এই তো কালকেই নিজের চোখে তাঁকে ওখানে বসে বসে লেমনেড খেতে দেখলাম। সহিসটা তো চামার, তা বলা নেই কওয়া নেই হুট-হাট ঘরে ঢুকে পড়ে! শুনছি নাকি মুসলমান বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে একসঙ্গে বসে নেমন্তন্ন খেয়ে আসেন! এসব অনাচার আর সহ্য করতে পারছি না। তিনি যখন ভালবেসে আমার হাত দুটো ধরে নিজের কাছে টেনে নেন, তখন মনে হয় মা বসুমতী দুভাগ হয়ে যাক, আমি তার কোলে আশ্রয় নিই। হায়রে হিন্দু জাতি! আমরা মেয়েরা কি পুরুষদের দাসী হয়েই চিরকাল থাকব, এজন্যেই কি আমরা পৃথিবীতে এসেছি! জানি স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র আরাধ্য দেবতা। কিন্তু তাই বলে আমাদের ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা, মতামতের কি কোন মূল্য নেই?

না, আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করে এই জঘন্য অনাচারের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে বাবার কাছেই ফিরে যাবো। আজ এখানে 'সহ ভোজন' হচ্ছে। আমার স্বামীই নাকি এই আয়োজনের প্রধান হোতা। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করবে। শুনছি নাকি মুসলমানরাও বাদ যাবে না,

একই পংক্তিতে বসবে। আকাশটা কেন ভেঙ্গে পড়ছে না। কোথায় তুমি ভগবান! এ ঘোর অনাচারের হাত থেকে ধর্মকে রক্ষা করতে কবে তুমি আসবে? যে ব্রাহ্মণরা নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ছাড়া অন্য কোনো ব্রাহ্মণের হাতে পর্যন্ত খান না, আর আজ সেই মহান জাতি এতদূর অধঃপাতে গেছে যে কায়স্থ-শূদ্র-বেনে এমন কি মুসলমানের সঙ্গে একত্রে বসে খেতে সংকোচ বোধ তো হচ্ছেই না উপরন্তু জাতীয় গৌরবে গর্বিত, এতে করে নাকি জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি পাবে।

পুরুষ

সে সৌভাগ্য কি আমাদের হবে, যেদিন আমাদের দেশের মেয়েরাও শিক্ষিতা হয়ে দেশ সংগঠনের কাজে পুরুষদের পাশে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন? মিথ্যে ব্রাহ্মণত্বের গোলক ধাঁধায় আর কতদিন আমরা এভাবে পথ খুঁজতে গিয়ে মাথা কুটে মরবো? এ দেশের বিবাহ-প্রথা, গোত্র ও বর্ণের কাঁটা তারের বেড়া টপকে সব বিধি নিষেধকে অগ্রাহ্য করে কবে নর-নারী, এ দুটো মনের চিন্তাধারার অনুকূলে যাবে অথবা তাকেই বেশী প্রাধান্য দেবে? তাহলে বৃন্দা আর আমার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠতো না। আমাদের দুজনের চিন্তা-ভাবনায় আসমান্ জমিন ফারাক। ও মুখে কিছু না বললেও, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও আমাকে ঘৃণার দৃষ্টিতেই দেখে, এমনকি স্পর্শ করতেও চায় না। অবশ্য এটা ওর দোষ নয়, আমাদের দুজনেরই বাবা-মায়ের অজ্ঞতার ফল, এই অত্যাচারের জন্যে একমাত্র তাঁরাই দায়ী।

বৃন্দার মনের ভাব কালকেই জানতে পারলাম। ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। আমার কয়েকজন বন্ধু সহভোজের প্রস্তাব করতেই সানন্দে সমর্থন করলাম। তারপর বেশ কয়েকদিন ধরে সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের সঙ্গে এনিয়ে কথা-কাটাকাটির পর দু-চারজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সহযোগিতায় জিনিস-পত্র জোগাড় করা গেল। আমি ছাড়া আরও চারজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, বাদবাকী সব অন্য জাতি। এ উদারতা বৃন্দার পক্ষে অসহ্য। সেদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে ঢুকতেই ও আমার দিকে এমন করে তাকালো যেন ওর বুকের পাঁজরগুলো কেউ মেরে গুড়িয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ আমার দিকে একভাবে চেয়ে থেকে তারপর বললো—আর কি, এবার তো স্বর্গের চাবি কাঠি তোমার হাতের মুঠোয়!

ওর মুখ থেকে আমাকে এরকম কথা শুনতে হবে ভাবিনি! যাই হোক্, বেশ গর্বের সঙ্গেই বললাম—অলস, অকর্মণ্য আর নির্জীব যারা তারাই স্বর্গ-নরক নিয়ে মাথা ঘামায়। এ মূর্ত পৃথিবীই আমার কাছে স্বর্গ-নরক। আলাদা করে কিছু ভাবার মতো সময় আমার নেই। সোজা কথা, দুনিয়ায় এসেছি, কিছু করে যেতে চাই।

বৃন্দা—বেশ কথা বলেছো যা হোক। শুনে মনে হচ্ছে পৃথিবীর সব পাপী তাপীকে উদ্ধার করে সত্য যুগকে ফিরিয়ে আনবে? এলেন আমার কলির কেষ্ট। কেন, এ ছাড়া কি আর অন্য পথ ছিল না।

আমিও রাগের মাথায় বলে উঠলাম—এসব কথা বোঝবার মতো সামান্য বুদ্ধিটুকুও ভগবান তোমার মাথায় দেন নি, দিলে বুঝতে। অতি সাধারণ লোকও বুঝতে পারছে যে এই ভেদাভেদ নিয়ে বসে থাকলে দেশের পক্ষে ঘোর অমঙ্গল। একে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় মিটিয়ে নেওয়াই ভাল। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি জেনে-শুনেও না জানার ভান করে তার কথা আলাদা।

বৃন্দা—খাওয়াটাই বড় কথা হোল? একসঙ্গে বসে না খেলে কাউকে ভালবাসা যায় না, দেশের মঙ্গল করা যায় না?

আমি আর ঝগড়া বাড়িয়ে নীতি-ভ্রষ্ট হতে চাই না। বৃন্দা ধর্মপরায়ণা, রাত-দিন ঠাকুর দেবতা নিয়েই কাটায়। ওর ঐ ঠাকুর-দেবতা দিয়েই ওকে শায়েস্তা করবো। ভেবে খুব গম্ভীর ভাবে বললাম—অসম্ভব না হলেও কঠিন তো নিশ্চয়ই। ভাবতে পারো, আমরা সবাই একই পিতার সন্তান হয়েও কে উঁচু কে নীচু এই নিয়ে একে অন্যকে ঘেন্না করছি? একি অন্যায় নয়? এই জগৎ-সংসার সেই পরম পিতারই বিশাল রূপ। প্রতিটি জীবের মধ্যেই সেই পরমাত্মার জ্যোতির্ময় রূপ। আসলে আমরা সবাই এক, আমাদের একটাই পরিচয়, আমরা মানুষ। শুধু মাত্র একটা বাহ্যিক পর্দা দিয়ে আমাদের সবাইকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কে কোন্ জাত, এটা কি খুব বড় কথা বৃন্দা। সূর্যের আলো পৃথিবীর সর্বত্র গেলেও তা সূর্যের আলোই থাকে, তেমনি পরম করুণাময় ঈশ্বরের মহান আত্মা সমস্ত জীবকুলের মধ্যে প্রবৃষ্ট হলেও তা অবিকৃতই থাকে·········

বৃন্দা তন্ময় হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে আমার কথা শুনে ও তৃপ্ত। কথা শেষ হলে ও আমার দিকে ভক্তি-ভাবে তাকিয়ে রইলো দু-চোখে শ্রাবণের ধারা।

স্ত্রী—

এতদিন অন্ধকার কুয়োতে পড়ে ছিলাম। স্বামীর উপদেশেই আজ আমার চোখ খুলেছে। তাঁর জ্ঞানের প্রভাবেই আমি পর্বতের জ্যোতির্ময় চূড়ায় এসে পৌঁছেছি। মিথ্যে কুলীনতার অভিমান, উঁচু বর্ণের অহঙ্কার আমার আত্মাকেই অপমান করেছে। ঠাকুর, তুমি আমায় ক্ষমা করো, না জেনে নিজের পরমগুরু স্বামীকে যে সব কুকথা বলেছি তার জন্যে কোনো দোষ নিও না গোবিন্দ!

সেই অমৃতময় বাণী শোনার পর থেকেই আমার মন সৎ-কল্পনা প্রবণ হয়ে উঠেছে। কাল ধোপা-বৌ কাপড় নিতে এলে জানতে পারলাম ওর নাকি খুব মাথা ধরেছে। আগেও ওর এরকম অবস্থা দেখেছি, তখন মৌখিক সমবেদনা জানাতাম, বড়জোর ঝিকে ডেকে একটু তেল দিতে বলতাম, কিন্তু কাল মনে হোল ও যেন আমার মায়ের পেটের বোন। নিজে হাতে ওর মাথায় তেল ঘষে দিলাম। সে সময়ে আমার মনের স্বর্গীয় আনন্দের অনুভূতির কথা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না, তবে এটুকু বলতে পারি, একটা প্রবল শক্তি যেন আমার দেহ-মনকে বশীভূত করে সেদিকে ক্রমাগত টানছে। ননদ এসে এসব অভাবণীয় কাণ্ড-কারখানা দেখে তো চোখ-মুখ কুচকে আমার দিকে চেয়ে রইলো, কিন্তু আমার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আজ ভোরে এমন ঠাণ্ডা পড়েছে যে কি বলবো! হাত-পা যেন সব জমে বরফ হয়ে যাবার জোগার। শাল জড়িয়ে আগুনের সামনে বসে আছি! হঠাৎ দেখি কাজের মেয়েটা একটা ছেড়া শাড়ী পরে এসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। এই হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় ওকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজের স্বার্থপরতার কথা ভেবে দুঃখে-লজ্জায় মনটা কুঁকড়ে গেল। ওর আর আমার মধ্যে কি তফাৎ! দুজনের আত্মা তো সেই পরমাত্মারই দান! তবে কি মায়াই আমাদের মধ্যে ভেদাভেদের দেয়াল তুলে দিয়েছে! আর ভাবতে পারছি না। উঠে ঘর থেকে আলোয়ানটা এনে ওর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে ওকেও আগুনের পাশে এনে বসিয়ে দিলাম। শুধু তাই নয়, কিছুক্ষণ পর ও বাসন মাজতে গেলে আমি সে কাজে হাত লাগালাম। ও আমার এই অপ্রত্যাশিত সাহায্যে লজ্জিত হয়ে বার বার সেখান থেকে চলে যেতে বললো। ননদ এসে এমন মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে চলে গেল, যেন আমি খেলা করতে বসেছি। এই সামান্য ব্যাপারেই সবাই কেমন এরই মধ্যে সোরগোল তুলেছে! চোখ থাকতেও আমরা আজ অন্ধ। সব জেনে-শুনেও সৃষ্টিকর্তাকেই অপমান করছি না-কি?

পুরুষ—

মেয়েরা বোধ হয় কখনো মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে জানে না। ওরা সীমারেখার কাছে পা রেখেই চলতে পছন্দ করে। এই বৃন্দার কথাই ধরা যাক্, এতদিন ও নিজের কুলীনতা-বংশ মর্যাদা নিয়েই ছিল, আর আজ সাম্য, সহৃদয়তায় দেবী বনে বসে আছে। আমার সেদিনের সেই সামান্য উপদেশেই এই ফল! তাহলে আমার ক্ষমতা আছে বলতে হয়। ও ছোট জাতের বৌ-ঝিদের সঙ্গে মেলামেশা করুক, তাদের কিছু পড়ে শোনাক, কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তাই বলে সীমা ছাড়িয়ে যাবে তা আমার একদম পছন্দ নয়। তিনদিন আগে এক চামার এসে তার জমিদারের নামে আমার কাছে

নালিশ করে গেল। মানছি, জমিদার ওর সঙ্গে অন্যায় করেছেন, তাই বলে উকিল তো আর বিনা ফিতে মোকদ্দমা চালাবে না। তাছাড়া সামান্য একটা চামারের জন্যে বড় জমিদারের সঙ্গে লড়াই করবো! তাহলে তো ওকালতি ডকে উঠবে! সেই চামার বেটার কান্না শুনেই বৃন্দাও সেই থেকে আমার পেছনে লেগেছে, কি-না, এ কেসটা হাতে নিতেই হবে। কত বোঝালাম, ভয় দেখালাম, না কিছুতেই কিছু হোল না, আমাকে দিয়ে ওকালত নামায় সই করিয়ে তবে ছাড়লো! ফলে হোল কি, গত তিন দিন ধরে আমার এখানে বিনা ফি-য়ের মক্কেলদের লাইন পড়ে গেল, এ নিয়ে বৃন্দার সঙ্গে আমার বেশ একচোট হয়েও গেছে। এ জন্যেই আগেকার দিনের লোকেরা মেয়েদের ধর্মোপদেশ দিতেন না। ও এটা বোঝে না যে প্রত্যেকটা সিদ্ধান্তেরই একটা ব্যবহারিক দিক আছে। কে অস্বীকার করছে যে ঈশ্বর ন্যায়শীল নয়, কিন্তু সেই ন্যায়ের পেছনে নিজের পরিস্থিতির কথাটাও তো মনে রাখতে হবে না-কি? আত্মার ব্যাপকতাকে বাস্তবে নিয়ে এলে সংসারটা আজ সাম্যের রাজত্ব হয়ে উঠতো, কিন্তু সে সাম্য বা ইউনিটি ওই ফিলজফির পাতায়ই রাখা আছে, আর থাকবেও, রাজনীতিতে তা অসম্ভব, অলভ্য হয়েই থাকবে। নিজের দলের পাল্লা ভারী করতে সবাই তার সাহায্য নেবে, কিন্তু কার্যকরী কক্ষনো সম্ভব নয়। বুঝতে পারছি না, এই সাদামাটা কথাটা কেন বৃন্দা বুঝতে পাড়ছে না!

* * * *

বৃন্দার বুদ্ধি-সদ্ধি যেন দিনকে দিন উল্টে যাচ্ছে। আজ সবায়ের জন্যে এক রকম রান্না করেছে। এতদিন ঘরের লোকের জন্যে সরু চালের ভাত হোত, তরকারিতে ঘি পড়তো। দুধ-মাখনও পাতে পড়তো। আর চাকর-বাকরদের জন্যে মোটা চালের ভাত, অড়হরের ডাল আর শাক্-পাতায় চচ্চড়ি বরাদ্দ ছিল। বড় বড় লোকের বাড়ীতেও দেখেছি এই একই ব্যবস্থা। তাছাড়া আমাদের বাড়ীর চাকর-বাকরেরাও এ নিয়ে কখনো কিছু বলে নি। কিন্তু আজ বৃন্দার রকম-সকম দেখে মুখে কিছু না বললেও হতভম্ব হয়ে গেলাম। ওর ছেলে মানুষি দেখলে গা জলে যায়! ও ভেবেছে চাকরদের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে! বোকা আর কাকে বলে! আরে বাবা, এ ফারাক চিরকালই থাকবে। আমিও তো জাতীয় ঐক্যের প্রেমিক। দেশের সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ই তাই। কিন্তু তাই বলে কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করে না যে কৃষক-মজুর, সমাজের তথাকথিত সেবাবৃত্তিধারীদের সমতার স্থান দেবে। আমরা তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করতে উঠে পড়ে লেগেছি, তাদের দৈন্য-দশা ঘোচাতে বদ্ধ-পরিকর। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে উদ্দেশ্য একটা, তা হচ্ছে রাজনৈতিক গুরুত্ব বাড়ানো, যাতে করে আমরা প্রভুত্ব বিস্তার করে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে আরও বেশী করে জোরদার

করতে পারি। এ কেবল আমার মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের মনের কথাই নয়, বরং সমগ্র জাতির মিলিত ধ্বনি, কিন্তু বৃন্দাকে এটা কে বোঝাবে!

স্ত্রী—

কাল আমার স্বামীর রাগ দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। হায় ভগবান! এ সংসারে আরও কত কি-ই না দেখাবে তুমি। মানুষ এতো নীচ, স্বার্থপরও হতে পারে! ওঁর উপদেশ শুনে দেবতার আসনে বসিয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমার জ্ঞান-চক্ষু খুলে গেছে। বুঝতে পারছি, যারা দু-নৌকোয় পা দিয়ে চলতে জানে তাদেরই সবাই দেশ হিতৈষী বলে। বিয়ের পর কালই আমার ননদ প্রথম শ্বশুর বাড়ী গেল। আত্মীয়-স্বজনে বাড়ী ভর্ত্তি। পাড়া-প্রতিবেশী, শহরের বিশিষ্ট গণ্য-মান্য কেউই আর নিমন্ত্রিত হতে বাকী নেই। মহিলারা সবাই দামী দামী শাড়ী-গয়না পরে এসে একটা গাল্‌চের ওপর বসে আছেন। আমি তো তাদের নিয়েই ব্যস্ত। হঠাৎ কোনো কারণে দরজার সামনে আসতেই নজরে পড়লো মহিলারা যেখানে তাদের জুতো-চটী ছেড়ে এসেছেন সেখানেও মাটিতে বেশ কিছু মেয়েরা বসে আছে. সে বেচারীরাও এ উৎসব দেখতে এসেছে। কেন জানি-না আমার মনে হোল, ওদের ওখানে বসা উচিৎ নয়। ওদেরও গাল্‌চেতে এনে বসলাম। এরপরই আসল নাটক জমে উঠলো। ভদ্রমহিলাদের মধ্যে চোখ টেপাটেপি, ফুস্‌-ফুস্‌, গুজ-গুজ শুরু হোল। নানান ছল-ছুতো করে একে একে সবাই সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। কথাটা ততক্ষণে আমার স্বামীর কানেও উঠে গেছে। তিনি রেগে-মেগে, চোখ লাল করে ঘরে এসে ঢুকে আমাকে হাতের কাছে পেয়েই ফেটে পড়লেন—তোমার মতলবটা কি বলতো? আমার মুখে চুন-কালি না লাগিয়ে ছাড়বে না দেখছি? ভগবান কি তোমার মাথায় এতটুকু বুদ্ধিও দেন নি না-কি? ওদের কাছে এদের বসতে দিয়েছো কি জন্যে? বড় বড় ঘরের ভদ্রমহিলারা কখনো এই ছোটলোকদের সঙ্গে বসতে পারে! মান-সম্মান বলেও তো একটা কথা আছে! ওরা কি ভাবলেন বলতো! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! তোমার জ্বালায় তো এরপর আমার ভদ্রসমাজে মুখ দেখানোই দায় হবে!

কিছু না বুঝতে পেরে বললাম—কেন, এতে তাদের কি অপমান করা হয়েছে শুনি? সবায়ের আত্মাই সমান। গয়না-গাটি দামী-দামী শাড়ী পরে এসেছেন বলে তাদের আত্মা কি এমন উঁচুতে উঠে গেছে?

স্বামী মহাশয় রাগে ঠোঁট চিবিয়ে বলেন—চুপ করো! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। সেই থেকে এক কথা বলে যাচ্ছে। আত্মা-আত্মা-আত্মা! আত্মা আর পরমাত্মা এক হোল? যা বোঝো না, জানো না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না।

শহর-সুদ্ধ লোক এবার থেকে আমার গায়ে থু-থু দেবে। লজ্জা করছে না তোমার, আবার বক্ বক্ করছো! ভদ্রমহিলাদের অন্তর-আত্মা যে দুঃখিত হয়েছে সেদিকে খেয়াল আছে?

হতভম্ব হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

* * * *

আজ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। রাতে অতিথিদের এঁটো পাতা, জলের ভাঁড়-টাড়গুলো বাড়ীর সামনের ঐ মাঠটাতেই ফেলা হয়েছে। জনা পঞ্চাশ হাড় জিরজিরে লোক, তাদের মধ্যে শিশু-মেয়ে-বুড়োও রয়েছে, সবাই সেই এঁটো পাতার ওপর হুমড়ী খেয়ে চাটতে থাকে। হ্যাঁ, ওরা সবাই মানুষ, পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপ। মানুষে-কুকুরে একসঙ্গে খেয়োখেয়ি করছে, শেষে কাঙালীদেরই জয় হোল, ওরা মেরে কুকুরগুলোকে তাড়িয়ে দিল। আগ্রাসী খিদের তাড়নায় মানুষগুলো কুকুরেরও অধম হয়ে উঠেছে। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলাম না, কান্নায় ভেঙ্গে পরলাম। দয়াময় ভগবান! এরাও তো আমাদেরই ভাই-বোন, আত্মার আত্মীয়। তাহলে এদের এ শোচনীয় অবস্থার শিকার হতে হয়েছে কেন? তক্ষুনি কাজের মেয়েটাকে দিয়ে ওদের ডাকিয়ে বাড়ীর ভেতরে এনে বসিয়ে পেটভরে অতিথিদের জল-খাবারের জন্যে রাখা লুচি-মিষ্টি খাইয়ে দিলাম। ঝি তো ভয়ে ঠক্ ঠক করে কাঁপতেই শুরু করে দিয়েছে, বাড়ীর কর্তার কানে এই সাংঘাতিক কথাটা উঠলে ওকে আর আস্ত রাখবেন না। আমি অনেক করে সাহস দিতে তবে ওর ধড়ে যেন প্রাণ এলো।

তখনো সেই কঙ্কালসার লোকগুলো পরম তৃপ্তিতে লুচি-মণ্ডা খেয়ে যাচ্ছে, এরই মধ্যে আমার জ্ঞানদাতা স্বামী চোখ-মুখ লাল করে কঠোর ভাষায় বলতে শুরু করলেন—সারা রাত ধরে ভাঙ্গ গিলেছো মনে হচ্ছে? একটা না একটা উপদ্রব করেই চলেছো। তোমার কি হয়েছে বলতো? ঘরে টিকতে দেবে না না-কি! কি অন্যায় কথা! ওই মিষ্টিগুলো কি মেথর-মুদ্দোফরাসদের জন্যে বানানো হয়েছে? ঘি-চিনি, ময়দা তো আজকাল সোনার দামে বিকোচ্ছে। তার ওপর হালুইকরদের মজুরীও আকাশ ছোঁয়া। এই বাজারে অতগুলো জিনিস তুমি ঐ ভাগাড়গুলোর পেটে দিলে! এবার অতিথিদের পাতে কি দেবে শুনি? তুমি কি আমার মান-সম্মান সব ধুলোয় মিশিয়ে দেবে বলে ঠিক করেছো নাকি?

আমিও বেশ গম্ভীর ভাবেই বললাম—এতে রাগের কি আছে? তোমার যত মিষ্টি ওদের খাইয়েছি, তা এক্ষুনি কিনে এনে দিচ্ছি, এ নিয়ে আর একটা কথাও শুনতে চাই না। কেউ খাবে, ফেলবে, ছড়াবে, আর কেউ শুধু পাত চেটে যাবে এ আমি কিছুতেই

দেখতে পারবো না। ভুলে যেও না মেথর-মুদ্দোফরাসরাও মানুষ। ওদেরও সেই একই ভগবান·······

আমার স্বামী আমাকে এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বললেন—আর শুনতে চাইনে, চুলোয় যাক্ তোমার আত্মা! নিজে বাঁচলে বাপের নাম। ভগবান ইচ্ছে করলেই তো সবাইকে সমানভাবে সুখী করতে পারতেন, নাকি কেউ তাঁকে বারণ করেছে? এ ছুঁৎ ও অচ্ছুং এ ভেদাভেদও তো তাঁরই সৃষ্টি, না-কি? তাঁর হুকুম ছাড়া একটা গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ে না, তাহলে তাঁর আদেশ ছাড়া এই বৃহৎ সমাজ ব্যবস্থাটাই বা কি করে ভেঙ্গে ফেলা যাবে? তিনি স্বয়ং সর্বব্যাপী হয়েও আবার নিজেই কেন ঘেন্নার উদ্রেক হয় এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে কি? না পারলে সংসারের বর্তমান রীতি নীতিকেই মেনে চলতে হবে। ওসব আবোল-তাবোল কথাতে হাসি আর নিন্দে ছাড়া কিচ্ছু লাভ হবে না, এই বলে রাখলুম। ভাল চাও তো পাগলামী ছেড়ে দাও।

আমার মনের অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছি না। তাঁর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। হায়রে স্বার্থ! মায়াময় দুনিয়া! পরমব্রহ্মকে চোখেও ধুলো দিতে আমরা ওস্তাদ। তাঁকে নিয়েও ভাঁড়ামি চলছে!

সেই মুহূর্তে যেন এক জাদুময় ফুৎকারে আমার মন থেকে পতিভক্তি উধাও হয়ে গেল!

এ ঘর এখন আমার কাছে কারাগার কিন্তু তাতেও হাল ছাড়িনি। আমার বিশ্বাস একদিন না একদিন এখানেও ব্রহ্ম-জ্যোতির ছটায় স্বার্থের ক্লেদাক্ত অন্ধকার দূর হয়ে ভোরের নতুন সূর্য দেখা দেবেই।

মন্ত্র ১

পণ্ডিত লীলাধর চৌবের কথায় যেন জাদু ছিল। তিনি যখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে ওঁর বাণীর সুধা বর্জন করতেন শ্রোতারা পরম আত্মতৃপ্তি লাভ করতো—শুধু তাই নয়, বিস্ময়-বিমূঢ় চিত্তে শুনতে শুনতে তাঁরা যেন মোহিত হয়ে পড়ত। তাঁর বাণীতে তত্ত্বজ্ঞান বা শব্দযোজনা খুবই কম ছিল কিন্তু একই কথা তিনি বার বার নানাভাবে এত সুন্দর করে ব্যাখ্যা করতেন যে শ্রোতাদের মধ্যে তার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তার লাভ করতো। তাঁর বলার মধ্যে এমন কিছু থাকত যা শ্রোতাদের মন আকর্ষণের সহায়ক হোত এবং

প্রভাব সৃষ্টি করতে তাঁর কথা সাহায্য করতো। আমরা জানিনা,—কিন্তু যাঁরা শুনেছেন তাঁরা বলেন যে তিনি একটিমাত্র ব্যাখ্যাকে মুখস্থ করে রেখেছেন, এবং সেটাই নানাভাবে-নানা ঢঙে শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করেন। জাতীয় গৌরব গাথা—তাঁর ব্যাখ্যার মূল বিষয় ছিল। মঞ্চে উঠেই প্রাচীন গৌরব ও পূর্বসূরীদের অমর কীর্তিকে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করতেন শ্রোতারা মুগ্ধ না হয়ে পারত না।

"সুধীবৃন্দ! আমাদের এই অধগতির কথা শুনে চোখে জল এসে যায় না কি? প্রাচীন গৌরবের কথা মনে করলেই আমাদের মনে স্বভাবতই সন্দেহের সৃষ্টি হয়—আমরা কি সেই আগের যুগেই আছি না বদলে গিয়েছি! যে মানুষ একদিন সিংহের সাথে লড়েছে আজ সেই মানুষই ইঁদুর দেখলে আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই পতনের একটা সীমা আছে। বেশীদূর যেতে হবে না, মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের সময়কেই ভাবা যাক। ইউরোপের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, সে সময় বাড়ীর দরজায় তালা লাগাবার প্রয়োজন হোত না, চুরির কথা তো শোনাই যেত না—ব্যভিচার বলে কিছু ছিল না। কোনো দলীলও আবিষ্কার হয়নি। সামান্যতম কাগজপত্রের মাধ্যমেই ব্যবসা চলতো। ন্যায়পদে বসে কর্মচারীদের মাছি তাড়ানো ছাড়া—কোনো কাজ ছিল না। সুধীবৃন্দ! সে সময় কোনো যুবককে অযথা মৃত্যু বরণ করতে হোত না, (তালি বেজে উঠল) সে সময় কোনো মানুষকে বিনা কারণে অকালে মরতে হোত না। পিতার সম্মুখে পুত্রহত্যা এক অভূতপূর্ব অসম্ভব ঘটনা ছিল। বর্তমানে এমন পিতা-মাতা কমই আছেন যাঁর বুকে অকাল বিয়োগ ব্যথার ঘা দগ্‌দগ্‌ করছেনা। সেই প্রাচীন ভারত আর নেই—সে ভারত বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছে।"

চৌবেজীর এটাই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে বর্তমান পরিস্থিতি আর দুর্দশাকে দূর করার জন্য সমস্ত মানব-সমাজে অতীতের সুখ-সমৃদ্ধি আলোচনা করে জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করে তুলতে হবে—এ ব্যাপারে হিন্দু সভাকে তিনি কর্ণধার বলে মনে করতেন। হিন্দু জাতির মতো এত উৎসাহী এবং নীতিজ্ঞান সম্পন্ন তিনি আর কাউকে ভাবতে পারতেন না। এই কারণে তিনি তাদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। মানুষ জানতো, ধন দৌলত চৌবেজীর কিছুই ছিল না কিন্তু সাহস-বুদ্ধি ধৈর্যের অমূল্য সম্পদে তাঁর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল—যা তিনি মানব সমাজে বিতরণ করে পরম আনন্দ লাভ করতেন। হিন্দু-জাতির উত্থান-পতন-জীবন-মরণকে অবলম্বন করেই তিনি খুব আনন্দ পেতেন তাঁর বক্তব্য বর্তমানে যে সব হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে তার সংস্কার করতে হবে—নইলে হিন্দুজাতির পুণঃজীবন প্রাপ্ত হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। জাতির নৈতিক-শারীরিক-মানসিক-সামাজিক-আর্থিক-ধার্মিক মনোভাবের বিকাশ সাধনের একমাত্র পথ হলো আন্দোলনের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করা এবং সার্বিকভাবে তিনি

তারই প্রচেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করেছেন। ঈশ্বর প্রদত্ত গুণে তিনি প্রস্তর খণ্ডেও প্রাণ সঞ্চারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি-সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ-নীতিতে বিশ্বাসী দেশের মঙ্গলের জন্য চুরি ডাকাতিকে পর্যন্ত ক্ষমার চোখে দেখতেন।

দুই

গ্রীষ্মকাল, লীলাধর চৌবে কোনো পাহাড়ী অঞ্চলে বেড়াতে যাবার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। বেড়ানোও হবে আর তাঁর বাণী প্রচারের মাধ্যমে কিছু চাঁদা সংগ্রহও করা যাবে। যখন তাঁর বেড়াতে ইচ্ছে হতো তখন সদস্যমণ্ডলীর কাছে একটা প্রস্তাব রাখতেন এবং তাতে হাজার টাকা মতো সংগ্রহ করে তার কিছুটা অংশ খরচ করতেন তাতে কারো ক্ষতি বা আপত্তির কারণ থাকত না। পণ্ডিতজী যখন সপরিবারে যাত্রার উদ্যোগ করলেন তখন সারা দেশ জুড়ে হিন্দু জাতির সংস্কার সমস্যা দেখা দিল। তাঁর আর্থিক অবস্থা যদিও একদিন শোচনীয় ছিল, বর্তমানে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। হিন্দুজাতির মধ্যে তখন এমন সৌভাগ্য কোথায় যার দ্বারা তারা শান্তিলাভে সমর্থ হতে পারে। হঠাৎ খবর এল মাদ্রাজে জাতি আন্দোলনের ঝড় উঠেছে। সমস্ত গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে চলেছে। মুসলমানরা সানন্দে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তখন পণ্ডিতজী ভাবলেন, যে যদি সমস্ত হিন্দু-জাতি এর বিরুদ্ধ-ভাব গ্রহণ না করে তবে হিন্দু-জাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হয়ে যাবে—তাদের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না।

সারা হিন্দু সমাজ জুড়ে তখন চাঞ্চল্যের ঝড় উঠলো। তাড়াতাড়ি নেতাদের কাছে গিয়ে এই সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন জানালেন। অনেক চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে স্থির হোল যে, চৌবেজীর ওপরই একমাত্র এই সমস্যা সমাধানের বা শান্তিরক্ষার দায়িত্ব-ভার দেওয়া যেতে পারে। তাঁর কাছে গিয়ে হিন্দু সভার সদস্যরা প্রার্থনা জানাল যে যত শীঘ্র সম্ভব তিনি যদি মাদ্রাজে চলে গিয়ে এই হিন্দু ধর্ম বিমুখ হিন্দুদের ইসলামধর্ম গ্রহণ থেকে উদ্ধার না করেন তাহলে তাদের উদ্ধার করার আর কোনো পথ নেই। চৌবেজী তো হিন্দু-জাতির জন্যই জীবন উৎসর্গ করেছেন তাই সদস্যদের অভিমত শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর পর্বত যাত্রা স্থগিত করে দিলেন এবং মাদ্রাজে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। হিন্দু সভার সর্ব প্রধান নেতা অশ্রু-সজল বিনয়ী নম্র আবেদন করলেন যে "মহারাজ, এ সমস্যার বেড়াজাল একমাত্র আপনিই ভাঙতে পারবেন—আপনি ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছি না। আপনি ছাড়া ভারত-বর্ষে আর কোনো দ্বিতীয় মানুষ নেই, যে এই ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হোতে পারেন। জাতির দীন-হীন দশার কথা চিন্তা করে আপনি এই হিন্দু-জাতির প্রতি দয়া করুন।"

লীলাধর চৌবে—এই প্রার্থনা অস্বীকার করতে পারলেন না। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পণ্ডিতজীর নেতৃত্বে সদস্য মণ্ডলীর বেশ কিছু সদস্য নিয়ে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করলেন। হিন্দু-সভার সদস্যরা তাঁদের সাদর বিদায় সম্ভাষণ জানাল। এক উদার বিত্তবান,—চৌবেজীকে এ ব্যাপারে বেশ কিছু অর্থ সাহায্য করলেন। স্টেশনে হাজার হাজার মানুষ তাঁদের বিদায় অভিনন্দন জানাল।

যদিও যাত্রার বিশদ বিবরণ লেখার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক স্টেশনে এই সেবকদের স্বাগত অভিনন্দন জানানো হলো। কোথাও অর্থ-সাহায্য, কোথাও চাঁদোয়া (সামিয়ানা) দিয়ে সাহায্য করা হোল। বরোদা নামক এক ধনী ব্যক্তি একটি মোটর গাড়ী দিলেন, যাতে পায়ে হেঁটে তাদের কষ্ট পেতে না হয়। মাদ্রাজ পৌঁছুবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস তাঁদের কাছে স্তূপীকৃত হয়ে গেল। সেখানে (মাদ্রাজে) পৌঁছে এক খোলামাঠে এক হিন্দু-সভার আয়োজন করা হোল। জাতীয় পতাকা উড়ানো হোল। স্থানীয় ধন-কুবের দান সামগ্রী পাঠালেন, যেন মনে হোল কোনো রাজা মহারাজার ক্যাম্প তৈরী হয়েছে।

তিন

রাত তখন আটটা—অস্পৃশ্য পল্লীর বস্তিতে সেবকদলের ক্যাম্পে গ্যাসের আলো জ্বল জ্বল করছিল। সেখানে কয়েক হাজার মানুষের বসবাস ছিল—যারা অধিকাংশই অস্পৃশ্য। ওদের জন্য পৃথক বসার ব্যবস্থা। পণ্ডিত লীলাধরজীর শান্তিপূর্ণ বাণীর ব্যাখ্যা হচ্ছিল যে তোমরা সেই ঋষিপুত্র সন্তান—যিনি এই আকাশের নীচে এক নতুন সৃষ্টি রচনা করতে পারতেন। যাঁর ন্যায়বুদ্ধি ও বিচার শক্তির সামনে আজ সারা বিশ্ব মাথা নত করে আছে। সহসা এক অস্পৃশ্য বৃদ্ধ উঠে জিজ্ঞাসা করলো—"আমরাও কি তাঁরই সন্তান?" পণ্ডিত লীলাধর ধীর—নম্র কণ্ঠে জানালেন—"নিঃসন্দেহে। তোমার শিরায় শিরায় তাঁরই রক্ত প্রবাহ বয়ে চলেছে—যদিও আজ তোমরা নির্দয়-কঠোর বিচার-হীন সঙ্কুচিত। হিন্দু সমাজ আজ তোমাদের অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে তবু তোমরা হিন্দুর থেকে নীচু নও বরং আরও উচ্চস্তরের"—বৃদ্ধ জানালো—"তোমাদের হিন্দু-সমাজ আমাদের সংস্কারমুক্ত করেনা কেন?"—পণ্ডিত লীলাধর বললেন, হিন্দু সভার জন্মের এখন শৈশব লগ্ন,—এই অল্প সময়ে তারা যত কাজ করেছে তাতে তাদের মধ্যে অহঙ্কার বোধ জেগে ওঠা-স্বাভাবিক। হিন্দু জাতির দীর্ঘদিন পর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে এখন সেই সময় উপস্থিত। যখন ভারতবর্ষে হিন্দুজাতি কাউকে নীচ ভাবতে পারবেনা, সকলকে এক ভাতৃভাবাপন্ন মনে করে বুকে টেনে নেবে। শ্রীরামচন্দ্র যেমন ব্যাধকে বক্ষে ধারণ করেছিলেন, শবরীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করেছিলেন...... বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলো—"আপনিও

যদি সেই ঋষিরই সন্তান,—তবে আপনার মধ্যে কেন এই উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ ভাবনা ?” —পণ্ডিতজী জানালেন যে তিনিও পতিত হয়ে গিয়েছেন—অজ্ঞানের অন্ধকারে তিনি সেই সকল মহাত্মাদের বিস্মৃত হয়েছেন। বৃদ্ধ পুনরায় প্রশ্ন করলো—“এবার তো আপনার নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে—অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধান পেয়েছেন মনে হয়—এখন কি আপনি আমাদের সঙ্গে বসে ভোজন করতে পারবেন ?” পণ্ডিতজী ধীর নম্র কণ্ঠে জানালেন—তাঁর কোনো আপত্তি নেই। বৃদ্ধ পুনরায় জানতে চাইল— আমার পুত্রের সাথে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে পারবেন ?” যতোদিন পর্যন্ত তোমার জন্ম সংস্কার হয়, তোমার আহার ব্যবহারের মধ্যে পরিবর্তন সাধন না হয়— আমি তোমার সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে পারব না। মাংস খাওয়া, সুরাপান ত্যাগ করো—শিক্ষাকে সহৃদয়ে গ্রহণ করো—তবেই তুমি উচ্চবর্ণ হিন্দুদের সাথে মিলিত হোতে পারবে।

বৃদ্ধ জানালো যে সে এমন অনেক কুলীন ব্রাহ্মণকে জানে, যারা দিনরাত সুরাপানে নেশাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, মাংস ব্যতীত মুখে গ্রাস তোলে না। আর এমন কতোই তো নিরক্ষর মানুষও রয়েছে—তাদের সাথে একপঙক্তিতে বসে আমি আপনাকে আহার করতে দেখেছি। তাদের সাথে বৈবাহিক সূত্র স্থাপনে আপনার বাধা নেই ? আপনি যখন নিজেই অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে রয়েছেন—তাহলে আপনি আমাদের উদ্ধার করবেন কি করে ? আপনার মধ্যে অহম্‌বোধ পরিপূর্ণ—আপনি আগে নিজের আত্মার সংস্কার করুন—আমাদের উদ্ধার করতে হবে না আপনাকে।

“হিন্দু সমাজ আমাদের অস্পৃশ্যতার কলঙ্কমুক্ত করতে পারবেনা আমি যতোই বিদ্বান-আচারশীল হইনা কেন আপনারা আমাদের আগের মতোই নীচ সম্প্রদায়ভুক্ত করেই রাখবেন। হিন্দুর-আত্মার বিনাশ ঘটেছে আর তার পরিবর্তে তাদের মধ্যে অহম্‌বোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছে। আমি এবার সেই দেবতার শরণাপন্ন হবো যিনি আমায় গ্রহণ করবেন। তিনি বলতে পারেন না, তোমার জীবনের সংস্কার করে এসো। আমি ভালোমন্দ যা-ই হোই না কেন, তিনি আমাদের এ রকম অবস্থায় ঠিক কাছে টেনে নেবেন। আপনি যদি উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হয়ে থাকেন, তবে থাকুন, আমাদের উদ্ধারের প্রয়োজন নেই আপনার।” পণ্ডিত লীলাধর বৃদ্ধের মুখে এ সকল কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন।” “বর্ণভেদ তো ঋষিদের দ্বারাই কৃত, তাকে তুমি অস্বীকার করবে কী করে।” বৃদ্ধ বললো, “আপনি ঋষিদের অপবাদ দেবেন না। জাতিভেদ প্রথা এ সব তো ধর্মভীরু মানুষেরই সৃষ্টি। আপনি, আমরা মাংস খাই, সুরা-পান করি—আর আপনারা সুরাপান কারীদের পাদুকা লেহন করেন। আমাদের মাংস খাওয়াকে ঘৃণা করছেন—আর গোমাংস ভক্ষণকারীদের সামনে আপনারা নাক রগড়ান। কারণ তারা

বলবান শক্তিশালী—তাদের কিছু সংস্কার করার স্পর্ধা আপনার নেই। আমিও যদি আজ রাজা হয়ে যাই আপনি আমার সামনে হাত জোড় করে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আপনার ধর্মে এরই নাম—'উচ্চবর্ণ'। যে বলবান সে যতো নীচ কর্ম করুক না—তার ধর্মসংস্কারের প্রয়োজন নেই।" এই বলে বৃদ্ধ সেখান থেকে চলে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গী সাথীরাও উঠে দাঁড়াল। শুধুমাত্র লীলাধর চৌবে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে রয়ে গেলেন—যেন মনে হোল মঞ্চে সমাপ্ত সঙ্গীত শেষ হয়ে যাওয়ার পর তার প্রতিধ্বনি বাতাসে ধ্বনিত হতে লাগলো।

চার

চৌবেজীর সেখান থেকে চলে যাবার খবর শুনে অন্যান্যরা (মুসলমানরা) এগিয়ে এলো এবং কী উপায়ে এদের একেবারে তাড়ানো যায় তার ব্যবস্থা নিতে সচেষ্ট হোল। সবাই মনে করেছিল চৌবেজী বোধ হয় এবার জাঁকিয়ে বসবেন কারণ দেশ দেশান্তরে তাঁর নাম যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল। সবাই ভাবল যে তিনি থাকলে—হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পরিণত হবে। তিনি যাতে কোনো প্রকারে এখানে জমিয়ে বসতে না পারেন সেটাই তাদের কাম্য। মোল্লারা উপায় ভাবতে লাগলো, অনেক বাদ বিসংবাদের পর স্থির হোল যেভাবেই হোক সকলকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেই হবে—যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করবে তাদের একেবারে মেরে ফেলতে হবে—এর জন্য তাদের অস্থবিধে হবে না। তাঁদের উন্নতির জন্য দ্বার তো খোলাই আছে। কার্যে সিদ্ধ হলে ঈশ্বরের দূত এসে তাদের জন্য মৃতদের ভস্মে সুর্মা তৈরী করবেন। পয়গম্বর তাদের মস্তকে বৈভবের হস্তস্পর্শ করবেন। খোদাবংশ করিম তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে বলবেন—"তোমরাই আমার আদর্শ বন্ধু।"

রাত তখন দশটা। হিন্দু-সভার ক্যাম্প অন্ধকারাচ্ছন্ন। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে—চারিদিক নিস্তব্ধ নিঃঝুম—শুধুমাত্র লীলাধর চৌবে তাঁর প্রধান সদস্যকে চিঠি লিখছিলেন যে, এখানে তাঁর সব থেকে বড় প্রয়োজন অর্থের। টাকা-টাকা, টাকা, যতো পারেন টাকা পাঠিয়ে দিন। সদস্যদের মধ্য থেকে উপযুক্ত কাউকে পাঠান এবং জোরদার মহাজনের পকেট থেকে ছিনতাই করে, ভিক্ষা করে—যে ভাবেই হোক টাকা পাঠান। অর্থের অভাবে এই অভাজনদের উদ্ধার সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি পাঠশালা, চিকিৎসালয় খোলা যাচ্ছে—সে পর্যন্ত কোন বিষয়ে অগ্রসর হওয়া কঠিন। তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে যে "হিন্দু-সভা" তাদের হিত চিন্তা করছে। মুসলমান সম্প্রদায় যত খরচ করছে তার অর্ধেকও যদি আমি খরচ করতে

পারি তবেই হিন্দুধর্মকে সম্প্রসারিত করে হিন্দুধর্মের ধ্বজা উত্তোলিত করতে পারব। শুধুমাত্র বাণী প্রচারে কাজ হবে না। তাদের হাত থেকে ইসলাম ধর্মকে অস্বীকার করে কোনো হিন্দু জীবিত ফিরতে পারবে না। হঠাৎ কোনো বাধা প্রাপ্ত হয়ে পণ্ডিতজী চমকে উঠলেন। চোখ তুলে তাকালেন, দেখলেন, তাঁর সামনে দুজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। পণ্ডিতজীর ভয় হোল, শঙ্কিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমরা কে—কি প্রয়োজনে এখানে এসেছ?" উত্তর পেলেন, "আমরা মহাত্মার দূত,—তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি—মহাত্মা তোমায় ডেকেছেন।"

পণ্ডিতজী যথেষ্ট বলিষ্ঠ ছিলেন—তাদের দুজনকে এক ধাক্কায় ভূপাতিত করতে পারতেন। তিনি প্রাতঃকালে তিন পোয়া মোহনভোগ এবং দু'সের দুধ তাঁর দৈনন্দিন প্রাতরাশ ছিল। মধ্যাহ্নে ডালের সাথে একপো ঘী খেতেন—। অপরাহ্নে আধসের বাদাম মিশ্রিত একসের মালাই খেতেন। রাত্রে জোর করে বা অনেক চেষ্টা করে উপবাস থাকতেন এবং প্রাতঃকাল না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর কিছু খেতেন না। তাছাড়া ক্ষণিকের জন্যও তিনি পায়ে হাঁটতেন না। পাল্কি হোলে ভালই—ঘরের পালঙ্কের মতো উড়িয়ে নিয়ে যেত। কিছু না পেলে এক্কাগাড়ী তো ছিলই। কাশীতে দু চারজন এক্কাওয়ালা এমন ছিল যে তারা পণ্ডিতকে দেখলে কখনো বলতে পারতো না যে "গাড়ী খালি নেই—বা এখন যেতে পারবে না।" এই রকম মানুষ তিনি ছিলেন যে বিনা বাক্য ব্যয়েই সকলকে দাবিয়ে রাখতেন স্ফূর্তির অবসরে তো কচ্ছপের মত রাত্রে বেরোতেন।

পণ্ডিতজী একবার দরজার দিকে তাকালেন,—পালাবার কোনো সুযোগই ছিল না। তখন মনে মনে সাহস সঞ্চয় করলেন। যদিও ভয়ের পরাকাষ্ঠাই হোল সাহস। —পাশে রাখা নিজের লাঠির দিকে হাত বাড়িয়ে—রাগত চিত্তে বলে উঠলেন—"বেরিয়ে যাও এখান থেকে।" কথা সম্পূর্ণ মুখ থেকে নিঃসৃত হওয়ার আগেই মাথায় লাঠির পর লাঠির বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। পণ্ডিতজী মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। শত্রুরা নিকটে এসে দেখলো—প্রাণ স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কাজ হয়ে গেছে। তখন তাঁর যা ছিল সর্বস্ব নিয়ে তারা পালিয়ে গেল।

পাঁচ

সময়—প্রাতঃকাল, বৃদ্ধরা যখন বেরিয়েছেন তখনোও অন্ধকারাচ্ছন্ন। পথে লোক চলাচল শুরু হয়নি—ততক্ষণে ছিনতাই কারীরা অনেক দূরে পালিয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধের মাথাটা কেমন ঘুরে গেল—কি ব্যাপার! সারারাত্রের মধ্যে

আলাদীনের প্রদীপের মত ঘরের জিনিসপত্তর সব কিছু শূন্য হয়ে গেছে। মহাত্মাদের একজনকেও দেখা যাচ্ছে না। প্রাতঃকালে মোহনভোগ, সন্ধ্যায় 'ভাঙ' খেতে দেখা যেত যাঁকে। একটু এগিয়ে তাঁবুর কাছে গিয়ে পণ্ডিত লীলাধরজীকে ডাকলেন সাড়া না পেয়ে বুকটা কেঁপে উঠলো—আরও কাছে গিয়ে দেখলেন—পণ্ডিতজী মাটিতে মৃতের মত নিষ্কমা নিস্তব্ধ অবস্থায় পড়ে আছেন। মুখের ওপর মাছিতে ছেঁকে ধরেছে মাথার চুলগুলো জমাট বেঁধে গিয়েছে—দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো চিত্রকরের তুলিতে লাল রঙ লাগানো রয়েছে। কাপড় চোপড় এলোমেলো। বৃদ্ধ স্বগতোক্তি করলেন মনে মনে,—'বুঝেছি, পণ্ডিতজীর সঙ্গী সাথীরা তাঁকে মেরে নিজেরা পালিয়েছে। 'সহসা' পণ্ডিতজীর মুখ থেকে কাত্‌রানোর আওয়াজ বেরোল। তাহলে এখন প্রাণ আছে! বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে গ্রামের কয়েকজনকে ডেকে এনে পণ্ডিতজীর নিথর দেহটা কোনোরকমে নিজের বাড়ী নিয়ে গেলেন।

ভালোমত ওষুধ লাগিয়ে মানুষটাকে আরামে শুইয়ে রাখলেন। তারপর বৃদ্ধ দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জেগে পণ্ডিতজীর পাশে বসে রইলেন। বৃদ্ধের আত্মীয় স্বজনরাও পণ্ডিতজীর সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলেন—গ্রামবাসীদেরও সহযোগিতা ছিল যথেষ্ট। বেচারা পণ্ডিতজীর এখানে আপনজন বলতে কেউ নেই। নিজের বলতে তার-বৃদ্ধই একমাত্র পরিচিত মানুষ। বৃদ্ধ ভাবতে লাগলেন—বেচারা পণ্ডিতজী তো আমাদের উদ্ধার করতেই এসেছিলেন। পণ্ডিতজী কয়েকবার নিজের বাড়ীতেও পড়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর আত্মীয় পরিজনরা এত যত্ন করে সেবা করেনি। সারা গৃহ আর গৃহ ছিল না—সারা গ্রামবাসী তাঁর (পণ্ডিতজীর) গোলাম হয়ে ছিল তখন। অতিথিসেবা তাঁদের (বৃদ্ধের) ধর্মের একটি অংশ বিশেষ। এখন সকলেই ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করলো। বৃদ্ধ নিজের হাতে মলমূত্র পর্যন্ত পরিষ্কার করতেন। আজ পণ্ডিতজীর এ রকম অবস্থায় সারা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে দুধ চেয়ে—নিজে হাতে তাঁকে খাওয়াতেন। কিন্তু পণ্ডিতজীর দৃষ্টি ছিল অমলিন। যদি কেউ তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চাইতেন—বৃদ্ধ তার ওপর রাগ করতেন, বকাবকি করতেন।

প্রায় মাসখানেক পর পণ্ডিতজী ধীরে ধীরে চলৎশক্তি ফিরে পেয়ে জানতে পারলেন যে এরা তাঁর কত উপকার করেছেন—কত সেবা যত্ন করেছেন এতদিন ধরে। এইসব লোকেদের তখন একমাত্র কাজ ছিল—তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা—নইলে মৃত্যুর তো আর বেশী দেরী ছিল না। তিনি বুঝতে পারলেন যাদের তিনি অস্পৃশ্য বলে মনে করতেন এবং যাদের উদ্ধারের জন্য এসেছিলেন, 'তারা আজ কোনো অংশে আমার থেকে কম নয়। এরকম পরিস্থিতিতে আমি হয়ত রোগীকে হাসপাতালে

স্থানান্তরিত করে গর্ব অনুভব করতাম। মনে করতাম দধীচি আর হরিশ্চন্দ্রের মুখ উজ্জ্বল করেছি।' তাঁর প্রতি রোমকূপে এদের জন্য আশীর্বাদ বর্ষিত হোল।

ছয়

তিন মাস অতিক্রান্ত—কিন্তু এর মধ্যে হিন্দু-সভা তাঁর কোনো খোঁজখবর নেয়নি, এমনকি বাড়ীর লোকও নয়। সভার মুখপত্রে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত করে তারা অশ্রু বর্ষণ করেছে—এবং পণ্ডিতজীর কার্য-রীতি-নীতিরও প্রশংসা করা হয়েছে তাতে। তাঁর অভিজ্ঞান প্রস্তুতের জন্য চাঁদা সংগ্রহও করা হয়েছে। আত্মীয় স্বজনরা কান্নাকাটির মাধ্যমে শোক প্রকাশ করে তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন বলা যেতে পারে।

এদিকে পণ্ডিতজী দুধ-ঘী খেয়ে খেয়ে রীতিমত সুস্থ হয়ে উঠলেন। শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত ও শক্তি বৃদ্ধিলাভ করেছে। দেহাত বা গ্রামের জলবায়ু তাঁর শক্তি বৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়ক ছিল। যা মালাই আর মাখন তাঁকে দিতে পারেনি—তা দিয়েছে গ্রামের জলবায়ু। তাঁর স্ফূর্তির আমেজ ফিরে এল—তিনি নবজীবন লাভ করলেন।

শীত এসে গিয়েছে। পণ্ডিতজী এবার বাড়ী ফেরার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন—এমন সময়ে হঠাৎ গ্রামে "প্লেগ" রোগের আক্রমণ দেখা দিল—গ্রামে তিন জন এই রোগের কবলে পড়লেন। তাদের মধ্যে বৃদ্ধ-চৌধুরী ও তাদের মধ্যে আরও একজন। আত্মীয়-স্বজনরা প্রাণ ভয়ে এদের ছেড়ে পালিয়ে গেল। তাদের একটা অন্ধবিশ্বাস ছিল, তারা এ রোগটাকে দৈবকোপ মনে করতো তাই এই সব রোগীদের অতি আপনজন হলেও ফেলে রেখে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য তারা পালিয়ে বাঁচত। তারা মনে কোরত এ-সব রোগীদের বাঁচালে দেবতা রুষ্ট হবেন। যে প্রাণীকে ঈশ্বর নিয়ে নেবেন মনে করেছেন সেই রোগীকে দেবতার হাত থেকে কেড়ে নেওয়াকে তারা গুরুতর অপরাধ বলে মনে কোরত। পণ্ডিতজীকে অনেকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইল—কিন্তু তিনি গেলেন না। গ্রামে থেকে তিনি রোগীদের রক্ষা করবেন স্থির করলেন। যে মানুষ তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে, তাকে ফেলে তিনি কি করে চলে যাবেন? বৃদ্ধের উপকার তাঁর আত্মাকে জাগিয়ে দিয়েছে। বৃদ্ধ চৌধুরী তিনদিন পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে তাঁকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, "আপনি এখানে কেন? আমাদের ওপর দেবতাদের আদেশবাণী এসে গিয়েছে, আমাদের আর কেউ বেঁধে রাখতে পারবে না। এই রোগের মধ্যে থেকে আপনি কেন প্রাণ বিসর্জন দিতে চাইছেন? আমাদের দয়া করুন, আপনি চলে যান।"

পণ্ডিতজীর ওপর এসব কথা বিশেষ প্রভাব বিস্তার কোরল না। তিনি বার বার এই তিনটি রোগীর কাছে যেতেন, নিয়ম-মতো সেবাযত্ন করতেন, কখনো বা পুরাণের

গল্প শোনাতেন। বাড়ীর জিনিসপত্তর আগের মতোই রাখা ছিল—শুধু প্রাণ রক্ষার্থে মানুষরা পালিয়ে বেঁচেছিল। পণ্ডিতজী রোগীদের পথ্য তৈরী করে খাওয়াতেন। রাত্রে রোগীরা ঘুমিয়ে পড়তো যখন—সারা গ্রামে একটা ভয় ভয় ভাব জেগে উঠত—নিস্তব্ধ গ্রামটার দিকে তাকালে পণ্ডিতজীরও মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করতো—কারণ রাত্রে তিনি একটা ভয়ঙ্কর জন্তু দেখতে পেতেন—তখন তিনি স্বভাবতই ভীত হয়ে পড়তেন কিন্তু তবু গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার কথা চিন্তাও করতেন না। নিজের মনে সাহস নিয়ে ভাবতে হয় রোগীদের সারিয়ে তুলব তা না হলে এদের জন্যই আত্মত্যাগ করবো।

দিন কয়েক তাঁর আন্তরিক সেবা যত্নেও যখন রোগীদের কোনো উন্নতি হোলনা, তখন তিনি রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। গ্রাম থেকে শহর প্রায় কুড়ি মাইল দূরে, ট্রেনের কোনো দেখাই নেই। পথে কোনো যানবাহন পর্য্যন্ত নেই। এদিকে রোগীদের ফেলে গেলে তাদের দুরবস্থার শেষ থাকবে না, এসব কথাই কেবল চিন্তা করতে লাগলেন পণ্ডিত লীলাধরজী। শেষ পর্যন্ত রোগীদের অবস্থার কোনো উন্নতি হ'চ্ছে না দেখে একদিন রাতের শেষে প্রায় ভোরের দিকে তিনি পায়ে হেঁটে শহরের দিকে চলতে আরম্ভ করলেন এবং সকাল দশটা নাগাদ শহরে পৌছে হাসপাতালে গেলেন। সেখান থেকে ওষুধ নিতে গিয়ে খুব নাস্তানাবুদ হোতে হলো। সেখানে তাঁর কাছ থেকে ওষুধের জন্য এমন দাম চাইছিল—যা দেওয়া তাঁর পক্ষে আজ অসম্ভব। ডাক্তার মুন্সী জানালেন—"ওষুধ তৈরী নেই।" পণ্ডিতজী মনে মনে গজগজ করতে করতে খুব বিনয় নম্র হয়ে বললেন,—"সরকার অনেক দূর থেকে এসেছি—আমার ঘরে কয়েকজন রোগী খুবই অসুস্থ, আপনি দয়া না কোরলে তারা মারা যাবে।" ডাক্তার মুন্সী রেগে গিয়ে বললেন—"বললাম তো ওষুধ তৈরী নেই—কেন বিরক্ত করছ? এত অল্প সময়ের মধ্যে ওষুধ তৈরী করাও সম্ভব নয়।" পণ্ডিতজী অত্যন্ত দীন হীন ভাবে বললেন,—সরকার আমি একজন ব্রাহ্মণ—আপনার সন্তানদের ঈশ্বর চিরজীবী করুন—আমি আপনার কাছে দয়া প্রার্থনা করছি।" কিন্তু ওখানকার কর্মচারীরা তো টাকার গোলাম, ওদের মধ্যে দয়া মায়া কোথায় বরং পণ্ডিতজী যত তোষামোদ করছেন আরও জলে উঠছিল। তিনি নিজের জীবনে কখনো এমন দীনতার সম্মুখীন হননি। এ সময়ে একটি পয়সাও ছিলনা—যদি কাছে পয়সা বা অর্থ থাকতো তাহলে এ রকম অসুবিধায় পড়তে হোতনা তাছাড়া গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ভিক্ষে করেও অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। বেচারা পণ্ডিতজী—হতবুদ্ধি হয়ে ভাবতে লাগলেন—এবার কি করা যায়! সহসা ডাক্তার সাহেব নিজের বাঙ্‌লো থেকে বেরিয়ে এলেন—পণ্ডিতজী দৌড়ে গিয়ে তাঁর পায়ের ওপর পড়ে কাতর কণ্ঠে বললেন—"আমার ঘরে

তিনজন রোগী পড়ে আছে, আমি খুব গরীব সরকার—দয়া করে কিছু ওষুধ দিন।”

ডাক্তারের কাছে এমন গরীব লোকের নিত্য নৈমিত্তিক আসা-যাওয়া চলছে—তাঁর চরণযুগল কারো চোখের জলে ভিজে যায়—কেউবা কাতর আর্তনাদ করতে থাকে, তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না। যদি এত দয়াই করবেন তাহলে তাঁর ঠাট-বাট বজায় থাকবে কিসে! কিন্তু মনের দিক দিয়ে ডাক্তার যতোই অনুদার হোক, তিনি মিষ্টি-ভাষীও ছিলেন কিছুটা। পণ্ডিতজীর কাছ থেকে পা দুটি সরিয়ে নিয়ে-জিজ্ঞাসা করলেন,—“রোগীরা কোথায় আছে?” তারা তো বাড়ীতে আছে—এত দূরে নিয়ে আসব কি করে। নিজের মস্ত ভুল হয়ে গেছে বুঝতে পারলেন। রোগী না দেখে, রোগ বিচার না করে ডাক্তার ওষুধ দেবে কি করে? ডাক্তার বললেন, “বেশ মজার কথা তো রোগী না দেখে ওষুধ দেব কি করে? পণ্ডিতজী বললেন—“বুঝেছি সরকার—কিন্তু রোগীকে নিয়ে আসার উপায় ছিল না। গ্রামবাসীদের সহযোগিতা পেলে হয়তো তিনি ডোলিতে করে তাদের আনতে পারতেন—কিন্তু সে সুযোগও তিনি পাননি। আজ তাঁকে সহায়তা করতে গ্রামে কেউ নেই। রোগীদের জন্যও চিন্তা ভয় হচ্ছে—জানিনা দুষ্ট দেবতারা অর্থাৎ তাঁর শত্রুপক্ষ এতক্ষণে কোনো বিপদ এনে দিয়েছে কিনা! যদি আমার পরিবর্তে অন্য কেউ হোত তাহলে ওদের মেরেই ফেলতো। কিন্তু চৌবেজীর সাথে ওদের একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে—তাই প্রাণ রক্ষার্থে এতদূরে ছুটে এসেছেন। কিন্তু স্বয়ং ডাক্তারের মুখের কথা শুনে পণ্ডিতজী কিছু বলার সাহস হোলনা—তবু মনকে শক্ত করে বললেন,—“সরকার কিছু করা যাবে না তাহলে?” ডাক্তার জানালেন যে হাসপাতাল থেকে ওষুধ পাওয়া যাবে না—তিনি নিজে ওষুধ দেবেন কিন্তু দাম দিতে হবে। পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করলেন,—“কত টাকা সরকার?” ডাক্তার জানালেন, “দশ টাকা—আর এই ওষুধে যে কাজ হবে, হাসপাতালের ওষুধে তা হবে না। সেখানে পুরনো ওষুধ রাখা থাকে—তাতে যে রোগী বাঁচে সে তার ভাগ্যে বাঁচে নইলে বেশীর ভাগই মারা যায়। তাতে কিছু লাভ হবে না, আমি যে ওষুধ দেব তা খাঁটি ওষুধ—দেব।”

দশ টাকা! এখন দশ টাকা তার কাছে দশ লাখের সমতুল্য। একদিন তিনি এ রকম কত দশ টাকাই খরচ করেছেন কিন্তু আজ তিনি নিঃস্ব। কারো কাছে ধার চাওয়ারও আশা নেই। হ্যাঁ সম্ভব—ভিক্ষা করে দেখা যাক্। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তিনি বেরোলেন, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে দশ টাকা ভিক্ষা কি পাওয়া যায়! আধ ঘণ্টা খানেক তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। ভিক্ষা ছাড়া উপায় নেই—জীবনে কোনোদিন ভিক্ষাও করেননি। চাঁদা জমিয়ে হাজার টাকা তিনি সংগ্রহ কোরতেন—সে কথা আলাদা। ধর্মের সেবাই জাতিকে রক্ষা করে। জাতির

সেবক—দলিত পতিতদের উদ্ধার কর্তা হিসেবে চাঁদা সংগ্রহ করায় তাঁর গৌরব ছিল কিন্তু চাঁদাও তিনি কোনোদিন হাত পেতে নেননি—কিন্তু আজ ভিখারীর মত তাঁকে দ্বারে দ্বারে—পথে পথে হাত পাততে হবে। তাতে কতো লোকের কতো কড়া কথা শুনতে হবে, কতো দুর্ব্যবহার সহ্য কোরতে হবে। কেউ বলবে এমন হৃষ্টপুষ্ট চেহারা পরিশ্রম করে অর্থোপার্জন করতে পার না—ভিক্ষা চাইছ তোমার লজ্জা করে না? কেউ বলবে ঘাস কেটে নিয়ে এস তোমায় ভাল মজুরী দেব।' তিনি যে একজন ব্রাহ্মণ, একথা কেউ বিশ্বাস কোরবে না আজ। এখন যদি রেশমী বস্ত্র, গৈরিক 'দোপাট্টা' পাওয়া যেত তাহলে একটা উপায় হোত। জ্যোতিষী সেজে কোনো শেঠজীর কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করতে পারতেন। ভেকধারী হলেও তাতে তাঁর উৎসাহ ছিল। কিন্তু এখানে সে সব কোথায় পাবেন? তাছাড়া তাঁর টাকা-পয়সা বস্ত্রাদি সবই তো চুরি হয়ে গিয়েছে। বিপদে মানুষ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। নইলে এখন ময়দানে দাঁড়িয়ে তিনি যদি কোনো মনোমুগ্ধকর বাণী শোনাতে পারতেন তাহলে হয়তো দশ পাঁচজন ভক্ত জুটে যেত এবং চাঁদাও সংগ্রহ হোতে পারত কিন্তু সে কথা তাঁর মনেও এলো না। পুষ্প নির্মিত মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁর বাণী হয়তো শোনাতে পারতেন কিন্তু তাঁর এই দুরবস্থা দেখে কে তাঁর কথা শুনবে বরং লোকে এখন পাগল মনে করবে।

দ্বিপ্রহর গড়িয়ে গেছে, অধিক চিন্তার সময় নেই, এমনিতেই সন্ধ্যা হোয়ে এল বলে। তাহলে রাত্রের মধ্যে বাড়ী ফিরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। ওদিকে রোগীদের কি অবস্থা কে জানে! তিনি আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলেন না। যতো অপমান-তিরস্কার-লাঞ্ছনা সহ্য কোরতে হয় হোক—এ ছাড়া আর অন্য কোনো পথ নেই। এই মনে করে এগোতে লাগলেন।

বাজারে গিয়ে একটি দোকানের সামনে দাঁড়ালেন—কিন্তু কিছু চাইতে পারলেন না। দোকানী জিজ্ঞাসা কোরল—কি নেবে?

পণ্ডিতজী বললেন—চালের দাম কত? ব্যাস এই পর্যন্তই। দ্বিতীয় দোকানে পৌঁছে আরও সাবধান হয়ে গেলেন। শেঠজী গদির ওপর বসে আছেন। পণ্ডিতজী তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং গীতার একটি শ্লোক পাঠ করে শোনালেন। তাঁর বিশুদ্ধ উচ্চারণ আর মধুর স্বর বিন্যাসে শেঠজী মুগ্ধ হয়ে গেলেন।—জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় থাকেন? পণ্ডিতজী বিনয়-নম্র কণ্ঠে বললেন—"কাশী থেকে আসছি।" এই বলে তিনি ধর্মের দশটি লক্ষণ কি তা বোঝালেন এবং সেগুলি এত সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা কোরলেন যে শেঠজী মুগ্ধ হোয়ে গিয়ে বললেন, "মহারাজ আমার বাড়ী গিয়ে সে স্থানটি পবিত্র করে দিন।"

কোনো স্বার্থপর ব্যক্তি হোলে তা সহজেই মেনে নিত—কিন্তু তিনি মনে করলেন

অন্যায় অসৎ উপায়ে কিছু নেব না, তাই শুধু বললেন—"না শেঠজী, আজ আর আমার সময় নেই।" শেঠজী বললেন আপনাকে আরো কত খাতির করতে হবে মহারাজ?" পণ্ডিতজী যখন কোনোমতেই রাজী হলেন না তখন শেঠজী উদাস হোয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি আপনাকে কীভাবে সেবা করতে পারি মহারাজ কিছু আদেশ করুন। আপনার কথা অল্প বিস্তর শুনে আমি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হোতে পারিনি—যখন আবার এদিকে আসবেন তখন দয়া করে অবশ্যই দর্শন দেবেন।" পণ্ডিতজী তা স্বীকার করলেও সেবার কথায় উত্তর দিলেন না। তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে এলো সঙ্কোচে। এই আদর আপ্যায়নের অন্তরালে তাঁর স্বার্থের কথা ভাবতে পারলেন না। শুধু তাঁর মনে হোল, কেউ স্বেচ্ছায় কিছু দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করছে আবার কেউ বা অন্য দৃষ্টিতে তাঁকে দেখছে। রুঢ়-শুষ্ক কণ্ঠের থেকে এই শ্রদ্ধা তাঁকেও মুগ্ধ করল। তিনি ধীরে ধীরে পথে নেমে এলেন—সামান্য সময়ের জন্য কী যেন চিন্তা করলেন—"এবার কোথায় যাব?" এদিকে শীতকাল বিলাসী ধনের মতো ক্রমশ সময়কে গুটিয়ে আনছে। তিনি নিজের ওপর নিজেই রাগান্বিত হোলেন। একটা দিন ছিল যেদিন ধনীরা ব্রাহ্মণকে পুজো কোরত—সেদিন তো আজ নেই। অতএব কিছু পাওয়ার আশা ত্যাগ করাই ভাল—যে কোনো মহাশয় ব্যক্তি এসে আমার হাতে টাকা তুলে দেবেন। তাঁর এই ব্যথা একমাত্র ঈশ্বরই বুঝেছিলেন বোধহয়। যা তিনিও বুঝতে পারেননি। লীলাধরজী ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন সুদূর প্রসারী দিশাহীন পথের দিকে। হঠাৎ শেঠজী পিছু ডাকলেন—"পণ্ডিতজী একটু দাঁড়ান।" পণ্ডিত দাঁড়ালেন আর ভাবলেন হয়তো আবার বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে আসছে। একটা টাকার নোট এনে যদি দিত আমার আজ কতো উপকার হোত। বাড়ী নিয়ে গিয়ে আমায় কি করবে কে জানে! মানুষের অন্তরের ব্যথা ঈশ্বর ছাড়া কেউ বোঝে না। বাস্তবিকই শেঠজী একটি গিনী বের কোরে পণ্ডিতজীর চরণে রেখে দিলেন—তখন তাঁর দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। খাঁটি ধার্মিক ব্যক্তি এখনো তাহলে পৃথিবীতে আছে—নইলে, এই বিশ্ব সংসার রসাতলে তলিয়ে যেত। তাঁর এই মুহূর্তে মনে হোল এখন যদি শেঠজীর কল্যাণার্থে এক সের রক্ত তাঁকে দিতে হোত তাহলে সানন্দে তিনি বোধহয় দিয়ে দিতেন। তিনি ভাবে গদগদ হোয়ে বললেন, "এর তো কোনো প্রয়োজন ছিল না শেঠজী।" আমি ভিক্ষুক নই, আমি আপনার সেবকমাত্র। শেঠজী শ্রদ্ধা-নম্র-বিনয়ী কণ্ঠে বললেন,—" ভগবান, আপনি এটি গ্রহণ করুন এটি ভিখারীর দান নয়, এটি আমার 'প্রণামী' জানবেন। আমি মানুষ চিনতে পারি। অনেক রকম সাধু-সন্ত-যোগী-ধার্মিক ব্যক্তিরা প্রায়ই আমার কাছে আসা যাওয়া করেন কিন্তু জানিনা কেন কারো প্রতি আমার শ্রদ্ধাভাব

জাগেনি। আপনাকে আজ আমার সাক্ষাৎ ভগবান বলে মনে হোল। তাই আপনার সঙ্কোচ দেখে মনে হোল, আপনার অর্থের প্রয়োজন। আপনি বিদ্বান-ধার্মিক ব্যক্তি বিশেষ—আজ কোনো সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়েছেন। আপনি এই সামান্য প্রণামীটুকু গ্রহণ করুণ।"

সাত

পণ্ডিতজী ধীর গতিতে এগিয়ে চললেন ঈশ্বরের করুণায় হৃদয় পরিপূর্ণ আজ তাঁর। অর্থের বিনিময়ে ওষুধ নিয়ে গৃহাভিমুখে এগিয়ে চললেন। হর্ষ-উল্লাস আর বিজয় তাঁর হৃদয়কে পূর্ণতায় ভরিয়ে দিয়েছে। হনুমান সঞ্জীবনী শেকড় এনেও বোধহয় এত প্রসন্ন হতে পারেননি। এ রকম সদানন্দময়-চিত্তের উপলব্ধি বোধ আজ তাঁর হৃদয়কে পবিত্র ভাবাপন্ন করে তুলেছে।

দিন শেষের আর অল্পই বাকি আছে। সূর্যদেব তার গতি পরিবর্তন করে পশ্চিমাকাশের দিকে যেন দৌড়চ্ছে—তাঁরও কি কোনো রোগীকে ওষুধ দিতে হবে! পণ্ডিতজী দ্রুতগতিতে দৌড়তে লাগলেন। সূর্যদেব পর্বতের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছেন। পণ্ডিতজী তখন আরো জোরে দৌড়তে লাগলেন। মনে হোল তিনি যেন সূর্যদেবকে ধরতে চাইছেন।

দেখতে দেখতে অন্ধকারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছেয়ে গেল, আকাশে দুটো একটা করে তারাও দেখা দিল। এখনো গন্তব্যস্থলে পৌছুতে মাইল দশেক বাকি। কালো মেঘ দেখে গৃহিণী যেমন দৌড়ে দৌড়ে শুকনো জামা কাপড় সামলাতে ছাদে গিয়ে দাঁড়ায়—পণ্ডিতজীও ক্ষীপ্রগতিতে দৌড়চ্ছেন। একা হলেও তাঁর চিত্ত আজ ভয়শূন্য। ভয় ছিল শুধু পথ হারিয়ে ফেলার। ডাইনে-বায়ে বস্তীগুলোকে পিছনে ফেলে রেখে তিনি ছুটে চলেছেন, যেন এ চলার শেষ নেই। এখন গ্রামের সৌন্দর্যে তাঁর চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে, প্রাণ ভরিয়ে দিচ্ছে। কিছু কিছু জায়গায় মানুষ শীতের আরাম উপভোগ কোরছে সামনে আগুন জ্বালিয়ে।

সহসা তিনি একটা কুকুর দেখতে পেলেন। জনহীন পথে কুকুরটা দেখে চমকে উঠলেন—কিন্তু দাঁড়াবার—ভাববার এতটুকু সময় নেই, শুধু ভাবলেন বৃদ্ধ চৌধুরীর কুকুরটা বোধহয়। সে এতদূর এলো কি করে! সেকি-সব জানে যে পণ্ডিতজী ওষুধ নিয়ে আসছেন—অচেনা জায়গা, পথভ্রষ্ট হোতে পারেন! কুকুরটার নাম ছিল মোতী—। পণ্ডিতজী একবার "মোতী" বলে ডাকলেন সে সানন্দে লেজ নাড়লো বটে, কিন্তু থামল না। পণ্ডিতজীর মনে হোল ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর সাথে রয়েছেন—ঈশ্বরই তাঁকে

রক্ষা করে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। রাত ১০টা বাজতে বাজতেই পণ্ডিতজী বাড়ী পৌঁছে গেলেন।

রোগটা মারাত্মক কিছু নয়। ওষুধ পেয়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনজন রোগী সুস্থ হয়ে উঠলো। পণ্ডিতজীর কীর্তিকথা দূর-দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। যমের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করে মৃত্যুর হাত থেকে তিনটি মানুষের প্রাণরক্ষা করেছেন। পণ্ডিতজী অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখালেন। সত্যিই তিনি সাক্ষাৎ দেবতা। তার দর্শন অভিলাষে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষের সমাগম হোতে লাগল। চৌধুরী বললেন, "মহারাজ আপনি স্বয়ং ভগবান। আপনি না থাকলে এই তিনটি প্রাণ কখনই রক্ষা পেত না। এবার আপনাকে কোথাও যেতে দেব না। বাড়ী গিয়ে ছেলেমেয়েদের এখানে নিয়ে আসুন।" পণ্ডিতজী বললেন—"হ্যাঁ, আমিও সেই কথাই ভাবছি। তোমাদের ছেড়ে আমিও আর কোনোদিন কোথাও যেতে পারবো না।"

আট

ওদিকে মোল্লারা শূণ্যমাঠ পেয়ে কাছাকাছি গ্রামগুলি বেঁধে ফেলেছিল। গ্রামের পর গ্রাম ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে সব হিন্দুরা। কিন্তু হিন্দু-সভা তাদের সকলকে টেনে নিল। কারো এতটুকু সাহস হোল না এ ব্যাপারে বাধা দেবার। দূর থেকে সকলে মুসলমানদের ওপর গোলাবারুদ নিক্ষেপ কোরতে লাগলো। এই হত্যার প্রতিশোধ কিভাবে নেওয়া যায় এটাই ছিল তাদের সমস্যা। তারা তাদের প্রধানকে বার বার পত্রের মাধ্যমে হত্যাকারীকে ধরবার প্রার্থনা জানাচ্ছিল—তার উত্তর ছিল—হত্যাকারীকে ধরা যাচ্ছে না। ওদিকে পণ্ডিতজীর অভিজ্ঞানের জন্য চাঁদা জমা করা হচ্ছিল।

কিন্তু এই নতুন আলোকে মোল্লারা নিষ্প্রভ হয়ে গেল। সেখানে এমন এক দেবতার আবির্ভাব হোল ভক্তের কল্যাণে—প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা ছিল না তাঁর। মুসলমানদের মধ্যে এই সিদ্ধিবিভূতি কোথায়? কোথায় এই মহিমা আজকের এই কীর্তির সামনে ভাতৃভাবাপন্ন মন নিয়ে কি দাঁড়াতে পারত? পণ্ডিতজী এখন আর নিজের ব্রাহ্মণত্বের—অহংকার করেন না। তাঁর কাছে সবাই সমান। তাদের বুকে টেনে নিতে তিনি ঘৃণাবোধ করেন না। নিজের ঘর অন্ধকার দেখেই তো তিনি ইসলামী প্রদীপের দিকে ঝুঁকেছিলেন। যখন নিজের ঘরে সূর্যের প্রকাশ দেখা দিল তখন অন্যের কাছে যাবার প্রয়োজন কি? সনাতন ধর্ম বিজয় প্রাপ্ত হোল। গ্রামে গ্রামে তৈরী হোল মন্দির। সকাল-সন্ধ্যা ঘণ্টা শঙ্খধ্বনিতে চারিদিকে পবিত্রতায় আলো জ্বলে উঠলো। মানুষ নিজেই আচার আচরণ সম্বন্ধে আত্ম-সচেতন হোল।

পণ্ডিতজী কারো ধর্ম সংস্কার করেননি বরং এ নাম নিতে তারা নিজেরাই লজ্জা পেত। এ রকম নির্মল পবিত্র আত্মার সংস্কার করতে গিয়ে তাঁকে অপমানিত করা কখনোই সম্ভব নয়।

এই মন্ত্র তিনি এক চণ্ডালের কাছেই শিখেছিলেন, সেই শক্তি প্রভাবেই তিনি স্বীয় ধর্ম রক্ষায় সাফল্য অর্জন করেছেন।

পণ্ডিতজী এখনো জীবিত আছেন—বিশ্বের এক কোণে সপরিবারে থাকেন। মানব-দেবতার সাধন-ভজনেই তাঁর সময় কেটে যায়।

ভাষান্তর : হীরা মজুমদার

সুধারস

ডাক্তার ঘোষের মত আজব লোক খুব কমই দেখা যায়। একবার তিনি নিজের চারজন সম্মানীয় তথা প্রতিষ্ঠিত বন্ধুকে তার ল্যাবোরেটরীতে আসার জন্যে ডেকে পাঠালেন। তাদের মধ্যে তিনজনের চুল-দাড়ি সব সাদা হয়ে গেছে, মোট কথা লালা করোড়ীমল, বাবু দয়ারাম ও ঠাকুর বিক্রমসিংহ বয়সের ভারে নুব্জ হয়ে পড়েছেন। আর একজন হচ্ছেন বিধবা মহিলা শ্রীমতী চঞ্চল কুমারী। তারও দেহের সর্বত্র বার্ধ্যক্যের ছাপ সুস্পষ্ট। এরা চারজনেই সব সময় কেমন যেন অন্যমনস্ক, মনমরা হয়েই থাকেন। মোটকথা জীবনটা তাদের কাছে নির্জীব পদার্থের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেলেও তারা কিন্তু এখনো বেঁচেই রয়েছেন।

লালা করোড়ীমল যৌবনে বেশ অর্থশালী বলেই ব্যবসায়ী মহলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু যথাসর্বস্ব সাট্টার পেছনে ঢেলে এখন বলতে গেলে ভদ্রভাবে ভিক্ষা বৃত্তিতেই কোনোরকমে বেঁচে আছেন। ঠাকুর বিক্রম সিংহ ছিলেন ভোগ-বিলাস-আনন্দের পূজারী, পৈতৃক সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজের নীরোগ দেহটাকেও ভোগ-লিপ্সার পায়ে অর্পণ করে নানারকম ব্যাধিকে আশ্রয় করে কোনোরকমে টিঁকে আছেন। দুঃখ কষ্টই এখন তার একমাত্র সঙ্গী। শোনা যায় বাবু দয়ারাম ওকালতি করতে করতে জাতীয় আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু কোনো কারণে বদনাম হওয়াতে এখন আর কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। দারুণ অভাবের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। আর শ্রীমতী চঞ্চল কুমারী, যার রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে অনেক পুরুষই তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। যৌবনের বেশীর ভাগ সময়ই তীর্থ-ভ্রমণ করে কাটিয়েছেন।

শহরের নামী-দামী লোকেরা, এমন কি তার আত্মীয়দের মধ্যেও কেউ কেউ সে জন্যে তাকে এড়িয়ে চলতেন। যাইহোক, তখন করোড়ীমল, দয়ারাম আর বিক্রমসিংহ— এই তিনজনেই শ্রীমতীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। এ নিয়ে তাদের তিনজনের মধ্যে শত্রুতা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে একে অন্যকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টাও করেছিল। যাক্ গে, ওসব পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। তাতে আরও দুঃখই বাড়বে।

ডাক্তার ঘোষ তাদের চারজনকে ইশারায় বসতে বলে বললেন—আচ্ছা, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে নানান রকমের গবেষণা করেই আমার সময় কেটে যায়। আজ সে রকমই একটা ছোট-খাট পরীক্ষার জন্যে আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করি। আশা করি আমাকে বিমুখ করবেন না।

সত্যি কথা বলতে কি, ডাক্তার ঘোষের এই ল্যাবোরেটরীকে ভুতুড়ে ঘর বললেও অত্যুক্তি হয় না। পুরোনো দিনের ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার ঘর, দিনের বেলাতেও আলো-জ্বালিয়ে যেতে হয়, তবু কেমন যেন গা ছম্‌ছম্ করে। মাকড়সার জালেই জানালার পর্দার কাজ হচ্ছে, সারাটা মেজেতে বেশ কয়েক বছরের ধূলো জমে আছে। দেয়াল-আলমারীতে সোনার জলে নাম লেখানো মোটা মোটা বাঁধানো বই সাজানো রয়েছে। মাঝখানের আলমারীতে একটা কাল-ভৈরবের মূর্তি। কিছু লোকের ধারণা বিপদে পড়লে ডাক্তারবাবু নাকি এই মূর্ত্তিটার সঙ্গে সলা-পরামর্শ করেন। ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার কোণে উঁচু হালকা ধরণের আর একটা আলমারীতে একটা নর-কঙ্কালের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। সেটার কাছাকাছি দুটো আলমারীর মাঝখানে একটা সেকেলে ধোয়াটে আয়না রাখা আছে, তার চারপাশের সোনালা ফ্রেম ময়লা হয়ে বিবর্ণ হয়ে কিছু কিছু জায়গা চটে গিয়েছে। অনেকে বলে ডাক্তার ঘোষের হাতে যে সব রুগী মারা গেছে, তাদের আত্মা নাকি সে আয়নাতেই থাকে, তিনি কখনো আয়নার দিকে তাকালেই সেই সব মৃত-আত্মাগুলো নাকি এক এক করে তার দিকে এগিয়ে আসে। উল্টো দিকের দেয়ালে এক মানুষ সমান লম্বা সুন্দরী মহিলার বাঁধানো ছবি টাঙ্গানো রয়েছে, কালের গতির প্রভাবে সে ছবিটাও নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে, মুখের কিছু কিছু অংশ ও পরনের কাপড়ের নানান রংয়ে ছোপ ছোপ পড়ে গেছে। বছর পঞ্চাশ আগে ডাক্তারবাবু এই সুন্দরীকে বিয়ে করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের দিনই খুব শরীর খারাপ করলে ডাক্তারবাবুর দেয়া ওষুধেই তার সব স্বপ্ন চিরতরে ঘুমিয়ে পড়ে। আরে, আসল রহস্যটাই তো এখনো বলা হয়নি! তা হচ্ছে চামড়ায় বাঁধানো ঐ মোটা বইটার কথা। বইটার নাম না জানলেও এটা যে একটা জাদু বই সেকথা সবাই জানে। একবার ডাক্তারবাবুর চাকর ধূলো ঝাড়বে বলে বইটা তুলেছিল। যেই না তোলা, অমনি

আলমারীতে রাখা কঙ্কালটা কেমন যেন নড়েচড়ে উঠলো। সুন্দরীর ছবিটাও এক-পা এগিয়ে এসে ওর দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে রইলো, যেন কাঁচটা ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে ওকে শেষ করে দেবে। শুধু তাই নয়, কালভৈরবের মূর্ত্তির রংটা পাল্টে গিয়ে তার মুখ থেকে 'থামা', 'থামা', 'বন্ধ কর', 'বন্ধ কর' আওয়াজ হচ্ছিল।

তাই ডাক্তার ঘোষের এই তলবে চারবন্ধু ভাবলেন, এবার হয়তো কাঁচের নলে ইঁদুরের মৃত্যু যন্ত্রণার তামাশা দেখতে হবে, নয়তো মাকড়সা কি করে জাল বোনে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে তা মন দিয়ে দেখতে হবে, অথবা কোনো আজগুবি গাল-গল্প শুনতেই তাদের ডাকা হয়েছে। কেননা এর আগেও কমপক্ষে বিশবার তাদের ডাক্তার ঘোষের খামখেয়ালীপনার শিকার হতে হয়েছে। তাই এসব গবেষণার ফল দেখতে তাদের আর কোনো উৎসাহ নেই, কিন্তু ডাক্তারবাবু তাদের কথার অপেক্ষা না করেই উঠে দাঁড়িয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সকলের চিরপরিচিত, সেই জাদুর বইটা নিয়ে এলেন। তার ভেতর থেকে অতি সন্তর্পণে একটা শুকনো মেটে রংয়ের গোলাপ বের করে আনলেন। ধরতে না ধরতেই পাপড়ীগুলো যেন গুড়ো হয়ে ঝুর্‌ঝুর করে পড়ে যাবে।

ডাক্তারবাবুর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসে বাতাসটাকে যেন ভারী করে দিল, তারপর আস্তে আস্তে বললেন—পঞ্চান্ন বছর আগেকার একটা টকটকে লাল, তরতাজা আধফোঁটা গোলাপের আজ এই পরিণতি। এই ছবিটা টাঙ্গানো রয়েছে দেখছেন, হ্যাঁ, আমার প্রিয়তমা এই গোলাপটা আমাদের বিয়ের দিন সকালে আমার হাতে দিয়ে বলেছিল, "বিকেলে এই ফুলটা পাঞ্জাবীর পকেটে লাগিয়ে এলে তবে কিন্তু আমাদের শুভদৃষ্টি হবে।" অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে এই ফুলটা সযত্নে রেখে দিয়েছি। আচ্ছা আপনারা কি বলেন, পঞ্চান্ন বছরের পুরোনো এই গোলাপটা কি ফের সতেজ হয়ে উঠতে পারে?

শ্রীমতী চঞ্চলকুমারী ঘাড় নেড়ে বলেন—সোনার পাথর বাটি কি কখনো হয় মিঃ ঘোষ, নাকি অমাবস্যায় চাঁদ দেখা যায়। কোনো বৃদ্ধা কি তার ন্যুব্জ দেহের বদলে যৌবনের সুগঠিত তনু ফিরে পেতে পারে। তা কি করে সম্ভব।

ডাক্তার ঘোষ—আচ্ছা দেখুন।

একথা বলেই তিনি টেবিলের ওপরে রাখা জালাটার ঢাকনা খুলে ফুলটাকে জালার জলে ফেলে দিলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত ফুলটা জলে ভাসতে লাগলো, কিন্তু তেমন কিছু পরিবর্তন ঘটলো না। পর মুহূর্তেই আশ্চর্যজনক চমক দেখা গেল। শুকনো চ্যাপটা পাপড়ীগুলো যেন একটু একটু করে নড়ছে, সেই সঙ্গে রংটাও আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠছে। প্রাণের স্পন্দন দেখে মনে হচ্ছে ফুলটা গভীর ঘুম থেকে জাগছে। পাতা

বোঁটাও সবুজ হয়ে গেছে, পঞ্চাশ বছরের পুরোনো ফুলটার টাটকা ভাব দেখে মনে হোল যেন সদ্য ফোটা ফুল গাছ থেকে তুলে আনা হয়েছে। মাঝখানের কিছু পাপড়ী এখনো গাঢ় ঘুমে একে অন্যকে জড়িয়ে আছে। তার ওপর দু' ফোঁটা শিশির চক্‌চক্‌ করছে।

ডাক্তার ঘোষের বন্ধুদের গলায় আশ্চর্যের সুর—ব্যাপারটা তো খুবই রহস্যজনক, কিন্তু কি করে তা সম্ভব হোল বলুন তো?

জাদুকরের অনেক রকম রোমাঞ্চকর খেলা, কেরামতি তারা দেখেছিলেন।

ডাক্তার ঘোষ—আপনারা 'জুল্মাত'-এর নাম কখনো শোনেন নি?

দয়ারাম—শুনিনি আবার! কিন্তু ওখানকার জল কি কেউ কখনো পেয়েছে?

ডাক্তার ঘোষ—চেষ্টা করেনি বলেই কেউ পায় নি। অনেক খোঁজ-খবর করতে জানা গেছে যে সেখানেই সুধারসের এক প্রস্রবণ রয়েছে। আর তার আশ পাশের কয়েক শতাব্দীর পুরোনো গাছগুলো এখনো সবুজ পাতায় ঢাকা। এ বিষয়ে আমার গবেষণা-প্রেম দেখে আমারই এক বন্ধু সেখান থেকে কিছু জল আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। সেই জল এই জালাতেই রেখে দিয়েছি।

ঠাকুর বিক্রম সিংহ কিন্তু কথাটা আদৌ বিশ্বাস করলেন না। তবু জিজ্ঞেস করলেন—তা মানছি, কিন্তু বলুন দেখি এ জল মানুষের জীবনটাকে পাল্টে দিতে পারে কিনা?

* জুল্মাতঃ—ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ, এই পথ ধরেই সেকেন্দার অমৃতকুণ্ডে গিয়েছিলেন।

ডাক্তার ঘোষ এক্ষুনি তা দেখতে পারেন। আপনারা সবাই মিলে এ-জল প্রাণ ভরে খান, দেখবেন যৌবন আপনি এসে ধরা দেবে। আমার যৌবনের লালসা নেই, কেননা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে তবেই শীর্ষে আসতে পেরেছি। আপনারা ইচ্ছে করলে এ জলের গুণ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

কথাগুলো বলেই ডাক্তার ঘোষ চারটে কাচের গ্লাস বের করে এনে তাতে জল ভরতে শুরু করলেন। জলে এমন কিছু জীবনদায়ী শক্তি নিশ্চয়ই ছিল, যার ফলে গ্লাসের ভেতর থেকে লাগাতার ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্‌ ওপরে উঠে এসে ফোয়ারার মত হয়ে জলে মিশে যাচ্ছিল। এছাড়াও একটা সুন্দর গন্ধও বের হচ্ছিল। এসব দেখে-শুনে জলের প্রভাব সম্বন্ধে কিছুটা বিশ্বাস যে তাদের হোল তা মানছি, তবে বুড়োরা এজলে চুমুক দিলেই হৃত যৌবন ফিরে পাবে এ কথা মানতে তারা রাজী নন। তবু একে একে এসে গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোয়ালেন।

ডাক্তার ঘোষ তাদের প্রবল ইচ্ছে দেখে একটু ভেবে-চিন্তে দেখতে বলে বললেন—

প্রিয় বন্ধুগণ, আজ আপনারা আমার সম্মানীয় অতিথি। আপনারা জীবনের প্রায় শেষ অঙ্কে এসে পৌঁছেছেন, তাই জল খাবার আগেই যা ভাববার ভেবে নেবেন, যাতে যৌবনের ভুত কাঁধে চেপে বসে আপনাদের সুন্দর জীবনটাকে বর্বাদ না করে দেয়, সংসার রঙ্গমঞ্চের এই অন্ধকার ঘাটীতে যাতে পাকা খেলোয়াড়ের মতই কাটাতে পারেন সেটাই আমার কাম্য। ভাবুন তো, এতদিন সংসারের দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকার পর নতুন ভাবে এসে চরিত্র রক্ষা করে নতুন পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে না পারেন তাহলে এর মতো লজ্জার আর কি-ই বা হতে পারে।

ডাক্তার বাবুর মুখে এ উপদেশ শুনে উপস্থিত সকলের চোখে একটা হালকা হাসির ঝলক দেখা গেল। ডাক্তার ঘোষ মুখে অবশ্য কিছুই বললেন না। মনে মনে তারও হাসি পাচ্ছে। এদের যৌবনের সেই ভুল-ভ্রান্তি জঘন্য উচ্ছৃঙ্খলতার কথা তিনি ভুলে যান নি। তাই আর একবার যৌবন ফিরে পেলে সেই ঘটনারই যে পুনরাবৃত্তি ঘটবে এ বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই।

ডাক্তার ঘোষ দয়ার্দ্র স্বরে বলেন—আপনারা নিশ্চিন্তে পান করুন। আপনাদের মতো বিশিষ্ট গুণীজন এই গবেষণার কাজে সাহায্য করবেন ভেবে যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে কি বলবো!

চারজনেই কাঁপা কাঁপা দুর্বল হাতে ধরা গ্লাসে চুমুক দিলেন। ডাক্তার ঘোষের কথা অনুসারে এই জলের যদি সত্যি সত্যিই প্রাণদায়ী শক্তি থাকে তাহলে পৃথিবীতে আর কারোর প্রয়োজন এদের চাইতেও বেশী থাকতে পারে বলে মনে হয়। তাদের মুখের হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন যৌবনকে দেখা দূরে থাক, যৌবনের নামই কখনও শোনেন নি। জরা জর্জরিত দেহে, হতাশা-দুঃখ-কষ্টকে সঙ্গী করেই পাকা চুল-দাড়ি নিয়েই এ পৃথিবীতে জন্মেছেন। ডাক্তার ঘোষের টেবিলের চারদিকে কেমন যেন নির্জীব হয়ে বসে আছেন। যৌবনকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তাদের চোখ-মুখের কোনো ভাবান্তর ঘটেনি। জল খেয়ে টেবিলের ওপর গ্লাস রেখে দিলেন।

কিন্তু পর-মুহূর্তেই তাদের শরীরে যেন বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে গেল। চোখে-মুখে তৃপ্তি আলো ফুটে উঠছে। গায়ের শুকনো ঢিলে চামড়া টান টান হয়ে জেল্লা দেখা দিয়েছে। গাল দুটোতে ভোরের লাল আভার চমক।

একে অন্যের মুখের দিকে সবাই অবাক হয়ে চেয়ে আছেন। নিষ্ঠুর বার্ধক্য এতকাল ধরে তাদের দেহে যে বলিরেখা এঁকে চলেছিল, চোখের পলকেই তা কোনো বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে উধাও হয়ে গেছে। চঞ্চল কুমারী তো মনে-প্রাণে যৌবনের উপস্থিতি অনুভব করে মাথার ঘোমটাটা আরও একটু বেশী করে সামনে টেনে দিলেন।

যৌবন-অভিলাষীরা সবাই খুশী হয়ে বললেন—আরও একগ্লাস সুধা-রস দিলে ভাল হয়। কাজ যে হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তবে এখনো মনে হয় একটু বাকী আছে, দেরী করার কী আছে? দিন, দিন, খেয়ে আমাদের তৃষ্ণা মেটাই?

ডাক্তার ঘোষ মনযোগ দিয়ে নিজের গবেষণার ফল নিরীক্ষণ করছিলেন, বললেন—সবুর করুন ভাই। বুড়ো হতে তো অনেকদিন লেগেছে, যৌবন ফিরে পেতে হলে ওনলি হাফ-য়্যান-আওয়ার আপনাদের ধৈর্য্য ধরতেই হবে। জল তো রয়েইছে, যত খুশী খান না। ডাক্তারবাবু আরেক প্রস্থ জলভর্তি গ্লাস তাদের হাতে তুলে দিলেন। জালায় এখনো এত জল আছে যে শহরশুদ্ধ সব বৃদ্ধরা খেয়ে তাদের নাতি-নাতনীদের তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবেন। গ্লাস থেকে বুঁদ বুঁদ উঠতে না উঠতেই তারা এক নিশ্বাসে খালি করে দিলেন। সত্যিই সুধারস। খেতে না খেতেই তাদের চেহারায় বিপ্লব দেখা দিল। চোখে যৌবনের তেজ, মাথার চুল সব কালো হয়ে গেছে। আরও দু-চার সেকেণ্ড কাটলো। টেবিলের চারিদিকে চার বুড়োর বদলে তিন সুপুরুষ যুবক আর এক কুসুম-কোমলাঙ্গী রূপবতী নারী বসে আছেন। ঠাকুর বিক্রম সিংহ চঞ্চল কুমারীর দিকে আড় চোখে চেয়ে বলেন—কিগো চঞ্চলা সুন্দরী, তোমার রূপযে একেবারে ফেটে পড়ছে, ছুঁয়ে দেখবো নাকি একটু!

রাতের ঘন অন্ধকার কেটে গিয়ে যেমন করে ভোরের আলো ফোটে, তেমনি করেই চঞ্চল কুমারীর দেহেও যৌবনের প্রকাশ ঘটেছে। এই ঠাকুর সাহেবকে তিনি কোনদিনই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন নি, তাই আজও তার কথায় না ভুলে ছুটে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে লাগলেন। ভয় হচ্ছিল, পাছে বার্ধক্যের সেই ঘৃনিত রূপটাই চোখে পড়ে। বাকী তিনজনের রকম-সকম দেখে অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন জলের গুণ সম্বন্ধে আর কোন দ্বিধা রইলো না। বার্ধক্যের ভুতটা যে ঘাড় থেকে গেছে সেই আনন্দেই তারা মত্ত। বাবু দয়ারাম দেশ-সেবা-মূলক কাজেই নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন, কিন্তু সে কাজের ভূত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। আজ আর একবার যৌবন ফিরে পেয়ে স্বদেশবাসীর দেশ ভক্তি উজ্জীবিত করতে জাতির মানবিক অধিকারের উদ্দেশ্যে আসন্ন বক্তৃতাটা যেটা আজ বিকেলেই দেবার কথা, সেটা আর একবার ঝালিয়ে নিচ্ছেন। কখনো আবার কোনো গোপন মামলার বিষয়ে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলছে, সে শব্দ তার নিজের কানেই যাচ্ছে কি-না সন্দেহ। পরক্ষণেই খোশামোদের সুর শুনে মনে হচ্ছে জজ-সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে বুঝি কিছু বলছেন। এদিকে ঠাকুর বিক্রমসিংহও একটা চলতি গানের সুর গুণ গুণ করতে করতে হাতের গ্লাসেই তাল দিতে শুরু করেছেন, চোখ কিন্তু রয়েছে রূপবতী চঞ্চল কুমারীর দিকেই। টেবিলের আরেক দিকে কড়োরীমল গালে হাত দিয়ে বসে

ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, হিসাব-পত্রের চিন্তায় মগ্ন, হিমালয় পর্বতের গা থেকে বরফের চাঁই কেটে এনে এখানে বিক্রী করলে লালে লাল হয়ে যেতাম। ওদিকে চঞ্চল কুমারীও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রূপ পরখ করছেন, মুখে স্মিত-হাসি। থেকে থেকেই আয়নার কাছে গিয়ে নিজেকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছেন অতীত বার্ধক্যে কোনো চিহ্নের অবশিষ্ট এখনো আছে কিনা। ভাবছেন—"যৌবনে তো আমি এর চেয়েও বেশী সুন্দরী ছিলাম"। তাই এবারের রূপে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হয়ে ঘোমটা সরিয়ে টেবিলের কাছাকাছি এসে বলেন—ডাক্তারবাবু, আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেবো! আর এক গ্লাস কিন্তু আমার চাই।

ডাক্তারবাবু হেসে বলেন—নিশ্চয়ই, এই তো, আপনাদের জন্যে রেডি করেই রেখেছি।

সুধারস ভর্তি গ্লাস টেবিলের ওপর রাখাই ছিল, আর তা থেকে মিহি জলের গুড়ো উঠে হীরের মত জ্বল জ্বল করছিল। অনেকক্ষণ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তাই ঘরটা যেন আরো বেশী রহস্যময় হয়ে উঠেছে। জালার ভেতর থেকে জ্যোৎস্নার মত মোলায়েম আলো বেরিয়ে ডাক্তারবাবু আর বন্ধুদের আর তার বন্ধুদের ওপর পড়েছে। তাতে ডাক্তার ঘোষের মুখের বলিরেখা-ভাজ পড়া কোচকানো চামড়া যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তিন গ্লাস খাবার পরই এই চার জনের মধ্যে যেন যৌবনের ঢেউ উপচে পড়ছে। আনন্দের আবেগে তারা যে কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না। নৈরাশ্যপূর্ণ যে বার্ধক্যের দুর্বিবহ ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, আজ তা দুঃস্বপ্নের মতোই মনে হচ্ছে। তাদের চোখে আজ সব জিনিসই সুন্দর নয়নাভিরাম, হবে না কেন! মনে যে রং লেগেছে, চোখে স্বপ্নের মায়া কাজল। চারজনেই সমস্বরে চীৎকার করে উঠল—হুর্‌রে আমরা আমাদের জোয়ান বয়সকে আবার ফিরে পেয়েছি! আজ থেকে আমরা ফের আনন্দ-সাগরে ভেসে বেড়াবো।

সত্যিই, তারা নিজেরাই নিজেদের দেহের এই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে আনন্দে পাগলের মতো কাণ্ডকারখানা করে যাচ্ছেন। প্রাক্তন জরা-গ্রস্থ শরীরের কথা ভেবে চোখ-মুখ কুঁচকে, দাঁত খিঁচিয়ে ব্যঙ্গ করছেন। তারপরই নিজেদের ছেঁড়া-ফাটা পোশাক-আশাকের দিকে নজর পড়তেই হো হো করে হেসে উঠলেন। একজন তো বাতের ব্যাথায় কাতর বুড়োরা কি করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেন তাই নকল করে দেখতে শুরু করলেন। আর একজন আবার নাকে চশমা এঁটে জাদুর বইটা টেনে নিয়ে এমন ভাব দেখাচ্ছেন, যেন খুব মনযোগ দিয়ে পড়ছেন। তৃতীয় জন তো ইজি-চেয়ারে আধশোয়া হয়ে ডাক্তার ঘোষকেই নকল করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তারপর

চারজনই তালি বাজিয়ে নাচ-গান, হৈ-হুল্লোর শুরু করে দিলেন। শ্রীমতী চঞ্চল কুমারীতো সুন্দরী নায়িকার মতো হাব-ভাব দেখিয়ে ডাক্তার ঘোষের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আধ ফোটা গোলাপের কুঁড়ির গন্ধ শুঁকে মত্ত ভ্রমরীর মতো বললেন—কিগো ডাক্তারবাবু, উঠে এসো না! আমার সঙ্গে একটু নাচবে না!

"চাঁদে আর বাঁদরে, কোথায় সুন্দরী চঞ্চল কুমারী, আর কোথায় বুড়ো ডাক্তার ঘোষ", চঞ্চল কুমারীর হাতে ডাক্তারবাবু আচ্ছা জব্দ হয়েছেন ভেবে চারজনেই হেসে গড়িয়ে পড়লেন।

ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—মাফ করো ভাই, এই বুড়ো বয়সে আমার আর নাচবার সখ নেই। এই তিন উঠতি যুবক তোমার সঙ্গে নাচবে বলে পা তুলেই আছে, নাচতে হয় ওদের সঙ্গে গিয়ে নাচো।

ঠাকুর সিংহ বললেন—চঞ্চল, তুমি শুধু আমার সঙ্গেই নাচবে প্যারী, আজকের রাতে শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ নয়।

দয়ারামবাবু বলে উঠলেন—উঁহু, তা তো হবে না! ও আমার সঙ্গেই নাচবে।

লালা করোড়ীমল চাইছেন—বাঃ! বাঃ! ও যে আমার পুরোনো সহেলী। পঞ্চাশ বছর আগে আমার সঙ্গে নাচবে বলে কথা দিয়েছিল।

একথা বলতে বলতে তিনজনেই তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। নতুন যৌবনের উন্মাদনায় একজন তো চঞ্চল কুমারীর হাত দুটো ধরে নিজের দিকে টানার চেষ্টা করছেন, আর একজন ওর কোমর জড়িয়ে ধরেছেন, অন্যজন আবার যুবতীর দীর্ঘ চুলের সুবাসে নিজের মত্ততাকে আরো বেশী বাড়িয়ে তুলছেন। লজ্জাবতী চঞ্চল কুমারীর পেটে খিদে, মুখে লাজ। 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' এমন ভাবে কখনো হাসছেন, কখনো আবার মুখ ঘুরিয়ে আঁচলটা মাথায় ভাল করে টেনে দিয়ে কৃত্রিম ক্রোধে ফেটে পড়ছে। তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গরম হাওয়া গায়ে এসে লাগতেই এই তিন প্রেমিকের নেশা আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেল। রূপসী তাদের প্রেম-পাশ থেকে মুক্তি পেতে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। এক মায়াবী প্রেমিকার সঙ্গ পেতে ওই তিন যুবকের মধ্যে হাতা-হাতি উপক্রম হোল। জানি-না এর আগে এ রকম দৃশ্য আর কেউ দেখেছেন কি-না। যাই হোক, পুরোনো আমলের আয়নাটায় কিন্তু আরেক দৃশ্য ফুটে উঠেছে। তিনজন জরাজীর্ণ, দৈন্যতার প্রতীক আধ পাগলা গোছের লোক এক থুরথুরী নথ-দন্তহীন, কোমর বেঁকে যাওয়া বুড়ীকে কাছে পেতে উঠে পড়ে লেগেছেন।

কিন্তু তারা নব-যৌবন ফিরে পেয়েছেন, মত্ত মধুকরের মতো মৌ-পিপাসু হওয়াই স্বাভাবিক। চঞ্চল কুমারীর ভাব-ভঙ্গিমা ওই তিন রোমিও ভীষণ রেগে গেছেন। কে আগে রূপসী প্রেমিকাকে আলিঙ্গন করবেন এই নিয়ে তাদের মধ্যে মারপিট হুল্লোড়

শুরু হয়ে গেল। ধস্তা-ধস্তি করতে করতে টেবিলে এসে ধাক্কা লাগতেই তা উল্টে গেল। কাঁচের জালাটা মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে সঞ্জীবনী সুধার সবটাই মাটিতে পড়ে গিয়ে বুদবুদের চমকে ঘরে আলো-আঁধারীর খেলা শুরু হোল। অবশ্য তা কয়েক মুহূর্ত, তারপরই সব শেষ। একটা আধমরা প্রজাপতি মাটিতে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। জলে ভিজে নেয়ে একসা হয়ে গেছে। তারপর ফরফর করে উড়ে গিয়ে ডাক্তার ঘোষের টুপীর ওপর বসলো। ডাক্তার বাবু বললেন—ব্যস্ ব্যস্ আর নয় বন্ধুরা, অনেক হয়েছে। চঞ্চলা দেবী, অনেকতো হোল, আর কেন? এসব ঝুট-ঝামেলা আমি একদম পছন্দ করি না।

চারজনে ক্লান্ত শরীরে চুপচাপ বসে পড়লেন। তাদের মনে হচ্ছে, বার্ধক্য যেন যৌবনের সাজানো সেই সবুজ উদ্যান থেকে আবার সেই আগের অন্ধকার গুহায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সকলেরই নজর ডাক্তার ঘোষের দিকে। তিনি ভাঙ্গা জালার তলা থেকে সেই পঞ্চাশ বছরের পুরোনো ফুলটাকে তুলে হাতে নিয়ে বসে আছেন। তার হাতের ইশারায় প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর চারজনেই নিজের নিজের জায়গায় বসলেন। যুবক হলেও, অহেতুক উন্মাদনা দেখিয়ে কাবু হয়ে পড়েছেন। ডাক্তার ঘোষ হাতে ধরা ফুলটার ওপর ভোরের অথবা সন্ধ্যার সৌন্দর্য দেখে বললেন—আফসোষ এটাই, ফুলটা আবার কেমন যেন মুসড়ে পড়েছে।

সত্যিই, ফুলটা একটু একটু করে নেতিয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা আগের মতো শুকনো-ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ডাক্তার ঘোষ খুব সাবধানে শুকনো ফুলটার পাঁপড়ী থেকে জলের ফোঁটাগুলো ফুঁ দিয়ে সরিয়ে নিজের শুকনো ঠোঁটে ছুঁইয়ে বললেন—এ ফুল আমার কাছে সব সময় তরতাজা, এখনো সেই গন্ধটা বুকের কাছে জমে আছে। এর মৃত্যু নেই।

ডাক্তার ঘোষের মুখের কথা শেষ না হতেই সেই প্রজাপতিটা তার টুপি থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

ডাক্তারবাবুর বন্ধুদের মুখগুলো কেমন যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। জানি-না অদৃষ্টের কোন নিষ্ঠুর পরিহাস তাদের চেহারা, হৃদয়কে দলে মুচড়ে নিমেষেই উধাও হয়ে গেছে। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছেন যে, প্রতি মুহূর্তেই তাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত যৌবনের গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে নিতে কে যেন গভীর ক্ষতের দাগ তৈরী করে দিচ্ছে। তারা ভুল দেখছেন না তো? আয়ু-সীমা এতো তাড়াতাড়ি কি করে পেরিয়ে এলাম?

চারজনেই আগের মতো জরাজীর্ণ দেহে তাদের পুরোনো বন্ধু ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে বসে আছেন। কিছুক্ষণ কারো মুখেও কোনো শব্দ নেই, তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে

গভীর হতাশায় বলে ওঠেন—আমরা এতো তাড়াতাড়ি কি করে আবার বুড়ো হয়ে গেলাম ?

হ্যাঁ, তাদের নেশার ঘোর কেটে গেছে। সুধারসের নেশা মদের চেয়েও বেশী প্রভাবশালী। এ থেকে উঠে আসা ভয়, মানুষকে আরো বেশী কমজোরি করে দিয়ে পঙ্গু করে ফেলে। বার্ধক্য তাদের মুখে পাত্র উজার করে সবটুকু কালি ঢেলে আগের চিহ্নগুলোকে আরো স্পষ্ট করে তুললো। চঞ্চল কুমারী দু-হাতে নিজের মুখ ঢাকলেন। তার হৃদয় জুড়ে এক পৈশাচিক নিস্তব্ধতা হাহাকার করে যাচ্ছে, রূপের সঙ্গে সঙ্গে এ জীবনটাও তো শেষ হয়ে যেতে পারতো। হয়তো শিক্ষার আর এক রূপ এখনো ঘেরাটোপের আড়ালে অপেক্ষা করে আছে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ডাক্তার ঘোষ মুখ খুললেন—আপনাদের শরীর থেকে প্রিয় যৌবন শেষ হয়ে গিয়ে আবার বরফঠাণ্ডা বার্ধক্য এসে মৃত্যুর হাতছানি দেবার তোড়জোড় করছে। দেখতেই পাচ্ছেন, জালাভর্তি সুধারসের সবটুকুই মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু সেজন্যে আমার এতটুকু দুঃখ হচ্ছে না। আজ যদি আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে সুধারসের নদী বয়ে যায়, আর তাতে চুমুক দিয়ে কিছুক্ষণের বদলে যদি কয়েক বছর ধরে সে নেশা কায়েম হয়ে থাকে তবুও তাতে চুমুক দেওয়া দূরে থাক্, ছুঁয়েও দেখবো না। আপনাদের দেখেই আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

ডাক্তার ঘোষের বন্ধুদের কিন্তু এসব নিষ্প্রাণ কথা ঠিক মনঃপূত হোল না। সকাল থেকে রাতে ঘুমতে যাবার আগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তারা যৌবনের নেশায় চুর হয়ে থাকতে চান, অনন্ত যৌবনকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে সুধারসের উৎসস্থলে যাবেন বলে মন স্থির করে ফেলেছেন।

সুজান ভগত

চাষাভুষো মানুষের হাতে টাকা পয়সা হলে যে ধর্মকর্ম করার দিকে ঝোঁকে। আলোকপ্রাপ্ত সমাজের মতন প্রথমেই নিজের ভোগবিলাসের পেছনে ছোটে না। সুজানের ক্ষেতে বছর কয়েক যাবৎ সোনা ফলছে। পরিশ্রম তো গাঁয়ের সব চাষীই করে, সুজানের যেন বেস্পতির দশা। ধুলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হয়। পরপর

তিনবছর নাগাড়ে আখ হল। ওদিকে গুড়ের দরও তেজীতে চলছে। কিছু না-হোক হাজার দু'আড়াই নগদ হাতে এসে গেল। আর দেখে কে। চিত্তবৃত্তি ধর্মমুখী হল। বাড়িতে দুবেলা সাধুসন্নিসির সেবা-সৎকার চলল। তার দোরে ধুনী জ্বলতে লাগল। এলাকার কানুনগো সফরে এলে সুজান মাহাতোর মণ্ডপে ডেরা বাঁধে। থানার বড়োবাবু, জমাদার, শিক্ষাবিভাগের অফিসার—কেউ না কেউ সবসময়েই সুজানের আটচালায় পড়ে থাকে। মাহাতোর আনন্দ আর ধরে না। ধন্য ভাগ্য হে সুজান মাহাতো। এখন বড়ো বড়ো হাকিম এসে তার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেন। যাঁদের সামনে তার মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোত না, এখন 'মাহাতো মাহাতো' করে তাঁদেরই গলা শুকিয়ে যাবার জো। মাঝে মাঝে বাড়িতে ভজন-সংকীর্তনও হচ্ছে আজকাল।

এক মহাপুরুষ দেখলেন ব্যাপার বেশ ভালোই। তিনি বেশ আসর জমিয়ে বসলেন। ঢোলক এল, খোল করতাল এল, সৎসঙ্গ হতে লাগল। সবই সুজানের সুসময়ের জলুস। ঘরে মনখানেক দুধ হয়, কিন্তু সুজানের নিজের গালে একফোঁটাও তলায় না, দিব্যি দেওয়া আছে। হয় হাকিমের পেটে যায়, নয় বৈরিগির পেটে। চাষায় আবার ঘি দুধ কবে খায়, শাকভাত হলেই হল। সুজান নম্রতা আর বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখায়। সবার সামনে মাথা হেঁট করেই রয়েছে। পাছে কেউ মনে ভাবে পয়সার গরম হয়েছে।

গ্রামে মোটে তিনটি কুয়ো। অনেক ক্ষেতে ভালোমতন জল যায় না। চাষ নষ্ট হয়। সুজান একটা পাকা ইঁদারা বানিয়ে দিল। ইঁদারার নান্দীমুখ হল, ব্রাহ্মণ-ভোজন হল। যেদিন প্রথম ইঁদারায় 'পুর' চলল, সুজানের যেন চতুর্বর্গ লাভ হল। যে কীর্তি গ্রামের কেউ রাখতে পারে নি, বাপ-পিতামোর পুণ্যফলে সুজান আজ সেই কীর্তি রাখল।

একদিন গ্রামে একদল গয়ার যাত্রী এল। সুজানের অতিথি-শালাতেই তাদের আহারাদি হল। গয়াধামের বাসনা সুজানের অনেকদিনকার। এই সুযোগে সেও যাবে বলে তৈরি হল।

বুলাকী, সুজানের বউ, বললে—এখন থাক না। আসছে বছর যাওয়া যাবে।

সুজান গম্ভীর স্বরে বললে—আসছে বছর কী হবে, তা কে বলতে পারে। ধর্মকর্মের ব্যাপারে খুঁতকাড়া ভালো লাগে না। পেরমাইয়ের ভরসাটা কী? আজ আছি কাল নেই।

বুলাকী—হাত যে একেবারে খালি হয়ে যাবে।

সুজান বলে—ভগবানের দয়া থাকলে আবার হাত ভরে যাবে। তাঁর কি কিছুর অভাব আছে রে ?

বুলাকী এ কথার কী জবাব দেবে। সৎকাজে বাধা দিয়ে সে কেন নিমিত্তের ভাগী হতে যায়। রাত পোহালে স্ত্রী-পুরুষে গয়া করতে বেরোল। তীর্থ সেরে যদি ফেরা হল তো আবার যজ্ঞি করতে হয়, জ্ঞাতিকুটুম খাওয়াতে হয়, বামুন-ভোজন—কাঙালী-ভোজন করাতে হয়। তাই হল। এগারোখানা গাঁয়ে, সুপুরি বিলানো হল, গাঁসুদ্ধ লোকের নেমন্তন্ন হল। মহা সমারোহে যজ্ঞি হল। ধুমধাম হল এমন যে চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। লোকে বলাবলি করতে লাগল—হ্যাঁ, ভগবান যদি ধন দেন তো সঙ্গে যেন এমন দরাজ দিলও দেন। এতটুকু দেমাক নেই। নিজে হাতে এঁটোপাতা কুড়োচ্ছে। বাঃ, বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে সুজান মাহাতো। কী সুপুত্তুর ছেলে। বাপ যখন মরে, তখন ঘরে কড়ার কুটো ছিল না। আর আজ যেন লক্ষ্মী হাঁটু ভেঙে বসেছে।

নিন্দুকেরও অভাব হয় না সংসারে। একজন বলে—দেখগে গুপ্তধন-টন পেয়েছে নিশ্চয়ই। শুনে আর সবাই তাকে এই মারে তো সেই মারে।—হ্যাঁ তোমার বাপদাদা ঘড়ায় ভরে মোহর পুঁতে রেখেছিল মাহাতোর পোতায়। আরে বাপু এ-সব ধর্মের দান। তুমিও তো হাড়ভাঙা খাটুনি খাটো, কই অমন আখের ফলন হয় না কেন ? ফলাও না দিকি অত ফসল। পার না কেন। ভগবান মানুষের মন দেখেন, বুঝলে। যে দুহাতে খরচ করতে জানে, ধন সে-ই পায়।

দুই

সুজান মাহাতো ভক্ত বৈরিগি হয়ে গেল। ভক্তদের আচার-বিচার অন্যদের থেকে আলাদা হয়ই। সে স্নান না করে কিছু খায় না। গঙ্গা যদি ভক্তর বাড়ির পাশে না হয়, নিত্যি স্নান করে ফিরতে গেলে যদি দুপুর গড়ায়, সেক্ষেত্রে রোজ না হোক অন্তত পুজো-পার্বণের তিথিতে ভক্তকে গঙ্গা নাইতে যেতেই হয়। বাড়িতে পুজো-আচ্চা, ভজন কীর্তন অপরিহার্য। তা ছাড়া খাওয়াদাওয়ারও অনেক বাছবিচার করতে হয়। সবচেয়ে বড়ো কথা অসত্যকে ত্যাগ করতে হয়। ভক্ত মিথ্যে কথা বলতে পারে না। সাধারণ মানুষ মিথ্যে কথা বললে তার যদি একটা শাস্তি হয়, ভক্ত মিথ্যে বললে তার এক লাখ শাস্তি। অজ্ঞান অবস্থায় বহু অপরাধ ক্ষমার্হ, জ্ঞানীর ক্ষমা নেই, প্রায়শ্চিত্ত নেই। থাকলেও তা বড়োই কঠিন। সুজানকেও এখন ভক্তের মর্যাদা রক্ষা করে চলতে হয়।

এতদিন তার জীবন ছিল মজুরের জীবন। সামনে কোনো আদর্শ বা নীতি বলতে কিছু ছিল না। এখন তার জীবনে বিচার ঢুকেছে, ধর্মের পথ কণ্টকাকীর্ণ। স্বার্থ-সেবাই আগে জীবনের লক্ষ্য ছিল, সেই নিরিখেই পরিবেশের বিচার করত। ইদানীং ঔচিত্যের কাঁটায় সব-কিছুর পরিমাপ করে। এক কথায় সুজন এখন জড়জগতের গণ্ডী পেরিয়ে চেতন জগতে পা রেখেছে! অল্পবিস্তর লেনদেনের কারবার ধরেছিল। কিন্তু আজকাল সুদ নিতে গেলে আত্মগ্লানিতে ভোগে। বেশি কি, আজকাল গাই দুইতে গেলে বাছুরের কথাটা আগে খেয়াল হয়, বাছুরটা না খেয়ে থাকবে না, তো। তারা কষ্ট পাবে, আহা ও হল গাঁয়ের মোড়ল, মুখিয়া। কতবার কত মকদ্দমায় সাক্ষী সাজিয়েছে, জরিমানা আদায় করে কত মামলার মনগড়া মীমাংসা করেছে, নিষ্পত্তির ছলে কত মামলার দফারফা করে ছেড়েছে। এখন ও-সব ব্যাপারে যেতে ঘেন্না করে। মিছে কথা, ছল চাতুরী থেকে যোজন খানেক দূরে পালিয়ে থাকে। আগে, আগে মজুরীর পয়সা কতটা কম ঠকিয়ে, জনমজুরদের কতটা দেঁড়েমুষে খাটিয়ে, কত বেশি কাজ আদায় করে নেওয়া যায়, সেই ফিকিরে থাকত। এখন হয়েছে উলটো চিন্তা। যেটুকু কাজ না নিলে নয়, তাই নাও। যতটা পার পারিশ্রমিক দাও। আহা, বেচারার আত্মাকে দুঃখ দিয়ো না। এখন ওর কথার মাত্রা দাঁড়িয়ে গেছে—দেখো যেন কারুর আত্মা কষ্ট না পায়। দুই জোয়ান ছেলে, তারা এখন কথায় কথায় বাপের খুঁত ধরে। এমন কি, বুলাকীও আজকাল ওকে পাঁড় বৈরিগি, গোঁড়া ভক্ত বলে ভাবে, ভাবে সংসারের ভালো-মন্দর ওর কিছু যায় আসে না। চেতন জগতে পা দিয়ে ভক্ত-সুজান উদাসী বৈরিগি হয়ে রইল।

দিনে দিনে সুজানের হাত থেকে কর্তৃত্বের লাগাম খসে যায়। কোন্ ক্ষেতে কী বোনা হবে, কাকে কী দেওয়া হবে, কার কাছে নেওয়া হবে, এমনি ধারার দরকারি কথাবার্তায় আজকাল কেউ আর ভগতজীর পরামর্শ নিতে আসে না। ভগতের কাছে কেউ বড়ো একটা যেতেই পায় না। হয় ছেলেরা কেউ, নয় স্বয়ং বুলাকীই মামলার ফয়সালা করে দেয়। সারা গ্রামে সুজানের মান-সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর নিজের ঘরে কমছে। ছেলেরা আজকাল ওকে বেশি ক'রে খাতির করে। সুজান নিজের হাতে চারপাই তুলছে দেখে, তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে হাত থেকে কেড়ে নিয়ে চারপাই তুলে দেয়। তামাকটাও নিজে সেজে খেতে দেয় না, ছেলেরা কল্কে ধরিয়ে এনে দেয়। পারলে বাপের পরনের কাপড়টাও কেচে দেয়। সে-সব দিক দিয়ে ঠিক আছে। কিন্তু কর্তৃত্ব গেছে, ক্ষমতা আর ওর হাতে নয়। এখন ওকে আর এ বাড়ির কর্তা, গৃহস্বামী বলা চলে না। ও এখন একেবারে মন্দিরের ঠাকুর হয়ে গেছে।

তিন

সেদিন যখন বুলাকী হামানদিস্তায় ডাল কুটছে, একটা ভিখিরি এসে সদর দোরে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল। বুলাকী ভাবল ডালটা কুটে নিই, তারপর ভিক্ষে দেব। ইতিমধ্যে বড়ো ছেলে ভোলা এসে বলল—ও মা, ওদিকে এক মহাত্মা দরজায় দাঁড়িয়ে গলা ফাটাচ্ছেন যে। কিছু দাও, নইলে আবার তাঁর আত্মা কষ্ট পাবেন।

বুলাকী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলে—কেন বৈরিগি ঠাকুরের কী হয়েছে, পায়ে আলতা পরেছেন? দুমুঠো নিয়ে গিয়ে দিতে পারছেন না? আমার কি চারটে হাত গজাবে। আর কতজনার আত্মা সুখী করে বেড়াব। চোপর দিনই দানছত্তর খোলা রয়েছে।

ভোলা—বোলো না আর। সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেবার ধান্দা ধরেছেন। মহঙ্গু ফসলের উশুলী দিতে এসেছিল। হিসেবে হয় সাত মন। ওজন দেখি পৌনে সাত মন। তা বললুম—আরো দশসের নিয়ে আয়। তা উনি ওমনি ফোড়ন কাটলেন—এখন আবার অতদূরে যাবে? হিসেব পুরো শোধ বলে লিখে দাও, নইলে ওর আঁতে ঘা লাগবে। শোধ হল না আমি কেন লিখতে যাবো বলো তো, আমি লিখি নি—দশসের বাকি লিখে রেখেছি।

বুলাকী—বেশ করেছিস। সব তাইতে বাড়াবাড়ি। দিন কতক ওই রকম থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিলেই, আপ্‌সে ফোড়ন কাটা বন্ধ হয়ে যাবে।

ভোলা—দিনভর বসে খুঁত ধরে বেড়াচ্ছেন। একশোবার বলে দিয়েছি, ঘর-গেরস্থালির কথায় তোমার থাকার দরকার নেই, তা কে কার কথা শোনে।

বুলাকী—তখন যদি জানতুম এই হাল হবে, তা হলে কক্ষনো মন্তর নিতে দিতুম না।

ভোলা—ভক্ত হয়ে দেখছি দুনিয়ার বার হয়ে গেছে। সারাদিন পুজোপাঠেই চলে যাচ্ছে! এখনো এত বুড়ো হয় নি যে কোনো কাজ করতে পারবে না।

এবার বুলাকী আপত্তি জানাল—না ভোলা, এ তোমার কুতক্ক। কোদাল কুড়ুল চালানোর আর বয়েস নেই, তা বলে বসে তো আর থাকে না। গোয়ালে জাব্‌না মাখা, গাই দোওয়া, যা গতরে কুলোয় করে বৈকি।

ভিখিরি সমানে চেঁচিয়ে চলেছে। সুজান দেখল কেউ কিছু দিচ্ছে না, তখন উঠে অন্দরে গিয়ে কড়া গলায় বলল—একটা মানুষ সেই এক ঘণ্টা থেকে দোরে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইছে, কেউ শুনতেই পাচ্ছ না নাকি। নিজের কাজ তো চব্বিশ ঘণ্টাই করছ, ভগবানের কাজও একবার নাহয় করলে।

বুলাকী—সেজন্যে তো তুমিই রয়েছ। গুষ্টিসুদ্ধ সবাইকেই কি ভগবানের কাজ করতে হবে নাকি।

সুজান—কোথায় আছে বলো, আমিই বের করে নিয়ে দিয়ে আসছি। তুমি রাজরানী সেজে বসে থাকো।

বুলাকী—আটা জালাভরা রয়েছে, বসে বসে কাঁদছে। যাও দো-হাত ভরে দিয়ে এসো। যত রাজ্যের পোড়া কপালের জন্য রাত থাকতে উঠে জাতা ঘোরাতে আমার বয়ে গেছে।

সুজান ভাড়ার ঘরে গিয়ে একটা ছোটো চুবড়ি ভর্তি করে যব নিয়ে আসে। তা সেরখানেকের কম তো নয়ই।

অমন ঝুড়ি ভরে কেউ ভিক্ষে দেয় না। তবু ইচ্ছে করেই, বউকে ছেলেকে চটাবার জন্যই ঐ ভাবে আনে। আবার চুবড়িটাকে দু'আঙুলে চিমটি কেটে ধরে আনছে, দেখাতে চাইছে যে মোটেই বেশি ওজন নয়—ওর মন উঠছে না। কিন্তু রীতিমত ভারী বোঝা দু'আঙুলে সামলানো যায় না। হাত কাঁপছে। বেশি দেরি করলে পাছে হাত ফসকে পড়ে যায়, তাই জোর পায়ে বাইরে বেরোতে যাবে—হঠাৎ ভোলা দৌড়ে এসে ওর হাত থেকে চুবড়ি কেড়ে নিল। রুক্ষ মেজাজে বলে উঠল—হাড় মাস কালি করে খাটতে হয়, তবে দানা ঘরে ওঠে।

সুজান খিঁচিয়ে ওঠে—খাটিস তোরাই, আমি বসে খাই না?

ভোলা—ভিক্ষে, ভিক্ষের মতন দিতে হয়। এ তো লুটের মাল নয়। আমরা একবেলা খেয়ে থাকি, যে না হাড়িতে দুটো দানা মজুত থাকুক, ও মশায়, এদিকে দানছত্তর খোলার ধান্ধা। তোমার কী? সংসারে কী এল গেল তার ধার ধারো?

সুজান এ কথার কোনো জবাব দিল না। বাইরে গিয়ে ভিখিরিকে বললে—বাবা এখন যাও, কারুর হাত খালি নেই। তারপর গাছতলায় বসে ভাবতে বসল। নিজের ঘরসংসারে আজ ওর এই হেনস্তা। তাও এখনো অপারগ হয় নি। গতর পড়ে যায় নি। বাড়ির এটা-ওটা কাজ নিয়ে লেগেই থাকে, তাই এই। নিজের হাতে গড়া সংসার। রক্ত-জল-করা ঐশ্বর্য। আর আজ তারই কোনো অধিকার নেই। কুকুরের মতন দোরে পড়ে থাকবে, গেরস্তর দয়া হলে যা দু'মুঠো ছুঁড়ে দেবে, তাই খেয়ে বাঁচবে। এমন জীবনে ধিক! সুজান এমন সংসারে থাকতে চায় না!

সন্ধ্যে হয়ে এল, ছোটো ছেলে শংকর ডাব এনে হাতে দিল। সুজান ডাবটা দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে দিল। কল্কের তামাক পুড়ে ছাই হয়ে গেল। খানিক পরে ভোলা উঠোনে চারপাই পেতে দিলে। সুজান গাছতলা থেকে উঠল না।

আরো খানিক পরে রান্না হয়ে গেলে ভোলা ডাকতে এল। সুজান বললে—আমার

ক্ষিদে নেই। অনেক পেড়াপীড়ি সত্ত্বেও উঠল না। তখন বুলাকী নিজে এল। বললে, খাবে না কেন? শরীর ভালো আছে তো।

সুজানের সব থেকে বেশি রাগ বুলাকীর ওপর। চোখের ওপর ছেলে বাপকে অপমান করছে, বসে বসে দেখলো। মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোল না যে—নিয়ে যাচ্ছে নিয়ে যেতে দে। ভেতরে ভেতরে ছেলেদের সঙ্গে সাট। ছেলেরা না-হয় ছোটো ছিল, জানেনা কী কষ্ট করে সুজান সংসারের ছিরি ফিরিয়েছে, তোর চোখ কোথায় ছিল, তুই জানিস্ না। দিনকে দিন, রাতকে রাত বলে ভাবে নি। ভাদ্দর মাসের আঁধার রাত্তিরে টঙে বসে জোয়ারের ক্ষেত পাহারা দিয়েছে। বোশেখ-জষ্ঠি মাসের দুপুররোদে দম নেবার ফুরসত পায় নি। আর আজ তার এই ফল যে ভিখিরিকে নিজে হাতে দু'মুঠো ভিক্ষে দেবার অধিকার নেই। আমি ঝুড়ি ভরে ভিক্ষে দেব তাতে কার কী বলবার আছে। আমার ঘরবাড়ি, আমার খুশি হলে আগুন ধরিয়ে দেব। আইনত ওতে আমার পাওনাগণ্ডা রয়েছে। তা আমি নিজের ভাগটা না খেয়ে বিলিয়ে দেব, তাতে কার বাবার কী ক্ষতি হচ্ছে। এখন এসেছেন সাধতে। আমি মানুষ তাই বউকে কখনো ফুলের পাপড়ি ছুঁড়েও মারি নি। নইলে কই, বলুক তো কেউ বুকে হাত রেখে, দেশ-গাঁয় কটা বউ আছে, যে সোয়ামীর লাথি খায় নি। কখনো কড়া চোখে তাকাই নি। টাকাপয়সা, নেওয়া-থোওয়া, সংসারের সব-কিছুই তো ওর হাতে ছেড়ে দিয়েছি। ও এখন বুঝি জমার কড়ি মুঠোয় এসে গেছে, তাই দেমাকে বাঁচেন না—আমার ওপরেই দেমাক দেখান। এখন আর আমি শালা কে। অকম্মা, ঘরজ্বালানো। এখন সব-কিছুই ছেলেরা। এখন আমার ধার ধারবে কেন। যখন ছেলেরা ছিল না, রোগে পড়েছিল, তখন যে কোলে করে কবরেজ বাড়ি নিয়ে যেতুম আসতুম—সেদিনের কথা এখন মনে রাখার দরকার কী! এখন বেটারাই জীবনসর্বস্ব। আমি তো বাইরের লোক। সংসারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী। বললে—আমার আবার এখন খাওয়া পরার দরকার কী। হাল জুড়ি না, কোদাল কোপাই না। আমাকে খাইয়ে খামোকে ভাঁড়ার খরচ করবে কেন। রেখে দাও, দুটো বেশি থাকলে, তোমার ছেলেদের আর-এক সাঁঝ হবে।

বুলাকী—তুমি বড়ো সামান্য কথায় চটে যাও বাপু। বুড়ো হলে ভীমরতি হয় কি সাধে বলে। ভোলা কী এমন বলেছে, অতগুলো ভিক্ষে দিয়ো না এই তো, না আর-কিছু?

সুজান—হ্যাঁ হ্যাঁ, কী আর এমন বলেছো। কথা খরচা না করে ঘা-কতক দিলেই বোধহয় তোমার আশা মিটত। হ্যাঁ। তা সাধ আর বাকি থাকে কেন, পুরো করে নাও। ভোলা বোধহয় এতক্ষণে খেয়ে উঠেছে, যাও ডেকে আনোগে। আর নইলে, নিজেই দাও-না দু-চার ঘা বসিয়ে।

বুলাকী—হ্যাঁ তা আর বলবে না? বলবে বই-কি। সোয়ামী হয়ে ধর্মশিক্ষে দিচ্ছ। মুখের তো রাখঢাক নেই। পেয়েছিলে আমার মতন সাদাসিধে মেয়েমানুষ তাই তরে গেল। পড়তে তেমন মুখফোড় মেয়েছেলের পাল্লায়, তো বুঝতে। তোমার ঘর করে কার সাধ্যি। হেঁসেলে আর চুলো জ্বলত না।

সুজান—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো বলছি গো। তুমি কি আর যে সে মেয়েমানুষ, তুমি হলে ঠাকরুণ। ছিলেও তাই, আছও তাই। আর আমি তখনও ছিলুম রাক্ষস, আর এখন তো ভূতপ্রেত হয়েছি। রোজগেরে সোমত্ত ছেলেরা, তাদের টেনে কথা বলবে না তো কি আমার হয়ে বলবে? আমার আর কী আছে।

বুলাকী—আমি যত চেষ্টা করছি যাতে কথা না বাড়ে—তুমি তত ঝগড়ার ছুতো খুঁজছ, যাতে পাড়ার লোক হাসাতে পার। এখন ওঠো, ভালোয় ভালোয় খেয়ে নেবে চলো। নয়তো আমিও গিয়ে শুয়ে পড়ব।

সুজান—বাঃ তুমি কেন না খেয়ে থাকবে। তোমার ছেলেদের রোজগারে খাচ্ছ। আমি বাইরের লোক, আমার কথা আলাদা।

বুলাকি—ছেলে তো তোমারও রয়েছে।

সুজান—না, না, আমার ছেলে নয়। আর কারো হবে। ওরা যদি আমারই ছেলে হবে, তবে আমার এ দুর্গতি?

বুলাকি—দেখো, আমার কাছে এসব উল্টোপাল্টা কথা বলে পার পাবে না। শুনতে পাই, তারা সব বুঝদার ছেলে, তুমিই নাকি খামোকা চীৎকার চেঁচামেচি করে তাদের সঙ্গে ঝামেলা করো? যখন যেমন, তখন সে রকম পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলাই তো বুদ্ধিমানের কাজ হে। আমরা বুড়ো হয়েছি, একটু একটু করে সংসারের দায়-দায়িত্ব সব ছেলেদের কাধে ছেড়ে দেওয়াই উচিৎ, ওরা যা ভাল বুঝবে করবে। ওরা তো এখন বড়ো হয়েছে, না-কি? আমরা এখন নামে মাত্র কর্তা, আমি তো তাই বুঝি বাপু, এ সামান্য ব্যাপারটা তোমার মাথায় যে এখনো কেন ঢোকেনি বুঝি না? যারা কামাই করবে, ঘরে তাদেরই রাজত্ব। আরে ভাই, এটাই তো দুনিয়ার নিয়ম, এটা কেন বোঝ না। ছেলেদের জিজ্ঞেস না করে আমি তো একটা কুটোও নাড়ি না, তুমি তো যা দেখছি সে সবের ধারই ধারো না। এ্যদ্দিন তো রাজত্ব করলে, এখনো মায়া কাটেনি? খাও-দাও, আর ঠাকুরের নাম করো, ব্যস, তা নয়! যাগ্‌গে ওসব কথা, চলো, খাবে চলো।

সুজান—তুমি বলতে চাও, এখন আমি দোরে কুকুরের মতো দুটো খাবার আশায় ধন্না দিয়ে পড়ে থাকবো, না?

বুলাকি—আমার কথা আমি বলেছি। শোনো ভাল, নয়তো যা খুশি করো।

সুজান তখনো উঠলো না, অগত্যা বুলাকি চলেই গেল।

চার

সুজানের সামনে এখন আরেকটা নতুন সমস্যা দেখা দিল। এতদিন সে সংসারের সর্বময় কর্তা ছিল, এখনো তাই মনে করে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে সেটা সে কিছুতেই মানতে চায় না। ছেলেরা যে তাকে এতো সেবা-যত্ন, শ্রদ্ধা করে, এসবই তার কাছে অসহ্য লাগে। তারা যে বাপের সামনে তামাক খায় না, খাটে বসে না পর্যন্ত, এসব কি যথার্থ গৃহস্বামীর প্রতি কর্তব্য নয়? কিন্তু সুজানের কাছে এই শ্রদ্ধা-সম্মানের কোনো দাম নেই। এসব দিয়ে কি সে তার পুরোনো কর্তৃত্ব ফিরে পাবে? না, অধিকার সে কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজি নয়! কিছুতেই না! এতদিন যে সংসারে পরাক্রান্তশালী সম্রাটের মতো রাজত্ব করে এসেছে, সেই নিজের ঘরে পরাধীন হয়ে কিছুতেই থাকতে পারবে না। শ্রদ্ধার চাহিদা বা সেবার বুভুক্ষা তার নেই, অধিকারই তার একমাত্র কাম্য। তারই নিজে হাতে গড়া সংসারে আজ অন্যের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে? না, এ কিছুতেই সম্ভব নয়, তার অবর্তমানে যা কিছু হোক সে দেখতে আসবে না, কিন্তু সে বেঁচে থাকতে এ ঘরে আর কেউ কর্তা হবে, এ চলবে না। মন্দিরের পূজারী হয়ে থাকার বাসনা তার নেই।

কে জানে, এখনো কত রাত বাকী। সুজান উঠে হেলে বলদগুলোর জন্যে খড় কুচোতে লেগে গেল। সারা গাঁ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, কিন্তু তার চোখে ঘুম নেই। আজকের মতো পরিশ্রম জীবনে আর কোনোদিনও করেছে কিনা সন্দেহ। যেদিন থেকে সংসারের দায়-দায়িত্ব সব ছেলেদের হাতে তুলে দিয়েছে, সেদিন থেকে রোজ বলদগুলোকে জাবনা দেবার সময় কুচো-খড় কম পড়তো, এ ওর ঘাড়ে দোষ চাপিয়েই খালাস। শঙ্কর, ভোলা সবাই তো একাজটা করছে, কিন্তু তবু নেই, নেই লেগেই আছে। হতচ্ছাড়াগুলোকে আজ দেখিয়ে দিতে হবে, খড় কি করে কাটতে হয়। তার সামনে কুচো খড়ের পাহাড় হয়ে গেছে। যেমনি ছোট তেমনি মিহি, বলদগুলোর চিবোতে কোনো কষ্ট হবে না। দেখে মনে হচ্ছে যেন কলে কাটা হয়েছে।

বুলাকিও বেশ অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে উঠেছে। বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই কাটা খড়ের স্তূপ দেখে তো অবাক। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই আপন মনে গজরাতে থাকে—ভোলাটা কি সারা রাত ধরে শুধু এই কম্মই করে গেচে? বুঝতে পারচি, রাতভর জেগেই ছিল। কতদিন বলেচি, ওরে বাবা, যা করবি রয়ে সয়ে কর, তা নয় যা মাথায় আসচে তাই করচে, একটা অসুখ-বিসুখ বাধিয়ে বসলে তখন কি হবে?

সুজান ভগতও ঝাঁঝালো স্বরে বলে ওঠে—তাই তো, ও আর ঘুমোয় কখন? যখন দেখি, শুধু কাজ আর কাজ, নাওয়া-খাওয়ার সময়টুকুও পায় না। দুনিয়ায় আর কেউ কি ওর মতো খাটা-খাটুনি করে?

এরই মধ্যে ভোলাও চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরে বেরিয়ে এলো। মায়ের মতো সেও কাটা খড়ের পাহাড় দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে—আজ শঙ্করা অনেক রাত থাকতে উঠেছে তাই না মা?

বুলাকি—তবেই হয়েছে, সে তো এখনো পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। আমি ভাবলুম তুই বুঝি কেটিচিস।

ভোলা—তুমি তো জান, ভোরে আমি কোনো দিনই উঠতে পারিনে। দিনভর যতখুশি কাজ দাও করে দোব, কিন্তু রাত্তিরে না ঘুমুলে আর দেখতে হবে না।

বুলাকি—তবে কি তোর বাবাই এ কম্ম করেচে?

ভোলা—আমারও তো তাই মনে হচ্ছে। রাত্তিরে ঘুমোয় নি। কাল আমারই ভুল হয়ে গেছে। আরে! ঐ দ্যাখো মা, বাবা হাল নিয়ে মাঠে চললো। বেঘোরে প্রাণটা দেবে বলেই ঠিক করেছে কি-না কে জানে?

বুলাকি—সব সময়ই তো মাথা গরম করে বসে আছে, কারুর কথা শুনলে তবে তো।

ভোলা—তুমি শঙ্করটাকে তুলে দাও, আমি মুখ-হাত ধুয়ে নিয়েই মাঠে যাচ্ছি।

আর সব কিষাণদের সঙ্গে ভোলাও হাল নিয়ে মাঠে গিয়ে হাজির হোল, ততক্ষণে সুজানের অর্দ্ধেক জমি জোতা হয়ে গিয়েছে। ভোলাও চুপচাপ নিজের কাজে হাত লাগালো, সুজানকে যে কিছু বলবে সে সাহসটুকু পর্যন্ত তার লোপ পেয়েছে।

দুপুর হয়ে যেতে হাল ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, কেউ বা স্নান-খাওয়া সারতে বাড়ী গিয়েছে। সুজান ভগত কিন্তু তখনো নিজের কাজ করে যাচ্ছে। এ হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ভোলাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বার বার বলদগুলোকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছে হলেও বাবার ভয়ে কিছুতেই মুখ খুলতে পারছে না। সেই সঙ্গে এটা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে যে তার বাবা এখনো কি করে এ হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খেটে যাচ্ছে।

পরে আর থাকতে না পেরে ভয়ে ভয়ে বলে—বাবা, অনেকক্ষণ দুপুর হয়ে গেছে। হাল খুলে দোব কি?

সুজান—দে, খুলে দে। আর শোন্, তুই বলদগুলোকে নিয়ে বাড়ী চলে যা আমি সারটা ছড়িয়ে দিয়েই যাচ্ছি।

ভোলা—এখন থাক না, আমি সন্ধ্যেবেলা ছড়াবোখন।

সুজান—যা বলছি করতো। খেতটা যে পানা হয়ে গেছে সে খেয়াল আচে? তকন তো মধ্যে মধ্যে জল জমে যাবে। আগে এই জমিতে ফসল হোত বিঘেতে বিশ মণ করে। তোরা এসে এর সর্বোনাশ করে ছেড়িচিস।

ভোলা বলদগুলোকে নিয়ে বাড়ী চলে এলো, সুজান খেতে সার ছড়িয়ে আরও

আধঘণ্টা পরে ফিরলো। কিন্তু ক্লান্তির নাম-গন্ধও নেই। নাওয়া-খাওয়া সেরে কোথায় একটু শোবে, তা নয়, বলদগুলোর গা বুলোতে বসলো। ওগুলোর পিঠে-পায়ে রগড়ে দিচ্ছে, লেজ থেকে এটুলি বেছে দিচ্ছে। ওরাও সুজানের কোলে মাথা রেখে এক অনির্বচনীয় সুখ ভোগ করছিল। আজ অনেকদিন পর সেই পুরোনো দিনের আনন্দকে ফিরে পেয়ে কৃতজ্ঞতায় তাদের চোখে জল চিক্‌চিক্ করছে। যেন বলতে চাইছে, তুমি রাত-দিন খাটালেও আমরা রাজি আছি।

অন্য চাষীদের মতো ভোলা তখনও গড়াগড়ি খাচ্ছে, কিন্তু সুজান ফের হাল নিয়ে মাঠে চললো। বলদ দুটো যেন পক্ষীরাজের মতো ডানা মেলে আগে আগে এগিয়ে যাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে ঠিক সময় মতো ক্ষেতে যাবার তাড়াটা তাদেরই বেশী। ভোলা শুয়ে শুয়ে, বাবাকে হাল নিয়ে মাঠে যেতে দেখেও উঠতে পারলো না। সারা গায়ে ব্যথা, এতটুকু শক্তি পাচ্ছে না। এর আগে কখনো এতটা পরিশ্রম করেছে বলে তো তার মনে পড়ছে না। তৈরী গেরস্তি হাতে পেয়ে যা হোক করে চালিয়ে যাচ্ছে। এতো কঠিন দাম দিয়ে এ ঘরের কর্তা মরার সখ আর যারই থাক না কেন, তার অন্তত নেই। যৌবনে লোকের হাজার রকম ধান্ধা থাকে। হাসি-ঠাট্টা-তামাশা গান-বাজনার জন্যও তো কিছুটা সময় হাতে রাখতে হবে। পাশের গাঁয়ে যাত্রা হচ্ছে, সে লোভটাই বা সামলাবে কি করে? নিজের গাঁয়ে কারোর মেয়ের বিয়ে, বরযাত্রী এসে গেছে নাচ-গান হচ্ছে। এই তো আনন্দ করার বয়স, এখন না করলে আর কবে করবে? বুড়োদের তো আর সে সব চিন্তা নেই। তারা ওসব নাচ-গান, খেল-তামাশার ধার ধারে না, নিজের কাজেই মশগুল।

বুলাকি এসে বলে—ওই ভোলা, বুড়ো বাপ যে এবেলাও হাল-বলদ নিয়ে চললো, সে খেয়াল আচে?

ভোলা—যেতে দাও না, আজ আর আমার দেহে কুলোচ্ছে না।

পাঁচ

সুজান ভগতের এ হেন নতুন উদ্যম দেখে গাঁয়ে সমালোচনার ঝড় উঠলো দুদিনের সব ভক্তি উবে গেল? ভণ্ড আর কাকে বলে। ফের মায়া জালে আটকে গেছে। ওটা কি আর মানুষ আচে, নির্ঘাৎ কোনো অপদেবতা ভর করেচে।

যাই হোক, ভগতজীর বাড়ীর উঠোনে ফের সাধু-সন্তের আনা-গোনা বেড়েছে। ভজন-কীর্তন, যাগ-যজ্ঞ-পূজো, কাঙালী ভোজন একটা না একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান লেগেই আছে। এবার তার জমিতে যেন সোনা ফলেছে। গোলাতে আর ফসল ধরছে না। যে জমিতে পাঁচ মণও হোত কি-না সন্দেহ, সে জমিতে এবার দশ মণ করে ফলেছে।

চৈত্র মাস। খামার-বাড়ীতে যেন সত্যযুগ ফিরে এসেছে। জায়গায় জায়গায় গম, বাজরা, জোয়ার জড়ো করে রাখা হয়েছে। এ সময়ে চাষীরা কিছুক্ষণের জন্য হলেও জীবনে সাফল্যের গর্বে বুকটা ভরে ওঠে। সুজান ভগত টুকরিতে ফসল ভরছে, আর তার দুই ছেলে তা ঘরে তুলছে আর ভাট-ভিখিরির দল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করছে; সেখানে সেই আট মাস আগে হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়া ভিক্ষুকটাও দাঁড়িয়েছিল।

সেদিকে নজর পড়তেই সুজান ভগত জিজ্ঞেস করলো—কিগো, আজ কোথায় কোথায় ঘুরে এলে?

ভিক্ষুক—কোথাও যাই নি বাবা, তোমার দোরেই পেথম এলুম।

ভগত—এসব দেখছো তো। যতটা পার নিয়ে যাও, নাও তোলো।

লুব্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে ভিক্ষুক বলে—তা কেন, নিজে হাতে করে যা দেবে, খুশী মনে তাই নে যাবো।

ভগত—না, তুমি যতটা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে, তাই নাও।

ভিক্ষুকের কাছে একটা চাদর ছিল। সে তাতেই সের দশেক শস্য তুলে নিয়ে ওঠাতে শুরু করলো। সংকোচ তার হাত চেপে ধরলো, তাই আর নেবার সাহস হোল না।

ভগত তার মনের ভাব বুঝতে পেরে আশ্বাস দিয়ে বলে—ব্যস, হয়ে গেল? আরে, এটুকু তো একটা বাচ্চা ছেলেও বয়ে নিয়ে যেতে পারবে গো!

ভিক্ষুক সন্দিগ্ধ চোখে ভোলার দিকে চেয়ে বলে—আর চাইনে গো, এই ঢের হয়েচে।

ভগত—বুঝেচি, তুমি লজ্জা পাচ্ছো। ভয় কি আমি বলচি, তুমি আরো নাও।

ভিক্ষুক আরো সের পাঁচেক তুলে নিয়ে সশঙ্ক চোখে ভোলার দিকে তাকায়।

ভগত—ওর পানে কি দেখছো গো বাবাজী, যা বলছি, তাই করো। যত পারো নিয়ে যাও, কেউ কিচ্ছু বলবে না।

ভিক্ষুক ভয় পাচ্ছিল, পাছে ভোলা তাকে বোঝাটা না নিতে দেয়, তাহলে তো তাকে অপমানের একশেষ হতে হবে, আর সব ভিখিরিরা তাকে আঙুল তুলে দেখাবে হাসবে আর বলবে—অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।

তাই আর তুললো না।

তখন সুজান সেই চাদরের ওপর আরো বেশী করে ফসল তুলে দিয়ে বেশ ভালো করে বেঁধে দিয়ে বললে—নাও, ওঠাও।

ভিক্ষুক—এতখানি চাগানো আমার সাদ্দি নয় গো।

ভগত—আরে! এটুকুও পারবে না! বল কি গো কত হবে বড়জোর মণ-খানেক। দেখি তোলো তো।

ভিক্ষুক পরীক্ষা করে দেখলো; খুব ভারী। ওঠাবে দূরে থাক নড়াতেই পারছে না। তাই বলে ওঠে—না বাবা, আমার দ্বারা হবে নে।

ভগত—ঠিক আছে, থাকো কোতা?

ভিক্ষুক—অনেকখানি পত্‌ গো অমোলার নাম শোনো নি? ওখেনে।

ভগত—ঠিক আচে, আগে চলো, আমিই পৌঁচে দিচ্চি।

একথা বলেই সুজন একটা হেঁচকা টানে বোঝাটা মাথায় তুলে নিয়ে ভিক্ষুকের পেছন পেছন চলতে সুরু করলো। উপস্থিত সবাই ভগতের এই অমানুষিক ক্ষমতায় চমকে উঠলো। তারা আর কি করেই বা জানবে যে কিসের নেশায়; কেমন করেই বা এ বুড়ো এই কঠিন পরিশ্রম করছে। তার আট মাসের কঠোর পরিশ্রমের ফল আজ সে হাতে হাতেই পেয়েছে, সেই সঙ্গে ফিরে পেয়েছে হৃত অধিকার। অস্ত্রের কোনো হের-ফের হয়নি. একই আছে, আগে তো তা দিয়ে কলাটাও কাটা যেতো না, সামান্য সান দিতেই তা দিয়ে লোহাও কাটা যাচ্ছে। মানুষের জীবনে ইচ্ছেটাই হচ্ছে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। যার মধ্যে ইচ্ছে থাকে, বয়স বাড়লেও তারুণ্যের উদ্দীপনায় কোনো ঘাটতি দেখা যায় না। যুবকের মধ্যেও যদি কর্ম-প্রবনতা না থাকে, লজ্জা না থাকে তাহলে সে জড়-পদার্থেরই সামীল। সুজান ভগতের মনের সেই ইচ্ছে, প্রেম-প্রীতিই এই অমানুষিক শক্তি জুগিয়েছে। যাবার সময় সে ভোলার দিকে সদর্পে দেখে বলে গেলো—এই ভাট-ভিখিরী যারা সব দাঁড়িয়ে আছে, কেউ যেন খালি হাতে না ফিরে যায়। ভোলা মাথা নীচু করে বোবার মতো দাঁড়িয়ে আছে। বৃদ্ধ বাবা আজ তাকে পরাস্ত করে দিয়েছে।

সম্পাদক মোটেরাম শাস্ত্রী

পণ্ডিত চিন্তামণি কয়েক মাস পর তীর্থ-ভ্রমণ সেরে দেশে ফিরলেন। দিন দুয়েক একটু জিরিয়ে নিয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোটেরাম শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চললেন। এ দীর্ঘ ভ্রমণে তিনি যে কত কি দেখেছেন, শুনেছেন, তা আর কি বলবো! নিজের সেই অভিজ্ঞতার কথা বেশ রসিয়ে রসিয়ে বন্ধুকে বলার জন্যে তার আর তর সইছে না। সে উদ্দেশ্যে একদিন মুখে পান পুরে রূপোর ডিবেতেও খান দশ-বার খিলি পুরে নিয়ে মোটে-

রামের বাড়ীতে এসে হাজির হলেন, সদর দরজা পেরিয়ে অন্দরে পা রাখতে যাবেন কি হঠাৎ একজন দারোয়ান গোছের লোক যমদূতের মতো সামনে এসে বাজ-খাই গলায় বলে ওঠে—কে? ভেতরে কি চাই? যা বলার আমাকেই বলুন।

চিন্তামণি তো হতভম্ব হয়ে গেলেন, পরে সে ভাব কাটিয়ে বললেন—এটা মোটেরামের বাড়ী তো?

দারোয়ান—ওসব জানি-না, মোটকথা সাহেবের হুকুম, কেউ ভেতরে যেতে পারবে না।

চিন্তামণি—সাহেব? সাহেবটা আবার কে? বলছি এটা মোটেরামের বাড়ী? তুমি বললেই হবে?

দারোয়ান—ওসব মোটেরাম ফোটেরাম বুঝি না, ডিরেক্টার সাহেবের অর্ডারটা তো মানতে হবে?

চিন্তামণি—আচ্ছা জ্বালা তো! আরে বাবা ডিরেকটার সাহেবের একটা নাম তো আছে, না-কি?

দারোয়ান—বাজে বকবেন না তো মশায়, ডিরেকটার সাহেবের নামে আপনার দরকারটা কি শুনি?

বাড়ীর ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত আর একবার ভাল করে চোখ বুলোতে থাকেন, না কোনো ভুল হয়নি, হঠাৎ দরজার ওপরের সাইন-বোর্ডটার কাছে এসে চোখ আটকে যায়, 'আরে! এটা তো আগে দেখিনি!' লেখা আছে—'সোনা কার্যালয়'। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার ব্যস্ততা এটা তার নজরেই পড়েনি। তাই জিজ্ঞেস করলেন—এখানে কি কোনো অফিস বসেছে না-কি?

দারোয়ান—চোখ নেই না-কি? দেখতে পাচ্ছেন না?

চিন্তামণি—এই, মুখ সামলে কথা বলো, ওসব রাগ-ফাগগুলো ঐ তোমার সাহেব-কেই দেখিও বলে দিলাম। ভিখিরি পেয়েছো না-কি যে, যা মুখে আসছে তাই বলছো? ভাল চাও তো, মোটেরামকে গিয়ে বলো—পণ্ডিত চিন্তামণি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসো না বাবা!

দারোয়ান—কার্ড নিয়ে এসেছেন? দেখি।

চিন্তামণি—কার্ড?

দারোয়ান—হ্যাঁ, কার্ড ছাড়া সাহেব কারুর সঙ্গে দেখাই করেন না।

চিন্তামণি—আরে বাবা, আমার নাম করলেই হবে।

দারোয়ান—হ্যাঁ তাই তো, তারপর আমার ওপর রেগে যান আর কি!

দারোয়ানকে দিয়ে কোনো কাজ হচ্ছে না দেখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চিন্তামণি

জোরে জোরে চীৎকার করতে শুরু করলেন—মোটেরাম! ও মোটেরাম!

দারোয়ান তো চিন্তামণির হাত ধরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে বললো—ফালতু চিল্লাচ্ছেন কেন মশায়? জানেন, এখানে চেচামেচি করার কোনো নিয়ম নেই।

ওদিকে চিন্তামনিও তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। দারোয়ানকে নিজের ব্রহ্মতেজের স্বরূপ দেখাবেন কি পণ্ডিত মোটেরাম ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে দেখে বলে উঠলেন—আরে। চিন্তামণি তুমি! তা কার্ড পাঠালেই তো পারতে? এসো, এসো, ভেতরে এসো, দেখো দেখি কি কাণ্ড! দারোয়ানটা তোমায় কার্ডের কথা কিছু বলে নি? হ্যাঁ! কার্ড ছাড়া কারুর সঙ্গেই দেখা করি না আজকাল। সাইন-বোর্ডটা দেখেছো তো 'সোনা' পত্রিকার সম্পাদনার কাজে খুব ব্যস্ত আছি ভাই। তবে তুমি হলে আমার পুরোনো বন্ধু, তোমার কথা আলাদা।

চিন্তামনি তো ভেতরে ঢুকেই ঘর-দোরের ঠাঁট-বাট দেখে অবাক। যে ঘরটাতে সোনা থাকতো, সেখানে টেবিল-চেয়ার পেতে অফিস করা হয়েছে। রান্না ঘরে বাণ্ডিল বাণ্ডিল কাগজ, বারান্দায় বসে কর্মচারীরা অফিসের কাজে ব্যস্ত।

দুজনেই দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন, মোটেরামজীই প্রথম মুখ খুললেন—তুমি যেদিন তীর্থে যাত্রা করলে, তারপর দিনই এই পত্রিকাটা বের করলুম।

চিন্তামণি—বুঝতে পারছি, তুমিই এই 'সোনা'-র সম্পাদক।

মোটেরাম—আরে ভাই তোমায় কি বলবো, যেদিন এ পত্রিকাটা প্রথম প্রকাশ করলুম, তারপর দিন থেকেই হিন্দী সাহিত্য-জগতে সোরগোল পড়ে গেল। এখনো তিন মাসও হয় নি, এর মধ্যেই এর গ্রাহক সংখ্যা পঁচিশ হাজারের ওপর। অর্ডার আসছে তো আসছে। শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে, পোষ্ট-অফিসে পর্যন্ত কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

চিন্তামণি—পঁচিশ হাজার! মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাও না, না। সত্যি মোটেরাম মিথ্যে বলতে তোমার জুড়ি মেলা ভার। ঠাকুর, দেবতাকেও তো ভয়-ডর নেই তোমার। পঁচিশ'শ হলেও বা কথা ছিল। মিথ্যে বলবে যদি ভেবে থাকো, তাহলে বলো না। তীর্থ-ধর্ম করে এসে ওসব ছল-চাতুরী আর ভাল লাগে না।

মোটেরাম হেসে বলেন—তবে আর বলছি কি! আরে ভাই, শুধু তুমি কেন, যে শোনে সে-ই অবাক হয়ে যায়। রেজিস্টার খুলে দেখে নিলেই সব ঝামেলা মিটে যায়। পঁচিশ হাজার গ্রাহক না হলে আমায় চোরের শাস্তি দিও, এই বলে দিলুম। আরে বাবা, এখনি হয়েছে কি। এ বছরেই ও সংখ্যাটা যদি এক লাখে না টেনে নিয়ে যাই তাহলে আমার নাম মোটেরাম নয়। আসল কথাটা কি জানো, এ দেশে পড়ুয়ার সংখ্যা কম নয়, অভাবটা হচ্ছে কাজের লোকের! ভাল ভাল আর্টিকেলস বের করলে দেখি

কেমন গ্রাহক না আসে। আজকের যুগটাই হচ্ছে বিজ্ঞাপনের, বুঝলে কি-না? দেখাবো রেজিস্টার?

চিন্তামণি—রেজিস্টারেই কিছু কারচুপি করো নি তা কি করে বুঝবো! জাল না লিখতে পারো, এও হতে পারে যে মাঝের দু-চার সংখ্যা ছেড়ে দিয়েছো। যাক্‌গে ওসব কথা। মানছি, তোমার মতো করিৎকর্ম্মা লোক ভূ-ভারতে আর নেই, আমি তো এর এক আনাও করতে পারতুম না। কিন্তু তাই বলে পঁচিশ হাজার গ্রাহক! অত টাকা পেলে কোথায়?

মোটেরাম—ও এই কথা, আরে ভাই সবই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। ব্যবসার আট-ঘাট জানলে ঘর থেকে এক কানা কড়িও দিতে হয় না। তুমিও ইচ্ছে করলে একটা বড় কিছু ফাঁদতে পারো। তবে হ্যাঁ, কায়দা-কানুন শিখতে হবে। ঘর থেকে টাকা বের করার তো কোনো দরকার নেই। পেপার মার্চেন্টের কাছ থেকে ধারে কাগজ নিয়ে, প্রেস থেকে ধারে ছাপার কাজ করে নিতে পারলেই কেল্লা-ফতে। টাকা হাতে এলে ধার শোধ করো, নয়তো কানে তুলো গুঁজে বসে থাকো। কি আছে যে নিয়ে নেবে?

চিন্তামণি—কাগজওলা, প্রেস, সবাই ধারেই দেবে? সেটা আবার কি রকম?

মোটেরাম—(হেসে) সে সব বিদ্যেও জানতে হয় ভাই, ভগবান কি আর সবাইকেই সব গুণ দেন, ও হোলগে প্রতিভা, জন্মগত। ও তুমি যতই পড়াশুনো করোনা কেন, আসল কথা হচ্ছে পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকা চাই। পেপার মার্চেন্ট শেঠ শুদ্ধিলালকে জানো তো, ঐ যে, যার ওখানে তুমি আমি দুজনেই বেশ কয়েকবার ব্রাহ্মণ ভোজনের নেমন্তন্ন রক্ষা করে এসেছি, সত্যি, ভদ্রলোকের দেব-দ্বিজে অসীম ভক্তি। তার কাছ থেকেই কাগজ নিয়েছি। এক কথায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল কাগজ ওর লোক দিয়ে ঠেলায় করে পৌছে দিয়ে গেল। বলেছে, 'টাকা-পয়সা সময় সুযোগ মতো দেবেন।' তারপর প্রেস থেকে ছাপিয়ে নিলুম। একটা প্রেস করারও ইচ্ছে আছে। পুরো দু-ডজন এজেন্ট রেখেছি। শহরে গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে তারাই আমার পত্রিকা প্রচার করে। আমার অফিসেও খুব টাইম-মেনটেন করি, কর্মচারীদের কোনো রকম টাল-বাহানা, কাজে ফাঁকি দিতে দেখলে নিজেই লেগে পড়ি। আমার মাথায় যেন খুন চেপে যায়, কি বলবো, ইচ্ছে করে সব বেটাদের চিবিয়ে খাই। সে জন্যে তো কত লোকই কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছে। অবশ্য তাতে লাভটা আমারই। তাদের মাইনে দিতে হোল না। কতকগুলোকে তো মেরে তাড়িয়েছি। আমাকে দেখলেই সবাই থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে। আরও দশ-পনর জন এজেন্ট হলে ভাল হয়। ইচ্ছে করলে তুমিও তোমার দু-চার জন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে চালাতে পারো। করতে পারলে এ লাইনে বেশ ভাল পয়সা।

চিন্তামণি—আমার বন্ধুরা করবে তোমার কাজ। একদিকে তুমি চোখ পাকিয়ে ঘুষি তুলবে আর একদিকে তারা তোমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ শুরু করে দেবে। শেষে আর একটা মহাভারত শুরু হয়ে যাক আর কি! ওসবে আর কাজ নেই। কিন্তু, পত্রিকা সম্পাদনার কাজ একা কি করে সামাল দিচ্ছ বলো তো?

মোটেরাম—সম্পাদনার কথা বলছো! স্রেফ বুদ্ধির জোরে, আবার কি?

চিন্তামণি—তোমার বুদ্ধির দৌড় আর কারোরনা জানা থকেলেও আমার খুব জানা আছে।

মোটেরাম—আমার বুদ্ধি আছে, না নেই, তুমি কি কোনোদিন পরখ করে দেখেছো?

যে লোক গাঁটের কড়ি খরচা না করে এতো বড় অফিস খুলে, একটা নামকরা পত্রিকা সম্পাদনা করে, যার নাম দেশের লোকের মুখে মুখে, তার বুদ্ধি নেই, আছে তোমার মতো বাক্‌সর্বস্ব গাধাগুলোর তাই না?

চিন্তামণি—আরে রাখো তোমার বুদ্ধি। একে বলে শেয়ালের চালাকি, বুঝলে।

মোটেরাম—শেয়ালের চালাকি, চিটিংবাজ, ঘোরেল যা খুশি বলো, আমার কাছে ওটা বুদ্ধিরই পরিচয়! কত বাঘা বাঘা লেখকরা তাদের লেখা পাঠান। তার ওপরে পর্যন্ত কলম চালিয়ে দু-চার জায়গায় লাল কালির দাগ দিয়ে তাদের মনে আতঙ্ক ধরিয়ে দিচ্ছি। বাংলা, গুজরাটি, নানান ভাষা থেকে টিকা-টিপ্পনী অনুবাদ করে তারা পাঠান। আমি সেগুলোকে সম্পাদকীয় কলমে ছেপে দি। লেখকদের নাম তো থাকছে না, কাজেই পাঠকরা ধরে নেয় এ নিশ্চয়ই এ শর্মারই লেখা। কে আর অত চুলচেরা বিচার করতে বসে? অনেকদিন পর সংসারে উন্নতি করার মূলমন্ত্র খুঁজে পেয়েছি, ভেবোনা, তা অত সহজেই হাতছাড়া করবো।

চিন্তামণি—কেন ইয়ার, আমার কাছে এত ঢাক-ঢাক, গুর-গুর কিসের! আমি তোমায় সব বিষয়েই নিজের গুরু মেনে নিয়েছি, আজ থেকে বড় ভাই হলে, তা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছো। একটু দিল খোলসা করো গুরু!

মোটেরাম—কথা দাও, একশো গ্রাহক করে দেবে।

চিন্তামণি—তোমার কথা কবে শুনিনি বলো?

মোটেরাম—বলছি, শোনো, এ লাইনে বড় বড় বুলিটাই হচ্ছে আসল কথা। যত লম্বা-চওড়া কথা বলবে ততই লোক তোমার কাছে ঘেষবে। প্রথম প্রথম অনেকেই অনেক কিছু বলবে, কোনো কথায় কান দেবে না। পরে সে লোকটাও মনে মনে ভাববে, যে এসব কথায় এক আনাও যদি সত্যি হয় তাহলেও বিরাট ব্যাপার। এমন

কেমন গ্রাহক না আসে। আজকের যুগটাই হচ্ছে বিজ্ঞাপনের, বুঝলে কি-না? দেখাবো রেজিস্টার?

চিন্তামণি—রেজিস্টারেই কিছু কারচুপি করো নি তা কি করে বুঝবো! জাল না লিখতে পারো, এও হতে পারে যে মাঝের দু-চার সংখ্যা ছেড়ে দিয়েছো। যাক্‌গে ওসব কথা। মানছি, তোমার মতো করিৎকর্ম্মা লোক ভূ-ভারতে আর নেই, আমি তো এর এক আনাও করতে পারতুম না। কিন্তু তাই বলে পঁচিশ হাজার গ্রাহক! অত টাকা পেলে কোথায়?

মোটেরাম—ও এই কথা, আরে ভাই সবই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। ব্যবসার আট-ঘাট জানলে ঘর থেকে এক কানা কড়িও দিতে হয় না। তুমিও ইচ্ছে করলে একটা বড় কিছু ফাঁদতে পারো। তবে হ্যাঁ, কায়দা-কানুন শিখতে হবে। ঘর থেকে টাকা বের করার তো কোনো দরকার নেই। পেপার মার্চেন্টের কাছ থেকে ধারে কাগজ নিয়ে, প্রেস থেকে ধারে ছাপার কাজ করে নিতে পারলেই কেল্লা-ফতে। টাকা হাতে এলে ধার শোধ করো, নয়তো কানে তুলো গুঁজে বসে থাকো। কি আছে যে নিয়ে নেবে?

চিন্তামণি—কাগজওলা, প্রেস, সবাই ধারেই দেবে? সেটা আবার কি রকম?

মোটেরাম—(হেসে) সে সব বিদ্যেও জানতে হয় ভাই, ভগবান কি আর সবাইকেই সব গুণ দেন, ও হোলগে প্রতিভা, জন্মগত। ও তুমি যতই পড়াশুনো করোনা কেন, আসল কথা হচ্ছে পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকা চাই। পেপার মার্চেন্ট শেঠ গুদ্দিলালকে জানো তো, ঐ যে, যার ওখানে তুমি আমি দুজনেই বেশ কয়েকবার ব্রাহ্মণ ভোজনের নেমন্তন্ন রক্ষা করে এসেছি, সত্যি, ভদ্রলোকের দেব-দ্বিজে অসীম ভক্তি। তার কাছ থেকেই কাগজ নিয়েছি। এক কথায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল কাগজ ওর লোক দিয়ে ঠেলায় করে পৌঁছে দিয়ে গেল। বলেছে, 'টাকা-পয়সা সময় সুযোগ মতো দেবেন।' তারপর প্রেস থেকে ছাপিয়ে নিলুম। একটা প্রেস করারও ইচ্ছে আছে। পুরো দু-ডজন এজেন্ট রেখেছি। শহরে গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে তারাই আমার পত্রিকা প্রচার করে। আমার অফিসেও খুব টাইম-মেনটেন করি, কর্মচারীদের কোনো রকম টাল-বাহানা, কাজে ফাঁকি দিতে দেখলে নিজেই লেগে পড়ি। আমার মাথায় যেন খুন চেপে যায়, কি বলবো, ইচ্ছে করে সব বেটাদের চিবিয়ে খাই। সে জন্যে তো কত লোকই কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছে। অবশ্য তাতে লাভটা আমারই। তাদের মাইনে দিতে হোল না। কতকগুলোকে তো মেরে তাড়িয়েছি। আমাকে দেখলেই সবাই থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে। আরও দশ-পনর জন এজেন্ট হলে ভাল হয়। ইচ্ছে করলে তুমিও তোমার দু-চার জন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে চালাতে পারো। করতে পারলে এ লাইনে বেশ ভাল পয়সা।

চিন্তামণি—আমার বন্ধুরা করবে তোমার কাজ! একদিকে তুমি চোখ পাকিয়ে ঘুষি তুলবে আর একদিকে তারা তোমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ শুরু করে দেবে। শেষে আর একটা মহাভারত শুরু হয়ে যাক আর কি! ওসবে আর কাজ নেই। কিন্তু, পত্রিকা সম্পাদনার কাজ একা কি করে সামাল দিচ্ছ বলো তো?

মোটেরাম—সম্পাদনার কথা বলছো! স্রেফ বুদ্ধির জোরে, আবার কি?

চিন্তামণি—তোমার বুদ্ধির দৌড় আর কারোরনা জানা থকেলেও আমার খুব জানা আছে!

মোটেরাম—আমার বুদ্ধি আছে, না নেই, তুমি কি কোনোদিন পরখ করে দেখেছো?

যে লোক গাঁটের কড়ি খরচা না করে এতো বড় অফিস খুলে, একটা নামকরা পত্রিকা সম্পাদনা করে, যার নাম দেশের লোকের মুখে মুখে, তার বুদ্ধি নেই, আছে তোমার মতো বাক্‌সর্বস্ব গাধাগুলোর তাই না?

চিন্তামণি—আরে রাখো তোমার বুদ্ধি। একে বলে শেয়ালের চালাকি, বুঝলে।

মোটেরাম—শেয়ালের চালাকি, চিটিংবাজ, ঘোরেল যা খুশি বলো, আমার কাছে ওটা বুদ্ধিরই পরিচয়! কত বাঘা বাঘা লেখকরা তাদের লেখা পাঠান। তার ওপরে পর্যন্ত কলম চালিয়ে দু-চার জায়গায় লাল কালির দাগ দিয়ে তাদের মনে আতঙ্ক ধরিয়ে দিচ্ছি। বাংলা, গুজরাটি, নানান ভাষা থেকে টিকা-টিপ্পনী অনুবাদ করে তারা পাঠান। আমি সেগুলোকে সম্পাদকীয় কলমে ছেপে দি। লেখকদের নাম তো থাকছে না, কাজেই পাঠকরা ধরে নেয় এ নিশ্চয়ই এ শর্মারই লেখা। কে আর অত চুলচেরা বিচার করতে বসে? অনেকদিন পর সংসারে উন্নতি করার মূলমন্ত্র খুঁজে পেয়েছি, ভেবোনা, তা অত সহজেই হাতছাড়া করবো।

চিন্তামণি—কেন ইয়ার, আমার কাছে এত ঢাক-ঢাক, গুর-গুর কিসের! আমি তোমায় সব বিষয়েই নিজের গুরু মেনে নিয়েছি, আজ থেকে বড় ভাই হলে, তা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছো। একটু দিল খোলসা করো গুরু!

মোটেরাম—কথা দাও, একশো গ্রাহক করে দেবে।

চিন্তামণি—তোমার কথা কবে শুনিনি বলো?

মোটেরাম—বলছি, শোনো, এ লাইনে বড় বড় বুলিটাই হচ্ছে আসল কথা। যত লম্বা-চওড়া কথা বলবে ততই লোক তোমার কাছে ঘেষবে। প্রথম প্রথম অনেকেই অনেক কিছু বলবে, কোনো কথায় কান দেবে না। পরে সে লোকটাও মনে মনে ভাববে, যে এসব কথার এক আনাও যদি সত্যি হয় তাহলেও বিরাট ব্যাপার। এমন

করে বলবে যাতে সবাই তোমার আকাশ-কুসুম কল্পনাকেও সত্যি বলে ধরে নেয়! বাক্-চাতুর্য্যও বলতে পারো, ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না, দু-দিনেই তোমায় শিখিয়ে পড়িয়ে নেবো। মনে রাখবে, গ্রাহক সংখ্যা এক লাখের নীচে কক্ষণো বলবে না। চারদিকে বলে বেড়াবে, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানী মহল থেকেও লেখা চেয়ে পাঠিয়েছি, এবং তারা বেশ স্বতস্ফূর্ত ভাবেই এগিয়ে আসতে রাজী হয়েছেন। লেখা-ছাপা-কার্টুন, সব জিনিসটাকে এ-ক্লাস বলে চালাতে কোন দ্বিধা করবে না, তখন দেখবে, গ্রাহক কাকে বলে, কাগজ ছেপে বেরোতে না বোরোতেই সব লুফে নেবে। একটু ঘাবড়েছো কি ব্যস, পুরো ব্যাপারটা গুবলেট হয়ে যাবে। ধর্মাধর্ম সব ভুলে গিয়ে তোমায় ধরে নিতে হবে যে যা বলছি, সব ধ্রুব সত্যি। আমার পত্রিকাটা পড়লেই বুঝতে পারবে, সমাজ-সংস্কারের ওপর কিভাবে জোর দিয়েছি।

চিন্তামণি—সমাজ সংস্কার! কবে থেকে আবার ও তক্‌মাটাও আটলে ভায়া? তুমি তো বাজারের পুরি-তরকারি পর্যন্ত ছোঁও না।

মোটেরাম—দেখো, আমি কি খাই, আর কি খাই না ওসব কথা তোলা থাক। এ ঘরে এলেই আমি একজন খাঁটি সমাজ-হিতৈষী হয়ে যাই, আবার বাড়ী ফিরলেই সমাজ সংস্কারের মুখোসটা খুলতেই আসল রূপটা বেরিয়ে পড়ে, তখন যে রক্ষক, সে-ই আবার ভক্ষক হয়ে ওঠে। সোজা কথা, কাগুজে বাঘ হতে হবে। দুমুখো সাপ না হলে সাফল্য কিছুতেই আসবে না! শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে বিধবা-বিবাহ সমর্থন করি, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের ভারী বোঝা মাথায় তুলে নিয়ে সংশোধনের বিউ'গল্ বাজালেও মনে মনে ঠিকই জানি, যে এসব সংস্কারের ধুঁয়োর ধোঁয়ায় হিন্দু-সমাজ রসাতলে যেতে বসেছে, কিন্তু কি করবো, ছেলে-পুলের মুখে তো কিছু দিতে হবে।

চিন্তামণি—কি সাংঘাতিক লোক তুমি! পেটে পেটে এতো ছিল!

মোটেরাম—চুপ-চাপ দেখে যাও! দু-চার দিনের মধ্যেই আর একটা বিজ্ঞাপন দেব, যে আমাদের পত্রিকার পক্ষ থেকে বার পাতার বিশেষ কি একটা প্রকাশিত হবে। এতে দুনিয়ার তাবড় তাবড় মহাপুরুষদের লেখা থাকবে। কোনো অঙ্কের সম্পাদনা করবেন বিশ্বকবি ঠাকুর, কোনোটা বা ডাক্তার ইকবাল, পর পর এভাবে শঙ্করাচার্য, মুসোলিনী, ক্যয়সর লায়ড জার্জ, সব্বাইকে টেনে আনবো। এ বিজ্ঞাপন পাঠক-মহলে দুর্দান্ত সাড়া জাগাবে।

চিন্তামণি—এতসব মহানুভবদের নাম তো করলে কিন্তু তাঁরা যদি নিজেদের নাম দিতে অস্বীকার করেন?

মোটেরাম—আরে সে কথা কি বলতে তুমিও যেমন, তবে কি জানো সেই ফাঁকে কিছু লোক অফিসে এসে আমাদের গ্রাহক হবে, তারা তো আর পরে টাকা ফিরিয়ে নিতে

আসবে না। পরের বছর আবার এ ধরনেরই একটা ধুঁয়ো তুলে টু-পাইস্ কামিয়ে নেবো!

দুই

দুজনের মধ্যে এসব কথা হচ্ছিল, ঠিক তক্ষুনি ভেতর থেকে সোনা দেবী দুপ্ দুপ্ করে পা ফেলে এসে হাজির হলেন। তার চোখ-মুখের ঝাঁঝালো ভাব দেখে চিন্তামনিকে দেখেই বলে উঠলেন—কি ভাগ্যি, পথ ভুলে নাকি?

চিন্তামণি—আর বলেন কেন, একটু তীর্থ ধম্মো করে এলুম। পরলোকের দিকটাওতো একটু দেখতে হবে।

সোনা—এরি মধ্যে? এখনো তো পঞ্চাশও হয়নে ভাই। ইদিকে আপনার বন্ধুর মাতায় যে নতুন ভুত চেপেচে তা দেখতে পাচ্চেন তো? কত বলিচি, ওগো ওসব কুপতে ভিরোনি, ভগমান কপালে যা নিকেচেন তাই হবে, তা কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটে? কাগজের তরে পাঁচশো গাহকও হয়নে ঠাকুরপো, ও মিন্‌সে পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার করে মিথ্যে চেঁচিয়ে মরচে, মরুক-গা!

মোটেরাম—তোমায় এখানে কে ডেকেছে যে ডাইনির মতো এসে দাপা-দাপি করছো। যাও, ভেতরে যাও।

চিন্তামণি—হ্যাঁ, সেকি! এখনো পাঁচশ গ্রাহকও হয়নি? ও তো বললো পঁচিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

সোনা—ওর কতা ছাড়ো, মিথ্যে না বললে ওর প্যাটের ভাতই হজম হয় নে।

মোটেরাম—তুমি এখান থেকে যাবে কি না?

সোনা—না-না-না, হোল! দেকি কি কত্তে পারো। ভারি এলেন আমার ইয়ে, ভাত দেবার ভাতার নয় কিল মারার গোঁসাই। আমরে সঙ্গে বেশী বাড়াবাড়ি কল্লেই হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দোব, এই বলে রাখলুম। আমাকে নাল চোক দেকাতে এয়েচো, চোক গেলে দোব। একন সাধু সাজা হচ্ছে না। লজ্জা নেই গা, হ্যাঁ, পত্রিকা না ওর মুণ্ডু, বসে বসে রাত দিন মিথ্যে কতা লিখে যাচ্ছে, আবার বড় বড় কতা।

আবার লিকচে কি-না বেধবা বে দেবেন। দিগে যাও-না, ঘরে তো একটা রাঁড় বোন বসানোই রয়েচে, কোনো বুড়ো মিন্‌সে খুঁজে তার বে দিয়ে দাও, সব ল্যাটা চুকে যাবে, আমারও হাড় জুড়োবে। দেখাও, কোতায় তোমার পঁচিশ হাজার গাহেক, দেখাও বলচি, নয়তো আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন। নকল রজষ্টর বাইনে সক্কলকে দেকাচ্চে। এর কত গুণের কতা তোমায় বলবো ঠাকুরপো। আজ-কাল আবার লাল জলও গেলা ধরেচে, বুঝলে।

চিন্তামণি—তাই নাকি! আরে রাম বলো!

মোটেরাম—এই, এখনো বলছি, এখান থেকে যা, নয়তো গলা টিপে এখানেই পুঁতে রাখবো।

সোনা—ছেলের দিব্যি, মদ খাও তুমি? চোরের মতন ইংরিজি দোকানে গে বোতল কে কিনে আনে শুনি? পকেট হাতরালেই দেখতে পাবে ঠাকুর-পো। চোরের-হদ্দ। আবার বলে কি-না এসব ছাই পাশ গিললে বুদ্ধি খোলে হজম হয়, আনন্দ করবে বলে ইসব গেলে গো ঠাকুরপো। আর কত বলবো। ছেলের প্যাটে ভাত নেই, বৌয়ের পিঠে কাপড় নেই, তার আবার ইসব ঘোড়া রোগ কি জন্যে। অমন মজার মুখে আগুন। ওর কি আর বুদ্ধি বলে কিচু আচে? আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে গা।

চিন্তামণি—এসব কি শুনছি ভাই। কেন, তুমি তো ভাঙ্গ খাও-ই। তাতে কি নেশা হয় না বলতে চাও?

মোটেরাম—বাদ দাও তো ওর কথা। ঘাস খেকো বুদ্ধি আর কত ভাল হবে।

সোনা—চুপ করো, নয়তো মুখোশ খুলে দোব বলচি। আমায় বেশী ঘাটিওনি হ্যাঁ। দেকো ঠাকুরপো, ভয়-ডর চোকের চামড়া বলে আর এর কিচু নেই, পরলোকে গে কি জবাব দেবে শুনি? আজকাল আবার পরের ঘরের বৌ-ঝি-য়ের ওপর নজর দেচ্চে গো আমাদের কলির কেষ্টা। ছেলে-পুলে নে আমি যে ঘরের মধ্যে নাজেহাল হচ্চি সিদিকে বাবুর কোনো খেয়ালই নেই, কি সুখেই না রেকেছে আমাকে! আহা! বাছাদের দিকে তাকানোই যায় নি গো ঠাকুরপো একেবারে হাড়-ক'খানা সার। ই মিন্‌সে তো ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে দেয়ালা করছে, বাপ না কষাই! সম্পাদক হয়ে সমাজের ভালো কত্তে সকলকে উপদেশ দে নাতজামাই হয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে, ইদিকে নিজের হাড়ির হালই অজানা। ওকে কে উপদেশ দেয় বলোতো? আরে বাপু আগে ঘর সামলাও, তারপর পর সামলাতে নেবো! কাগজঅলার কাচ থেকে নিয়েচে পাঁচশো টাকা, পেসঅলা তো দুবলাই ঘরে এসে শাপ-মন্যি করে যাচ্চে, যত জ্বালা তো আমার, ও তো নিজের ঢং নে-ই মত্ত হয়ে আচে। লজ্জায় আমার মাতা কাটা যায়!

চিন্তামণি—তুমি ঠিক বলছো বৌদি? এমন বাঁটপার তো আমার জীবনেও দেখিনি গো! ঘুরলুম তো অনেক কিন্তু............

সোনা—(ট্যারা চোখে চেয়ে) আরে ভাই তিন মাস ধরে ঘরে ঠায় বসে আচে, এ রকম বে-আক্কেলে বেটাছেলের হাতে পড়ে জেবনটা ভাজা ভাজা হয়ে গেল গা? সাফ বলে দিইচি, দেকো বাপু, আমার পেচনে নাগ্‌তে এসোনি, একটা বল্লে হাজার-টা শোনাবো বলে রাকলুম। এসো, আমার সঙ্গে এসো, নিমুকুদের কাণ্ডকারখানা দেকবে চলো ঠাকুরপো। আসল খাতাটা অন্য ঘরে লুকিয়ে রেকেচে, যদি কেউ দেকে ফেলে,

তবে তো গুণের কতা সব জাহির হয়ে যাবে গো, বুঝতে পেরোচো? এসো।

চিন্তামণিও এটাই চাইছিলেন। উঠে দাঁড়ালেন। শাস্ত্রীজীও তো কম নয়, তিনিও একলাফে এসে চিন্তামনির হাত চেপে ধরলেন। বেচারা তো চরম বিপাকে পড়ে গেলেন। একদিনে সোনা তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তার হাত নিজের দিকে টানছেন, অন্যদিকে মোটেরামও ওর হাতটা চেপে শক্ত করে ধরে আছেন। এ দোটানায় পড়ে চিন্তামণি চীৎকার করতে শুরু করলেন, মনে হচ্ছিল তার হাতদুটো বোধ হয় ছিঁড়েই যাবে।

সোনা—আচ্চা ঠাকুরপো, তুমিই একে বেশ কষে ধরে থাকো, ওঘর থেকে গে খাতাটা নে আসচি। দেকো, আবার ছেড়ে দিও না যেন।

একথা বলেই তিনি পাশের ঘরে রেজিস্টর খাতা আনতে গেলেন। এদিকে দুই বন্ধুতে মিলে মল্লযুদ্ধের আয়োজন করেছেন।

মোটেরাম—হাড়-গোড় ভেঙ্গে দেবো।

চিন্তামণি—গর্ত করে পুঁতে রাখবো বলে দিলাম।

মোটেরাম—পীষে ফেলবো।

চিন্তামণি—মেরে, কুচিয়ে চাটনি বানিয়ে খাবো তোকে।

মোটেরাম—মেরে পেট ফাটিয়ে দেবো, আমার সঙ্গে চালাকি নয়।

চিন্তামণি—এমন ঘুষি মারবো না, যে মুখের মানচিত্রই পাল্টে যাবে।

উভয়েই মেঝেতে পড়ে বাক্‌যুদ্ধে লিপ্ত। এদিকে সোনাও রেজিস্টর খাতা নিয়ে হাজির হয়ে চিন্তামণিকে দেখাতে লেগে গেছেন। চিন্তামণি দেখলেন, শেষ গ্রাহক সংখ্যা চারশ আশি। তাই বললেন—কি ভাই, আমার সঙ্গে তো এতক্ষণ খুব পায়তাড়া কষছিলে, এবার মুখটা রইলো কোথায়? উঁচু মাথাটা যে ধুলোয় মিশে গেলো। সে খেয়াল আছে?

মোটেরাম—এই মেয়েছেলেটাই যত্ত নষ্টের গোড়া। স্ত্রী নয়, বুঝলে ঘোর পাপ। নয়তো স্বামীর কথা কেউ কাউকে বলে? যাক্‌গে, সবই তো দেখলে, শুনলে। আমার মান-সম্মান সবই এখন তোমার হাতে। কাউকে বোলো-টোলো না যেন, তাহলে আর কোরে খেতে হবে না।

চিন্তামণি—আমায় কি ভাবো বলোতো, আমি কি এতই বোকা! তবে হ্যাঁ, একটা কথা। পত্রিকাতে আমার নামটা দিতে যেন ভুলো না! এবার থেকে আমরা দুজনেই এর সম্পাদক। ইচ্ছে করলে তোমার নামটা ওপরে দিয়ে আমার নামটা নীচেও দিতে পারো, তাতে কিছু এসে যায় না। বলো, রাজি?

মোটেরাম গম্ভীর স্বরে বলেন—ঠিক আছে।

(এ গল্পের লক্ষ্য কোনো ব্যক্তি-বিশেষ নয়। সম্পাদক মোটেরামজী কল্পনাজগতের নায়ক।)

জাদু টোনা

ডাক্তার জয়গোপাল ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে ডাক্তারী পাশ করেছেন, কিন্তু হলে কি হবে, ব্যবসায়িক বুদ্ধির ঘাটতিই তার উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার বাড়ীটাও একটা এঁদো অস্বাস্থ্যকর গলির শেষ সীমানায়; কিন্তু তাই বলে সেখান থেকে ভাল পরিবেশে উঠে আসার কথা কখনো ভাবতেই পারেন না। ডিস্‌পেনসারীর আলমারী-শিশি-বোতল, ডাক্তারী যন্ত্র-পাতিগুলোও কেমন যেন সেকেলে-ম্যাড়ম্যাড়ে-নোংরা। পারিবারিক জীবনেও তার এই মিত-ব্যয়ীতার ছাপ সুস্পষ্ট।

ডাক্তারবাবুর ছেলের গোঁফ-দাড়ি ওঠার বয়স হোল, তবু এখনো হাতে-খড়ি দেন নি। হয়তো ভাবছেন, এতদিন পড়াশোনা করে আমি-ই-বা কি এমন বড় সম্পত্তির মালিক হয়ে বসে আছি যে ওর পড়ার পেছনে হাজার-হাজার টাকা খরচ করবো! স্ত্রী অহল্যার ধৈর্য্যশীলতার সুযোগে তার ওপরও সাংসারের এতো বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন যে ফলে সে বেচারারও কোমর ঝুঁকে গেছে। মা বেঁচে রয়েছেন, তীর্থ যাত্রা দূরে থাক্, গঙ্গা-স্নানও তার ভাগ্যে দুর্লভ! এ কঠিন কৃপণতার ফলে ঘরে সুখ-শান্তি নেই বললেই চলে। ব্যতিক্রম শুধু জগিয়া। সে জয়পালকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে, এখন এ বাড়ী এমন ভালবেসে ফেলেছে যে এদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও সে যাবার নাম করে না। আর যাবেই বা কোথায়? নিজের বলতে এরা ছাড়া আর কেউই নেই।

২

ডাক্তারী করে ডাক্তারবাবুর যা আয় হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য, তাই কাপড় ও চিনির কারখানার শেয়ার কিনে সে অভাব পূরণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। এই তো আজই বোম্বের কারখানা থেকে বার্ষিক লাভের সাড়ে সাতশো টাকা এসে পৌছেছে। ডাক্তারবাবু সই করে পিয়নের হাত থেকে নোট নিয়ে গুনতে শুরু করলেন। পিয়নের ব্যাগে খুচরো টাকা বেশী ছিল, বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্যে সে বললে—ডাক্তারবাবু, নোটের বদলে এই খুচরো টাকাগুলো নিলে আমার খুব উপকার হয়, এখনো অনেক দূর যেতে হবে, এ ভারী বোঝাটা নিয়ে আর যেতে পারছি না বাবু! তাই বলছিলাম···।

ডাক্তারবাবুও এই পিয়নকে হাতে রাখতে পয়সা ছাড়াই ওষুধ বিষুধ দিয়ে দেন। তিনি ভাবলেন, ব্যাঙ্কে গেলেও তো আমাকে সেই টাঙ্গা ভাড়া দিতেই হবে, এতে ওর, আমার দুজনেরই যখন উপকার হবে, তবে তাই করি না কেন। টাকাগুলো গুনে-গুনে একটা ব্যাগে ভরে ভাবলেন যে কোনদিন ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এলেই হবে, ঠিক তক্ষুণি এক রুগীর বাড়ী থেকে ডাক এলো। এরকম লোভনীয় সুযোগও এখানে খুব কমই আসে। এতগুলো টাকা হাতের কাছে রাখা এই বাক্সটাতে রাখতেও তিনি ভরসা পাচ্ছেন, অগত্য ব্যাগটা তাতে রেখেই রুগী দেখতে চললেন। ফিরে আসতে তিনটে বেজে গেল, এতক্ষণে নিশ্চয়ই ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গেছে। আজ আর তাহলে তার টাকা জমা দেওয়া হোল না। প্রতিদিনের মতো ডিস্‌পেনসারীতে এসে বললেন। রাত আটটা বাজতেই সব বন্ধ করে বাড়ীর ভেতরে যাবেন বলে বাক্স খুলে ব্যাগটা বের করে হাতে নিতেই বেশ কিছুটা হালকা মনে হোল, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, এ কি করে সম্ভব ? পাঁচশো টাকা কম ! বিক্ষিপ্ত ব্যাকুলতার সঙ্গে বাক্সটার ভেতরে হাতরে দেখলেন, কিন্তু না, কোথাও তো নেই ! হতাশ হয়ে সামনে রাখা চেয়ারটাতে বসে স্মরণ-শক্তিকে একত্রিত করতে চোখ বুজে ভাবতে শুরু করলেন, আর কোথাও রাখিনি তো ? পিয়নটা কম দেয় নি ? নাকি আমারই গুনতে ভুল হোল ? পঁচিশ-পঁচিশ করে বাণ্ডিল করলুম, পুরো তিরিশটা বাণ্ডিল হোল, হ্যাঁ, খুব মনে আছে। একটা-একটা করে বাণ্ডিল গুণে ব্যাগে রেখেছি, আমার স্মৃতি-শক্তি এতো কম নয়। স্পষ্ট মনে আছে। বাক্সতে তালা লাগালুম, ওঃ হোঃ ! এবার বুঝতে পারছি, চাবিটা টেবিলের ওপরই ফেলে গিয়েছি। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ওটা পকেটে ঢোকাতেই ভুলে গেছি। ওই তো এখনো টেবিলের ওপর পড়ে আছে। কিন্তু বাইরের দরজা বন্ধ, তাহলে নিলটা কে ? ঘরের কেউ তো আমার টাকা-পয়সায় হাত দেবে না, আজ পর্যন্ত তো এমন ঘটনা ঘটে নি ! তাহলে এ নিশ্চয়ই কোনো বাইরের লোকের কম্ম ! হতে পারে, কেউ হয় তো দরজাটা খুলে রেখেছিল, আবার এও হতে পারে কেউ ওষুধ নিতে এসে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা চাবি দেখে বাক্স খুলে টাকা বের করে নিয়েছে।

এইজন্যে আমি কিছুতেই খুচরো টাকা নিতে চাই-না, পিয়নটাই যে করে নি কে বলতে পারে ? যদ্দূর সম্ভব সে-ই আমাকে বাক্সের মধ্যে ব্যাগটা রাখতে দেখেছিল। এখন দেখছি টাকাটা জমা দিয়ে দিলেই হোত, পুরো··· হাজার টাকা হয়ে যেতো, সেই সঙ্গে সুদটাও বেড়ে যেতো। এখন কি করবো ?

পুলিশে খবর দিলে কেমন হয় ? খামোকা অশান্তি টেনে এনে তো লাভ নেই। পাড়া-সুদ্ধু লোক এসে দরজায় ভীড় করে মজা দেখবে। কাজের কাজ কিছুই হবে না, মাঝের থেকে দশ-পাঁচজন লোককে নিয়ে টানাপোড়েন চলবে, ফালতু গালাগালি খেতে হবে! তাহলে কি ধৈর্য্য ধরে ব্যাপারটা দু-চার দিন আরও দেখবো ? আচ্ছা, এতে কি আর ধৈর্য্য রাখা যায়! গায়ের রক্ত জল করা পয়সা বলে কথা। কালো টাকা হলেও বা কথা ছিল, তখন ভেবে নিতাম যে ভাবে এসেছে সে ভাবেই গিয়েছে, এতটা দুঃখ হোত না। কিন্তু এত যে কাট-ছাঁট করে সংসার চালাচ্ছি, এত করেও শেষে কৃপণ নাম কিনতে হোল, তা হোক, ওসব কথায় কান দেয় পাগলে, বুঝে শুনে খর্চা করবো না তো কি ঠগ-জোচ্চোর-লম্পটের পেছনে ঢালবো ? নয় তো ভাল খেতে ভাল পরতে কার না ইচ্ছে করে ? রেশমী কাপড়ের ওপর কোনো বিদ্বেষ নেই, না আছে মাংস পোলাও কালিয়াতে কোর্মায় অরুচি, পেটের রোগও নেই যে রাবড়ি খেলেই অজীর্ণ হবে, দৃষ্টি-শক্তি কম হলেও বা কথা ছিল যে সে জন্যে সিনেমা-থিয়েটারে যাই না। ওসব দিক থেকে নিজের মনটাকে মেরে রেখেছি কি জন্যে, না হাতে দুটো পয়সা থাকলে আমারই তো থাকবে না কি! ব্যবসার যা অবস্থা, বলা তো যায় না কখন কি হয় ? তখন আবার কার কাছে হাত পাততে যাবো ? ভেবেছি জমি-জমা কিনে বাগান-বাড়ী করে বাকী দিনগুলো একটু শান্তিতে থাকবো। এতো কষ্টে এই ফল হোল! শুধু কি তাই পরিবারের কোন ইচ্ছেই কোনোদিন পূরণ করিনি। কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ। আমি কপাল চাপড়াচ্ছি, আর যে নিয়েছে তার তো পোয়া-বার, বাড়ীতে নিশ্চয়ই এতক্ষণে আনন্দের হাট বসিয়েছে। কি অন্যায় কথা! একেই বলে ঘোর কলি।

এর প্রতিশোধ নিতে ডাক্তারবাবু ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। সাধু-ফকির বা কোনো ভিখিরীকে একটা পয়সা দেওয়া দূরে থাক বাড়ীর ধারে কাছে আসতেই দিই নি। বন্ধু-বান্ধবদের আবদার সব সময় এড়িয়ে চলেছি, নেমন্তন্ন করে খাওয়াবো কি, কখনো এক-কাপ চা দিয়েও আপ্যায়ণ করেছি বলে মনে পড়ে না। আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে সব সময় দূরে দূরেই থেকেছি, তা কি এই জন্যে। কে নিয়েছে, ঘুনাক্ষরে জানতে পারলে একটা পয়জনাস ইন্‌জেকশানেই তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতাম।

কিন্তু কোনো উপায় নেই। চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতোই আমার অবস্থা, জোলার যত রাগ তার দাড়ির ওপর। ডিটেকটিভ ফিটেকটিভ ওসব নাম কেওয়াস্তে, কাজের কাজ কিছুই করবে না, মাঝের থেকে

আরো জল ঘোলা করে দেবে। পলিটিক্স-এর ব্যাখ্যা আর মিথ্যে রিপোর্ট দিতেই তাদের সময় কেটে যায়। মিস্মেরিজম জানে এমন কারোর কাছে গেলে নিশ্চয়ই একটা সুরাহা হবে। শুনছি, আজকাল ইউরোপ, আমেরিকাতেও নাকি অনেক চুরি-টুরির সন্ধানে এর সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু এখানে তেমন ওস্তাদ পাওয়াই দুষ্কর, আর পেলেও তাদের ওপর বিশ্বাস করা যায় না। জ্যোতিষীদের মতো তারাও আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে বসে থাকে। তবু এখনো কিছু লোকের নাম শোনা যায়। আমি অবশ্য ও সব আজগুবি গাল-গপ্পে যদিও বিশ্বাস করি না, তবু একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে, নয় তো এ বিজ্ঞানের যুগে এর কোনো অস্তিত্বই থাকতো না। আজকালকার শিক্ষিত সমাজে আত্মিক বল খুঁজে পাওয়াই ভার, তবু কেউ যদি চোরের নামটাও অন্তত বলে দিতে পারে মুহূর্তের জন্যেও আর কিছু না হোক শান্তি পাবো, এছাড়া আর কি-ই-বা লাভ হবে? প্রতিশোধ নিতে তাই বলে খুন খারাপি তো করতে পারবো না।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। নদীর ধার দিয়ে যাবার সময় ওই ওঝাকে তো বসে থাকতে দেখেছিলাম, ওর তো এদিকে বেশ নাম-ডাক আছে বলেই শুনেছি। শোনা যায় ওর মন্ত্রের জোরে, চোর বেটা নাকি বমাল ধরা পড়ে, ঘাটের মড়াও উঠে বসে, এইবারে যে ও কত মৃতপ্রায় রুগীকে ভাল করে দিয়েছে কি বলবো, অবশ্য সবই শোনা কথা, চোখে দেখিনি, এবার দেখতে হবে ওর মন্ত্র চালান কি জিনিস! চোরের উদ্দেশ্যে মন্ত্র চালান দিলে সে যেখানেই থাক তার মুখ থেকে রক্ত উঠবে, যতক্ষণ না মাল ফেরত দেবে ততক্ষণ রক্ত বন্ধ হবে না। ব্যাপারটা সত্যি হলে আর দেখতে হবে না! আমার বুকটা ঠাণ্ডা হবে! মনের ইচ্ছেও পূর্ণ হবে। টাকাটা তো পাবই, সেই সঙ্গে চোরও এমন শিক্ষা পাবে যে সারাজীবন মনে থাকবে। ওর ওখানে তো রাত-দিনই ভীড় লেগে রয়েছে। কিছু উপকার না পেলে কি আর এতগুলো লোক এমনি-এমনি আসে? এছাড়া ওঝার মুখেও প্রতিভার ছাপ রয়েছে। শিক্ষিত সমাজ ওকে বিশ্বাস না করলেও অশিক্ষিত লোকেরা তাকে দেবতা জ্ঞানে পূজো করে। ভূত-প্রেত ইত্যাদির কথা তো রোজই শোনা যায়। ওই ওঝার কাছে গেলে হয় না? লাভ না হলেও ক্ষতি তো হবে না। পাঁচশো টাকা তো গেছেই, আরও নাহয় দু-চার-পাঁচ টাকা যাবে। এখন ভীড়টাও একটু কম থাকবে, যাই দেখি।

৩

মনে-মনে স্থির করে ডাক্তারবাবু ওঝার বাড়ীর পথেই পা বাড়ালেন:

শীতের রাত। ন'টা বাজতে না বাজতেই রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। আশেপাশের বাড়ীগুলো থেকে রামায়ণ পড়ার সুর ভেসে আসছে। কিছুক্ষণের পর আর তাও শোনা যাচ্ছে না। জমির আলের পথ ধরে চলছেন। দু'ধারে কচি ফসলের ভারে গাছগুলো নুয়ে পড়েছে। ডাক শুনে মনে হচ্ছে আশেপাশেই একদল শেয়াল ঘোরা-ফেরা করছে। এর আগে এদের হুয়াক্কা হুয়া ডাক এত কাছ থেকে শোনবার সৌভাগ্য ডাক্তারবাবুর হয়নি। ধারে-কাছেই আছে বলে নয়, এই জন-মানবহীন রাতে এত কাছ থেকে ওদের সমস্বরে চীৎকার শুনে তাই তার গা ছম্-ছম্ করতে থাকে। বেশ কয়েকবার হাতের লাঠিটা মাটিতে ঠুকলেন, পা দিয়েও মাটিতে ধম্-ধম্ শব্দ করলেন। শেয়ালের মতো ভীতু জানোয়ার খুব কমই আছে, মানুষের কাছে না ঘেষলেও পাগলা শেয়ালে কামড়ালে আর রক্ষে নেই। কথাটা চাড়া দিতেই নানান ধরণের জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া, পাস্তুর ইনস্‌টিটিউট, সুপুরি পোড়া এইসবের কথা মনে আসতেই মাথাটা কেমন যেন ঘুরতে শুরু করে। বড়-বড় পা ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে-যেতে ভাবতে থাকেন— বাড়ীর কেউ যদি টাকাটা নিয়ে থাকে তাহলে! মুহূর্তটাক মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে ঠিক করে নেন, তাতে হয়েছেটা কি? বাড়ীর লোক বলে কি ছাড় পেয়ে যাবে? তাদের আরও কড়া সাজা দেওয়াই উচিত। কই, চোরের তো আমার ওপর দয়া হোল না, পরিবারের সহানুভূতি কি আমি দাবী করতে পারি না? তাদের জানা উচিত, যা কিছু করছি সব তাদের সুখের জন্যেই। রাত-দিন যে কলুর বলদের মতো খেটে মরছি, তা কি শুধু নিজের জন্যেই? তারা যদি আমার চোখে ধুলো দিতে চায়, তাহলে তাদের মতো অকৃতজ্ঞ, নিষ্ঠুর, পাষাণ প্রাণ আর কার আছে বলতে পারেন? এমন শিক্ষা দেবো, যাতে আর কোনদিন এমন কর্ম করার সাহস না পায়, হুঁ, ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখোনি। দেখাচ্ছি মজা!

ওঝার বাড়ীতে এসে কোনোরকম ভীড় না দেখে খুব খুশী হলেন। তবে হ্যাঁ, যেন একটু দমে গেছেন। আবার ভাবছেন এসব ব্যাপার বুজরুকি, ভাওতাবাজি হলে তো লজ্জার একশেষ হতে হবে। যে শুনবে, সে-ই হাসবে। তাছাড়া ওঝার কাছেও ছোট হয়ে যাব। কিন্তু এসেই যখন পড়েছি, তখন দেখাই যাক্ না। কিছু না হলেও যাচাই তো করা যাবে। ওঝা জাতিতে চামার, নাম বুদ্ধু, সবাই চৌধুরী বলেই ডাকে। ছোট ঝুপড়ীর মতো ঘর, তাও আবার তেমনি নোংরা। এত নীচু যে বসে ঢুকলেও যেন চালাটা

মাথায় এসে লাগলো বলে। উঠোনে এক নিমগাছ, তলাটা বেদীর মতো বাঁধানো। গাছটার মগডালে এক টুকরো লাল কাপড় হাওয়ায় পতাকার মতো উড়ছে। বেদীর ওপর অগনিত সিঁদুর মাখানো ছোট-ছোট মাটির হাতী দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই একটা ত্রিশূল খাড়া করে রেখেছে, দেখে মনে হচ্ছে হাতীগুলোর গতি শ্লথ হয়ে এলেই ওটা দিয়ে চাবুকের কাজ চলবে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন দশটা বেজে গেছে। বুদ্ধু চৌধুরী এক ছেঁড়া চটের ওপর বসে নারকেল খাচ্ছে, পাশেই একটা বোতল ও গ্লাস রাখা আছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এককালে বেশ চটকদার ভুঁড়ি সেই সঙ্গে প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

ডাক্তারবাবুকে দেখেই বুদ্ধু বোতলটা লুকিয়ে ফেলে, নীচে এসে প্রণাম করে। এক বুড়ি ঘরের ভেতর থেকে একটা মোড়া এনে ডাক্তারবাবুকে বসতে দেয়। তিনি বেশ লজ্জিতভাবেই সব কথা খুলে বলেন।

বুদ্ধু সব কথা শুনে বেশ বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলে—এ আর এমন কি কথা। এই তো রবিবার দিনে দারোগাবাবুর ঘড়ি চুরি হয়ে গেল, অনেক চেষ্টা করেও না পেয়ে শেষে আমাকে ডেইক্যে পাঠালেন। আমি ত শুনেই মালটা কোথায় আছে তা বলে দিলুম। দারোগাবাবু ত আমায় পাঁচটা ট্যাকা বকশিস্ দিয়ে দিলেন। কালই তো, জমাদারসাবের মাদী ঘোড়াটা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। লোকজন সব চারদিকে ছোটাছুটি করতে শুরু করে দিলে। আমার কথা মত জায়গায় গিয়ে দেখে জানোয়ারটা মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছে। উস্তাদের কাছে শেখা বিদ্যের দৌলতেই তো সবাই আমাকে মেনে-গুণে চলে।

এ সময় দারোগা আর জমাদারের কথা শুনতে ডাক্তারবাবুর ভাল লাগছে না। এ ধরণের আকাট মূর্খদের কাছে দারোগা-জমাদারই হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তাই তিনি বললেন—আমার কিন্তু শুধু চুরির মাল ফেরৎ পেলেই চলবে না, চোরকে কঠিন সাজাও দিতে হয়।

বুদ্ধু তো কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে, বিড়-বিড় করে কিসব বলে নিল, তারপর বেশ কয়েকবার তুড়ি বাজিয়ে চোখ খুলে বলে—এ আপনার ঘরেরই কারুর কম্ম গো ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু—তা হোক, চোরকে শায়েস্তা করতেই হবে।

বুড়ী—শেষকালে খারাপ কিছু হলে ত্যকন গো আমাদিগেই দোষ দিবেগ বাবু।

ডাক্তারবাবু—ও নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না, অনেক ভেবে-চিন্তেই আমি একথা বলেছি! বাইরের লোক হলে তবু ক্ষমা করা যায়, কিন্তু ঘরের লোক, যাদের জন্যে এত কষ্ট করে, মুখে রক্ত তুলে রোজগার করছি, শেষকালে তারাই কি-না···। না-না, ঘরের লোক হলে তো কথাই নেই, এমন শিক্ষে দিতে হবে যাতে আর কেউ কোনদিন এমন অপকর্ম করতে কোনমতেই সাহস না পায়।

বুদ্ধু—তাহলে আপনি কি চাইছেন বটে?

ডাক্তারবাবু—চুরির মাল তো চাই-ই, সেই সঙ্গে চোরকেও আচ্ছা জব্দ করতে চাই।

বুদ্ধু—তাহলে ত মন্তর চালান দিতেই হয়। তুই কি বুলছিস্ গো মা? উটাই করবো বটে?

বুড়ী—না বাবা, উসব মন্তর চালান-টালান ছেইড়ে দে তু। শেষকালে কি হতে কি হইয়ে যাবে কে বুলতে পারে?

ডাক্তারবাবু—শোনো বুদ্ধু, তুমি মন্ত্র চালানই দাও, যত টাকা লাগে লাগুক! আমার সঙ্গে বেইমানি! দেখাচ্ছি মজা! শুরু করে দাও তো ভাই!

বুড়ী—ভেইব্যে ছাখ্ বোধা, মন্তরের ফেরে পইরত্যে যাবি ক্যনে? শুনিস্ লাই, বাঘে ধইরলে আঠ্যার ঘা খেইত্যেই হয়। কেউ জখম হইল্যে ত্যকন-ই বাবু ফের তুর কাচে এইস্তে মন্তর উঠায়ে লিতে বুইলবে। মন্তর ফিরায়ে লিয়া যে ক্যত্ত কষ্টের তা জেইন্যে-শুইন্যেও তু অবুঝ হইচিস্ ক্যনে বাপ?

বুদ্ধু—হ, ঠিকই বুলচিস্ বটে! আর একবার ভাল কইরে ভেবে লিন বাবু। মন্তর চালান দিব বটে, তব্যে তা তুইল্যে নিতে বুলবেন নাই। সে দায় কিন্তুক আমরা লয়।

ডাক্তারবাবু—বেশ তাই হবে, তুমি চালাও তো এখন।

বুদ্ধু তো মন্ত্র চালানের জন্যে যা যা লাগবে তার এক বিরাট ফর্দ করে ডাক্তারবাবুকে শোনালো। ডাক্তারবাবুর তো আর তর সইছে না, তিনিও সঙ্গে-সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। বুদ্ধুও মন্ত্র-চালানের আয়োজন করতে উঠে পড়লো। ডাক্তারবাবু বললেন—এমন মন্ত্র চালাবে যাতে চোর মাল শুদ্ধু আমার সামনে এসে হাজির হয়।

বুদ্ধু—সেজন্যে আপনাকে ভাইব্‌তে হবেক লাই। লিচ্চিন্তে ঘরে ফিরে যান গো ডাক্তারবাবু।

৪

রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ বন্ধুর কাছ থেকে বাড়ীর পথে পা বাড়ালেন। একে শীতের রাত, তার ওপর ঠাণ্ডাও পড়েছে বেশ জাঁকিয়েই। মা আর স্ত্রী দু'জনেই তার পথ চেয়ে বসে আছেন। কন্‌কনে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে মাঝখানে একটা আগুন-পাতিল রেখে শরীর গরম করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সে চেষ্টার প্রভাব দেহের চেয়ে মনের ওপরই পড়ছে বেশী। কেননা ডাক্তারবাবুর মতে এটাও এক ধরণের বিলাসিতা। বুড়ী ঝি জগিয়াও সেখানেই একটা ছেঁড়া চট গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। থেকে-থেকে উঠে নিজের অন্ধকার ঘরে গিয়ে কুলুঙ্গী হাতড়ে এসে আবার নিজের জায়গাতেই পড়ছে। বারে-বারে জিজ্ঞেস করছে—ক'টা বাইজ্‌লো গ মা?

সামান্য শব্দেই চম্‌কে উঠে এদিকে-ওদিকে দেখছে। কোনদিনও ডাক্তারবাবু এত দেরী করেন নি, তাই সবাই অস্থির হয়ে উঠেছে। রুগী দেখতে-দেখতেও তো কক্ষণো এত রাত হয়নি। কিছু লোকের যদিও তার ওপর অগাধ বিশ্বাস, তবু এত রাতে শত দরকারেও কেউ এ-গলির পথ মাড়াবে কি-না সন্দেহ। সভা-সমিতি বা কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে তো তাব জ্বর আসে। বন্ধু-বান্ধব নেই বললেই চলে, যাও বা আছে, তাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগও নেই।

মা ভাবতে-ভাবতে বলেন—কে জানে কোথায় গিয়ে বসে আছে, খাবার-দাবার যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে সে খেয়াল আছে?

স্ত্রী অহল্যা বলেন—মানুষ তো কোথাও গেলে বলে-টলে যায়, রাত দুপুর গড়াতে চললো।

মা—হয়তো কোথাও গিয়ে আটকে পড়েছে, নয়তো বাড়ীর বাইরে গিয়ে আড্ডা দেবার সময় কোথায় বাছার?

অহল্যা—যখন খুশী আসুক, এই আমি শুতে চললুম। সারা রাত বসে-বসে কে পাহারা দেবে।

শাশুড়ী-বৌ-এর কথার মাঝখানেই ডাক্তারবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন। অহল্যা মাথার ঘোমটা, গায়ের চাদরটা ঠিক করে নিয়ে বসলেন; জগিয়াও ধড়ফড় করে উঠে বসে ভয়ে-ভয়ে ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে তাকাতে থাকে।

মা জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় গিয়েছিলি, যে এত রাত হোল?

ডাক্তারবাবু—তোমরা তো মহা আরামেই বসে আছ! আমার দেরী হলেই বা কি আর না হলেই বা কি! যাও, শুয়ে পড় সব। তোমাদের

ওসব উপরি ভালবাসা আমি বুঝি না ভেবেছ। সুযোগ পেলেই গলায় ছুরি বসাচ্ছো, ঢের হয়েছে বাবা, আর মায়া-কান্না কাঁদতে হবে না।

মা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বলেন—এসব কেন বলছিস্ বাবা? ঘরে আর তোর কে এমন শত্রু আছে যে পেছনে লাগবে?

ডাক্তারবাবু—না-না, ওসব ভাল-ভাল কথায় আর কাজ নেই, যমপুরীতে বাস করছি, যে কোনো সময় আমার এই বুকটাতে তোমরা ছোরা বসিয়ে দিতে পার। নয়তো চোখ ফিরতে না ফিরতেই আমার টেবিলের ওপর থেকে জল-জ্যান্ত পাঁচশো টাকা উধাও! বাইরের দিক দিয়েই তো দরজা বন্ধ ছিল, এমন কেউ তো আসেও নি, তোমরা না নিলে টাকাগুলোর কি পা গজালো? যে আমার এমন সর্বনাশ করতে পারে, তাকে কি করে নিজের লোক ভাবি বল তো। বুদ্ধু ওঝার কাছ থেকেই তো এলাম। ও তো পরিষ্কার বলে দিয়েছে, এ ঘরের লোকেরই কারসাজি। আমিও জানি সোজা আঙুলে কখনো ঘি ওঠে না। বুনো ওলের জন্যে তাই বাঘা তেঁতুলের ব্যবস্থা করেছি। বাইরের লোক হলেও নাহয় মেনে নিতাম। কিন্তু যে লোকগুলোর জন্যে রাত-দিন কলুর বলদের মতো দিন-রাত খেটে মরছি, আর তারাই কি-না আমার সঙ্গে চাতুরি করছে! কোনো ক্ষমা নেই! দেখনা, ভোর হতে না হতেই চোরের কি দশা হয়! আমিও ওঝাকে মন্ত্র চালান দিতে বলে এসেছি। তখন চোরের বাবার সাধ্য কি তাকে রক্ষা করে।

জাগিয়া ঘাবড়ে গিয়ে বলে ওঠে—জাদু-টোনা চালান দিতে বলে এয়েচো? করেচোটা কি ভাই, সে যে প্রাণে মেরে দেবে।

ডাক্তারবাবু—চুরির সাজা তো পেতেই হবে।

জগিয়া—কোন ওঝার নাম বললে?

ডাক্তারবাবু—বুদ্ধু চৌধুরীর নাম শোনো নি?

জগিয়া—ওরে বাপরে, ওর মন্তর তো আবার কাধে চেপে বসে, নামার নামও করে না।

ডাক্তারবাবু নিজের ঘরে চলে গেলে মা বললেন—কিপ্টের ধন যক্ষে খায়। পাঁচ-পাঁচশো টাকা, কোন আবাগীর বেটা গায়েব করলে গা! ও টাকায় আমার অমন সতেরো ধাম তীর্থের পুণ্যি হোত!

অহল্যা—বেশ হয়েছে, আমার বুকটা ঠাণ্ডা হয়েছে। একজোড়া কঙ্কণের জন্যে সেই কবে থেকে মাথা খুঁড়ে মরছি, দিলে? ভগবান আছেন, হ্যাঁ।

মা—ঘরের কে-ই বা ওর টাকা হাত দেবে?

অহল্যা—আপনি থামুন মা, দরজা নিশ্চয়ই খোলা ছিল, এ বাইরের লোকেরই কম্ম।

মা—ঘরের লোকেই যে টাকাটা নিয়েছে একথা ও বিশ্বাস করলো কি করে?

অহল্যা—টাকার জন্যে মানুষ পারে না হেন কাজ নেই, ওটা ওরই মন গড়া কথা।

৫

রাত একটা বেজে গেছে। জয়পাল ডাক্তার একটা বীভৎস স্বপ্ন দেখছিলেন। হঠাৎ অহল্যা এসে বলেন—এই, একটু ওঠো তো, জাগিয়া কিরকম যেন করছে। জিভ বেরিয়ে গেছে, মুখ দিয়ে গেঁজলা উঠছে, চোখের মণি দুটোও পাথরের মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কোনো কথাও বলছে না।

ডাক্তারবাবু চমকে উঠে বসলেন। কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখলেন ভাব খানা এমন যেন, এটাও স্বপ্ন নয় তো। একটু ধাতস্থ হয়ে বললেন—কি বলছো! জগিয়ার কি হয়েছে?

অহল্যা ফের জগিয়ার অবস্থার কথা শোনালেন। ডাক্তারবাবুর মুখে যেন একটা হালকা হাসির আভা ছড়িয়ে পড়লো। বললেন—মন্ত্রে কাজ হয়েছে। চোর ধরা পড়েছে।

অহল্যা—ঘরের আর কেউ তো নিতে পারে, না—কি?

ডাক্তারবাবু—তাহলে তারও এই দশাই হোত, এমন শিক্ষা হোত, যাতে সারা জীবনেও আর চুরির চিন্তা না করতে পারে।

অহল্যা—পাঁচশো টাকার জন্যে একটা মানুষকে মেরে ফেলবে! তুমি মানুষ, না আর কিছু!

ডাক্তারবাবু—পাঁচশো টাকার কথা হচ্ছে না, দরকার হলে মিথ্যে প্রবঞ্চনার শাস্তি দিতে পাঁচ-হাজার টাকা খর্চা করতেও রাজী।

অহল্যা—কি পাষাণ তুমি!

ডাক্তারবাবু—তোমার আপদ-মস্তক সোনায় মুড়ে দিতে পারলে তুমিও আমায় মাথায় তুলে নিয়ে নাচতে, তাই না? তোমার ঘাড়ে এসে চাপলে খুশী হতুম।

একথা বলতে-বলতে তিনি জগিয়ার ঘরে গেলেন। এসে দেখেন, অহল্যা যা বলেছেন তার চেয়েও খারাপ অবস্থা। চোখে-মুখে আসন্ন মৃত্যুর ভয়াল ছায়া, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে একটু বেঁকে গেছে, নাড়ী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ডাক্তারবাবুর মা তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে চোখে-মুখে ঘন-ঘন জল ঝাপটা দিচ্ছেন। অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবু ভয় পেয়ে গেলেন। কোথায় চোরকে ধরতে পেরে খুশী হবেন, তা নয়, আপশোষ করছেন। মন্ত্র চালানের প্রভাব যে এত তাড়াতাড়ি প্রাণ-ঘাতী আকার ধারণ করবে তা তিনি অনুমান করতেও পারেন নি। এ যে মেঘ না চাইতেই জল। চোর কোথায় হাত-জোড় করে যন্ত্রণায় কাতরাতে-কাতরাতে তার কাছে এসে দাঁড়াবে, তা নয়, একেবারে মরতে বসেছে! প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছের এই আশাতীত সফলতা দেখে কোথাও আনন্দিত হবেন, এ তা নয়, এই মর্মান্তিক দৃশ্য বুকের পাঁজরে যেন হাতুড়ির আঘাত হানতে শুরু করলো। যতই যাই হোক না কেন এই জগিয়াই সন্তান স্নেহে কোলে-পিঠে করে তাকে মানুষ করেছে, এই কৃতজ্ঞতা বোধ তার প্রতিহিংসা চরিতার্থের টুঁটি টিপে ধরলো। অন্তরের ঘুমিয়ে থাকা মনুষ্যত্বটা জেগে উঠলেই নিজেদের নির্দয়তা-কঠোরতার ভুল বুঝতে পারি। প্রত্যক্ষ ঘটনা চিন্তা-ভাবনার চেয়েও অধিক ফলপ্রসূ। রণস্থলের বর্ণনা কতই না কবিত্বময়। যুদ্ধ-বেশের কাব্যও মানুষের মনকে উত্তেজিত করে তোলে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের পদদলিত রক্তাক্ত শবের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভয়াবহ রূপ দেখে সবাই শিউরে ওঠে। কেননা, দয়া যে মানুষের স্বাভাবিক গুণ।

শীর্ণকায়া, দুর্বল জগিয়া তাহলে তারই রোষের বলি, এর বেশী তিনি ভাবতে পারছেন না। আর কারো ওপর তার এই প্রতিশোধের প্রভাব পড়লে, এমন কি স্ত্রী-পুত্রের ওপর পড়লেও এমন করে ভেঙ্গে পড়তেন না। কিন্তু মরাকে মারা, পদদলিতকে দলানো একই কথা, এ প্রতিঘাত তার আত্ম-সম্মানের বিরুদ্ধাচারণই করেছে। পেটে ভাত নেই, পিঠে কাপড় নেই, আশা-আকাঙ্ক্ষা-গুলো অনেকদিন আগেই অন্ধকারে চাপা পড়ে আছে, বেচারীর একটা ইচ্ছেই তো কোনদিন পূর্ণ হয় নি, ওর পা পিছ্‌লে যাওয়াটা স্বাভাবিক। সামান্য এটুকুর জন্যে জগিয়াকে ক্ষমা করা যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডিস্‌পেন্‌সারীতে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার মোক্ষম ওষুধগুলো মিলিয়ে এক অদ্ভুত মিক্‌চার তৈরী করে এনে জগিয়ার গলায় ঢেলে দিলেন। কিন্তু এতে রুগীর অবস্থার কোনো পরিবর্তন হোল না দেখে বৈদ্যুতিক যন্ত্র নিয়ে এসে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই জগিয়া চোখ খুললো। অমনোযোগী ছাত্র যেমন মাষ্টার মশাইয়ের ছড়ির দিকে তাকায়, লজ্জা মাখানো চোখে সেও ঠিক তেমনি করে ডাক্তারবাবুর দিকে দেখে, তারপর সর্দি জড়ানো গলায় আস্তে-আস্তে বলে—হায় ভগবান একি হোল, বুকটা জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে যে। তোমার টাকা

তুমি নিয়ে নাও, কুলুঙ্গীতে হাড়ীর মধ্যে আছে। ওরে বাবা! আর পারছি না! আর কষ্ট দিও না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে রক্ষে করো কি কুক্ষণেই না ডিস্‌পেন্‌সারীতে ঢুকেছিলাম। তেথ-ধম্ম করবো বলে ও টাকাটা সরিয়ে ছিলুম। কটা ট্যাকার জন্যে আমাকে এভাবে শেষ করে দিলে! ও ভগবান, ও মা কালী, বাঁচাও আমাকে, আর পারিনে!

একথা বলতে-বলতে ফের অজ্ঞান হয়ে গেল, নাড়ীর গতিও বন্ধ হয়ে গেছে, নীল ঠোঁট একটু-একটু করে কাঁপছে, সারা শরীরে অব্যক্ত যন্ত্রণার খিচুনী। ভয়ে-ভয়ে ডাক্তারবাবুর অহল্যার দিকে তাকিয়ে বলেন—অনেক চেষ্টা তো করলুম, এ রুগীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনা আমার সাধ্যের বাইরে। মন্ত্র চালান যে এ তো সাংঘাতিক তা কি করে জানবো? এ মরে গেলে জীবন-ভর পছ্‌তাতে হবে। বিবেকের দংশণে আজীবন জ্বলতে হবে। কি যে করি, আমার মাথায় তো কোনে বুদ্ধিই আসছে না।

অহল্যা—কোনো সিবিল-সার্জেনকে কল দিলে হয় না! এর চেয়ে ভাল ওষুধও তো দিতে পারেন? জেনে-শুনে আগুনে হাত দিতেই বা যাওয়া কেন বাপু!

ডাক্তারবাবু—যা করেছি, সিবিল সার্জেনেও তাই করতেন। খুনেটা যে কি মন্ত্রই না চালান দিলে কে জানে? এর অবস্থা তো এখন-তখন। ওঝার মার কথা শুনলেই ভাল হোত, সে বুড়ী তো অনেক বারণ করেছিল, কিন্তু রাগের মাথায় তখন তার কথায় কানই দিলাম না, এখন ফল ভোগ করতে হচ্ছে!

মা—আমি বলি কি, তুই বরং সেই ওঝার কাছেই যা খোকা। মরে গেলে তখন খুনের দায়ে পড়বি। লোকের কাছে মুখ দেখানোই ভার হবে।

৬

রাত দুটো বেজে গেছে, হাড়-কাপানো ঠাণ্ডায় ডাক্তারবাবু লম্বা-লম্বা পা ফেলে বুদ্ধু চৌধুরীর বাড়ীর দিকে যাচ্ছেন। একটা টাঙ্গা বা এক্কা পাওয়া যায় কি-না, এদিক সেদিক ব্যর্থ দুচোখ তারই সন্ধান করছে। মনে হচ্ছে বুদ্ধুর বাড়ীটাও আজ অনেক দূরে চলে গেছে। বেশ কয়েকবার থমকে দাঁড়ালেন, পথ ভুল হয়নি তো? এর আগেও তো এদিকে এসেছি, তখন তো এ বাগানটা চোখে পড়ে নি? লেটার বক্স, এ ব্রিজটা তো আগে দেখিনি? নিশ্চয়ই ভুল পথে এসেছি। কাকেই বা জিজ্ঞেস করি। নিজের স্মরণ-শক্তিকে ধিক্কার দিয়ে আরও কিছুটা পথ প্রায় ছুটে এগিয়ে গেলেন। ওঝা বেটাকে এসময় পাওয়া

যাবে কি-না কে জানে, হয় তো মদে চুর হয়ে আছে। ওদিকে বেচারী না মরে যায়। কয়েকবার মনে হোল বাড়ীই ফিরে যাই, যা হবার হবে, কিন্তু অন্তঃপ্রেরণার তাগিদে তা আর হয়ে উঠলো না। ওই তো বুদ্ধুর কুঁড়েঘরটা দেখা যাচ্ছে। ডাক্তার জয়পালের ধড়ে যেন প্রাণ এলো। দরজার কাছে এসে খুব জোরে কড়া দুটো নাড়লো। কুকুরটাই ভেতর থেকে অসভ্যতাপূর্ণ উত্তর দিল, কিন্তু কোনো জন-মানবের সাড়া-শব্দও নেই। আরও জোরে খট্-খট্ করে কড়া নাড়তে ভেতরের কুকুরও গলার স্বর চড়িয়ে দিল, বুড়ীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। বললো—ইত্য রাইতে ক্য বটে, কেওয়ারটা ভাইঙ্গে ফেলবেক কি?

ডাক্তারবাবু—আমি গো, যে কিছুক্ষণ আগে এসেছিলাম, সেই ডাক্তার-বাবু।

গলার শব্দ শুনে চিনতে পারলো, ভাবলো, নিশ্চয়ই বাড়ীরই কারোর কোনো বিপদ হয়েছে, নয় তো এতো রাতে আসবেই বা কেন; কিন্তু বুদ্ধু তো এখনো মন্ত্র চালান দেয় নি। তাহলে কেমন করে হোলো, অত করে বলা সত্বেও তখন শুনলো না। এখন ফাটা বাঁশে আটকে পড়ে ছুটে এসেছে। উঠে লম্প জ্বেলে বাইরে বেড়িয়ে এলো।

ডাক্তারবাবু বুড়ীকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন—বুদ্ধু চৌধুরী ঘুমোচ্ছে ন-কি? একটু জাগিয়ে দাও না।

বুড়ী—অরে বাপরে বাপ, এখুন অকে জাগাতে গেলেই আম্মাকে কাচ্চাই খেইয়ে লিবে, রাইতে লাট সাহেব এইলেও ও উঠবেক লাই, হ।

ডাক্তারবাবু খুব সংক্ষেপেই পুরো ঘটনাটা বলে নিয়ে বুড়ীকে প্রায় করজোড়ে বুদ্ধুকে জাগিয়ে দিতে বললেন। এরই মধ্যে বুদ্ধু নিজে থেকেই উঠে বাইরে এসে চোখ রগরাতে-রগরাতে বলে—কি হয়েছে ডাক্তারবাবু?

বুড়ী প্রায় চীৎকার করে ওঠে—অরে মুখপোড়া, আইজ তর কালঘুম ভাইঙ্গলেক ক্যমনেরে? আম্মু জাগাইতে গেইলেত খেইত্যে আসিস।

ডাক্তারবাবু—যা বলার সব মাকেই বলেছি, ওর কাছে শোনো।

বুড়ী—কিছু লয়, তু মন্তর চলায়ে দিলি তো, বাবুর ঘরের ঝিই ট্যাকা লিয়েছে বটে, অখন তো যায়-যায়।

ডাক্তারবাবু—হ্যাঁ ভাই, একটা যা হোক উপায় তোমায় করতেই হবে।

বুদ্ধু—হ, তবে কি-না মন্তর ফিরায়ে লিয়া ঘুম কঠিন।

বুড়ী—উসব করিস লাই বুদ্ধু, তুর জানটাকেও জখম কইরে দিতে পারে। মন্তর-উন্তর লিয়ে কি খেলা কতা।

ডাক্তার—বুদ্ধু ভাই, কথা রাখো, তোমার হাতেই ওর জীবন।

বুড়ী—ইসব কি বলচো গো ডাক্তর, উর লেগে কি আমার বেটা কাল-কেউটার ল্যাজে হাত দিবে? তুম্মাকে অ্যত কইয়ে বল্লুম, শুইন্‌লে লাই। ইখ্যন কি আর উ আম্মাদের হাতে?

ডাক্তারবাবু—রাত-দিন তোমরা এইসবই করছো, আট-ঘাট সব জানো। মারতেও পার আবার বাঁচাতেও পার। আমি তো ভাই আগে এসব বিশ্বাসই করতুম না। এখন দেখছি তোমার জুড়ি মেলা ভার। শুনেছি, কত লোককে তুমি যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছো, এ হতভাগী বুড়ীটাকেও যে দয়া করতে হবে ভাই।

বুদ্ধু একটু নরম হয়ে এলো, কিন্তু তার মা এ সব বিষয়ে পাকা-পোক্ত। তাই ভয় পাচ্ছিল, পাছে ছেলে না ব্যাপারটা বিগড়ে দেয়। বুদ্ধুকে বলার সুযোগ না দিয়ে সমানে বলে চলেছে—তা লয় হোইল্য, বিস্তুক বাবু, উর অ ত ঘরে পুল্যা-পান সবই রইচে। উ-সব জীন, উর মুখের গরাস ছিনাইয়ে লিলে উ কি আম্মাদের ছেইড়ে কত্তা কুইবে! নিজের কাম হাসিল হইয়ে গেইলে তুমি তো ডাক্তারবাবু কেইট্যে পড়বে গো, আমরা ত সিরকম লারব।

বুদ্ধু—হ বাবু, কামটা বড্ড কঠিন বটে।

ডাক্তারবাবু—তা মানছি, তবে যা লাগবে দেব।

বুড়ী—হ, হ, শ'-পঞ্চাশ ট্যাকা বড়জোর দিবেক বটে, উতে কি জীবনভর চইলবে? ক্যত্তবার বইব, মন্তর ফিরায়ে লেয়া আর সাপের মুখ্যে হাত ফেরনা একই কতা, উয়ারা সাক্ষাত যম।

ডাক্তারবাবু—বুদ্ধ ভাইয়ের মতো আমিও তোমার ছেলে মা। বলো, তুমি যা চাও, তাই দেব। বেচারা আমাকে ছোটবেলায় মায়ের মতই কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। এখানে কথায়-কথায় অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে, জানিনা ও বেঁচে আছে কি-না।

বুড়ী—দেরী ত তুম্মিই কইরচো বটে ডাক্তর, পাক্কা কতা বুলে উয়াকে লিয়ে চইলে যাও। তুমার খাতিরে একরাশ বিপদ মাথায় তুইল্যে লিয়েচি। এই পরথম আর এই শ্যাষ। সব জেইনে-শুইনে বিষ খেলম আর কি!

ডাক্তারবাবুর কাছে এখন প্রতিটি মুহূর্ত যেন এক-এক বৎসরের সামিল। বুদ্ধুকে তিনি সঙ্গে করেই নিয়ে যেতে চান। জগিয়ার প্রাণটা বেরিয়ে গেলে কি করেই বা মনকে প্রবোধ দেবেন। তার প্রাণের কাছে টাকার মায়াও তুচ্ছ। কেবল একটাই চিন্তা, জগিয়াকে এই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে যে

করেই হোক বাঁচাতে হবে। এই টাকার পায়েই তিনি একদিন নিজের, পরিবারের সকলের প্রয়োজন, আশা-আকাঙ্খাকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন, আর আজ নিছক মনের আবেগে সেই জিনিসই প্রায় দু'পায়ে দলে-মুচড়ে চলে যেতে উদ্যত হয়েছেন। বললেন—তুমি যা বলবে তাই করবো। চটপট বলো ভাই। আর দেরী করলে হয়তো জগিয়াকে বাঁচানো যাবে না।

বুড়ী—তা বেশ, উই পাঁচশ ট্যাকাই দিত্তে হবে, উর কমে লারব।

বুদ্ধু আশ্চর্য হয়ে মার মুখের দিকে তাকায়, ওদিকে কথাটা শুনেই তো ডাক্তারবাবুর মূর্ছা যাবার উপক্রম; নিরাশ হয়ে বলেন—এত টাকা দেবার সামর্থ্য আমার নেই মা, বুঝতে পারছি, বেচারী জগিয়ার কপালে মরাই লেখা আছে।

বুড়ী—তবে উয়াকে মরতেই দাও না ক্যানে। বুদ্ধু যা না ক্যনে, সারাদিন ইত খাটা-খাটুনি, শুয়ে পড় বাপ। আম্মাদের পরানটা কি পরান লয়।

ডাক্তারবাবু—ও বুড়ীমা, এতটা নির্দয় হও না, মানুষই তো মানুষকে সাহায্য করে।

বুদ্ধু—না বাবু, কথা দিলাম, যে করেই হোক উকে বাঁচায়ে তুলব। পাঁচশ লয়, আর কিছু কম করায়ে দিবেন। তবে হ, জখমির কথাটো মনে রাখবেন।

বুড়ী—তু ঘরকে যা না ক্যনে? ইত বড় কামটার লেগে ই ক'টা ট্যাকা দিতে ডাক্তারবাবুর কইল্জেটো শুকায়ে উইঠলো, ক্যনে, গরীব বলে আম্মাদের জানটা কি জান লয়? ভাল-মন্দ কিচু হইলে ত্যকন কি হবেক? ঘরে তো ভাঙ্গা সান্‌কি আর ছেঁড়া মাদুরি ছাড়া আর কিচ্ছুই লাই, কাচ্চা-বাচ্চাগুলান কি দোরে-দোরে ঘুইরবে?

ডাক্তারবাবু সসঙ্কোচে আড়াইশো টাকা বলতেই বুদ্ধু রাজি হয়ে গেল। তিনি ওকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর পথে হাটতে শুরু করলেন। আজকের মতো আত্ম-সন্তুষ্টি তিনি আর কখনো পেয়েছেন কি-না সন্দেহ। হেরে যাওয়া মামলায় জিতে গিয়ে আদালত ফেরত কোনো মামলাবাজও এত আনন্দ পায় না। হন্-হন্ করে এগিয়ে চললেন। পিছিয়ে পড়া বুদ্ধুকে বার বার আরো জোরে পা চালাতে বললেন। বাড়ী পৌঁছে দেখেন, জগিয়ার নাভি-শ্বাস উঠছে। দেখে মনে হচ্ছে, আর বেশীক্ষণ টিকবে না। ডাক্তারবাবুর মা-স্ত্রী দুজনেই কান্না-কাটি শুরু করে দিয়েছেন। বুদ্ধুকে দেখে তারা দুজনেই যেন অকূলে কূল পেল। ডাক্তারবাবুও চোখের জল সামলাতে পারছেন না। ঝুঁকে

দেখতে গেলে দু-ফোঁটা চোখের জল জগিয়ার শুকনো-ফ্যাকাশে মুখের ওপর পড়লো। রুগীর অবস্থা বুঝতে পেরে বুদ্ধু সজাগ হয়ে উঠে বলে—বাবু, উর যা অবস্থা দেখছি, সব আমার লাগালে বাইরে, ইর মুখে গঙ্গাজল দিয়ে দিন, ই চললো।

ডাক্তারবাবু বুদ্ধুর হাতদুটো ধরে প্রার্থণার ভঙ্গীতে বললেন—না চৌধুরী না, ভগবানের নাম নিয়ে তুমি আর একবার মন্ত্র চালাও ভাই, তুমি পারবে, ওকে বাঁচাতে পারলে তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো।

বুদ্ধু—ই ব্যাপারটা দেইখছেন তো, জেইনে-শুইনে ই বিষ মুখে তুইলবো ক্যমনে? না বাবু, ইখন লারব। মন্তরের দ্যাবতা খুব গরম হইয়ে গ্যাছে। ইসময় উয়ার মুখের শিকার কেড়ে লিলে উ আম্মাকে তো খাবেই, আপনাকেও রিহাই দিবেক নাই।

ডাক্তারবাবু—যে করেই হোক দেবতাকে রাজি করাও।

বুদ্ধু—কামটা তো খুম কঠিন বটে, হ, পাঁচশই লাইগবেক। উ জীনকে উয়ার ঘাড় থিকে লামাতে হলে অনেক কাট-খড় পোড়াইতে হবে। ই সব কাঁচা খেকো দ্যাবতা লিয়ে তো খেলা নয়!

ডাক্তারবাবু—বেশ, তাই দেব, একে বাঁচিয়ে দাও।

বুদ্ধু—হ, পিতিজ্ঞে কইরলাম বটে।

ডাক্তারবাবু বিদ্যুৎ গতিতে ঘরে গিয়ে পাঁচশো টাকার ব্যাগটা এনে বুদ্ধুর সামনে রাখলেন। বিজয়ীর দৃষ্টিতে ব্যাগটা দেখেই বুদ্ধু জগিয়ার মাথাটা নিজের কোলে তুলে হাত ঘোরাতে শুরু করে। বেশ কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে, সেই সঙ্গে রুগীর মুখের ওপর ফুঁ দিতে থাকে। পরক্ষণেই জগিয়ার চোখে-মুখে ভয় পাওয়ার ভাব ফুটে ওঠে, বুদ্ধুকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এর পর বেশ কিছুক্ষণ ধরে গা ভাঙ্গতে থাকে। জগিয়ার এ দশা দেখে বুদ্ধুও খুব জোরে বেসুরো গলায় গান গাইতে থাকে। মাথাটা কিন্তু তখনো তার কোলের ওপরই রয়েছে। আধঘণ্টা পর জগিয়া চোখ খুললো, প্রায় নিভে যাওয়া প্রদীপে তেল পড়লে যেমন হয়, ঠিক তেমনি ভাবেই তার অবস্থাও একটু একটু করে পরিবর্তন হোল। ওদিকে ডাকও শোনা যাচ্ছে, জগিয়া দু-একবার হাই তুলে, গা ভেঙ্গে উঠে বসলো।

৭

সাতটা বেজে গেছে। জগিয়া তৃপ্তিতে ঘুমোচ্ছে; চেহারায় কোনো

রোগের ক্লান্তি ছাপ নেই, অনেকক্ষণ আগেই বুদ্ধু টাকার ব্যাগ নিয়ে চলে গেছে। ডাক্তারবাবুর মা এসে বলেন—কথায় কথায় পাঁচশো টাকা হাতিয়ে নিলে গা!

ডাক্তারবাবু—একটা মরাকে যে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল, সে কথাটা তো বললে না। ওর জীবনের কোন দাম নেই বোধ হয়?

মা—তা নয় মানছি বাবা, তবে হাড়িতে পাঁচশো টাকা ঠিক ঠিক আছে কি-না দেখছিস তো?

ডাক্তারবাবু—না, ও টাকায় কেউ হাত দেবে না, ও ওখানেই থাক। ওটা দিয়ে ও তীর্থ ধর্মই করবে, এই বলে দিলাম।

মা—টাকাগুলো সব ওর কপালেই ছিল।

ডাক্তারবাবু—কে বললে, ওর ভাগ্যে তো ছিল? পাঁচশো টাকা, বাকী সবটাই তো আমার হাত দিয়েই গেছে। ওর জন্যেই তো আজ আমার চোখ খুলেছে। ওঃ! সারা জীবন মনে থাকবে! আজ থেকে তোমাদের সবায়ের যা দরকার হবে সবই পাবে। ঢের শিক্ষা হয়েছে। কিপ্‌টেমি আর নয়!

উন্মাদ

মনোহর অনুরক্ত হয়ে বললো—এসব তোমার আত্মত্যাগের ফল, তা না হলে আজ আমি কোন অন্ধকার গলিতে, অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিজের অন্ধকার জীবন কাটাতাম। তোমার সেবা এবং উপকার সব সময় মনে থাকবে। তুমি আমার জীবন বদলে দিয়েছো—আমাকে প্রকৃত মানুষ তৈরী করেছো।

বাগেশ্বরী মাথা নুইয়ে নম্রতার সুরে উত্তর দিলো—এ তো তোমার ভাল-মানুষী। আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ কি করে তোমার জীবন ফেলে দেবে? বরং তোমার সাথে যেয়ে আমি একদিন প্রকৃত মানুষ তৈরী হবো। তুমি পরিশ্রম করেছো তার পুরস্কার পেয়েছো। যে নিজের চেষ্টা নিজে করে, পরমাত্মাই তাকে সাহায্য করেন। আমার মতো একজন গোঁয়ার যদি অন্য কারো পাল্লায় পড়তো, না জানি তার কি অবস্থা-ই না হতো?

মনোহর এই তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বেশ জোরের সাথে বললো—তুমি যেমন গোঁয়ার, আমি তেমনি একলায় সাজানো পুতুল এবং রঙীন প্রজাপতিকে উৎসর্গ করতে পারি। তুমি আমায় মেহনত করবার অবসর এবং অবকাশ দিয়েছো যা কি না কেউ সফলই হতে পারে না। যদি তুমি অন্ন-বিলাস প্রিয়তায়, রঙীন মেজাজে অন্যের মত আমাকে তোমার দাবীতে দাবিয়ে রাখতে তাহলে আমার উন্নতি কি করে সম্ভব হতো? তুমি আমায় সেই নির্ভরতা প্রদান করেছো যা আমি স্কুল জীবনেও পাই নি। আমি আমার নিজের সাথীদের দেখছি, আর ওদের উপর আমার করুণা হচ্ছে। কারুরই হাত খরচায় সম্পূর্ণ মাস যেতো না। অর্ধেক মাস যেতে না যেতেই হাত খালি হয়ে যেত। কোন বন্দুর কাছে কেউ ধার চায়, কেউ ঘরের লোককে চিঠি লেখে, কেউ আবার গহণার জন্য পাগল হয়। কেউ কাপড়ের জন্য। কখনও চাকরের জন্য হয়রাণী তো কখনও ডাক্তারের জন্য। কারুরই শান্তি নেই। এখনকার দিনে তো (স্বামী-স্ত্রী) স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে ঝগড়াও কে আমার মতো ভাগ্যবান তো দেখাই যায় না। ঘরের সমস্ত আনন্দ আমি একাই পাই। কারণ আমার কোন ভাগীদার নেই। তুমি আমায় উৎসাহ জানিয়েছো, প্রেরণা জুগিয়েছো। যখন আমি নিরৎসাহ হয়ে পড়তাম। তখন তুমি-ই আমাকে সান্ত্বনা দিতে। আমি বুঝতে পারতাম না তুমি ঘর সামলাতে কি করে? তুমি ছোট-বড় কাজ সব নিজের হাতে করতে যাবে বই-এর জন্য টাকার অভাব না হয়। তুমি আমার দেবী! তোমার সেবার জন্যই আজ আমার এই সৌভাগ্য সম্ভব হয়েছে। আমি তোমার সেই সেবার স্মৃতিকে আমার হৃদয়ে সুরক্ষিত রাখবো, বাগী! এমন একদিন আসবে যখন তুমি তোমার ত্যাগ ও তপস্যার আনন্দ বুঝতে পারবে।

বাগেশ্বরী গদগদ স্বরে বললো—তোমার এই কথাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার মানু! আমার আর কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা নেই। আমি অল্প-বিস্তর যা কিছু সেবা করেছি; তার জন্য যে এত যশ আমার প্রাপ্য তা আমার ধারণা ছিল না।

মনোহর নাথের হৃদয় এই সময় উদার ভাবে ভরা ছিল। সে এমন স্বল্পভাষী, রুক্ষ লোক ছিল যে বাগেশ্বরীর মনে তার শুষ্কতার জন্য দুঃখ হতো। কিন্তু এই সময় সফলতার নেশা তার কথায় ডানা মেলে উড়ছিল। বললো—যে সময় আমার বিয়ের কথা হচ্ছিল, তখন আমি খুব শঙ্কিত ছিলাম। মনে করেছিলাম আমার যা হবার হয়ে গেছে। এখন থেকে সারা জীবন দেখার হুকুমেই

কাটবে। বড়-বড় ইংরেজ বিদ্বানের বই পড়ে, বিয়ে সম্পর্কে আমার ঘৃণা জন্মেছিল। আমি বিয়েকে বয়সের জেলখানা বলে ভাবতাম যা আত্মা এবং বুদ্ধির দ্বারকে বন্ধ করে দেয়। যা মানুষকে স্বার্থের ভক্ত করে তোলে, যা জীবনের ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করে দেয়। কিন্তু দু'চার মাস পরে আমার ভুল আমি বুঝতে পারলাম যে সু-গৃহিণী স্বর্গের সবচেয়ে বড় বিভূতি যা মানুষের চরিত্রকে উজ্জ্বল এবং পূর্ণ করতে সাহায্য করে, যা আত্মোন্নতির মূল মন্ত্র। আমার মনে হয় বিয়ের উদ্দেশ্য ভোগ নয়, আত্মার বিকাশ।

বাগেশ্বরী এই নম্রতা আর সহ্য করতে পারলো না। বাহানা করে সে উঠে চলে গেলো।

মনোহর এবং বাগেশ্বরীর বিয়ে তিন বছর হয়ে গেল। মনোহর সে সময় কোন এক অফিসের ক্লার্ক ছিলেন। সাধারণ যুবকের মতো তিনিও গোয়েন্দা উপন্যাস পড়তে ভালবাসতেন। ধীরে-ধীরে তাঁর গোয়েন্দা হওয়ার সখ হল। এই বিষয়ে তিনি অনেক বই জোগাড় করলেন এবং খুব মনোযোগ দিয়ে সেই বইগুলি পড়লেন। তারপর এই বিষয়ে তিনি নিজেই একটি বই লিখলেন। সেই রচনাতে তিনি এত বিবেচনা-শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তার শৈলীও এত রোচক হয়েছিল যে জনগণ সেই বইকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। এই বিষয়ে এটাই ছিল সর্বোত্তম গ্রন্থ।

সারা দেশে হৈ-হৈ পড়ে গেল। এমনকি ইটালী, জার্মানী দেশ থেকে পর্য্যন্ত তাঁর কাছে প্রশংসা পত্র আসতে লাগলো, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে ভালো ভালো সমালোচনা বার হতে লাগলো। শেষ পর্য্যন্ত সরকারও তার গুণ গ্রাহিতার পরিচয় দিলেন—ইংল্যাণ্ডে গিয়ে এই শিল্পের চর্চা করার জন্য বৃত্তি প্রদান করলো। আর এসব ছিল বাগেশ্বরীর সৎপ্রচেষ্টার ফল।

মনোহরের ইচ্ছা ছিল বাগেশ্বরীও সাথে যায়। কিন্তু বাগেশ্বরী তার পায়ের বেড়ী হতে চায়নি। ঘরে থেকে শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করাটাই সে উচিত কাজ মনে করেছিল।

মনোহরের মতে ইংল্যাণ্ড একটা অন্য জগৎ, যেখানে উন্নতি সোপান হল রূপবতী-স্ত্রী। যদি স্ত্রী রূপবতী হয়, চপল হয়, চতুর হয়, বাণী-কুশল হয়, প্রশস্ত হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে সে সোনার খনি পেয়েছে, সে এখন সহজেই উন্নতির শিখরে পৌছাতে পারবে। মনোযোগ এবং তপস্যার উপর নয়, পত্নীর প্রভাব এবং আকর্ষণ শক্তির দ্বারাই তা সম্ভব। সেই জগতে রূপ এবং লাবণ্য ব্রতের বন্ধন থেকে মুক্ত এবং এক অবাধ সম্পত্তি। যদি কেউ কোন রমণীকে লাভ

করে তাহলে তার ভাগ্য খুলে যায়। যদি কোন সুন্দরী তোমার সহধর্মিণী না হয় তাহলে তোমার সমস্ত উদ্যোগ কার্য-কুশলতা সব নিষ্ফল, কেউ তোমার ভাগীদার হবে না। অতএব সেখানকার লোকেরা রূপকে ব্যবসায়িক দৃষ্টি দিয়ে দেখে।

সারা বছর ইংরেজ সমাজের সংসর্গ মনোহরের মনোবৃত্তিতে বিপ্লব এনে দিয়েছিল! তার মেজাজে সাংসারিকতা এত বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল যে সেখানে কোমল ভাবের কোন জায়গা ছিল না।

বাগেশ্বরী বিদ্যাভ্যাসে তার সহায়ক হতে পারতো কিন্তু তার অধিকার এবং উচ্চ পদ পর্যন্ত পৌছাতে পারতো না, বাগেশ্বরীর ত্যাগ এবং সেবার মহত্ব মনোহরের দৃষ্টিতে এখন কম হয়ে যাচ্ছিল। বাগেশ্বরী এখন তার কাছে একটা ফালতু বস্তু বলে মনে হচ্ছিল। কারণ তার দৃষ্টিতে প্রত্যেক বস্তুর মূল্য তার ভবিষ্যৎ-এর লাভের উপর নির্ভর করে। তার অতীত জীবন এখন তার কাছে হাস্যাস্পদ বলে মনে হয়। চঞ্চল হাসিমুখ, বিনোদিনী ইংরাজী যুবতীর সামনে বাগেশ্বরী এক হাল্কা, তুচ্ছ বস্তুর মত মনে হয়—যেন বিদ্যুতের আলোর সামনে প্রদীপের আলো নিস্প্রভ হয়ে পড়েছে। মাঝে-মাঝে তার মানিক প্রকাশটুকুও বিলীন হয়ে যায়।

মনোহর নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঠিক করে নিয়েছিল যে সে এক নারীর রূপ-নৌকার দ্বারাই নিজের লক্ষ্যে পৌছাবে। এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

২

রাত ন'টা বাজে। মনোহর লণ্ডনের এক ফ্যাশানেবল রেঁস্তোরাতে সেজেগুজে বসেছিল। তার রূপ-রঙ্গ, ঠাঁট-বাঁট দেখে হঠাৎ কেউ-ই বুঝতে পারবে না যে সে ইংরেজ নয়। লণ্ডনেও সৌভাগ্য তাকে সাথ দিয়েছিল। চুরির ব্যাপারে কতকগুলি মামলা জিতিয়ে দিয়েছিল বলে ধন এবং যশ দুটোই সে পেয়েছিল এখন সে সেখানকার ভারতীয় সমাজের এক বিশিষ্ট অঙ্গ বলে পরিগণিত হয়েছে, যার আতিথ্য এবং সৌজন্যকে সবাই প্রশংসা করে। তার আচার-ব্যবহারও ইংরেজদের মত হয়ে গেছিল। টেবিলের অপরদিকে তার সামনে একজন রমণী বসেছিল, সে তার কথা খুব মনোযোগের সাথে শুনছিল। ভারতবর্ষের অদ্ভুত গল্প শুনতে-শুনতে তার চোখ খুশীতে এত উজ্জ্বল হয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন পাখির সামনে মনোহর দানা ছড়াচ্ছে।

মনোহর—বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ; জেনি! অত্যন্ত বিচিত্র। পাঁচ

বছরের বৌ ভারত ছাড়া আর কোথাও পাবে না। লাল রঙের ফুলকাটা শাড়ী। মাথার উপর ঝলমলে টোপর, গলায় ঝোলানো ফুলের মালা পরে ঘোড়ায় চেপে তারা বিয়ে করতে যায়। দু'জন লোক দু'দিক থেকে ছাতা ধরে থাকে। হাতে তারা আবার মেহেন্দিও লাগায়।

জেনি—মেহেন্দি আবার কেন লাগায়?

মনোহর—হাত লাল রঙ হবার জন্য। পায়েও তারা আবার আলতা লাগায়। সেই দৃশ্য দেখতে খুব ভাল লাগে।

জেনি—এ দৃশ্য তো হৃদয়ে রোমান্টিকতা সৃষ্টি করে। বৌকেও তো এইভাবে সাজানো হয়?

মনোহর—এর থেকে আরও কয়েক গুণ বেশী সাজায়। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সোনাতে মুড়ে দেয়। এমন কোন অঙ্গ থাকে না যেখানে গহনা পরায় না।

জেনি—তোমার বিয়েও নিশ্চয়ই এমনিভাবে হয়েছিল আর তোমারও খুব আনন্দ হয়েছিল।

মনোহর—হ্যাঁ, যেমন তোমাদের 'মেরি-গো-রাউণ্ড' চড়লে আনন্দ হয়, ঠিক তেমনি আনন্দই হয়েছিল। ভাল-ভাল খাবার পাওয়া যায়, ভাল-ভাল কাপড়-চোপড় পরতে পাওয়া যায়। খুব নাচ-তামাশা দেখেছিলাম এবং সাথীদের গানও শুনেছিলাম। সব থেকে মজা হয় নতুন বৌ যখন বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার জন্য বিদায় নেয়। সারা বাড়ী বেদনায় ভরে যায়। নতুন বৌ একে-একে সবাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। যেমন তোমরা···

জেনি—নতুন বৌ কাঁদে কেন?

মনোহর—কান্নার রেওয়াজ বহুদিন থেকে চলে আসছে। যদিও সবাই জানে সে চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছে না তবুও বাড়ীর সবাই ডুকরে-ডুকরে কাঁদে; মনে হয় যেন তার বিরাট কিছু ক্ষতি হয়েছে।

জেনি—আমি তো সেই অবস্থায় খুব হাসতাম।

মনোহর—হাসবারই কথা।

জেনি—তোমার বৌ-ও নিশ্চয়ই কেঁদেছিল?

মনোহর—আর বোলো না, আছাড় খাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমি যেন তার গলার টুঁটি চেপে মারবো। আমার পালকী থেকে ছুটে পালাচ্ছিল। তাই আমি জোর করে আমার পাশে চেপে বসিয়ে রেখেছিলাম। তখন আমাকে দাঁত দিয়ে কামড়াতে গেছিল।

এই কথা শুনে মিস জেনি খুব জোরে চিৎকার করলো এবং হাসির চোটে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। তারপর বললো—কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! এখনও কি কামড়ায় নাকি?

মনোহর—সে এখন এই পৃথিবীতে নেই, জেনি! আমি তাকে খুব খাটাতাম। আমি শুয়ে থাকতাম আর সে আমার মুখে পাউডার লাগাতো, মাথায় তেল মাখাতো, পাখার হাওয়া করতো।

জেনি—আমার তো বিশ্বাস হয় না। সে একেবারে মূর্খ ছিল।

মনেহর—সে আর বলো না। সারাদিন তো কারো সামনে আমার সঙ্গে কোন কথাই বলতো না; কিন্তু আমি সব সময় তার পিছনে ঘুরতাম।

জেনি—ও; দুষ্টু ছেলে! তুমি খুব সুন্দর ছিলে, আর সে ছিল রূপবতী?

মনোহর—হ্যাঁ, তার মুখ ছিল তোমার পায়ের তলার মতো।

জেনি—কাণ্ডজ্ঞানহীন! তুমি এরকম মেয়েছেলের পিছনে কখনও যেতে না।

মনোহর—সে সময় আমিও মূর্খ ছিলাম, জেনি!

জেনি—এরকম মূর্খ মেয়ের সঙ্গে তুমি বিয়ে করলে কি করে?

মনোহর—বিয়ে না করলে আমার বাবা-মা বিষ খেতো।

জেনি—সে তোমাকে কি করে ভালবাসতো?

মনোহর—আর কি করতো? আমি ছাড়া আর কে ছিল? তার ঘর থেকে বার হতে পারতো না; কিন্তু ভালোবাসা আমাদের কারুরই মধ্যে ছিল না। সে আমার আত্মা এবং হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে পারতো না, জেনি! সেই সব দিনের কথা মনে পড়লে মনে হয় যেন কোন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। ওহ! যদি সেই স্ত্রী আজ বেঁচে থাকতো তাহলে আমাকে আজ কোন অন্ধকার ঘরে বসে কলম চালাতে হতো। এই দেশে এসে আমার যথার্থ জ্ঞান হয়েছে যে এই পৃথিবীতে স্ত্রীর ভূমিকা কি! তার কি দায়িত্ব, তাকে পেলে জীবন কত আনন্দময় হয়, আর যেদিন তোমার দর্শন পেলাম সেদিন তো আমার জীবনের সবচেয়ে আশীর্বাদের দিন ছিল। মনে আছে তোমার সেই দিনের কথা? তোমার সেদিনকার মুখ আজও আমার চোখে ভাসে।

জেনি—তাহলে আমি কিন্তু চলে যাব। তুমি আমাকে খুব খোসামোদ করছো।

৩

শ্রমিক-দলের ভারত-সচিব ছিলেন লর্ড বারবর আর তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন মিঃ কাবর্ড। লর্ড বারবর ভারতের সত্যিকারের বন্ধু বলে

পরিচিত ছিলেন। যখন ভারত কুসংস্কার ও উদার দলদের মধ্যে অধিকার নিয়ে বিবাদ চলছিল তখন লর্ড বারবর ভারতের হয়ে ওকালতি করেছিলেন। তিনি সেইসব মন্ত্রীদের উপর এমন-এমন যুক্তি আরোপ করতেন যে সেইসব বেচারীরা উত্তর খুঁজে পেতেন না। একবার তিনি হিন্দুস্থানে এসেছিলেন এবং এখানকার কংগ্রেস দলে যোগ দিয়েছিলেন। সে সময় তাঁর উদার বক্তৃতা সারা দেশে আশা ও উৎসাহের এক ঢেউ তুলেছিল। কংগ্রেস দলে আসার পর তিনি শহরে গেছেন, জনগণ তাঁকে রাস্তাতেই সম্মান দেখিয়েছে, তাঁর গাড়ি টেনেছে, তাঁর উপরে ফুল ছড়িয়েছে। চারদিক থেকে এই ধ্বনি উঠেছিল—তিনি হলেন ভারতের উদ্ধারকারী। মানুষের এই বিশ্বাস হয়েছিল যে, সৌভাগ্যবশতঃ ভারতে কখনও যদি বারবর সাহেব অধিকার নিয়ে আসেন সেদিন ভারতের ইতিহাস কল্যাণকর হবে।

কিন্তু অধিকার পাওয়ার পরই লর্ড বারবরের মধ্যে এক বিচিত্র পরিবর্তন হয়েছিল। তাঁর সদ্ব্যবহার, উদারতা ন্যায়-পরায়ণতা, সহানুভূতি এ সমস্ত সদ্‌গুণ সব হারিয়ে গিয়েছিল। এখন তাঁর ব্যবহার পূর্বাধিকারী থেকে একটুও পৃথক ছিল না। তাঁর আগের লোকের মত, তিনিও তাই করেছিলেন—সেই দমণ নীতি, সেই জাতিগত অহংকার, সেই কঠোরতা, সেই সংকীর্ণতা। অধিকারের সিংহাসনে পা রাখতেই দেবতা তাঁর দেবত্ব হারিয়ে ফেললেন। দু'বছরের কর্ম কালের মধ্যে তিনি শত-শত অফিসার নিযুক্ত করলেন, তার মধ্যে একজনও হিন্দুস্থানী ছিলেন না। ভারতবাসী নিরাশ হয়ে তাঁকে ডাইহার্ড 'ধনের উপাসক' এবং 'সাম্রাজ্য বাদের পূজারী' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এর আসল রহস্য হল, বাকিছু করণীয় সব মি, কায়র্ডই করতেন। কারণ ছিলো যে লর্ড বারাবর যতটা ভাগ্যবান ছিলেন, মনের দিক থেকে ঠিক তেমনি দুর্বল ছিলেন। যদিও দুটো অবস্থার পরিণাম এক ছিল।

এই মিঃ কায়র্ডই ছিলেন একজন মহাপুরুষ। তাঁর বয়স চল্লিশের একটু বেশী ছিল। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তিনি বিয়ে করেন নি। তিনি মনে করেছিলেন যে রাজনীতি করলে বিবাহিত জীবনে আনন্দ পাওয়া যায় না। আসলে উনি নবীনতার পূজারী ছিলেন। তাই নিত্য নতুন বিনোদ এবং আকর্ষণ, বিলাস এবং উল্লাসের স্রোতে ভাসতেন।

দুপুরবেলা মিঃ কায়র্ড জলখাবার খেয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন। এমন সময় মিস জেনি রোজের আসার খবর পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখলেন, এলোমেলো চুলকে ঠিক করে বহুমূল্য সেন্ট মেখে

তিনি হাসি মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে মিস রোজকে আহ্বান করবার জন্য হাত মেলালেন।

জেনি ঘরে পা দিতেই বললো—এখন আমি বুঝতে পারলাম যে কেন, কোন সুন্দরী মেয়ে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে না। তুমি নিজের কথা নিজেই রক্ষা করতে পারো না।

মিঃ কায়র্ড জেনির জন্য একটা চেয়ার টানতে-টানতে বললো—আমি খুব দুঃখিত, মিস রোজ। আমি নিজের কথা রক্ষা করতে পারিনি। প্রাইভেট সেক্রেটারীর জীবন কুকুরের থেকেও হেয় জীবন। বারবার অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেও একের পর এক ফোন এসে আমাকে বার হতে দিল না। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, মজলিশে নিশ্চয়ই খুব আনন্দ হয়েছিল তোমার ?

জেনি—আমি তোমায় খুঁজছিলাম। যখন তোমায় পেলাম না, তখন আমার মেজাজ চড়ে গেল। আমি আর কারো সাথে নাচি নি। যদি তুমি না-ই যাবে তবে আমাকে নিমন্ত্রণ-পত্র কেন পাঠিয়েছিলে ?

কায়র্ড জেনিকে সিগারেট দিতে-দিতে বললো—তুমি আমাকে লজ্জা দিচ্ছ, জেনি। তোমার সাথে নাচ করা ছাড়া আর কি খুশীর খবর আমার কাছে হতে পারে ? একজন অবিবাহিত বুড়ো হয়েও আমি সেই আনন্দের কল্পনা করতে পারি। ব্যস, এটাই বুঝে নাও যে আমি সেখানে ছটফট করছিলাম।

জেনি তখন বেশ কঠোরতার সুরে বললো—তুমি অবিবাহিত থাকবারই যোগ্য, এটাই তোমার শাস্তি।

কায়র্ড অনুরক্ত হয়ে উত্তর দিল—তুমি খুব কঠোর, জেনি! তুমি কেন, সব মেয়েরাই কঠোর হয়। আমি যত কারণই দেখাই না কেন তোমার বিশ্বাস হবে না। আমার এই ইচ্ছাই রয়ে গেল যে কোন সুন্দরী আমার ভালবাসা এবং মানসিক অবস্থাকে সম্মান করে না।

জেনি—তোমার মধ্যে ভালবাসা আছে ? মেয়েরা এমন ছলনা করার মুখ দেখে না বা পছন্দ করে না।

কায়র্ড—আবার ছলনাকারী বললে ?

জেনি—আমি কারো বাধ্যতা মানি না। আমার কাছে এটা আনন্দ এবং গৌরবের কথা হতে পারে না যে যখন তোমার নিজের সরকারী, অর্ধ সরকারী এবং বে-সরকারী কাজের মাঝে তোমার অবকাশ মিলবে তখন তুমি আমার মন রক্ষা করতে একটি-ক্ষণের জন্য তোমার কোমল মনকে কষ্ট দেবে। এইজন্য তুমি এখনও পর্য্যন্ত অবিবাহিত থেকে গেছো।

কায়র্ড গম্ভীর স্বরে বললো—তুমি আমার সাথে অন্যায় ব্যবহার করছো, জেনি। আমার অবিবাহিত থাকবার কারণ গতকাল পর্য্যন্ত আমার কাছে অজানা ছিল। তারপর আপনা থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি।

জেনি সেই কথাকে পরিহাস করে বললো—আচ্ছা! এ রহস্য তুমি বুঝতে পেরেছো? তাহলে তুমি তো সত্যি কারের আত্মদর্শী, আমি একটু শুনতে পারি, কি কারণ ছিল?

কায়র্ড উৎসাহের সাথে বললো—আজ পর্য্যন্ত এমন কোন সুন্দরী পাইনি যে আমায় উন্মত্ত করতে পারে।

জেনি কঠিন পরিহাসের স্বরে বললো—আমার মতে এই পৃথিবীতে এমন কোন মেয়ে জন্মায়নি যে তোমাকে উন্মত্ত করতে পারে। তুমি উন্মত্ত করাতে চাও কিন্তু হতে চাও না।

কায়র্ড—তুমি খুব অত্যাচার করেছো, জেনি?

জেনি—তোমার উন্মাদের প্রমাণ দিতে চাও?

কায়র্ড—হৃদয় দিয়ে। জেনি! আমি সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছি। সেইদিন সন্ধ্যেবেলা জেনি মনোহরকে বললো—তোমার সেই ভাগ্যকে ধন্যবাদ! সেই জায়গা তুমি পেয়ে গেছো।

মনোহর খুব উৎসাহিত হয়ে বললো—সত্যি! সেক্রেটারীর সাথে কোন আলোচনা হয়েছিল?

জেনি—সেক্রেটারীর সাথে কিছু বলার দরকারই হয়নি। সব কিছু কায়র্ডের হাতে আছে। আমি তো তাঁকে খুব জোর দিয়ে বলেছি। যেন আমি তাকে কত ভালবাসি। পঞ্চাশ বছর তো বয়স, পাকা চুলও তো ঝরে যাচ্ছে, গালে বয়সের ছাপ পড়েছে; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত আপনার প্রেমের আকর্ষণ আছে। আপনি নিজেকে বড় রসিক ভাবেন। তার বুড়োর মতো হাবভাব আমার খুব খারাপ মনে হয়েছে। কিন্তু তোমার জন্য আমাকে সব কিছু সহ্য করতে হয়েছে। তবে পরিশ্রম সফল হয়েছে। কালই তোমার কাজ হয়ে যাবে। এখন খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার।

মনোহর গদগদ স্বরে বললো—তুমি আমার উপর খুব ভরসা করেছো জেনি!

8

মনোহর গুপ্তচর বিভাগের উঁচু পদে চাকুরী পেয়েছে। দেশের রাষ্ট্রীয়

পত্রগুলি তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তার ছবি ছাপিয়েছে এবং রাষ্ট্রের তরফ থেকে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। সে-ই প্রথম ভারতীয় যার এত উঁচু পদ মিলেছে। ব্রিটিশ সরকার মন্তব্য করেছিলেন যে তার ন্যায় বুদ্ধি, জাতীয় অহঙ্কার এবং দ্বেষ-এর থেকে অনেক উচ্চতর।

মনোহর এবং জেনির বিয়ে ইংল্যাণ্ডেই হয়েছিল। মধুরাত কাটিয়েছিল ফ্রান্সে। সেখান থেকেই দু'জনে এই ভারতবর্ষে এসেছে। মনোহরের অফিস বোম্বাই শহরে। সেখানে তারা এক হোটেলে থাকতে লাগলো। গুপ্ত অভিযোগের তল্লাশে মনোহর প্রায়ই বাইরে যেত—কখনও কাশ্মীর কখনও মাদ্রাজ, কখনও রেঙ্গুন। জেনি এই যাত্রাতে সব সময় তার সাথে থাকতো। নিত্য-নতুন দৃশ্য, আনন্দ উপভোগ, উল্লাসে তারা ভরে থাকতো। নবীনতা প্রিয় প্রকৃতির আনন্দের চেয়ে আর কি জিনিস তার কাছে ভাল হতে পারে?

মনোহরের হাবভাব তো ইংরেজদের মতো ছিলই, ঘরের লোকেদের সাথেও সম্পর্ক ছেদ হয়ে গিয়েছিল। বাগেশ্বরীর পত্রের উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা, সে চিঠি খুলে পর্য্যন্ত পড়তো না। ভারতবর্ষে এসে তার সব সময় ভয় হতো যে ঘরের লোকেরা তার ঠিকানা যদি পেয়ে যায়? জেনির কাছে সে অমন খবর সব সময় লুকিয়ে রাখতে চাইতো। সে ঘরের লোকেদের কাছে খাওয়ার খবর পর্য্যন্ত বলতো না। এমন কি সে ভারতবাসীদের সাথে খুব কম মেলামেশা করতো। তার বন্ধুরা বেশীর ভাগ পুলিশ এবং ফৌজের অফিসার ছিলেন। তারাই তার অতিথি হতো। বাক্‌চতুর জেনি সম্মোহন কলাতে সিদ্ধহস্ত ছিল। পুরুষের প্রেম নিয়ে তার সবচেয়ে আনন্দময় খেলা ছিল। কাউকে জ্বালাতো আবার কাউকে মুগ্ধ করাতো আর মনোহরও সেই কপট-লীলার শিকার হতো। সে সব সময় তাকে ভুলিয়ে রাখতো; কখনও কাছে টানতো আবার কখনও দূরে ঠেলতো; কখনও নিষ্ঠুর এবং কঠোর হতো আবার কখনও প্রেম-বিহ্বলে ভরপুর থাকতো। এটা এমন হৃদয় রহস্য ছিল যা সে কখনও বুঝতো আবার কখনও হয়রান হয়ে যেতো।

এই ভাবে দু'বছর কেটে গেল। মনোহর তথা জেনি দুই প্রান্তে দুই হাতের মতো একে অপরের থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো। মনোহর এই চিন্তা কখনও হৃদয় থেকে দূর করতে পারতো না যে তার প্রতি জেনির এক বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। এটা হতে পারে তার সঙ্কীর্ণতা, অথবা কুল মর্য্যাদার প্রভাব, কিন্তু দেবীকে সে পরাধীন দেখতে চাইতো। তার স্বচ্ছন্দতা মনোহরের কাছে লজ্জাস্প্রদ বলে মনে হতো। স্বার্থকে অবলম্বন করেই জেনির সাথে যে তার

সম্বন্ধ হয়েছিল, সে সেটা ভুলে যেতো। সে বোধহয় মনে করেছিল, সময় হলে জেনি তার নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবে। যদিও তার বোঝা উচিৎ ছিল যে মজবুত ভিত ছাড়া বাড়ী তৈরী করতে যত দেরীই হোক আর তাড়াতাড়ি হোক, তা একদিন ভেঙ্গে পড়বেই। উঁচু হবার সাথে-সাথে তার আশঙ্কা আরও বেড়ে যাচ্ছিল। অপরদিকে জেনির ব্যবহার সম্পূর্ণ পরিস্থিতির অনুকূল ছিল। সে মনোহরকে বিনোদময় তথা বিলাসময় জীবনের এক সাধন বলে ভেবে ছিল এবং সেই বিচারের উপর সে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এই-রকম লোককে সে মনে স্থান দিতে পারে না কারণ পাষাণ প্রতিমা কখনই দেবী হতে পারে না। আদর্শ স্ত্রী হওয়া তার জীবনের স্বপ্ন ছিল না। সেজন্য সে কারো প্রতি কোন কর্তব্যকে স্বীকার করতো না। যদি মনোহর নিজের সর্বস্ব তার চরণে অপিত করতো তবুও সে তাকে বিশ্বাস করতো না। মনোহর যেন তার তৈরী পুতুল বা লাগানো গাছ স্বরূপ ছিল। সেই গাছের ছায়া এবং তার ফল ভোগ করা যেন তার অধিকার বলে মনে করতো।

মনোমালিন্য বাড়তে লাগলো। শেষ পর্য্যন্ত মনোহর তার সাথে পার্টিতে বা জলসায় যাওয়া ছেড়ে দিল। কিন্তু জেনি আগের মতো বেড়াতে যেতো, বন্ধুদের সাথে দেখা করতো, নিমন্ত্রণ করতে আসতো এবং অন্যদের নিমন্ত্রণও রক্ষা করতো। মনোহরের সাথে না গিয়েও লেশমাত্র দুঃখ বা নিরাশ হতো না। বরং তার উদাসীনতা দেখে আরও প্রসন্ন হতো। মনোহর এই মানসিক ব্যথাকে ভুলবার জন্য মদের নেশায় ডুবে থাকবার চেষ্টা করতো। মদ খাওয়া তো সে ইংল্যাণ্ড থেকেই শুরু করে দিয়ে ছিল, এখন সেই মাত্রা আরও বেড়ে গেল। সেখানে ফূর্তি এবং আনন্দ করার জন্য যেতো আর এখানে তা ভুলে থাকার জন্য যেতো। তাই দিনের পর দিন দুর্বল হতে লাগলো। সে জানতো মদই তাকে খাচ্ছে। তবুও এটাই তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হয়ে রইল।

গরমের দিন ছিল। মনোহরের একটা মামলা খুব জটিল ছিল। মাথা তুলবার মতো ফুরসত তার হতো না। স্বাস্থ্যও তার খুব খারাপ হতে লাগলো; কিন্তু জেনির বেড়ানোতেই মশগুল। শেষ পর্য্যন্ত মনোহরকে ডেকে বললো—আমি নৈনিতাল যাচ্ছি। এখানকার গরম আমি সহ্য করতে পারছি না।

মনোহর রক্ত চক্ষু বার করে তাকে জিজ্ঞাসা করলো—নৈনিতালে কি কাজ আছে? সে আজ তার নিজের অধিকার দেখাতে চরমে উঠলো। জেনিও

তার অধিকার উপেক্ষা করতে আরও চরমে উঠে বললো—এখানে কোন সমাজ নেই। সারা লখনউ কেবল পাহাড় দিয়ে ঘেরা।

মনোহর এই কথা শুনে যেন খাপ থেকে তলোয়ার বার করে বললো—যতক্ষণ আমি এখানে থাকবো ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার কোথাও যাওয়ার অধিকার নেই। তোমার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে, সোসাইটির সাথে হয় নি। তুমি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছো যে আমি অসুস্থ। তবুও তুমি নিজের বিলাস-প্রবৃত্তিকে থামাতে পারছো না। তোমার কাছে আমি এ আশা করিনি, জেনি! আমি তোমাকে আমার জীবনের অংশীদার ভেবে ছিলাম। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে তুমি আমার সাথে এমন বেইমানি করবে।

জেনি অবিচলিত ভাবে বললো—তাহলে তুমি আমাকে কি বুঝতে; আমি কি তোমার ভারতবর্ষের স্ত্রীর মতো ঘর কুনো হয়ে থাকবো আর তোমার অত্যাচার সহ্য করবো? আমি তোমাকে এতটা অপদার্থ মনে করিনি। যদি তুমি আমাদের ইংরাজী সভ্যতার এই সাধারণ কথাটা না বুঝে থাকো তাহলে এখন বুঝে নাও যে আমাদের ইংরাজ স্ত্রীরা নিজের রুচি ছাড়া অন্য কিছু যে পরোয়া করে না। তুমি আমাকে এই জন্য বিয়ে করে ছিল যে আমার দ্বারায় তোমার আরও সম্মান এবং উঁচু পদ মেলে। সব পুরুষই এমনটি করে, তুমিও করেছো। আমি সেই জন্য তোমাকে খারাপ বলছি না, কিন্তু যখন তোমার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, তার জন্য তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে। তবে অন্য কিছুর আশা আমার কাছে করো কেন? তুমি ভারতবাসী, ইংরেজ হতে পারো না। আমি ইংরেজ, তেমনি ভারতবাসী হতে পারি না।. সেইজন্য আমাদের দুজনের কারুরই এই অধিকার নেই যে নিজের মর্জি মতো অন্যকে গোলাম তৈরী করার চেষ্টা করবো।

মনোহর হতবুদ্ধির মত বসে-বসে শুনতে লাগলো। প্রতিটি শব্দ এক একটি বিষের বিন্দুর মত গলার নীচে যেতে লাগলো। সত্য কতো কঠোর। পদ লালসার সেই প্রচণ্ড আবেগে; বিলাস-তৃষ্ণার সেই প্রচণ্ড প্রবাহে সে ভুলেই গিয়েছিল যে জীবনের এমন কতকগুলি তত্ত্ব আছে যার কাছে পদ এবং বিলাস কাঁচের খেলনা থেকে বেশী মূল্যবান নয়। সেই বিস্মৃত সত্য এই সময় করুণ বিলাপ করে তার মদমগ্ন চেতনা যেন ছটফট করতে লাগলো।

সন্ধ্যেবেলা জেনি নৈনিতাল চলে গেল। মনোহর তার দিকে চোখ তুলে পর্য্যন্ত তাকিয়ে দেখলো না।

৬

তিনদিন পর্য্যন্ত মনোহর ঘর থেকে বার হয় নি। জীবনের পাঁচ-ছয় বছর ধরে যত রত্ন সঞ্চিত করেছিল, যার উপর তার সবচেয়ে বড়ো গর্ব ছিল, যাকে পেয়ে সে নিজেকে ধন্য মনে করতো, এখন সেই রত্ন কোষ্ঠী পাথরে ঘসার পর যেন পাথর প্রমাণিত হয়েছে। তার অপমানিত, গ্লানিময় পরাজিত আত্মার একান্তে কান্না ছাড়া আর যেন কোন পরিত্রান নেই নিজের পূর্ণ কুটীরকে ছেড়ে সে যে সোনার কলসী বসানো ভবনের দিকে এগিয়েছিল তা এখন মরীচিকা মাত্র মনে হ'ল। আবার সেই পুরানো ঝুপড়ীর কথা মনে হলো, যেখানে সে শক্তি, প্রেম এবং আশীর্বাদের সুধা পান করেছিল। এখনকার এই আড়ম্বর কাঁটার মত বিঁধতে লাগলো। সেই সরল শীতল স্নেহের সামনে এ সমস্ত বিভূতি তুচ্ছ মনে হতে লাগলো।

তৃতীয়দিন সে এক দৃঢ় সঙ্কল্প করলো এবং দুটো চিঠি লিখলো। তার মধ্যে একটা হল নিজের চাকুরীতে ইস্তফা আর একটা হল জেনির কাছ থেকে শেষ বিদায়। পদত্যাগ পত্রে সে লিখলো—আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে; আমি এই ভার আর বহন করতে পারছি না। জেনির চিঠিতে লিখলো—আমি এবং তুমি দুজনেই ভুল করেছি, আমাদের দুজনের, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই ভুলের মাশুল দেওয়া উচিৎ, আমি তোমাকে সকল বন্ধন থেকে মুক্তি দিলাম, তুমিও আমাকে মুক্তি দাও। আমার সাথে তোমার আর কোন সম্পর্ক রইলো না। অপরাধ তোমারও নয়, আমার নয়। বোঝার ভুল তোমার ও যেমন ছিল; আমারও তেমনি। আমি আমার পদ থেকে অবসর নিয়েছি। এখন আমার উপর তোমার আর কোন দাবী রইল না। আমার কাছে যা কিছু আছে সব-ই তোমার, তাই আমি সব ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমি তো কেবল নিমিত্ত মাত্র ছিলাম, মালিক ছিলে তুমি-ই। তোমাদের সভ্যতাকে দূর থেকেই সেলাম জানাই যা বিনোদ এবং বিলাসের সামনে অন্য কোন বন্ধনকে স্বীকার করতে পারে না।

মনোহর নিজে গিয়েই চিঠি দুটো রেজিস্ট্রী করেছিলো এবং উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য তৈরী হলো।

৭

জেনি যখন মনোহরের চিঠি পেল; সে একটু মুচকি হাসলো। মনোহরের ইচ্ছার ওপর শাসন চালানোর অভ্যেস তার এমন হয়ে গিয়েছিল যে সে একটুও

ঘাবড়ে যায়নি। দু'চার দিন উল্টো-পাল্টা কথা বলে সে তাকে আবার বশীভূত করে নেবে এটাই তার বিশ্বাস ছিল। মনোহরের ইচ্ছা যদি কেবল ধমকানো না হতো বা তার মনে কোন চোট লাগতো তবে এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে সেখানে থাকতো না, কবেই সেখান থেকে চলে যেতো। ওর ওখানে থাকা মানেই হল সে কেবল তাকে বাঁদরের হুমকি দিচ্ছে।

জেনি স্থির চিত্ত হয়ে কাপড় ছাড়লো এবং তারপর সে এমন ভাবে মনোহরের ঘরে ঢুকলো যেন অভিনয় করার জন্য স্টেজে উঠেছে।

মনোহর তাকে দেখতে পেয়ে জোরে ঠাট্টা করে হেসে উঠলো। জেনি সহ্য করে পিছনে সরে গেল। এই হাসিতে ক্রোধ বা প্রতিকার ছিল না। এতে ছিল উন্মাদনা। মনোহরের সামনে টেবিলের ওপর বোতল এবং গ্লাস রাখা ছিল। সে জানে না একদিনে সে কতটা মদ খেয়েছে। তার চোখ দিয়ে যেন রক্ত বেরিয়ে আসছিল।

জেনি কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললো—কি, সারারাত ধরে কেবল খেতেই থাকবে। শোবে চল, রাত অনেক হয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তোমার প্রতীক্ষা করছি। এত নিষ্ঠুর তো তুমি কখনই ছিলে না।

মনোহর ক্ষীণ কণ্ঠে বললে—তুমি কখন এসেছো, বাগী? দেখো, আমি কবে থেকে তোমায় ডাকছি। চলো, আমরা বেড়িয়ে আসি। সেই নদীর ধারে বসে তুমি তোমার সেই প্রিয় গানটা শোনাবে, যে গানটা শুনলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। কি বলছো? আমি অকৃতজ্ঞ? এটা তোমার অন্যায়, বাগী! আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি—এমন একটা দিনও যায়নি যে আমি তোমার জন্য কাঁদিনি।

জেনি তার কাঁধ বেঁকিয়ে ধরে বললো—তুমি এসব কি উল্টো-পাল্টা বকছো? বাগী এখানে কোথায়?

মনোহর তার দিকে অপরিচিতের দৃষ্টিতে দেখে কিছু বললো, তারপর খুব জোরে হেসে বললো— আমি এটা মানবো না, বাগী! তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে। সেখানে তোমার জন্য আমি একটা ফুলের মালা গাঁথবো···।

জেনি বুঝলো, মনোহর মদ খুব বেশী খেয়েছে। সেজন্য বকবক বেশী করছে। এই মুহূর্তে তার সাথে কথা বলা উচিত নয়। আস্তে-আস্তে কামরার বাইরে বেরিয়ে এল একটু আশঙ্কা যা তার হয়েছিল এখন তার মূলোচ্ছেদ হয়ে গেল। যে লোকের নিজের কথার উপর সংযম নেই; ইচ্ছার উপর কি অধিকার থাকতে পারে?

সেই সময় থেকে মনোহর ঘরের লোকেদের উপর বেশী অনুরক্ত হয়ে পড়লো। কখনও বাগেশ্বরীকে ডাকছে, আবার কখনও মাকে, কখনও দাদুকে। তার আত্মা অতীতে বিচরণ করতে লাগলো আর সেই অতীতে যেখানে জেনি তার জীবনে কালো ছায়ার মত প্রবেশ করতে পারেনি, সেখানে বাগেশ্বরী খুব সহজেই তার জীবনে আলো ছড়িয়ে দিল।

পরের দিন জেনি গিয়ে তাকে বললো—তুমি এত মদ কেন খাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ না তোমার অবস্থা কি হচ্ছে?

মনোহর তার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে বললো—তুমি কে?

জেনি—কি, আমাকে তুমি চেনো না? এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে?

মনোহর—আমি তোমাকে কখনও দেখিনি। আমি তোমাকে চিনি না।

জেনি আর কথা বাড়ালো না। সে মনোহরের ঘর থেকে মদের বোতলগুলোকে সব সরিয়ে ফেললো এবং চাকরকে বলে দিল যে একবিন্দু মদ যেন সে তাকে না দেয়। এখন তার একটু-একটু সন্দেহ হতে লাগলো; কেননা, মনোহরের অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক বলে মনে হ'ল—যতটা সে বুঝতো। মনোহরের জীবন এবং স্বাস্থ্য রাখা তার নিজের জন্য প্রয়োজন ছিল। কেননা এই ঘোড়ার উপর বসেই সে শিকার করতো। ঘোড়া ছাড়া শিকারে আনন্দ কোথায়?

কিন্তু এক সপ্তাহ পরেও মনোহরের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হ'ল না। না বন্ধুকে চিনতে পারতো, না চাকরকে। গত তিন বছর ধরে যেন তার জীবন এক স্বপ্নের মতো কেটে গেল!

সাতদিনের দিন জেনি সিবিল সার্জেনকে নিয়ে এল, কিন্তু মনোহর কিছুই বুঝতে পারলো না।

৮

পাঁচ বছর পরে বাগেশ্বরীর হারানো প্রেম আবার জেগে উঠলো। মা-বাবা পুত্র শোকে কেঁদে-কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছলো। বাগেশ্বরী নিরাশার মধ্যেও আশায় বুক বেঁধে ছিল। তার বাপের বাড়ীর লোকেরা বেশ ধনী ছিল। সেখান থেকে বারবার নিতে আসতো বাবা, দাদা, কিন্তু ধৈর্য্য এবং তপস্যার দেবী ঘর থেকে কখনও যায় নি!

যখন মনোহর ভারতবর্ষে এসেছিল, তখন বাগেশ্বরী শুনেছিল যে তার স্বামী বিলেত থেকে একজন মেমকে নিয়ে এসেছে। তবুও তার আশা ছিল

যে সে ফিরে আসবে; কিন্তু তার আশা পূর্ণ হয় নি। তারপর আবার শুনলো সে খ্রীষ্টান হয়ে গেছে এবং আচার বিচার সব ত্যাগ করেছে। তখন সে নিজের মাথা ঠুকছিলো।

ঘরের অবস্থা দিনের পর দিন আরও খারাপ হতে লাগলো, বর্ষা বন্ধ হয়ে যেতে; সাগরও শুকোতে লাগলো। ঘর বিক্রি করলো কিছু জমি ছিল, তাও বিক্রী করে দিল। তারপর গয়না বিক্রি করবার সময় এল। অবস্থা এত খারাপ হয়েছিল যে কখনও উনুন জলতো আবার কোনদিন তাও সম্ভব হতো না।

একদিন সন্ধ্যার সময় সে কুঁয়োতে জল আনতে গিয়ে দেখলো যে আধমরা একটা লোক কুঁয়োর কাছে এসে বসে আছে। বাগেশ্বরী দেখলো যে লোকটা তো মনোহর! সে সঙ্গে-সঙ্গে ঘোমটা বাড়িয়ে দিল। বিশ্বাস-ই হল না, তবুও আনন্দে এবং বিস্ময়ে তার হৃদয় উতাল-পাতাল হতে লাগলো। দড়ি এবং কলসি কুঁয়োর উপর রেখে সে এক দৌড়ে ঘরে এসে শাশুড়ীকে বললো—মা; কুঁয়োর পাশে গিয়ে দেখুন, কে যেন এসেছে।

শাশুড়ী বললো—তুমি জল আনতে গিয়েছিলে, না তামাশা দেখতে গিয়েছিলে? ঘরে এক ফোঁটা জল নেই। কুঁয়োর ধারে কে এসেছে?

"গিয়ে দেখো না।"

"কোন সিপাহী পেয়াদা হবে। তারা ছাড়া আরকে আসবে?

"কোন মহাজন তো নয়?

"না, মা। তুমি গিয়ে কেন দেখছো না?"

বুড়ী মা একটু-একটু আশঙ্কা নিয়ে কুঁয়োর কাছে গেলো। মনোহর দৌড়ে এসে তার পায়ের উপর আচাড় খেয়ে পড়লো। মা তাকে বুকে টেনে নিয়ে বললো—তোমার দশা এ কি হয়েছে মানু? অসুস্থ আছ? তোমার সব জিনিস কোথায়?

মনোহর বললো—কিছু খেতে দাও, মা! খুব খিদে পেয়েছে। আমি অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছি।

সারা গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়লো যে মনোহর ফিরে এসেছে। লোকেরা দৌড়ে-দৌড়ে তাকে দেখতে এল। কিরকম ঠাঁট-বাঁট এসেছে? অনেক উঁচু পদে কাজ করে, হাজার টাকা মাইনে পায়। এখন তার ঠাঁট আর কি জিজ্ঞাসা করার আছে? মেমসাহেব তার সাথে এসেছে কি না?

কিন্তু যখন এসে দেখলো, মনে হল যেন আধমরা একটা লোক, যার হাল

খুব খারাপ। ছেঁড়া কাপড় পরা, লম্বা-লম্বা চুল—যেন জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছে।

শত প্রশ্নে জর্জরিত হতে লাগলো যে, আমরা তো শুনেছি, তুমি কোন বড় উঁচু পদে চাকুরী করো?

মনোহর যেন কোন ভুলে যাওয়া অবস্থাকে স্মরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললো—আমি? আমি তো কোন চাকরীতে নেই?

"ওহো! তুমি বিলেত থেকে মেম নিয়ে আসনি?"

মনোহর চকিত হয়ে বললো—বিলেত? কে গিয়েছিল?

আরে ভাঙ তো খাও নি? তুমি বিলেতে যাও নি?"

মনোহর মূঢ়ের মতো হেসে বললো—আমি বিলেতে কি করতে যাবো?

"ওহো! তুমি বিলেতে যাওয়ার সুযোগ পাও নি? এখান থেকে তুমি বিলেতে গিয়েছিলে। তোমার চিঠি বরাবর আসতো। আর এখন তুমি বলছো, আমি বিলেতে যাই-ই-নি। তুমি কি অজ্ঞান হয়ে আছো না আমাদেরকে উল্লুক ভাবছো?

মনোহর সব লোকেদের দিকে চোখ তুলে তাকালো এবং বললো—আমি তো কোথাও যাই নি। আপনারাই জানেন, কি বলছেন?

এখন আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না যে সে ঘোরে অচৈতন্য অবস্থায় আছে। বিলেত যাওয়ার আগে পর্য্যন্ত সব কথা তার মনে আছে। গ্রাম এবং ঘরের সব লোকদের চিনতো, সবার সাথে নম্র ভাবে এবং ভালভাবে কথা বলতো; কিন্তু যখনই ইংল্যাণ্ডে, ইংরাজী-বিবি এবং উঁচু পদের কথা হতো, তখনই ভোঁচাকা খেয়ে কাঁপতে লাগতো। এখন বাগেশ্বরীর প্রতি এক অস্বাভাবিক অনুরাগ দেখাতো যেটা একেবারে কৃত্রিম মনে হতো! বাগেশ্বরী চাইতো তার আবার ব্যবহার আগেকার মতো স্বাভাবিক হোক। সে প্রেম পাগলিনী নয়; প্রেম চাইতো মাত্র। পাঁচ-দশ দিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারলো, এই বিশেষ অনুরাগের কারণ সাজানো নয় বা লোক দেখানোও নয় বরং কোন সাহসিক বিকার। মনোহর আগে মা-বাবাকে এত সম্মান কখনও করি নি। খুব বড়ো-বড়ো কাজ করতেও তার কোন সংকোচ হয় না। বাজার থেকে শাক-শব্জী বয়ে আনতে সে যে লজ্জা পেত, এখন আর তা পায় না, বরং কুয়ো থেকে জল তুলতো, কাঠ কাটতো এমন কি ঘর পরিষ্কারও করতো। কেবল ঘরের লোকেরা নয়, সারা মহল্লার লোকেরা তার সেবা এবং নম্রতার কথা আলোচনা করতো।

একবার সে অঞ্চলে চুরি হয়েছিল। পুলিশ খুব দৌড়াদৌড়ি করেছিল। কিন্তু চোরের কোন পাত্তাই পেল না। মনোহর কেবল চোরকেই ধরলো না; চুরি যাওয়া সমস্ত মালপত্রও বার করে দিয়েছিল। এ থেকে আশেপাশের গ্রাম এবং মহল্লায় তার যশ ছড়িয়ে পড়েছিল। যার ফলে কোন চুরি হলেই লোকে তার কাছে ছুটে আসতো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার উপকার সফল হতো। এইভাবে তার জীবিকার এক ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। এখন সে বাগেশ্বরীর ইশারাতেই গোলাম গিরি করে। বেশ হাসি-খুশিতে রাখে এবং লোককে সেবা করে তাদের দিন কাটতে লাগলো। যদি কোন বিকার বা অসুখের লক্ষণ বলে কিছু থাকতো তো সেটাই দিক। এই লোকই তার যাত্রী হয়েছিল।

তার দশা দেখে বাগেশ্বরীর খুব দুঃখ হতো। কিন্তু এই অসুখ তার স্বাস্থ্যের থেকেও বেশী প্রিয় ছিল যখন তার কথা সে জিজ্ঞাসা করতো না।

৯

ছ'মাস পরে একদিন জেনি তার খোঁজ করতে-করতে সেখানে এসে পৌঁছালো। হাতে যা কিছু ছিল, সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে এখন সে কারো আশ্রয়ের খোঁজে বার হয়েছিল। তার প্রিয় লোকেদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে তাকে আর্থিক সাহায্য করে। সম্ভবতঃ এখন জেনির মধ্যে কিছুটা গ্লানির ভাব এসেছে। সে নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়েছিল।

দরজায় হর্ণের আওয়াজ শুনেই মনোহর বাইরে বেরুলো এবং এইভাবে তাকাতে লাগলো যেন জেনিকে সে কতদিন দেখেই নি।

জেনি, মোটর থেকে নেমে তার সাথে হাত মেলালো এবং নিজের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা শোনাতে লাগলো—তুমি এইভাবে আমাকে লুকিয়ে কেন চলে এলে? এখানে এসে একটা চিঠিও লেখনি? আমি তোমার সাথে এমন কি অন্যায় করেছি? তারপর, যদি তুমি কোন খারাপই দেখেছিলে তো আমাকে সাবধান করে দাওনি কেন? লুকিয়ে চলে এসে কি লাভ হয়েছে? এমন ভাল জায়গা পেয়েছিলে, সে হাত থেকে চলে গেল।

মনোহর কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

জেনি আবার বললো—তুমি চলে আসার পর আমার উপর যে কি বিপদ এসেছিল, তা বললে তুমি ঘাবড়ে যাবে। আমি সেই চিন্তায় এবং দুঃখে অসুখে পড়ে গেলাম। তোমাকে ছাড়া আমার জীবন নিরর্থক বলে মনে হয়েছে। তোমার ছবি দেখে দেখে মনকে সান্ত্বনা দিতাম। তোমার চিঠি প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত পড়তে আমার সবচেয়ে আনন্দের বিষয় ছিল। তুমি আমার সাথে

চলো। আমি একজন ডাক্তারের সাথে আলোচনা করেছি, তিনি মানসিক রোগের ডাক্তার। আমি আশাকরি তাঁর চিকিৎসায় তুমি ভাল হয়ে যাবে।

মনোহর কিছুক্ষণ বিরক্তভাবে দাঁড়িয়ে রইলো দেখে মনে হয় সে যেন কিছুই শোনেনি, দেখেও নি।

হঠাৎ বাগেশ্বরী বাইরে এল। জেনিকে দেখেই সে চমকে উঠে বুঝে নিল যে এই সেই ইউরোপীয়ান সতীন। সে তাকে খুব সম্মান দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল। মনোহর ও তাদের পিছনে-পিছনে গেলো।

জেনি, ভাঙা খাটে বসতে-বসতে বললো—ইনি নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে তোমাদের বলেছেন। ইংল্যাণ্ডে এনার সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল।

বাগেশ্বরী বললো—সে তো আমি আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি।

জেনি—ইনি কি আমার পরিচয় দেন নি ?

বাগেশ্বরী—কখনই না। এনার তো কিছু মনেই নেই। আপনার এখানে আসতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে ?

জেনি—বেশ কয়েক মাস পরে এঁর বাড়ীর ঠিকানা পেয়েছি। সেখানে কিছু না বলে-কয়েই এখানে বলে এসেছি।

"এর কি হয়েছিল, আপনি কি কিছু জানেন ?"

"খুব মদ খেতে লাগলেন। তারপর কোন ডাক্তারকে দেখান হয় নি।"

"আমরাও তো কোন ডাক্তারকে দেখায় নি।"

জেনি তিরস্কার করে বললো—কেন ? আপনারা কি এঁকে সব সময় অসুস্থ করে রাখতে চান ?

বাগেশ্বরীও বেশ রেগে গিয়ে বেপরোয়া ভাবে বললো—আমার জন্য কি উনি অসুস্থ হয়েছেন, না এঁর শরীরটা থাকলেও উনি কি সত্যিই ভাল আছেন ? তবে তিনি নিজেকে ভুলে গেছিলেন, এখন আবার পেয়েছেন। সে আরও কটাক্ষের সুরে বললো—আমার বিচারে তো তিনি তখনই বেশী অসুস্থ ছিলেন, এখন বরং অনেক ভাল হয়েছেন।

জেনি আরও রেগে গিয়ে বললো—ননসেন্স! এঁকে কোন বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা করাতে হবে। সে গোয়েন্দার কাজে খুব দক্ষ। এর সব অফিসারেরা এঁর উপর খুব প্রসন্ন ছিলেন। যদি উনি চান তো এখনও সে চাকুরী উনি পেতে পারেন। নিজের বিভাগে খুব উঁচু পদ পর্য্যন্ত পৌঁছাতেও পারবেন। এঁর রোগ অসাধ্য নয় বলে আমার বিশ্বাস। অবশ্য বিচিত্র বটে; আপনি কি এঁর বোন ?

বাগেশ্বরী তো মুচকি হেসে বললো—আপনি তো গালাগাল দিচ্ছেন। উনি আমার স্বামী।

জেনির মাথায় যেন বজ্রপাত হল। তার মুখের উপর থেকে নম্রতার আচরণ সরে গেল এবং মনের মধ্যের চাপা ক্ষোভকে দাঁত চেপে বার করতে লাগলেন। তার ঘাড় যেন শক্ত হয়ে উঠেছে, হাত দুটো মুঠো করে রেখেছে। উন্মত্ত হয়ে বললো—তুমি তো খুব ধাপ্পাবাজ লোক। আমাকে তো খুব ধোকা দিয়েছো। আমাকে বলেছো যে আমার স্ত্রী মারা গেছে। কত বড় চালাক। এ পাগল নয়। পাগলামী করার অছিলায় ভরা। আমি কোর্টে কেস করাবো।

রাগের চোটে সে কেঁপে উঠলো। তারপর কেঁদে-কেঁদে বললো—এই ধোকাবাজীর আমি মজা বার করে দেবো। ওহো, সে আমাকে কত বড় অপমান করেছে। এমন বিশ্বাসঘাতক লোককে যে শাস্তি দেওয়া হয় সে তো অনেক কম। এ কেমন মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমিই তাকে এই জায়গা দিয়েছিলাম, আমারই চেষ্টাতে সে এত বড় হতে পেরেছে। এরজন্য আমি আমার ঘর ছেড়েছি, নিজের দেশ ছেড়েছি, আর সে আমার সাথে এমন কপট আচরণ করলো।

জেনি মাথার উপর হাত রেখে বসে পড়লো। তারপর হঠাৎ উঠে মনোহরের কাছে গিয়ে তাকে নিজের দিকে টেনে আনতে-আনতে বললো—আমি তোমাকে খারাপ করেই ছাড়বো। তুই আমাকে কি বুঝেছিস...?

মনোহর একই রকম ভাবে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, যেন তার কোন প্রয়োজন নেই।

তারপর জেনি সিংহীর মত মনোহরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর বসলো। বাগেশ্বরী তার হাত ধরে ছাড়িয়ে দিয়ে বললো—তুমি এরকম ডাইনি না হলে কি তার দশা এমন হতো?

জেনি তক্ষুণি উঠে পকেট থেকে পিস্তল বার করলো এবং বাগেশ্বরীর দিকে উঁচিয়ে ধরলো। তক্ষুণি মনোহর এক লাফ দিয়ে উঠে তার হাত থেকে গুলি ভরা পিস্তল কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং বাগেশ্বরীর সামনে এসে এমন মুখ করে দাঁড়ালো যেন কিছুই হয় নি।

এমন সময় মনোহরের মা দুপুরের ঘুম থেকে উঠে আসছিল এবং জেনিকে দেখে বাগেশ্বরীর দিকে জিজ্ঞাসা ভরা চোখে তাকালো।

বাগেশ্বরী উপহাসের সুরে বললো—ইনি আপনাদের বউ।

বুড়ি বেরিয়েই বললো—কে আমার বউ? এ কি আমার বউ হবার যোগ্য, বাঁদরের মতন? ছেলের উপর না জানি কি সব করেছে, এখন বুকের উপর ডাল পিষতে এসেছে?

জেনি এক মুহূর্ত ধরে রক্ত চক্ষু করে মনোহরের দিকে দেখতে লাগলো। তারপর বিদ্যুতের মত দৌড়ে গিয়ে উঠোনে পড়ে থাকা পিস্তলকে উঠিয়ে নিল এবং বাগেশ্বরীর দিকে গুলি মারতে উদ্যত হলে মনোহর সামনে এসে দাঁড়ালো। সে খুব সহজেই জেনির সামনে গিয়ে তার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিল এবং নিজের বুকে গুলি করলো এবং একটা তীব্র আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

ভাষান্তর: গায়ত্রী চক্রবর্তী

দ্বিধা

রূপ, যৌবন, ঐশ্বর্য আর আনন্দে কোকিলার যে কলুষিত জীবন শুরু হয়েছিল, তা পবিত্র করার বাসনায় আজকাল সে চোখের জল ফেলে। বিগত দিনের কথা স্মরণ করে শিউরে ওঠে, বিষাদ ও নিরাশায় বিফল হয়ে কেঁদে বলে—হায়, এ সংসারে জন্ম হলো কেন! জীবনের কালিমা মোচনের উদ্দেশ্যে দান, ধ্যান ও নাম-গানে রত, কিন্তু তাতে কি তার ফল লাভ হবে? নবজাত শিশু কন্যাই যেন তার আশার আলো, সান্ত্বনার বস্তু। শিশুর মুখ দেখেই একদিন তার শুকনো ঠোঁটে বিদ্যুতের মত হাসি খেলে যায়, তাও ক্ষীণ, করুণ ও উদাস। পরক্ষণেই একটা দীর্ঘশ্বাস তাকে গ্রাস করে। আজ পনের বছর ধরে সেই শিশুকে লালন-পালন করে আসছে। তাকেই সে জীবনের জ্যোতি ভেবে রেখেছে। বাৎসল্যের সেই জ্যোতিই যেন তার জীবন-সন্দেশ ও মূক-উপদেশ।

কোকিলা তার মেয়ের নাম রেখেছে শ্রদ্ধা। কারণ, তার মেয়ের জন্মের পরই সে শ্রদ্ধাশীলা হয়ে ওঠে। শ্রদ্ধাকে সে সামান্য মেয়ে মনে করে না, ভাবে, হয়তো কোন দেবী এসেছে। তাই মেয়ের বান্ধবীদের সঙ্গেও বেশী মিশতে দেয় না, কোন পাপ-দৃষ্টি যাতে না পড়ে, তার জন্যেও সচেষ্ট। শ্রদ্ধাই যেন তার বিভূতি, তার আত্মা, তার জীবন-দীপ। শিশুকে কোলে নিয়ে চোখের জলে বারবার বলেছে—ঠাকুর! এই ক্ষীণ আলোটা যেন নিভিয়ে দিয়ো না, আমার চেষ্টা যেন বিফল না হয়। হায়, এমন কোন ওষুধ নেই, যাতে জন্মের-সংস্কার নষ্ট করে দিতে পারে? হে ঈশ্বর, আমার মেয়ের গায়ে যেন কাঁটার আঁচড় না লাগে। তার কথায়, কাজে, ব্যবহারে, আচারে, বিচারে, জ্ঞানে সব সময় যেন সে নারী জীবনের আদর্শ রেখে যেতে পারে। মেয়ের সরলতা, প্রগলভতা, চাতুরী ও বুদ্ধিমত্তা দেখে কোকিলার চোখ আনন্দ-অশ্রুতে ভরে যায়। তাকে আজও সুখ, শান্তি ও আশা জুগিয়ে চলেছে।

দুই

ষোল বছর পর সেই সরলমতি শ্রদ্ধা হয়ে উঠেছে—এক সগর্ব; শান্ত, লজ্জাশীলা নব-যৌবনা, যাকে দেখে চোখ তৃপ্ত হয়। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, বিদ্যা-অর্জনে প্রথমস্থান অধিকার করে, সংসার-বিমুখ, সহপাঠীরা কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না, আর বায়ুমণ্ডলের মত তাকে মাতৃ-স্নেহ ঘিরে রেখেছে। পড়াশুনাই হলো তার একমাত্র সাধনা, একান্তে থাকাই তার বেশী পছন্দ। তার সঙ্গে কথা বলতে কেউ যেন সাহসই পায় না। তাকে

দেখে অনেকে দূর থেকে আঙুল বাড়িয়ে বলে—"ও তো কোকিলা বেশ্যার মেয়ে।" লোকের কথা শুনে শ্রদ্ধার মথায় নত হয়, মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে, কী করবে ভেবে পায় না।

শ্রদ্ধাকে একা একা থাকতে দেখে মা কোকিলা তার বিয়ের কথা চিন্তা করে, মেয়ের কাছে প্রস্তাব দেয়। শ্রদ্ধা কিন্তু মায়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়, বিয়েটাকে ঈশ্বরীয় কোপ বলে মনে করে। কোকিলা নাছোড়-বান্দা হলে শ্রদ্ধার মুখ লাল হয়ে ওঠে, চোখে জলের ধারা বয়। উভয়ের জীবনাদর্শ ভিন্ন। কারণ, কোকিলা সমাজের দেবতাগণের পুজারিণী আর শ্রদ্ধা সমাজের কাছে, ঈশ্বরের কাছে ও মানুষের কাছে ঘৃণ্য। তার কাছে সংসারের প্রিয় বস্তু বলতে বই। তাই সে বিদ্বান ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে থাকতে ভাল-বাসে। কেননা, সেখানে নেই কোন ভেদাভেদ, নেই জাত-পাতের স্থান,—সকলের সমান অধিকার। কবি রহিমের দোহা থেকেই শ্রদ্ধার প্রকৃতির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

—"প্রেম সহিত মরিবো ভলো, জো বিষ দেয় বুলায়।"

অর্থাৎ, যদি কেউ ভালবেসে কাছে টেনে বিষ দেয়, তাহলে নতজানু হয়ে সে বিষ মাথায় তুলে নেবে, কিন্তু অনাদরে দেওয়া অমৃতের প্রতিও সে ফিরে চাইবে না।

একদিন, কোকিলা সজল-নয়নে শ্রদ্ধাকে বললে—হ্যাঁরে খুঁকি, তুই আমার মেয়ে হয়ে জন্মেছিস্ বলে তোর খুব লজ্জা করে না? আচ্ছা, তুই যদি উঁচু বংশে জন্মাতিস্, তাহলে কি তোর এমন লজ্জা হতো? মনে মনে আমাকে খুব ঘেন্না করিস না রে?

মায়ের কথা শুনে অবাক হয়ে শ্রদ্ধা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে—মা, আজ তুমি এমন প্রশ্ন কেন করছো? আমি কি কোনদিন তোমাকে অপমান করেছি?

কোকিলা গদগদ হয়ে বলে—না রে না, অপমান করবি কেন। তাই তো আমি ভগবানকে দিনরাত বলি—সবাইকে যেন তোর মত মেয়ে দেন। আবার এটাও ভাবি—তোর মত মেয়ে যদি না পেতাম, তাহলে জীবনে আপশোষ করতে হেতো।

মায়ের কথা শুনে শ্রদ্ধা ধীর কণ্ঠে বলে—মা, সত্যি কথা বলতে কি, তোমার ওপর আমার যা' শ্রদ্ধা-ভক্তি, তেমনটি কারোর প্রতি নেই। তোমার মেয়ে হয়ে জন্মানোটা আমার লজ্জার কথা তো নয়ই, বরং গৌরবের। মানুষ পরিবেশে ও পরিস্থিতির দাস। তুমি যে অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটিয়েছো, সেটাকে পাপ বলা চলে না। দেখো, স্রোতের অনুকূলে নৌকা চালানো খুবই সহজ, কিন্তু স্রোতের প্রতিকূলে যে নৌকা সহজ ভাবে চালাতে পারে, সেই-ই তো দক্ষ নাবিক।

মেয়ের কথা শুনে কোকিলা হেসে জিজ্ঞেস করে—তুই তাহলে বিয়ে করতে রাজী হচ্ছিস না কেন বলতো?

শ্রদ্ধা অবনত মস্তকে উত্তর দেয়—আচ্ছা মা, বিয়ে না করে কি জীবন কাটে না? আমি কুমারী হয়েই থাকতে চাই। স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ভর্তি হয়েছি। দু'তিন বছর পর কলেজ থেকে বেরিয়ে ডাক্তারি পড়তে পারি, ওকালতি পড়তে পারি, কোন চাকরি করতে পারি। আজকাল মেয়েরা তো সব কাজই করতে পারে।

কোকিলা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁরে, তুই কাউকে ভাল বাসিস্ না? না, ভালবাসতে ইচ্ছে করে না?

শ্রদ্ধা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—মা, সংসারে কে প্রেম-বিহীন বলো? প্রেমই হলো মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। ঈশ্বরের সত্তা তো প্রেমের মধ্যে দিয়েই উপলব্ধি করা যায়। আমি চাই, যে আমার সামনে প্রেমের হাত বাড়িয়ে দেবে, আমি তাকেই মন-প্রাণ দিয়ে পুজো করবো, কিন্তু হাত বাড়িয়ে আমি প্রেম ভিক্ষে করবো না। এই সব ভেবেই আমি বিয়ের কথা খুব একটা চিন্তা করি না।

তিন

একদিন টাউন হলে অনুষ্ঠিত হলো মহিলা-সম্মেলন মহিলাদের সঙ্গে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও অংশ গ্রহণ করেন। ভীড়ে হল উপচে পড়ছে। মহিলাদের শেষ সারিতে জায়গা না পেয়ে শ্রদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে। শ্রদ্ধা যে কে তা অনেক মহিলাই জানেন, তাই সে সভা-সমিতিতে বড় একটা যায় না।

সভার কাজ আরম্ভ হয়। সম্মেলনের যিনি প্রধান তাঁর বক্তৃতয়ে তিনি কয়েকটা প্রস্তাব রাখেন এবং তাঁর প্রস্তাবকে সমর্থন করে অন্যেরা একে একে বক্তৃতা দেন। অনেকের বক্তৃতা শুনে মহিলাদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। তবু তাঁরা নিজেদের জোরালো মতামত ব্যক্ত করতে পারছেন না। তাঁদের মধ্যে দু'একজন সামান্য কয়েকটা কথা বলেই বসে পড়েন। আবার কেউ কেউ রেগে মঞ্চে যান, কিন্তু দু'চার কথার বেশী আর বলতে পারেন না। তাই শেষ পর্যন্ত দেখা যায় প্রস্তাব গুলো মহিলাদেরই বিরুদ্ধা-চারণ করছে।

যুব-সম্প্রদায় মহিলাদের বিপক্ষে কৌতুক করতে ছাড়ে না। তাদের যেন আনন্দের দিন, হাততালিও দেয়! যুবকদের আচরণ দেখে শ্রদ্ধার গা জ্বলে যায়, অসহ্য লাগে। তাই গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে মঞ্চের ওপর ওঠে দাঁড়ালে সভা নিস্তব্ধ হয়ে যায়। দর্শক-মণ্ডলী মঞ্চের দিকে হাঁ-করে তাকিয়ে থাকেন। শ্রদ্ধা রীতি-নীতি অনুসারে বক্তৃতা শুরু করে। শ্রোতা তার প্রতিটি শব্দের মধ্যে নতুনত্ব সজীবতা ও দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করে। তার নব যৌবনের সুরভিও চারদিক বিচ্ছুরিত হয়ে সভাকে স্তব্ধ করে দেয়।

সভা শেষ হলে নানাজনে নানা মন্তব্য করে।

একজন অপরকে বলে—আচ্ছা, মেয়েটা কে বলো তো ?

দ্বিতীয় জন—জানো না ? ও তো সেই কোকিলা বেশ্যার মেয়ে।

তৃতীয়জন—যাই বলো বাপু, কথার মধ্যে বেশ জাদু মেশানো আছে।

চতুর্থজন—থাকবে না কেন ? বলি, মা-টাকে দেখো। পুরুষের মেজাজ খারাপ করে দেয়। পেশা ছেড়ে দেওয়ায় শহরের কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে বলো ? মেয়েটাও বোধহয় মায়ের পেশাটাই ধরবে।

খদ্দর পরা এক ময়লা যুবক বললে—ওর কথাগুলো কি আপনার খারাপ লাগলো ? ভাল কথা বলার কি ওর অধিকার নেই ?

চতুর্থজন—আপনার রাগ হচ্ছে কেন ? ওর সঙ্গে কিছু আছে নাকি ?

ময়লা যুবকটি রেগে উত্তর দেয়—এই ধরণের কথা বলতে আপনার লজ্জা করছে না ?

দ্বিতীয়জন—লজ্জা কেন হবে ? বেশ্যার মেয়ে বেশ্যা হবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে ?

যুবকটি ঘৃণিত স্বরে বলে—তা তো বলবেনই। আপনারা বেশী বুদ্ধিমান বলে এমন মন্তব্য করছেন ! দেখলেন না ; যে যুক্তি দিয়ে ব্যক্তিগত মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সে সাধারণ মেয়ে নয়, যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। ঐ রকম মেয়েরা কখনো রূপ বিক্রি করে না, এটা জানবেন।

শ্রদ্ধা সেই সময় পাশ দিয়ে পেরিয়ে যায়। শেষ কথাটা তার কানে আসায় বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে থেমে কৃতজ্ঞতা ভরা দৃষ্টিতে যুবকের দিকে তাকায়। তারপর আবার এগিয়ে যায়, কিন্তু কানে সেই কথাটা বারবার প্রতিধ্বনিত হয়।

শ্রদ্ধা মনে মনে ভাবে—তাকে উৎসাহ দেয় ও প্রশংসা করে একমাত্র তার মা। বাকী সবাই তো তাকে উপেক্ষা করে, তিরস্কার করে। আজই প্রথম এক খদ্দরধারী ময়লা যুবকের মুখে তার প্রশংসা শুনে সে আনন্দে আত্মহারা হয়। মনে প্রশ্ন জাগে—যুবকটি কে ? কী করে ? আর কী তার সঙ্গে দেখা হবে ?

কলেজে যাতায়াতের পথে শ্রদ্ধার চোখ সেই যুবককে খুঁজে বেড়ায়। ঘর থেকে বাইরে পথের দিকেও তাকিয়ে থাকে, কিন্তু নিরাশ হয়।

কিছুদিন পর আবার মহিলা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের তখন চারদিন মাত্র বাকী, শ্রদ্ধা এবারেও বক্তৃতা দেবে বলে মনস্থ করে। এবারের বক্তৃতা যাতে আরো জনপ্রিয় হয়, সেদিকেই তার লক্ষ্য বেশী।

সম্মেলনের দিন উপস্থিত। শ্রদ্ধা ভয়ে ভয়ে সভায় যায়। দেখে যথেষ্ট লোক সমাগম হয়েছে। তাকে দেখেই জনমণ্ডলী করতালি বাজিয়ে স্বাগত জানায়, চারদিকে কোলাহল। তাদের বক্তব্য—আপনি আগে বক্তৃতা শুরু করুন।

মঞ্চে উঠে শ্রদ্ধা প্রথমেই দর্শকমণ্ডলীর দিকে একবার চোখ মেলে তাকায়। দেখতে পায়—সেই যুবক জায়গা না পাওয়ায় সকলের শেষে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে শ্রদ্ধা যেন উৎসাহ পায়। কম্পিত কণ্ঠে বক্তৃতা শুরু করে। শ্রোতাগণ ধীর-স্থির ভাবে ভাষণ শোনে। তাঁর বিচারে সেখানে জহুরী ছিল একটাই, সেই যুবক !

যাইহোক, তার ভাষণ চলে আধ ঘণ্টা ধরে। শ্রোতাগণ এমন জোরালো ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা ইতিপূর্বে শোনে নি।

চার

সভা শেষ হলে শ্রদ্ধা বাড়ী ফেরে। পথে যেতে যেতে পিছন ফিরে দেখে সেই যুবক তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তারই পিছনে পিছনে হাঁটছে। সে বুঝতে পেরেছে আজ তার ভাষণ শুনে সকলেই খুশী, কিন্তু যুবকের অভিমত শোনা হয় নি। তাই গতি কমিয়ে দিয়ে দু'জনে দু'এক মিনিট চুপচাপ পা বাড়ায়।

যুবক মৃদু হেসে বলে—আজ তো আপনি কামাল করে দিয়েছেন।

শ্রদ্ধা উল্লাস চেপে বলে—ধন্যবাদ ! আপনার কেমন লাগলো ?

যুবক—আমি কেন, সবাই, আপনার প্রশংসা করছে।

শ্রদ্ধা—আপনি কি এখানেই থাকেন ?

যুবক—হ্যাঁ, এখানে ইউনিভারসিটিতে এম. এ. পড়তে এসেছি। ভাবি, সমাজের এই জাত্যাভিমান আর কতদিন আমাদের ঘাড়ে চেপে থাকবে ? আমিও সেই হতভাগ্যদের মধ্যে একজন। কারণ, আমি জাতিতে চামার। বাবা ছিলেন স্কুলের ইন্সপেক্টরের আর্দালী। সেই ইন্সপেক্টরের সুপারিশেই স্কুলে ভর্তি হতে পেরেছিলাম। তারপর ভাগ্যের জোরে এতদূর এসেছি। প্রথম প্রথম স্কুলের মাস্টার আমাকে ছুঁয়ে ফেললে চান করতেন। সে রকমটি অবশ্য এখন আর নেই। তবু অনেকে অন্য চোখে দেখে।

শ্রদ্ধা—দেখুন, আমি এই জাত্যাভিমানটা জন্মে মানি না, ধর্মে মানি।

যুবক—সে তো আপনার বক্তৃতাতেই শুনলাম। তাই তো আপনার সঙ্গে কথা বলতে সাহস হলো, না হলে আপনি কী আর আমিই বা কে !

শ্রদ্ধা অবনত মস্তকে বলে—আপনি হয়তো আমার পরিচয় জানেন না।

যুবক—হ্যাঁ, জানি বৈকি। আপনার মায়ের সঙ্গে পরিচয় হলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

"সত্যি, মাও খুব খুশী হবে। আচ্ছা, আপনার নামটা কি ?"

"ভগতরাম।"

ধীরে ধীরে তাদের পরিচয়টা হয় দৃঢ় আর মৈত্রী হয় প্রগাঢ়। শ্রদ্ধার চোখে ভগত-রাম দেবতা আর ভগতরামের চোখে শ্রদ্ধা দেবীরূপে ধরা পড়ে।

পাঁচ

এই ভাবে একটা বছর পার হয়। ভগতরাম রোজ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা করতে যায়। দু'জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে। শ্রদ্ধা কোন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করলে ভগত-রাম মনোযোগ দিয়ে শোনে। উভয়ের মানসিকতা এক, জীবনাদর্শ এক, রুচি এক এবং বিচারও এক। ভগতরাম আজকাল প্রেমের আদর্শ সম্বন্ধেও আলোচনা করে তার কথায় 'রস' ও 'অলংকার' না থাকলেও ভাবের ইঙ্গিত যথেষ্ট। যখন শ্রদ্ধার কপোলদ্বয় উল্লাসে রঞ্জিত হয়ে ওঠে, ঠিক তখনই ভগতরাম চলে যায়। তাকে চলে যেতে দেখে শ্রদ্ধার চোখে জল নেমে আসে আর ভাবে—ওকি আমাকে ভালবাসে না?

একদিন কোকিলা ভগতরামকে একান্তে ডেকে বলে—বাবা, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। দেখো, আমার বয়েস হয়েছে, কবে মরে যাবো তার ঠিক নেই। তাই বলছিলাম, শ্রদ্ধাকে তোমার হাতে তুলে দিতে পারলে আমি শান্তিতে যেতে পারি।

ভগতরাম অবনত মস্তকে উত্তর দেয়—দেখুন মাসীমা, পরীক্ষায় পাশ করে একটা চাকরি পেলে তবে তো বিয়ে করা শোভা পাবে।

"আমার যা আছে, সবই তোমাদের থাকবে, সঙ্গে করে কি আর নিয়ে যাবো?"

"হ্যাঁ, আপনি যা বলছেন, সবই ঠিক। তাছাড়া শ্রদ্ধার সঙ্গে যার বিয়ে হবে, সে ভাগ্যবান, কিন্তু মাসীমা, আমার কথাটাও তো ভাবতে হবে। কারণ, মন্দিরে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করার আগে ফুল, চন্দন, নৈবেদ্য ইত্যাদির তো প্রয়োজন হয়।"

বছর খানেক পর ভগতরাম এম. এ. পাশ করে একটা স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছে। সেই স্কুল থেকেই সে একদিন পাশ করেছিল। চাকরি পেয়ে ভগতরাম কোকিলার সঙ্গে দেখা করতে গেলে কোকিলা আনন্দে-আটখানা হয়, তাকে মিষ্টি মুখ করায় এবং প্রাণভরে আশীর্বাদ করে। ভাবে, এই সুযোগে বিয়ের কথাটা পাকা করে ফেলবে। শ্রদ্ধাও প্রতীক্ষা করে আছে, গর্বে যেন পা পড়ে না। ভগতরামকে শুনিয়ে বলে—মা, আমাদের জন্যে একটা ছোট-গাড়ী কেনার ব্যবস্থা করো।

কোকিলা হেসে উত্তর দেয়—ছোট কেন, বড় গাড়ীই কিনে দেবো, আগে গাড়ী রাখার মত তোরা বাড়ী ঠিক কর।

তারপর শ্রদ্ধা ভগতরামকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে গল্প করে। আজ তার বড় আনন্দের দিন। তাদের গল্পের বিষয়—কীভাবে এবং কি কি জিনিস দিয়ে তাদের ঘর সাজানো হবে। আলোচনা শেষে শ্রদ্ধা বলে—যত খরচ হবে, সব মা দেবে।

ভগতরাম—তাঁর কাছ থেকে টাকা নিতে আমাদের লজ্জা করবে না?

শ্রদ্ধা হেসে বলে—কেন, মাকে বরপণ দিতে হবে না?

এইভাবে দু'জনের মধ্যে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক কথাবার্তা চলে। শ্রদ্ধা যে কথাটা শোনার জন্যে আগ্রহী ও উদ্বিগ্ন ছিল, সেটা ভগতরামের মুখ থেকে শোনা গেল না। তাই ভগতরাম চলে গেলে সে যেন ভেঙে পড়ে।

কোকিলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁরে, আজ কোন কথা হলো?

মায়ের বক্তব্য বুঝতে পেরে শ্রদ্ধার চোখে জল আসে। বলে—আমি যদি এতই তোমার গলায় লেগে থাকি, তাহলে আমাকে কুয়োতে ফেলে দাও নি কেন!

এই বলে শ্রদ্ধার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। বিছানায় গিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে।

কোকিলা মেজাজের সুরেই বলে ওঠে—পরিষ্কার করে যদি না বলবে, তাহলে রোজ আসে কেন? এমন কিছু বড়-দরের ছেলে নয় বা শেঠজীও নয়, যে তার পথ চেয়ে বসে থাকতে হবে।

শ্রদ্ধা চোখ মুছে জবাব দেয়—দেখো মা, ঐরকম কথা বলবে না, বলে দিচ্ছি। তার মনের কথা আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝি। তাই মুখে কিছু না বললেও তার মনের খবর রাখি।

কোকিলা শ্রদ্ধাকে আর কিছু বলে না। পরের দিন ভগতরাম এলে কোকিলা বললে—হ্যাঁ বাবা, তুমি কী এত ভাবছো বলো তো?

ভগতরাম মাথা চুলকে বলে—মাসীমা, আমার দিক থেকে কোনো অসুবিধা নেই, তবে বাড়ীর লোকদের তো রাজী করাতে হবে। আমি দু'এক দিনের মধ্যেই বাড়ী যাবো। দেখুন; মা-বাবার বিরুদ্ধে গেলে তো চলবে না।

কোকিলা নিরুত্তর।

ছয়

ভগতরামের মা-বাবা শহর থেকে দূরে এক গ্রামে থাকেন। ভগতরামই তাঁদের একমাত্র সন্তান। তাঁদের বাসনা, ছেলের খুব ধুম-ধাম করে বিয়ে দেবেন। বেশ কয়েকবার বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন, কিন্তু ভগতরাম রাজী না হয়ে বলেছিল—যতদিন না চাকরি পাচ্ছি, ততদিন বিয়ে করবো না। ছেলের চাকরি হওয়ার সংবাদ পেয়েই মা-বাবা তল্পি-তলপা নিয়ে মাঘ মাসের সকালে শীতে-কাঁপতে কাঁপতে ভগত-রামের বাসায় এসে হাজির হলেন। ভগতরাম তাঁদের পদধূলি নিয়ে বললে—তোমরা এত কষ্ট করে এলে কেন, আমি তো কালই বাড়ী যেতাম।

চৌধুরীবাবু স্ত্রীকে বললেন—শুনছো ছেলের মা, তোমার ছেলে বলছে—কষ্ট করে এলে কেন, আমিই যেতাম। আরে বাপু, যাকে বারবার ডেকে পাঠালে যায় না, সে নিজেই যেতো, শোনো কেমন কথা। যাক, আমরা তোর বিয়ের সব ঠিক করে ফেলেছি। একমাসের ছুটি নিয়ে আমাদের সঙ্গেই তোকে বাড়ী যেতে হবে। আমরা তোকে নিতে এসেছি।

চৌধুরী গিন্নী—শোন্ বাবা, তুমি না গেলে কিছু হবে না। আজকেই অপিসে চিটি লিকে দে। বড় ঘরের বিটি, দেখতে খুব ভাল, নেকাপড়াও ভাল জানে।

ভগতরাম লজ্জামিশ্রিত ভাবে বলে—মা, আমি এখানে একটা মেয়ে দেখেছি, খারাপ নয়, তোমরা মত দিলে হতে পারে।

চৌধুরী—হ্যাঁগো ছেলের মা, এই শহরে আমাদের জাতের কেউ আছে, তুমি জানো?

চৌধুরী গিন্নী—কি জানি বাপু, আমার তো জানা নাই।

ভগতরাম—ওরা মা আর মেয়ে। ভাল পয়সা আছে। মেয়েটা দেখতেও খুব সুন্দরী। আশা করি তোমাদেরও পছন্দ হবে। বিয়েতে আমাদের খরচই করতে হবে না।

চৌধুরী—মেয়ের বাবা মারা গেছে? কী নাম ছিল? কোথায় থাকত? ওদের ফেমিলীটা কেমন, বাড়ী-ঘর-দোর কেমন, এসব না জেনে বিয়ে হয় নাকি? কী বলো ছেলের মা?

চৌধুরী গিন্নী—হ্যাঁ, সে তো বটেই। ওসব না জেনে আবার বিয়ে দেয় নাকি?

ভগতরাম উত্তর খুঁজে পায় না।

চৌধুরী—মা-মেয়ে শহরের কোন্ জায়গায় থাকে? আমি তো এখানে বিশ বছর কাটিয়েছি, আমার সব জানা। কি বলো ছেলের মা?

চৌধুরী গিন্নী—বিশ কিগো, আরো বেশী।

ভগতরাম—ওদের বাড়ীটা হলো নখাসে।

চৌধুরী—নখাসের কোন্ দিকটায়?

ভগতরাম—নখাসের গলিতে ঢুকেই প্রথমেই যে বাড়ীটা পড়বে, সেটাই ওদের বাড়ী। রাস্তা থেকেও বাড়ীটা দেখা যায়।

চৌধুরী—প্রথম বাড়ীটা তো সেই কোকিলা বেশ্যার। বাড়ীটা গোলাপি রঙের না?

ভগতরাম অবনত মস্তকে বলে—হ্যাঁ, সেই বাড়ীটাই।

চৌধুরী—সেখানে কোকিলা কি আর থাকে না?

ভগতরাম—হ্যাঁ থাকে। তারই মেয়ের কথাই তো বলছি।

চৌধুরী—তুই কোকিলার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছিস্? নাক-কান কাটা যাবে যে! স্বজাতিরা আমাদের হাতে জলই খাবে না।

চৌধুরী গিন্নী—অ্যাঁ, এ তুই কী সর্বনাশ করতে যাচ্ছিস? মেয়েটার রূপ দেখে গলে গেছিস না কি?

ভগতরাম—ওর সঙ্গে বিয়ে হলে ভাগ্যবান মনে করবো। কারণ, আমার সঙ্গে অমন মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হয়েছে, সেটাই তো বড় কথা! ইচ্ছে করলে ধনীর বাড়ীতে বিয়ে দিতে পারে।

চৌধুরী—শোন, ধনীরা তাকে বিয়ে করবে না,—ঘরে রাখবে। তোরও হিম্মৎ থাকলে একটা কেন. ও রকম চারটে রাখতে পারিস। পুরুষ মানুষ হয়ে বিয়ে করতে চাস তো স্বজাতির মেয়ে বিয়ে কর।

চৌধুরী গিন্নী—অনেক নেকাপড়া শিকলে এমনি বোকা হয়ে যায়, বুঝলে?

চৌধুরী—দেখ, আমরা মুখ্যু-শুখ্যু মানুষ, তবু বলছি—তোর রুচি হলো কী করে? বেশ্যার মেয়ে যত রূপসী হোক না, স্বর্গের অপ্সরী হোক না কেন, তবু সে বেশ্যারই মেয়ে। আমরা এ বিয়েতে রাজী নই। এর পরও যদি তুই তাকে বিয়ে করিস, তাহলে আমাদের সঙ্গে তোর কোন সম্বন্ধ থাকবে না, কি বলো ছেলের মা?

চৌধুরী গিন্নী—বিয়ে করবে মানে, একি হাসি-ঠাট্টার কথা! ঝাঁটা মেরে তাড়াবো। ছেলে-বউএর নিকুচি করেছে।

ভগতরাম—তোমাদের মত না থকেলে বিয়ে করবো কী করে? তবে একটা কথা আমি কিন্তু অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারবো না।

চৌধুরী গিন্নী—হ্যাঁ তুই আইবুড়ো থাক, সেও ভাল, তবু ঐ নচ্ছার মেয়েকে বউ করে আনতে পারবি না।

ভগতরাম ঝাঁঝালো স্বরে বলে—তোমরা তাকে কেন খারাপ ভাবছো? কেন নচ্ছার বলছো? সব দিন কারোর সমান থাকে না। জানো, তাদের আচার-আচরণ, দৈনন্দিন জীবন যে রকম, সে রকমটি সচরাচর দেখাই যায় না। তারা বর্তমানে এমন সুন্দর পবিত্র জীবন-যাপন করে, তা দেখে তোমরাও অবাক হয়ে যাবে।

ভগতরামের সব চেষ্টা বিফল হয়। চৌধুরী গিন্নী কিছুতেই নিজের গোঁ ছাড়লেন না।

একটু রাত হলে ভগতরাম চিন্তিত মনে ও উদাস ভাবে প্রেম-মন্দিরের দিকে যাত্রা করে। শ্রদ্ধা তারই পথ চেয়ে বসে আছে। সন্ধ্যা নেমে এলে নিরাশ হয়। ভাবে—এত রাত হলো, এখনো এলো না কেন? অন্তদিকে ভগতরামের চিন্তা—শ্রদ্ধা আমার

অবস্থা কি অনুমান করতে পারছে? দূর থেকে আমাকে দেখতে পেলেই হয়তো ছুটে আসবে।

কোকিলা মেয়েকে বলে—আমি কতবার বলেছি, এখন তার সঙ্গে মেজাজ দেখিয়ে কথা বলবি না। শেষ পর্যন্ত কী হবে তার ঠিক নেই! তবু আমার কথা শুনবি না।

শ্রদ্ধা দুঃখিত হয়ে বলে—মা, তুমি বিশ্বাস করো, আমি তাকে কোন সময় মেজাজ দেখিয়ে কথা বলি না। ঐ রকম লোকের ওপর বিশ্বাস রাখবো না তো কাকে করবো বলো?

এমন সময় উদাস দৃষ্টি ও নিরাশ ভাব নিয়ে ভগতরাম ঘরে ঢোকে। মহিলাদ্বয় বিস্ময়ে তাকায়। কোকিলার চোখে সন্দেহ আর শ্রদ্ধার চোখে বেদনা ফুটে ওঠে। কোকিলার চোখ বলে—এমন রং-ঢং কেন? আর শ্রদ্ধার চোখ বলে—তুমি এমন নির্দয়?

ভগতরাম বেদনা ভরা কণ্ঠে বলে—আমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছো না? কী করবো, মা-বাবা হঠাৎ বাড়ী থেকে এসে পড়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেল।

কোকিলা—বাড়ীর সব ভালো আছে তো?

ভগতরাম মাথা নুইয়ে জবাব দেয়—হ্যাঁ। বিয়ের কথাটা বললাম। পুরনো লোক, তাই কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না।

কোকিলা গম্ভীর হয়ে বলে—হ্যাঁ রাজী হবেন কী করে! আমরা তো তোমাদের চেয়ে নীচু। দেখো বাবা রাগ করো না, একটা কথা বলি, তুমি মা-বাবার যখন এতই অনুগত, তখন তাদের জিজ্ঞেস করেই এ কাজে নামতে পারতে। আমাদের এভাবে অপমান করে তোমার কী লাভ হলো? আগে যদি জানতাম তুমি মা-বাবার গোলাম, তাহলে কি আর এগুতাম!

শ্রদ্ধা দেখতে পায় ভগতরামের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছে।

ভগতরাম বিনীত ভাবে বলে—মাসীমা, মা-বাবার অনুগত হওয়াটাকে আমি অন্যায় বলে মনে করিনা। আপনি আমার গুরুজন, আপনাকে উপেক্ষা করলে আপনি দুঃখ পাবেন না? তেমনি তো তাঁদের ক্ষেত্রেও বলা যায়!

শ্রদ্ধা ভগতরামের কথা শুনে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায় এবং ভগতরামকেও যাবার জন্যে ইশারা করে। ঘরে গিয়ে দু'জনেই কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে। উভয়ের ভাবনা—কে আগে কথা বলবে।

অবশেষে ভগতরাম নিস্তব্ধতা দূর করে বলে ওঠে—জানো শ্রদ্ধা, আমার ভেতরটায় যুদ্ধ চলছে। সেটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। ইচ্ছে হচ্ছে বিষ খেয়ে

আত্ম-হত্যা করি। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না। আমি মা-বাবাকে কত বোঝালাম, কত অনুরোধ করলাম, তবু তাঁরা সম্মতি দিচ্ছেন না। তাঁদের শেষ কথা —তুই যদি আমাদের অমতে বিয়ে করিস, তাহলে তোর সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ থাকবে না। তাঁরা আমার মরা মুখ দেখতে চান, তবু তোমাকে বউ করে ঘরে তুলতে চান না।

শ্রদ্ধা সান্ত্বনা দিয়ে বলে—দেখো, তাঁরা আমাকে ঘেন্না করে উচিত কাজই করেছেন। শিক্ষিত লোকেরাই যখন ঘেন্না করে, তখন তাদের দোষ কি? শোনো, আমি কাল সকালেই তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবো। আমাকে দেখে নিশ্চয়ই তারা খুশী হবেন, এটা আমার বিশ্বাস। আমি তাঁদের সেবা করে ঠিক মন জয় করবো দেখো। তাঁদের খুশী করার জন্যে আমি গান শোনাবো, মায়ের মাথার পাকা চুল তুলে দেবো, পায়ে তেল দেবো, রান্না করে খাওয়াবো, বেড়াতে নিয়ে যাবো, সব কিছু করবো, তাতে লজ্জা কিসের? তোমার জন্যে আমি জীবন-পণ করতেও প্রস্তুত!

শ্রদ্ধার কথা শুনে ভগতরামের যেন চোখ খুলে যায়, শরীরে বল পায়, নতুন জীবন লাভ করে, উৎসাহ বাড়ে এবং শ্রদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা জাগে।

সাত

চৌধুরী ও চৌধুরী গিন্নী প্রায় পনের দিন হলো শহরে এসেছেন। প্রতিদিনই বাড়ী ফিরবেন স্থির করেন, কিন্তু যাওয়া আর হয় না। কারণ, শ্রদ্ধা যেতে দেয় না। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা স্নানের জল গরম করে আর চৌধুরীকে হুঁকোয় তামাক সেজে দেয়। শ্রদ্ধার সেবা-যত্নে উভয়ে মুগ্ধ। চৌধুরীবাবু এমন সুন্দর, এমন মধুর-ভাষিণী, এমন হাসি-খুশী আর এমন চালাক মেয়ে ইন্সপেক্টারের ঘরেও দেখেন নি। তাই তিনি শ্রদ্ধাকে দেবী আর চৌধুরী গিন্নী ঘরের লক্ষ্মী বলেই মনে করছেন। শ্রদ্ধার প্রতি তাঁদের স্নেহ-মমতা থাকলেও তার কলঙ্কের কথা ভুলতে পারছেন না। পনের দিন পর রাত দশটার সময় শ্রদ্ধা নিজের বাড়ী যায়। শ্রদ্ধা চলে গেলে চৌধুরী স্ত্রীকে বললেন—আহা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমা!

চৌধুরী গিন্নী—হ্যাঁ, মা আমার এমন সব কাজ করেছে যে আমার লজ্জা লাগছিল। নিজের মেয়েও এমন করে না।

চৌধুরী—তা হলেই দেখো, স্বজাতির মধ্যে এমন মেয়ে পাওয়া যাবে কী?

চৌধুরী গিন্নী—শোনো, ঠাকুরের নাম করে বিয়ে লাগিয়ে দাও। যা' বাহান্ন, তা' তিপ্পান্ন। স্বজাতির মেয়ে কেমন হবে তার ঠিক নাই। মেয়েটাকে তো ভালই লাগছে।

চৌধুরী—আহা, কথা শুনেছো, যেন মধু ঝরে পড়ছে।

চৌধুরী গিন্নী—মেয়েটা খুব লক্ষ্মী, হয়তো ওর মা-টা আরো ভাল।

চৌধুরী—কালই চলো, কোকিলার সঙ্গে কথা বলে আসি।

চৌধুরী গিন্নী—সেখানে যেতে বাপু লজ্জা করবে! ওরা কত বড় লোক, তাতে সুন্দরী!

চৌধুরী—ঠিক আছে, তুমি খানিকটা পাউডার মেখে ফর্সা হয়ে নাও। জানো, ইন্সপেক্টারের বউ রোজ পাউডার মাখে। রং শ্যামলা, কিন্তু পাউডার মাখলে ভালই দেখায়।

চৌধুরী গিন্নী—দেখো, ঠাট্টা করলে গাল দেবো বলে দিচ্ছি। কালো রং কি আর পাউডারে ফর্সা হয়? আর যদি বা হয়, তখন তো তোমাকে চৌকিদার বলে মনে হবে!

চৌধুরী—তাহলে কাল অন্ধকারে যাবো। শ্রদ্ধা যদি এসে যায়, তো কোন অসুবিধাই থাকে না। ছেলেকে বলে দেবো, পণ্ডিতের সঙ্গে কথা বলতে। একটু হেসে বললেন—তারপর ওদের খেল দেখে কে!

চৌধুরী গিন্নী বিগত দিনের কথা স্মরণ করে একটু মুচকি হাসলেন।

আট

ভগতরামের মা-বাবার মতামত পেয়ে কোকিলা বড় খুশী হয় এবং বিয়ের আয়োজনে মেতে ওঠে। কাপড়-চোপড় কেনে, গয়নার অর্ডার দেয় এবং অন্যান্য সামগ্রী কিনে এনে ঘর ভর্তি করে। বিয়ের দিন হওয়ার পর ভগতরামের কিন্তু মনে শান্তি নেই। তার প্রফুল্লতা কোথায় যেন উড়ে গেছে। কেবলই মন-মরা হয়ে থাকে। কখনো আপন মনে চিন্তা করে, আবার কখনো খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন আত্ম-বিস্মিত। শ্রদ্ধা আগ্রহ ভরে জামা-কাপড়-গয়না দেখতে এলে ভগতরাম সেদিকে চোখ ফেরায় না, বরং তার চোখে জলের ধারা বয়। মনে যেন স্ফূর্তিই আসে না।

চৌধুরী বাবুও বসে নেই। একমাত্র ছেলের বিয়ে, তাই কোমর বেঁধে কাজে নেমেছেন। প্রায়ই শহরে এসে জিনিষপত্র কিনে নিয়ে যান। ভগতরামের কোন কোন বন্ধু তার ভাগ্যের জন্যে ঈর্ষা করে। ধন-দৌলতের সঙ্গে সুন্দরী স্ত্রী, হিংসা তো হবেই। মা-বাবার আনন্দ, কোকিলার প্রসন্নতা, শ্রদ্ধার উদ্বিগ্নতা ও বন্ধুদের ঈর্ষাকে উপেক্ষা করে ভগতরাম সব সময় যেন কাঁদছে, জীবনটাকে দুঃখময় মনে করছে, যেন প্রদীপের নীচেটা অন্ধকার। তার মনের খবর কিন্তু কেউ-ই রাখে না।

বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসছে, ভগতরামের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তত

খারাপের দিকে যাচ্ছে। বিয়ের যখন চারদিন মাত্র বাকী, তখন ভগতরামের সামান্য জ্বর হলো। তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা করতেও যেতে পারে না। চৌধুরীবাবুর বাড়ীতে ইতিমধ্যে অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব এসে গেছেন। তাঁরা সবাই বিয়ের কাজে এমন ব্যস্ত যে ভগতরামের দিকে ফিরেও তাকান না।

ভগতরাম পরের দিনও বাড়ী থেকে বের হতে পারলো না। শ্রদ্ধা ভাবে—বিয়ের কাজে হয়তো ব্যস্ত, তাই আসতে পারছে না। তৃতীয় দিন চৌধুরী গিন্নী ছেলের ঘরে গিয়ে দেখেন—ভগতরামের চেহারা হয়েছে জীর্ণ-শীর্ণ। উদাসভাবে কী সব যেন দেখছে। মাকে দেখেই দু'হাত দিয়ে চোখদুটো ঢেকে মৃদুস্বরে কী সব বলছে। মা জিজ্ঞেস করেন—খোকা কী হয়েছে তোর? এমন করে বসে আছিস কেন?

মায়ের প্রশ্ন শুনে ছেলে যেন প্রলাপ বকৃতে শুরু করেছে। বলে—কিছু হয়নি। দেখো মা, শ্রদ্ধা আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। দেখো, দেখো, ওর দু'হাতেই কেমন দুটো কালো রঙের সাপ! ঐ সাপ নিশ্চয়ই আমাকে ছোবল মারবে। দেখো, কেমন কাছে এসে গেল! শ্রদ্ধা! শ্রদ্ধা! তুমি কেন এমন শত্রুতা করছো? ভাল-বাসার কি এই পুরস্কার? তোমাকে গ্রহণ করতে তো সব সময়েই তৈরী ছিলাম! জীবনটার কী মূল্য আছে বলো? তুমি সাপ দুটো ফেলে দাও লক্ষীটি! আমার ভয় করছে! আমি তোমার জন্যে জীবন-পণ করেছি, কি বিশ্বাস হচ্ছে না?

ভগতরাম তার পরই অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। চৌধুরী গিন্নী ভয় পেয়ে স্বামীকে ডাকেন। দু'জনে ধরাধরি করে তাকে বিছানায় শোয়ান। চৌধুরীবাবু তন্ত্র-মন্ত্র ও কবিরাজী চিকিৎসা করেন। তাই ছেলের জ্ঞান ফেরাবার জন্যে নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চেষ্টা করলেন। ভগতরামের তখন শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কিন্তু মাথাটা প্রচণ্ড গরম।

রাতে ভগতরাম বেশ কয়েকবার চমকে ওঠে। চৌধুরীবাবুও ঝাড়-ফুঁক করতে ছাড়েন না।

চৌধুরী গিন্নী—একবার ডাক্তারকে ডাকলে না কেন? ওষুধ দিলে বরং কাজ হতো। বেচারীর দু'দিন পর বিয়ে, আর আজ এই অবস্থা, কী হবে কে জানে।

চৌধুরীবাবু নিঃসঙ্কোচে জবাব দেন—ডাক্তার এসে কী করবে শুনি? গেছো বাবার দয়া হলে কোন ওষুধেরই দরকার হবে না। রাতটা কাটাতে দাও। সকাল হলেই একটা পাঁঠা আর এক বোতল সুরা পুজো পাঠাবো। ব্যাস, আর কিছু করার দরকার নাই। মনে হচ্ছে হাওয়া লেগেছে, ডাক্তার কী ওষুধ দেবে? অসুখের কোন লক্ষণই নাই। বে-জাতের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে বলে দেবতা রুষ্ট হয়েছেন বুঝলে?

সকাল হতেই চৌধুরীবাবু একটা পাঁঠা আনলেন। মেয়েরা গান গেয়ে গেছো বাবার

কাছে যায়। তারা ফিরে এসে দেখে ভগতরামের অবস্থা খুবই খারাপ। নাড়ীর গতি ক্রমশঃ কমে আসছে আর মুখে পড়েছে মৃত্যুর বিভীষিকার ছায়া। কপোলদ্বয়ে বয়ে চলেছে অশ্রুধারা। আর চোখের কোনে দুটো অশ্রু বিন্দু টল্‌টল্‌ করছে।

ভগতরামের অন্তিম অবস্থা দেখে চৌধুরীবাবু ঘাবড়ে যান। কোকিলাকেও তাড়াতাড়ি খবর দিলেন! একজনকে পাঠালেন ডাক্তার আনতে, কিন্তু ডাক্তারের আসতে দেরী হবে শুনে কোকিলা অন্য এক ডাক্তারকে সঙ্গে করেই নিয়ে আসে। ডাক্তারবাবু ভগতরামেরই বন্ধু। শ্রদ্ধা ভগতরামের সামনে দাঁড়িয়ে নির্বাক হয়ে চোখের জল ফেলছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর ভগতরাম চোখ মেলে তাকায়। শ্রদ্ধাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে—শ্রদ্ধা তুমি এসেছো? আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। তিন বছর ধরে মেলামেশার ফলে যে "দ্বিধা" উপস্থিত হয়েছিল, আজই তা শেষ হয়ে যাবে। আমার যে কী যন্ত্রণা, তা আমিই জানি। শ্রদ্ধা, তুমি দেবী, আমিই হয়তো ভুল বুঝেছি, তুমি ক্ষমা করো। আমি তোমার যোগ্য নই। তুমি নিষ্পাপ, আমি তোমাকে ভুল বুঝে পাপ করেছি। তোমার ভালবাসার মূল্য আমি দিতে পারলাম না, সেটাই আমার আক্ষেপ রয়ে গেল।

কথাগুলো বলতে বলতে ভগতরামের চোখ আবার বন্ধ হয়ে আসে। শ্রদ্ধা নির্বিকার। চোখের জলও তার শুকিয়ে গেছে। ঝুঁকে থাকা শরীরটাকে সোজা করে নেয়। মনে প্রতিহিংসা জেগে ওঠে, আর চোখে আত্ম-অভিমানের ঝলক। ক্ষণকাল ভগতরামের শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে থেকে নীচে নেমে এসে টাঙ্গায় বসে। কোকিলা তার পিছনে পিছনে দৌড়ে এসে বলে—হ্যাঁরে, এটা কি রাগ করার সময়? একবাড়ী লোক তাদের অবস্থার কথা চিন্তা কর। ওর মা-বাবার কথাও একবার ভেবে দেখ।

শ্রদ্ধা মায়ের কথার উত্তর দেয় না। কোচোয়ানকে বলে—বাড়ী চলো। পরাজিত কোকিলাও গাড়ীতে ওঠে।

মাঘ মাসের শেষ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। তাই প্রচণ্ড শীত। গাছ-পালাও শীতে জড়সড়। বেলা আটটা। তখনো বহু মানুষ লেপের ভেতরে শুয়ে। এই রকম শীতেও শ্রদ্ধা কিন্তু ঘামছে, যেন সূর্যের সমস্ত তাপ তার ওপরেই পড়েছে। তার মুখ-মণ্ডল শুষ্ক। বাইরের তাপে নয়, তার হৃদয়ের আগুনটাই সব কিছুকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাইছে। তার নাক ও মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে তপ্ত বায়ু। বাড়ী পৌঁছাবার আগেই ফুলের মত দেহটা একেবারে যেন শুকিয়ে গেল। কোকিলা বিষন্ন বদনে বার বার মেয়ের দিকে তাকায়, কিন্তু সান্ত্বনা দেওয়ার মত ভাষাও সে হারিয়ে ফেলেছে।

বাড়ী পৌঁছে শ্রদ্ধা নিজের ঘরে যেতে চায়, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠার শক্তিও যেন নেই। অনেক কষ্টে শোবার ঘরে যায়। হায়, আধ ঘণ্টা আগে যে জিনিসগুলো তাকে আনন্দ দিয়েছে, আহ্বান করেছে ও আশা জুগিয়েছে সেগুলোর প্রতি সে আর তাকাতেই পারছে না। জিনিসগুলো যেন তাকে দেখে হাসছে। তাই তীরবিদ্ধ হরিণীর মত বিরহ কাতর হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

তিন বছর আগে তোলা একটা ছবির দিকে হঠাৎ তার নজর পড়ে। আহা, ছবিটা তার কত প্রিয়, রোজ বার বার দেখেছে, মনে মনে কত কল্পনাই না করেছে। আজ সেই ছবিটার দিকে তাকানোর যেন তার অধিকারই নেই।

শ্রদ্ধার হৃদয়ে কী অসহ্য যন্ত্রনা, কী চিন্তা, তা' কে বুঝছে! তার মন হাহাকার করে ওঠে। বলে—হায়, মৃত্যুপথ যাত্রী কী কষ্টই না ভোগ করছে। জানি না, ঈশ্বর তাকে কেন এমন শাস্তি দিচ্ছেন। ভগতরামের কথাগুলো তাকে কী আঘাতই না দিল। সে কেন এমন নিষ্ঠুর হলো? সে কি আমার জন্যে আত্মহত্যা করছে? তাছাড়া আর কী হতে পারে? একটু সান্ত্বনা বাক্যও তার মুখ দিয়ে বের হলো না। আজই সে প্রথম অনুভব করতে পারলো যে, সে বেশ্যার মেয়ে! যে ত্যাগ, যে সেবা, যে গর্ব, যে উচ্চাদর্শ তাকে মাথা তুলতে সাহায্য করেছিল, আজ তার সব শেষ, সব ধূলিস্মাৎ হয়ে গেল।

বিছানায় শুয়ে শ্রদ্ধা আরো কত কি চিন্তা করে। তারপর ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নামে। ভগতরামকে একবার শেষ বারের মত দেখবে বলে ছুটে যায়। যেতে যেতে ভাবে—পবিত্র প্রেমকে মরতে দেবে না, তার ভালবাসাকে পাথেয় করেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে।

রাস্তায় কোন যানবাহন না পেয়ে হেঁটেই এগিয়ে যায়। ক্লান্ত হয়ে পড়ে, পোষাক ঘামে ভিজে যায়, কতবার যে হোঁচট খায়, তার হিসেব কে রাখে পা থেকে রক্ত ঝরছে, শাড়ীর নীচের দিকের খানিকটা অংশ ছিঁড়ে গেছে, তার কোন কিছুতেই যেন ভ্রূক্ষেপ নেই, পাগলের মত ছুটে চলে। ঈশ্বরকে মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে বলে—ঠাকুর, ভগতকে ভাল করে দাও, আমি তার সামনে দাঁড়ালে সে যেন আমাকে 'শ্রদ্ধা' বলে ডাকে। তার মুখ থেকে 'শ্রদ্ধা' ডাকটা আমার বড় ভাল লাগে। আমার মনবাসনা অপূর্ণ রেখো না ঠাকুর।

শ্রদ্ধাকে দেখেই চৌধুরীগিন্নী কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—কোথা গেছিলি মা? তোকেই তো খুঁজছিল, তোর নাম ধরে ডাকছিল!

শ্রদ্ধার হৃদয়টা যেন ফেটে পড়তে চায়। ভাবে—সে যেন অনন্ত, অপার, অসীম সমুদ্রে ভাসছে, কী করবে বুঝতে পারে না। ভগতরামের পায়ে হাত দিয়ে দেখে ঠাণ্ডা।

তাই সে চোখের গরম জল দিয়ে পা দুটোকে গরম করতে চেষ্টা করে। ভাবে—এটাই কুলহীন নারীর আশা আকাঙ্খার সমাধি।

ভগতরাম ধীরে ধীরে চোখ খুলে মৃদু স্বরে থেমে থেমে বলে—কে, শ্রদ্ধা? আমি জানি, তুমি আসবে। তোমার জন্যেই আমার প্রাণটা এখনো বের হয় নি। আমার বুকের ওপর তোমার মাথাটা একবার রাখো না শ্রদ্ধা। আমার বিশ্বাস, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছো। এবার তুমি যাবার অনুমতি দাও। যাবার সময় কী বা তোমার কাছে চাইবো? চাইবার কি আর মুখ আছে?

আমার সময় হয়ে এলো। যাবার সময় একটা কথা বলে যাই—এ পৃথিবীতে কোন মানুষ ছোট নয়। আমরা যাদের ঘেন্না করি, দূরে সরিয়ে রাখি, প্রাণ তাদের জন্যেই একদিন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তুমি আমার চোখে কোন দিনই ছোট নও, এটা জেনে রেখো। তারপর ভগতরাম হঠাৎ কি যেন ভেবে একটু হাসার চেষ্টা করে। হায়রে অবোধ সাধ।

শ্রদ্ধা ভগতরামের বুকে মাথা রেখে কাঁদে। ভগতরাম শ্রদ্ধার গালে একটা চুম্বন করার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে। অবশেষে প্রেমিকার গালে একটা চুম্বন করে অন্তিম সাধ মেটায়।

অবরুদ্ধ কণ্ঠে ভগতরাম বলে—এই হলো আমাদের বিয়ে। এইটাই হলো আমার শেষ উপহার। এই কথা বলেই চিরদিনের জন্যে তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল।

কেঁদে কেঁদে শ্রদ্ধার চোখ লাল হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে সে দেখতে পায়—ভগতরাম তাকে আলিঙ্গন করার জন্যে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে। তার কোন কিছুতেই যেন আগ্রহ নেই। আহত সৈনিক জয়লাভের সংবাদে নিজের ব্যথা-বেদনার কথা যেমন ভুলে যায়, তেমনি শ্রদ্ধারও অবস্থা হয়েছে। সেও নিজের জীবনকে প্রেমের নিষ্ঠুর বেদীমূলে উৎসর্গ করার জন্যে প্রস্তুত, যেমন—লায়লা ও মজনু এবং শীরি ও ফরহাদ করেছিল।

ভগতরামের নিষ্প্রাণ গালে চুম্বনের প্রত্যুত্তোর দিয়ে শ্রদ্ধা বলে—ওগো, আমি তোমার, চিরদিন তোমারই থাকবো।

কামনা তরু

রাজা ইন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কুমার রাজনাথের শত্রুরা এমন বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করলো যে তাঁকে হত্যা করে এ পদপূরণের জন্য তাদের এক পুরণো সেবকের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হলো। একটি ছোট গ্রামের সামন্ত ছিলেন। কুমার এমনিতেই শান্তি-প্রিয়—হাসি খেলার মধ্য দিয়ে সময় কাটাতে ভালবাসতেন। যুদ্ধক্ষেত্র অপেক্ষা তিনি নিজের কাব্যক্ষেত্রেই বিকাশ বা প্রতিভাস্জনশীল ছিলেন। রসালাপ অথবা কোনো বৃক্ষের পদপ্রান্তে বসে কাব্য-রচনায় তিনি যে আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন—শিকার বা রাজ-দরবারের মধ্যে তা তিনি একটুও পেতেন না। এই পর্বতমালায় ঘেরা গ্রামটির মধ্যেই ছিল তাঁর শান্তি আর আনন্দের অনুভব। এই নির্মল আনন্দের বিনিময়ে তিনি রাজ্যত্যাগেও একরকম স্বীকৃত ছিলেন বলা চলে। এই পর্বতে ঘেরা গ্রাম, এমন সবুজ-সৌন্দর্য, নদী স্রোতের কলকল, পাখীদের কলরব, হরিণ-শিশুদের উচ্ছলতা, এ সব রমণীয় দৃশ্য তাঁর মনে এক অনির্বচনীয় বাল্যোচিত সরলতা এনে দিয়েছিল। তাঁর কাছে আরও আকর্ষিত বস্তু যা ছিল, তা হলো সামন্তরাজের যুবতী কন্যা-চন্দা।

চন্দা-গৃহস্থালীর কাজ নিপুণভাবে নিজে হাতে করতো। মাতৃ-স্নেহ বঞ্চিত পিতার সেবা যত্ন নিয়েই সময় কাটিয়ে দিত। এই বছরেই তার বিবাহ স্থির হয়েছিল—এমন সময়ে সহসা কুমার এসে তার মনে এক নতুন চিন্তাধারা ও আশা অঙ্কুরিত করে দিলেন। আপন মনে সে যে ভাবী স্বামীর চিত্র এঁকে রেখেছিল সে যেন দৃশ্যপটে রূপধারণ করে, স্বয়ং এসে দাঁড়াল,—সে হলো কুমার। কুমারেরও আদর্শ রমণীশ্রেষ্ঠ চন্দা-ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা ছিল না। কুমারের মনে সংশয় ছিল, সত্যিই কি তিনি চন্দাকে কোনোদিন লাভ করতে পারবেন? চন্দাও ভাবত তাদের দুজনের মিলন কি কোনোদিন সম্ভব হবে?

দুই

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর—চন্দাদের 'খাপরার' ঘর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। খস্‌খস দিয়ে ঘেরা ঘরে বসবাসে অভ্যস্ত কুমারচিত্তও ঘরের ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছে। তিনি বাইরে বেরিয়ে যান ঘন বনাঞ্চলে এসে বসলেন। সহসা দেখলেন,—কলসী কাঁখে চন্দা নদী থেকে জল নিয়ে আসছে। পায়ের নীচে তপ্ত বালুকারাশি-মাথার ওপর জ্বলন্ত সূর্য। উত্তপ্ত বাতাসে দেহ জ্বলে যাচ্ছে। এত গরমে তৃষ্ণাকাতর মানুষেরও জলপানের নিমিত্তে নদী প্রান্ত পর্যন্ত যাওয়ার শক্তি ছিল না। ঘরে জল থাকা সত্ত্বেও চন্দা নদীতে কেন জল আনতে বেরিয়েছে এ সময়ে! কুমার দৌড়ে গিয়ে চন্দার জলপূর্ণ

কলসীটা কেড়ে নিতে নিতে বললেন, "আমায় এটা দিয়ে ছায়ায় চলে যাও—এ সময়ে তোমার জলের এমন কী প্রয়োজন হলো ?"

চন্দা কলসী ছাড়লো না। মাথার আঁচল সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—তুমি এ সময়ে—এখানে এলে কেন ? বোধহয় গরমে ঘরের মধ্যে থাকতে পারছিলে না, তাই নয় ?" কুমার তার কথার উত্তর না দিয়ে বললো, কলসী দিয়ে দাও, নইলে কেড়ে নেব।

চন্দা স্মিতহাস্যে জানাল, রাজকুমারদের কলসী নিয়ে চলা ভাল দেখায় না। কুমার জানাল, আমায় এই অপরাধের অনেক দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে চন্দা, এখন রাজকুমার একথা ভাবতেও আমার লজ্জা হয়।

চন্দা—প্রসঙ্গক্রমে বললো—দেখ, নিজে অনেক হয়রান হয়েছ, আমায়ও যথেষ্ট হয়রানি করেছো, এবার কলসী ছাড়ো, সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো,—পুজোর জল নিয়ে যাচ্ছি।

কুমার জিজ্ঞাসা করলো—পুজোর জল আমি নিয়ে গেলে অপবিত্র হয়ে যাবে বুঝি ?

চন্দা কি বলবে ভেবে না পেয়ে বললো,—বেশ ঠিক আছে,—কথা যদি না-ই শোনো, তুমিই নিয়ে চলো। নইলে তো আবার....।

জলভরা কলসী নিয়ে কুমার আগে আগে চলতে লাগলেন—পিছু পিছু চললো চন্দা। বাগানে পৌছে একটা ছোট্ট চারাগাছের কাছে পৌছে বললো—আমি এই দেবতার পুজো করি, এখানেই কলসীটি রাখো—কুমার আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে—কোথায়, কোন্ দেবতার চন্দা ? আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। চন্দা চারা গাছটিকে সিঞ্চনরত অবস্থায় জানালো এটিই তার দেবতা।

মূর্ছিত প্রায় চারাগাছটি জলসিঞ্চনে সবুজ সতেজ হয়ে উঠলো, যেন দু-চোখ মেলে দেখতে লাগলো।

কুমার প্রশ্ন করলো—তুমি কি চারাগাছটি লাগিয়েছিলে ? একটি কঞ্চি দিয়ে চারাগাছটি বাঁধতে বাঁধতে চন্দা উত্তর দিল,—হ্যাঁ, যেদিন তুমি প্রথম এখানে এসেছিলে। আগে এখানে আমার পুতুলের খেলাঘর ছিল। আমি পুতুলের ছায়ার জন্য আমগাছের চারা পুঁতে দিয়েছিলাম। তারপর ঘরের কাজের ব্যস্ততায় এদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। যেদিন তুমি প্রথম এখানে এলে, কি জানি কেন, আমার এই চারাগাছটির কথা মনে পড়ে গেল। আমি এসে দেখলাম যখন, তখন তো সে প্রায় শুকিয়েই গিয়েছে। আমি তখনি ওর গোড়ায় জল ঢেলে দিলাম, গাছটি আস্তে আস্তে সতেজ-সজীব হয়ে উঠলো। দেখ গাছটা যে চোখ মেলে মিটি মিটি হাসছে।

এই বলতে বলতে কুমারের দিকে তাকিয়ে বললো যে, সব কাজ ভুলে যেতে

পারি কিন্তু এর গোড়ায় জল ঢালতে আমার ভুল হয় না। তুমিই এর প্রাণ রক্ষা করেছো। তুমি না এলে বেচারা শুকিয়ে মরে যেত। এটাই তোমার শুভাগমনের স্মৃতি। আমার তো তাই মনে হয়। সে আমার সঙ্গে কথা বলে, কখনো কাঁদে, কখনো হাসে। আবার কখনো মুখ ঘুরিয়েও নেয়। আজ তোমার আনা জল পেয়ে কতো খুশী হয়েছে দেখেছ ? পাতাগুলো যেন তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

চারাগাছটিকে দেখে কুমারের মনে হলো যেন ক্রীড়ারত এক শিশু। শিশুর মতই দু-হাত তুলে যেন প্রসন্ন চিত্তে কোলে উঠতে চাইছে। তার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে চন্দার প্রেম স্নেহ-ভালোবাসার প্রকাশ।

চন্দার ঘরে খেত খামারের সব জিনিসপত্তরই ছিল। কুমার একটা কোদাল এনে মাটিতে গর্ত করে চারাগাছটিকে সেখানে বসালো—আর চারপাশের মাটিগুলি খুপরী দিয়ে গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে সেখানে ছোট ঢিবির মত করে দিল। গাছটি আনন্দে দুলে উঠল।

চন্দা-জিজ্ঞাসা করলো শুনতে পাচ্ছ, কি বলছে ? কুমার স্মিতহাস্যে জানাল—হ্যাঁ, বলছে মার কোলে বসবো।

চন্দা পুনরায় বললো—না বলছে—"এত ভালবেসে ভুলে যেও না।"

তিন

তখনো কুমারের রাজপুত্র হওয়ার দণ্ডভোগ বাকি ছিল। শত্রুপক্ষরা কি করে তার খোঁজ পেয়ে গিয়েছে। এদিকে তো বৃদ্ধ কুবের সিংহ চন্দা ও কুমারের বিবাহের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ওদিকে শত্রুদের একদল এসে পৌছুলো। কুমার সেই গাছটার চারপাশে ফুলগাছ লাগিয়ে যেন একটা কুঞ্জবনের মতো তৈরী করেছে। জল দেওয়া রোজের কাজ হয়ে উঠলো। একদিন ভোরবেলা কাঁধে ঘড়া নিয়ে নদী থেকে জল আনছিলেন—হঠাৎ শত্রুরা পথেই তাকে ঘিরে ফেললো। কুবের সিংহ তলোয়ার নিয়ে দৌড়ে এলেন ততক্ষণে শত্রুদের আক্রমণে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। নিরস্ত্র অবস্থায় একা কুমার কি করতে পারেন ? শুধু ক্ষীণ-কাতর-কণ্ঠে বললেন,—আমার পিছু নিলে কেন তোমরা, আমি তো সব কিছু ছেড়ে দিয়েছি। শত্রুপক্ষের সর্দার জানালো তাদের ওপর আদেশজারী করা হয়েছে—"আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে।' কুমার বললো—তোমাদের প্রভু আমাকে এই অবস্থায় দেখতে পারবে না। যদি ধর্মে বিশ্বাস থাকে, তাহলে কুবের সিংহের তলোয়ার আমায় দিয়ে দাও যাতে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি। কিন্তু শত্রু অর্থাৎ সেপাইরা অন্যদের জানাল কুমারকে মুখ বেঁধে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে পাঠিয়ে দাও। কুবের সিংহ সেখানেই পড়ে রইলেন।

ঠিক সেই সময়ে চন্দা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো—দেখল কুবের সিংহ পড়ে রয়েছেন। আর কুমারকে ঘোড়ায় পিঠে বসাচ্ছে—আহত পাখীর মত সে কিছুটা এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলো—কিন্তু তার দু-চোখে ঘন অন্ধকার নেমে এল।

হঠাৎ তার দৃষ্টি পিতার (কুবের সিংহ) ওপর পড়লো—সে হতচকিতের মতো সেদিকে গেল—কুবের সিংহের প্রাণটুকু তখনো চোখের কোণায় আটকে আছে—চন্দাকে কাছে পেয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—"মা···কুমার।" এর বেশী তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না—তাঁর প্রাণটুকু শেষ হয়ে গেল।

কুড়ি বছর কেটে গেছে। কুমার তখনো বন্দী। কেল্লার চারদিকে শুধুই পাহাড়। কেল্লার মধ্যে কুমারের সেবার কোনো ত্রুটি নেই। চাকর-বাকর, ভোজন-বস্ত্র, শিকার-ভ্রমণ কোনোকিছুতেই তার বাধা নেই—কিন্তু তার সেই বিয়োগাগ্নিকে কেউ নেভাতে পারতো না,—যা তার হৃদয়ে তুষের আগুনের মতো জ্বলছে। জীবনে কোনো আশা বা প্রকাশ কুমারের ছিল না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হোত "প্রেমতীর্থকে" একবার দেখে আসে—যেখানে সে সব কিছু পেয়েছিলেন। তার একান্ত ইচ্ছে, জীবনের সেই পবিত্র স্মৃতি রাঙানো স্থান দর্শন করে সেই নদীতে নিজেকে বিসর্জন দেন। সেই নদী সেই কুঞ্জবন, সেখানে চন্দার ছোট্ট সুন্দর কুটির তার চোখের সামনে আজও ভেসে ওঠে। আর সেই ছোট্ট চারাগাছটি,—যাকে তারা দুজনে মিলে স্নান করাত—তার মধ্যেই যেন তাদের মন প্রাণ জড়িয়ে আছে আজও। সেদিনগুলো কি আর ফিরে আসবে, যখন সবুজ পাতায় ছেয়ে যাওয়া গাছটাকে আবার তিনি দেখতে পাবেন? কে জানে, এতদিনে গাছটা বোধহয় শুকিয়েই গিয়েছে—কে আর তাকে জল দেবে! চন্দা কি আর আজও কুমারীই আছে—তা হতে পারে না। আমার কথা হয়তো সে ভুলেই গিয়েছে। যখন বাড়ীর কথা মনে পড়ে, তখন চারাগাছ—যা আজ বৃক্ষে পরিণত হয়েছে—মনে হয় সেই বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি মেলে তার কথা হয়তো চন্দার মনে হতে পারে। আমার মতো অভাগার ভাগ্যে এর থেকে বেশী আর কি হতে পারে! সেই স্থানটি দেখার জন্য তার মন-প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠতো—কিন্তু তার সব আশা অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যেত।

আঃ! একটা যুগ পার হয়ে গিয়েছে—শোক আর নৈরাশ্য তার সমুজ্জ্বল যৌবনকে দলিত মথিত করে দিয়েছে। আজ চোখের জ্যোতিও নেই, পায়ে বলও নেই। জীবনটা আজ তার কাছে দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। ঘন অন্ধকারে আজ সে দেখতেও পায়না। তার জীবনটা ছিল কত আশা আকাঙ্খাময় সুখী এবং আনন্দমুখরিত। আরও একবার সে তার বিগত সুখ-স্বপ্নকে ফিরে পেতে চায়। তাহলে বোধহয় তার ইচ্ছা পূর্ণ হবে—অনন্ত-অসীম ভবিষ্যৎ, সারা জীবনের চিন্তা-ভাবনা সবকিছু যেন একটা স্বপ্নের

মতো বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

তারদিক থেকে তার দেহরক্ষীদের সম্বন্ধে আর কোনো আশঙ্কা ছিল না বরং কুমারের ওপর তাদের দয়াই ছিল। রাত্রে তার কাছে একজনই থাকত, বাকি সকলে সুখনিদ্রার কোলে ঢলে পড়তো। কুমার পালিয়ে যেতে পারত তার কোনো আশঙ্কাই ছিল না। পাহারাদার সেপাইটাও নিঃসংশয়ে বন্দুক নিয়ে নিদ্রারত ছিল। নিদ্রা যেন কোনো হিংস্র পশুর মতো তাকে লক্ষ্য করে বসেছিল। শুতে শুতেই লোকটি ঘুমিয়ে পড়লো। সিপাইয়ের নাসিকাগর্জন শোনা যেতে লাগল একটি সুযোগ পেয়ে কুমারের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কিন্তু পা দুটি তার কাঁপতে লাগল। বারান্দার নীচে পর্যন্ত নামার সাহস হোল না—যদি এদের ঘুম ভেঙে যায়! ব্যর্থতা মানুষের আক্রোশ বাড়ায় আর অসহয়াতে মানুষকে সাহসী করে তোলে। সেই সাহসই আজ তার সাথে সহযোগিতা করছে কারণ নিদ্রারত সেপাইটার তলোয়ার মাটিতে পড়ে রয়েছে। কিন্তু ভালবাসার সাথে হিংসার শত্রুতা। কুমার সিপাহীকে জাগিয়ে দিল, সে চমকে জেগে উঠে বসলো। সব সংশয় মুক্ত হয়ে সে দ্বিতীয়বার পুনরায় নাসিকা গর্জন তুলে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল—দেখলো ঘরে কুমার নেই। কুমার তখন হাওয়ার মতো ঘোড় সওয়ার হয়ে দ্রুতবেগে পালাচ্ছে—সেইখানে যেখানে তার সুখস্বপ্ন বিজড়িত স্মৃতিটুকু পড়ে আছে। কেল্লার চতুর্দিকে খোঁজ পড়ে গেল—ঘোড়া নিয়ে তারাও দৌড় দিল—কিন্তু কুমারের সন্ধান পেল না।

পাঁচ

পাহাড়ী পথ—অতিক্রম করা খুব কঠিন—সেখানেও যেন মৃত্যুদূত পিছু নিয়েছে যা থেকে মুক্তি পাওয়া রীতিমত সাহসের ব্যাপার।" কামনাতীর্থে"—পৌছুতে কুমারের একমাস লাগলো। যখন সে এসে পৌছুলো তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। সেখানে আগের কোনো অস্তিত্বই নেই শুধু চিহ্ন স্বরূপ কয়েকটা ভাঙাচোরা বস্তী পড়ে আছে। চারিদিকে দেখা যায় ঝোপঝাড়। যেথানে ওদের প্রেমের প্রথম প্রকাশ। যার নীচে দাঁড়িয়ে তারা সুখময় পবিত্র সময় অতিবাহিত করতো, যা ছিল তাদের প্রাণের-প্রেমের উপাসনা মন্দির সেখানে আজ ভগ্ন বস্তীস্তূপ মূকভাষায় তাদের জীবনের করুণ ইতিহাস শোনাতে চাইছিল। কুমার এসব দেখেই "চন্দা-চন্দা" বলে চারিদিকে তাকে খুঁজে ফিরতে লাগলো। সেখানের ধুলো নিয়ে মাথায় লাগালো, যেন কোনো দেবতার বিভূতি। ভাঙা দেওয়ালগুলো দেখে সে কেঁদে—উঠলো। হায় বিধাতা! সে কী কাঁদবার জন্যই আজ এত দূর থেকে এলো? ক্রমশ ক্রন্দন তাকে বিকল করে দিতে

চাইলেও—তবু তারি মধ্যে সে স্বর্গীয় আনন্দ উপলব্ধি করলো। বিশ্ব সংসারের সুখের সাথে এই অশ্রুর তুলনা হয় না।

ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে সে বেরিয়ে এলো। সামনে দিগন্ত প্রসারী প্রান্তরে একটি বৃক্ষ নিজেকে সবুজের সাজে সাজিয়ে—তাকে যেন সম্ভাষণ জানাতে আজ সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই সেই চারাগাছ যাকে তারা বিশ বছর আগে দুজনে মিলে বপন করেছিল। সে আজ বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। কুমার উন্মত্ত হয়ে উঠল। মাতৃহারা পুত্র যেমন পিতার বক্ষে আছড়ে পড়ে কুমারও বৃক্ষকে ঠিক তেমনি করেই জড়িয়ে ধরলেন—এই বৃক্ষই তাদের প্রেমের সাক্ষ্য স্বরূপ। সেই অক্ষয়-প্রেমের প্রমাণ দেবে বলে সে আজ বিশাল বৃক্ষরূপে দাঁড়িয়ে আছে। বৃক্ষকে আজ তার অন্তরের অন্তঃস্থলে রেখে দিতে ইচ্ছা হলো যাতে তার গায়ে বাতাসের ঝাপ্‌টা না লাগে। তার প্রতিটিপল্লবে চন্দার স্মৃতি জড়ানো রয়েছে। পাখীদের এই মধুর সঙ্গীত সে কি আর কখনো শুনেছে?—তার হাতে কোনো শক্তি ছিল না—সারা দেহ ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্তিতে শিথিল। বৃক্ষে চড়ে বসেন, আঃ! কি শান্তি। বৃক্ষের শীর্ষডালে বসে তিনি সুদূর প্রান্তরে তার গর্বিত দৃষ্টি প্রসারিত করে ভাবতে লাগলো এটাই তাদের কামনা-বাসনার-স্বর্গ ছিল একদিন। সারা দৃশ্য তার দৃষ্টিতে আজ 'চন্দাময়' হয়ে উঠলো। দূরে ধূম্র পর্বতশ্রেণীতে বসে চন্দা সুর বিস্তার করছে। আকাশে বহমান মেঘনৌকায় বসে চন্দা উড়ে যাচ্ছে। সূর্যের প্রকাশে চন্দার হাসি মাখা ছিল যেন। কুমারের মনে হলো সে যদি পাখী হতেন তাহলে গাছের ডালে বসেই জীবনটা কাটিয়ে দিতেন।

যখন অন্ধকার হয়ে এল—কুমার গাছ থেকে নেমে এলেন। সেখানেই পাতার শয্যা রচনা করে শুয়ে পড়লেন। এই ছিল তার জীবনের সুখময় স্বপ্ন—আঃ! এই বৈরাগ্যময় জীবনে তিনি বৃক্ষের শরণাগত হয়ে জানালেন—এই আশ্রয় ছেড়ে তিনি দিল্লীর সিংহাসনের জন্য কোনোদিনই ফিরে যাবেন না।

ছয়

সেই স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল চাঁদনী রাতে সহসা একটা পাখী এসে বসলো। যেন তার হৃদয়-বিদারক কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত শোনাতে লাগলো। সেই বেদনাময় সঙ্গীতে কুমার চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, মনে হলো এবার বোধহয় তিনি ভেঙে পড়বেন। সেই সঙ্গীত মুখর কণ্ঠ তীর বিদ্ধ করতে লাগলো তাকে। হায়রে পাখী! তোরও বুঝি জোড়া হারিয়ে গিয়েছে? নইলে তোর সঙ্গীতে এত বিয়োগব্যথা-বিষণ্ণ রোদন কেন? সঙ্গীতে সুরের একেকটা বিস্তার তীরের মত কুমারের হৃদয়কে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে দিচ্ছিল। কুমার বসে থাকতে পারলেন না—আত্মবিস্মৃত হয়ে সেই ঝোপ ঝাড়ে পরিপূর্ণ বস্তীতে

গেলেন—আবার ফিরে এলেন বৃক্ষের পাদদেশে। এই পাখী কোথা থেকে এল। তাকে দেখা যাচ্ছে না তো!

পাখীর গান বন্ধ হয়ে গেল—কুমারও ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখলেন সেই পাখী তার কাছে এসে বলছে, 'কুমার ভাল করে দেখেছ—ওটা পাখী নয়, সে তোমার চন্দা ছিল, হ্যাঁ, তোমারই চন্দা।

কুমার জিজ্ঞাসা করলেন,—চন্দা এই পাখী এখানে কেমন করে এল?

চন্দা—উত্তর দিল—আমিই তো সেই পাখী।

কুমার আবার প্রশ্ন করলেন—তুমি পাখী,—তুমিই গান গাইছিলে?

চন্দা জানালো—হ্যাঁ প্রিয়ে, আমিই গান গাইছিলাম। কত রকমভাবে কাঁদতে কাঁদতে একটা যুগ কেটে গেল।

কুমার জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার বাসা কোথায়?

চন্দা জানালো—সেই ঝোপঝাড় জঙ্গলে, যেখানে তোমার খাট পাতা ছিল। সেই খাটের টুক্‌রো দিয়ে আমি আমার বাসা তৈরী করেছি।

কুমার প্রশ্ন করলো—তোমার জোড়া কোথায়?

চন্দা জানালো—সে একা। তার প্রিয়কে স্মরণ করে তার জন্য কেঁদেই তার সুখ-যা অন্য জোড়ায় পাওয়া যাবে না। আমি এভাবে একাই থাকব আর একদিন একাই মরে যাব।

কুমার প্রশ্ন করলেন—সেও কি একটা পাখী হয়ে যেতে পারে না?

চন্দা চলে গেল। কুমারের ঘুম ভেঙে গেল। পুবাকাশে সূর্যের রক্তিমা ছড়িয়ে পড়েছে—শয্যার পাশে পাখীর কলরব শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার আর পাখীর কণ্ঠে বিরহিনীর করুণ সুর ছিল না, ছিল না কোনো বিলাপ। সরল-আনন্দ চঞ্চল সুরের আলাপে বনাঞ্চলকে মুখরিত করে তুলেছে। বিয়োগ ব্যথার ক্রন্দন নয় তার কণ্ঠ থেকে ভেসে আসছিল মধুর মিলনের সুর।

কুমার ভাবলেন—এই স্বপ্নের কী রহস্য?

সাত

কুমার ঘুম ভেঙেই শুকনো পাতা-ভরা ডাল দিয়ে একটা ঝাড়ু তৈরী করে ঝোপ-ঝাড়গুলো পরিষ্কার করলেন। তিনি জীবিত অবস্থায় এই জায়গা এরকম অপরিচ্ছন্ন থাকতে পারে না। কুমার এখানে প্রাচীর তুলবেন—মাথায় ছাউনি দেবেন ঘরে মাটি দিয়ে বাসোপযোগী করে তুলবেন। এর মধ্যে চন্দার স্মৃতি রয়েছে। ঝোপঝাড়ের কাছেই একটা জায়গায় একটা ভাঙা পাত্র-মত পড়েছিল। সে তাতে করে জল এনে

বৃক্ষকে সেচন করতো। কুমার দু-দিন কিছু খায়নি। রাত্রে খুব খিদে পেয়েছিল—কিন্তু এখন আর তার কোনো খাবার ইচ্ছা ছিল না। সারা শরীরে ছিল শুধু যেন একটা আনন্দের শিহরণ। নদী থেকে জল এনে মাটি ভেজাতে লাগলেন। অজানা এক আনন্দে যেন নবশক্তি ফিরে পেলেন দৌড়ে গিয়ে বার বার জল নিয়ে আসছিলেন মাটি ভেজাতে।

একদিনেই দেওয়ালের অনেকখানি তুলে ফেললেন, যা চারজন মজুরের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। আর কী সুন্দর মসৃণ দেওয়াল, যা নাকি কারীগর দেখেও বোধহয় লজ্জা পেত। প্রেমের শক্তি-অপার-অনন্ত।

সন্ধ্যা হয়ে এল। বৃক্ষে পাখী এসে তার আশ্রয় নিয়েছে। বৃক্ষের পাতাগুলিও সারাদিনের ক্লান্তির পর চোখ বন্ধ করে ফেলেছে যেন—কিন্তু কুমারের আরাম কোথায়! তারাদের মলিন প্রকাশে মাটির সৌন্দর্যও ম্লান মনে হচ্ছে। হায়রে কামনা! শেষ পর্যন্ত তুই কি এর প্রাণ নিয়ে ছাড়বি ?

বৃক্ষে পাখীর মধুর সঙ্গীত শোনা যাচ্ছিল। কুমারের হাত থেকে ঘড়া পড়ে গিয়ে চারিদিকে জলকাদায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। হাত পায়ে মাটি লাগলো—বৃক্ষের নীচে গিয়ে বসলেন। পাখীর স্বরে ছিল—মাধুর্য আর উল্লাস। মানুষের স্বর এর কাছে বেসুরো মনে হয়। এই সুরের বিস্তার-এত অমৃত-কোথা থেকে পেল ? সঙ্গীতে আনন্দ ছিল, ছিল বিস্মৃতি—কিন্তু সেই বিস্মৃতি ছিল কতো শ্রুতি মধুর। অতীতের জীবন এবং তার প্রকাশকে এত বিদগ্ধ ও প্রত্যক্ষ করে দেবার শক্তি সঙ্গীত ব্যতীত অন্য কিছুতে নেই। কুমারের মানসপটে ভেসে উঠলো সেই দৃশ্য—একদিন চন্দা নদী থেকে জল এনে এনে তার চারাগাছটিকে সেচন করতো। হায়! সেদিন কি আর ফিরে আসবে!

সহসা এক পথচারী এসে দাঁড়াল। কুমারকে দেখে সে নানা প্রশ্ন করতে লাগলো, যা সাধারণতঃ দুটি প্রাণীর মধ্যে হয়ে থাকে। যেমন তুমি কে, কোথা থেকে আসছ, কোথায় যাবে ? আগে সেও নাকি এই গ্রামেই থাকতো। কিন্তু যখন গ্রাম উজাড় হয়ে গেল তখন কাছাকাছি একটা গ্রামে সে বাসা বাঁধলো। এখনও এখানে তার খেত আছে। রাত্রে পশুদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সে এখানে এসে শুতো। কুমার জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি জানো—এই গ্রামে কুবের সিংহ ঠাকুর থাকতেন। কৃষক বললো—হ্যাঁ জানি বৈকি! বেচারাকে তো এখানেই হত্যা করা হলো। তোমারও কি তিনি পরিচিত ছিলেন ?

কুমার জানালো, হ্যাঁ সে দিনগুলোর কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আমিও রাজার সেনাদের মধ্যে একজন চাকর ছিলাম। তাঁর বাড়ীতে আর কেউ ছিল না। কৃষক

বললো—আর ভাই কিছু জিজ্ঞাসা কোরনা, সে সব বড় করুণ কাহিনী। তাঁর স্ত্রী তো আগেই মারা গিয়েছিলেন। তাঁর একটি মেয়ে ছিল। আঃ কী সুশীলা-সরলা-বালিকা ছিল। তাকে দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত। সাক্ষাৎ স্বর্গের দেবী ছিল যেন। যখন কুবের সিংহ বেঁচে ছিলেন তখন কুমার রাজনাথ পালিয়ে এসে তাঁর কাছেই থাকতেন। সেই মেয়েটির সাথে কুমারের আলাপ ছিল। যখন কুমারকে এসে শত্রুরা ধরে নিয়ে গেল—তখন চন্দা ঘরে একাই ছিল। গ্রামবাসীরা অনেক চেষ্টা করলো যে চন্দার বিবাহ হয়ে যাক্। কিন্তু স্বামীভাগ্য তার ছিল না। এমন কেউ ছিল না যে তাকে পেয়ে জীবনে না ধন্য মনে করে। কিন্তু সে কাউকে বিবাহ করতে রাজী হলো না। এই বৃক্ষ যা তুমি দেখছ—সে সময়ে এটা একটা ছোট চারাগাছ ছিল। তার চারপাশে ফুলের বেড়া দেওয়া ছিল। একে দেখা শোনা করেই সে দিন কাটাতো আর বলতো,—"আমার কুমার সাহেব আসবে।"

কুমারের দু-চোখে অশ্রু বর্ষণ হতে লাগলো। পথিক কিছুটা থেমে আবার বলতে লাগলো, তুমি বিশ্বাস করবে না ভাই, সে দশ বছর এইভাবে কাটিয়ে দিলে। এত দুর্বল—ক্ষীণকায়া হয়ে গেল, যে তাকে আর চেনাই যেত না। কিন্তু তখনো সে কুমার সাহেবের আসার আশায় ছিল। শেষ পর্যন্ত একদিন এই বৃক্ষের নীচে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেল। —এরকম প্রেম—কে করতে পারে ভাই! জানি না, কুমার জীবিত কি মৃত, তার বিরহিনীর কথা মনে পড়ে কিনা কে জানে! কিন্তু চন্দার প্রেম ছিল নিখাদ। তাই সে তার প্রেমকে ভুলতে পারেনি।

সবকথা শুনে কুমারের হৃদয় দুঃখে-শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল—তিনি বুকটা চেপে বসে রইলেন।

কৃষকের হাতে একটা জলন্ত আগুনের টুক্‌রো ছিল—তার কল্কেতে সেটি রেখে দু-চারবার সুখটান দিয়ে বললো—তার (মেয়েটির) মৃত্যুর পরেই তার ঘরটিও ভেঙে পড়লো। গ্রামবাসীরা আগেই চলে গিয়েছিল। এখন তো সব শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে। আগে দু-চারজন মানুষ এখানে এসে বসতো। এখন তো পাখীরা পর্যন্ত আসে না। সেই মেয়েটির মৃত্যুর পর—এই একটিমাত্র পাখীর ডাক শোনা যায়—প্রত্যহ এই ডালে বসে সে গান শোনায়। রাত্রে সব পাখীরা ঘুমিয়ে পড়ে, এই পাখীটি রাত-ভোর ডাকতে থাকে। এর জোড়াকে কখনো দেখা যায় না। সে একাই এই জঙ্গলে থাকে। রাত্রে এই গাছে বসে গান করে। তার গানে এমন কিছু আছে যা শুনলে চোখের জল বাধা মানে না। মনে হয় সে যেন তার মনের ভাবাবেগ প্রকাশ করছে। আমি তো কতবার বসে বসে কেঁদেছি। সবাই বলে এই পাখীই—সেই চন্দা। এখনো সে তার কুমারের বিয়োগ-বিলাপ করছে, আমার তো এই কথাই মনে

হয়। জানিনা, আজ কেন সে খুব প্রসন্ন।

কৃষক তামাক সেবন করে শুয়ে পড়লো। কুমার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। —তারপর ধীর কণ্ঠে বললেন সত্যিই যদি তুমি সেই চন্দা—আমার কাছে আসো না কেন?

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাখীটি তার হাতে এসে বসলো। চাঁদনীরাতের আলোয় পাখীটিকে কুমার মুগ্ধ আবেসে দেখলেন। যেন মনে হলো, তার চোখের সামনে থেকে একটা আবরণ সরে গেল—পাখীর মুখের পরিবর্তে সে চন্দার মুখখানি দেখতে পেল।

দ্বিতীয়দিন কৃষকের যখন ঘুম ভাঙলো দেখলো কুমারের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে!

আট

কুমার এখন নেই—কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে তৈরী তার দেওয়ালের ওপর খড়ের নতুন ছাউনি পড়ে গিয়েছে। তায় দ্বারে ফুলের কেয়ারী দেওয়া হয়েছে। গ্রামের কৃষক এর বেশী কি-ই-বা করতে পারে? সেই জঙ্গলে এখন একজোড়া পাখী বাসা বেঁধেছে। দুজনেই খাদ্য-দানা অন্বেষণে বেরোয়—একই সাথে ফিরে আসে। রাত্রে দুজনকে বৃক্ষের একই ডালে বসে থাকতে দেখা যায়। —তাদের সুরম্য মিলিত স্বর রাত্রে বহুদূর পর্যন্ত শোনা যায়। বনের জীবজন্তুরাও সঙ্গীত মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে যায়।

লোকেদের মতে—সেই পাখীদের জোড়া কুমার আর চন্দা। এতে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না। একবার এক ব্যাধ এসেছিল তাদের শিকার করতে। গ্রামের লোকেরা তাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

ভাষান্তর : ॥ হীরা মজুমদার ॥

যাবজ্জীবন কারাবাসী

রাত দশটা, বিশাল এক ভবনের ছোট্ট একটি কামরা বিদ্যুৎ হিটারে এবং আলোয় ঝলমল করছে। বড়দিন এসে গেছে!

শেঠ খুবচন্দবাবু অফিসারদের কে উপহার পাঠাবার জন্য সব জিনিস সাজাচ্ছিলেন। ফল, মিষ্টি, আতা, ছোট-ছোট খেলনার পাহাড় সামনে রাখা আছে। মুনিমবাবু

অফিসারদের নাম বলে বলে যাচ্ছেন আর নিজের হাতে যথা-সম্মান উপহার সাজিয়ে রাখছেন।

খুবচন্দবাবু হলেন একজন মিলমালিক ও বোম্বাই শহরের বড় ঠিকাদার। একবার তিনি শহরের মেয়রও নির্বাচিত হয়েছিলেন। এখনও তিনি ব্যবসায়ী সভার মন্ত্রী এবং ব্যবসায়ী মণ্ডলের সভাপতি রূপে আছেন। এই ধন যশ ও মানের প্রাপ্তিতে উপহারের যে কত ভাগ আছে তা কে বলতে পারবে? এই উপলক্ষে পাঁচ-দশ হাজার টাকা তাঁর নষ্টই হয়ে যায়। যদি কিছু লোক তাঁকে খোশামোদী, তোয়াজী, জী হুজুর বলে তো বলতে পারে। তাতে শেঠজীর কি যায় আসে? শেঠজী সেই ধরণের লোকেদের মত নন যিনি উপকার করে সমুদ্রে ঢেলে দেবেন।

পুজারী এসে বললেন—সরকার, অনেক দেরী হয়ে গেছে, ঠাকুরের ভোগ তৈরী হয়ে গেছে।

অন্য ধনীদের মতো শেঠজীও একটা মন্দির তৈরী করেছিলেন। ঠাকুরের পূজা করবার জন্য একজন পুরোহিতও রেখেছিলেন।

পূজারীকে দেখে বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন—দেখতে পাচ্ছো না, কি করছি? এটাও একটা কাজ, খেলা নয়। তোমার দেবতা সব কিছু দেবেন না। পেট—ভরলে তবে লোকে কিছু করতে পারে। আধঘণ্টা দেরী হলে তোমার ঠাকুর ক্ষিদেয় মরে যাবেন না।

পুরোহিত মশায় ছোট মুখ করে চলে গেলেন এবং শেঠজী আবার উপহার সাজাতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন।

শেঠজীর জীবনের ধন উপার্জনই হল মুখ্য কাজ এবং সেই সাধনকে রক্ষা করাই হল তাঁর মুখ্য প্রধান কর্তব্য। তাঁর সমস্ত ব্যবহার এই সিদ্ধান্তের অধীন ছিল। বন্ধুদের সাথে এইজন্য মিশতেন যাতে ধন উপার্জনে সাহায্য পাওয়া যায়। ব্যবসায়িক দৃষ্টিতেই তাঁদের মনোরঞ্জন করতেন। দান করতেন তার সামনেও একটা লক্ষ্য থাকতো। পূজার্চ্চনা বা বন্দনা তাঁর কাছে পুরানো সংস্কার বলে মনে হতো বা কোন রকমে পালন করে স্বার্থ সিদ্ধ কর। যেন কোন নিপীড়িত শ্রমিক, সব কাজ থেকে ছুটি গেল তো ঠাকুর ঘরে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, চরনামৃত নিল এবং চলে এল।

এক ঘণ্টা বাদে পূজারী এসে খুব চেঁচামেচি করতে লাগল। খুবচন্দবাবু তার মুখ দেখেই তাড়া দিয়ে উঠলেন। যে পূজোতে সাথে সাথে লাভ হয়, সেই পূজোয় যদি কেউ বারবার বিঘ্ন ঘটায় তাহলে কার না রাগ হয়? বললেন—"বলে দিয়েছি তো, এখন আমার সময় নেই। তুমি কি মাথায় চড়েছো? আমি পূজার গোলাম নই। যখন ঘরে টাকা হয় তখন পুরোহিতের ও পূজা হয়। ঘরে পয়সা নেই তো ঠাকুরও জিজ্ঞাসা

করতে আসবে না।

পূজারী হতাশ হয়ে চলে গেলেন এবং শেঠজী নিজের কাজে লেগে গেলেন।

হঠাৎ তাঁর বন্ধু কেশবরাম বাবু এলেন। শেঠজী উঠে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন—কোথা থেকে? আমি এক্ষুনি তোমাকে ডেকে পাঠাচ্ছিলাম।

কেশবরামবাবু একটু মুচকি হেসে বললেন—এতরাত ধরে কেবল উপহারই সাজাচ্ছো? এখন রেখে দাও। কালকের সারাদিন তো আছেই; গুছাবে। তুমি কি করে এত কাজ করছো। আমি তো দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। আজ কি প্রোগ্রাম ছিল, মনে আছে?

শেঠজী মাথা তুলে স্মরণ করবার চেষ্টা করে বললেন—কোন কি বিশেষ প্রোগ্রাম ছিল? আমি তো মনে করতে পারছি না। (একের পর এক স্মৃতি জেগে উঠছে) আচ্ছা সেই কথা। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এমন কিছু তো দেরী হয়নি। এই ঝামেলায় এত জড়ীয় পড়েছিলাম যে একদম মনে ছিল না।

"তাহলে চলো, আমি তো ভেবেছিলাম তুমি সেখানে পৌঁছে গেছো।"

"আমি যাইনি বলে, লালা তো নারাজ হইনি?"

"ওখানে গেলে তো তা জানা যাবে।"

"আমার হয়ে তুমি ক্ষমা চেয়ে নেবে।"

"আমার কি এমন গরজ পড়েছে যে আমি তোমার হয়ে ক্ষমা চাইবো! সে তো পথচেয়ে বসে ছিল।

বলতে লাগলো—তাঁর উপর আমার কোন পরোয়াই নেই, সেইজন্য আমার উপর তারও কোন পরোয়া নেই। আমাকে আসতেই দিচ্ছিল না। আমি তো শান্ত করে দিয়েছি, তবুও কিছুটা ছলনা করতে হবে।"

খুবচন্দজী চোখ মেরে বললো—আমি বলে দেব, গভর্ণর সাহেব জরুরী কাজে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

"না, ভাই এ ছলনা ওখানে চলবে না। বলবে—তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা না করে চলে গেলে কেন? সে আপনার সামনে গভর্ণরকে চেনে নাকি? রূপ এবং যৌবন খুব সাংঘাতিক জিনিস, বড়বাবু! আপনি জানেন না।"

"তাহলে তুমিই বলো, কি অজুহাত দেখাবো?"

"ওহ, অন্তত বিশটা অজুহাত আছে। বলবে, দুপুর থেকে ১০৬° ডিগ্রি জ্বর ছিল। এখনই উঠলাম।"

দু'জন বন্ধু হাসলো এবং লায়লার স্বাগত শুনতে চললো।

দুই

দেশের খুব বড় বড় মিলদের মধ্যে শেঠ খুবচন্দবাবুর স্বদেশী মিল অন্যতম। যখন থেকে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তখন থেকেই মিলের উৎপাদন হঠাৎ দু'গুণ বেড়ে গেল। শেঠজীও কাপড়ের দাম দু'আনা করে বাড়িয়ে দিলেন। তবুও বিক্রি কম হতো না, কিন্তু এদিকে কাঁচামাল খুব সস্তা হয়ে গেল, সেজন্য শেঠজী মজুরী কম দেবার কথা ঘোষণা করলেন। কয়েকদিন ধরে শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সাথে আর শেঠজীর সাথে তর্ক হতে লাগলো। শেঠজী জীবন থাকতে দমতে চাননি। যখন অর্ধেক মজুরী দিয়েই নতুন শ্রমিক পাচ্ছেন তো পুরো মজুরী দিয়ে কেন পুরানো লোকদের রাখবেন? বাস্তবিক পুরানো লোকেদের তাড়াবার জন্যই এই নীতি তিনি প্রয়োগ করেছিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত শ্রমিকরা এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে তারা ধর্মঘট করবেই।

সকাল বেলা মিলের গেটের সামনে শ্রমিকদের ভীড় জমতে লাগলো, কিছুলোক গেটের উপরই বসে গেল, কিছু মাটিতে; কিছু লোকেরা এদিক ওদিক ঘোরা ফেরা করছে। মিলের দরজার সামনে কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছে। মিলে সম্পূর্ণ ধর্মঘট চলছে।

একজন যুবককে আসতে দেখে শত শত কর্মচারীরা এদিক ওদিক থেকে দৌড়ে এসে তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললো। প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো—শেঠজী কি বলেছেন?

এই লম্বা, পাতলা, শ্যামবর্ণা যুবকটি হল শ্রমিকদের প্রতিনিধি। তার চেহারার মধ্যে এমন কিছু দৃঢ়তা, এমন কিছু নিষ্ঠা, কিছু এমন গভীরতা আছে যা দেখে সমস্ত শ্রমিকরা তাকে নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছে।

যুবকের কণ্ঠে ছিল কিছু নিরাশা, ক্রোধ এবং আহত সম্মানের কান্না।

"কিছু হ'ল না। শেঠজী কিছু শুনলো না।"

চারিদিক থেকে আওয়াজ এল—তাহলে আমরাও খোশামোদ করবো না।

যুবকটি আবার বললো—সে শ্রমিকদের কে তাড়াবার তালে আছে; কেউ কাজ করুক আর না করুক। এই মিলে এ বছর দশ লাখ টাকা লাভ হয়েছে। তা হ'ল আমাদের লোকেদের মেহনতের ফল। তবুও আমাদের মজুরী কেটে নেওয়া হচ্ছে। ধনবানদের পেট কখনও ভরে না। আমরা দুর্বল, নিঃসহায়, আমাদেরকে কে মানবে? ব্যবসায়ী-মণ্ডল সবই তাঁর দিকেই, সরকারও তাঁর দিকে, মিলের অংশীদারেরাও তাঁর দিকে, আর আমাদের দিকে কে আছে? আমাদের উদ্ধার তো স্বয়ং ভগবানই করবেন।

একজন শ্রমিক বললো—শেঠজী তো ভগবানের খুব বড় ভক্ত।

যুবকটি মুচকি হেসে বললো—হ্যাঁ, খুব বড় ভক্ত। তাঁর ঠাকুর ঘরের মত সাজানো ঠাকুরঘর এখানে আর নেই, কোথাও এত নিয়ম করে ভোগ হয় না, কোথাও এমন উৎসব হয় না, কোথাও এমন অপূর্ব দর্শন ও হয় না। সেই ভক্তির প্রভাবে আজ সারা নগরে এত সম্মান তিনি পেয়েছেন। অন্যদের মাল তো পড়ে পড়ে পচে যায়, কিন্তু এনার মাল তো গুদাম পর্য্যন্ত পৌছায় না। সেই ভক্তরাজ আমাদের মজুরী কেটে নিচ্ছেন। মিলে যদি লোকসান হয়, তখন আমরা অর্ধেক মজুরীতে কাজ করবো; কিন্তু যখন লাখ লাখ টাকা লাভ হচ্ছে তো আমাদের মজুরী কেন কাটা হচ্ছে? আমরা অন্যায়কে মানতে পারি না। প্রতিজ্ঞা কর যে কোন বাইরের লোককে আমরা মিলের মধ্যে ঢুকতে দেব না, যতই তারা নিজেদের সাথে (পুলিশ কনেষ্টবল) নিয়ে আসুক, কোন কিছুকে পরোয়া করবো না যতই আমাদের উপর লাঠি চলুক আর গুলি চলুক....

অন্যদিক থেকে আওয়াজ চলে—শেঠজী?

সকলেই পেছন ফিরে ফিরে শেঠজীর দিকে দেখতে লাগলো। সকলেরই চেহারার উপর প্রতিহিংসার ছাপ পড়লো, কিছু লোকেরা ভয় পেয়ে কনস্টেবলের সাথে সাথে মিলের মধ্যে ঢুকবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো, কিছু লোক তুলোর বস্তার আড়ালে গিয়ে লুকালো, আগে কিছু লোক নির্ভিকভাবে—যেন জীবনটা হাতে নিয়ে যুবকের সাথে দাঁড়িয়ে রইল।

শেঠজী মোটর গাড়ি থেকে নেমে কনেস্টবলকে ডেকে বললেন—এই লোকগুলোকে একদম মেরে বার করে দাও।

শ্রমিকদের উপর লাঠি পড়তে লাগলো, পাঁচ-দশজন তো লুটিয়ে পড়লো, বাকীরা নিজের প্রাণ নিয়ে কেটে পড়লো। সেই যুবকটি দু'জন লোককে নিয়ে এখনও পর্য্যন্ত তেজের সাথে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রভুত্ব সকলেরই অসহ্য। শেঠজী যদি নিজে আসেন, তবুও এই লোকেরা সামনেই দাঁড়িয়ে থাকবে—কারণ এটা তো প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এই দুর্ব্যবহারকে সহ্য করতে পারবে? এই ছেলে গুলোকে দেখো, দেহে তাদের লজ্জা নিবারণের কাপড় পর্য্যন্ত নেই; তবুও তারা জমায়েত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে করো আমি কিছু নই। বুঝতে নিশ্চয়ই পারছো যে এরা আমায় কি করতে পারে।

শেঠজী বন্দুক ফায়ার করলেন এবং সকলের সামনে এসে তাকে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। তবুও সেই যুবকটি সকলের আগে দাঁড়িয়ে ছিল! এই দেখে শেঠজী উন্মত্ত হয়ে গেলেন। এটা কি জুলুম নাকি? তক্ষুনি হেড কনস্টবলকে

ডেকে আদেশ দিলেন—এই লোকগুলোকে বন্দী করো।

কনেস্টবল সেই তিনজনকে দড়ি দিয়ে বাঁধলেন এবং তাদের গেটের দিকে নিয়ে গেলেন। এদেরকে বন্দী করার সাথে সাথে মিল থেকে এক হাজার কর্মচারীর দল রেলা দেখিয়ে বেরিয়ে এল এবং কনেস্টবলদের ওপর আক্রমণ চালালো। কনেস্টবলরা দেখলো যে বন্দুক চালালে এদের প্রাণ বাঁচবে না, তাই অপরাধীদেরকে ছেড়ে দিল এবং আলাদা হয়ে দাঁড়ালো। শেঠজীর এমন রাগ হচ্ছিল যেন সবগুলোকে বন্ধুকের গুলিতে উড়িয়ে দেয়। ক্রোধের চোটে নিজের আত্মরক্ষা করতে পর্য্যন্ত ভুলে গেল। কয়েদীদেরকে সিপাহীদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেই জনতা শেঠজীর দিকে আসছিল। শেঠজী ভাবলো—সকলেই আমাব প্রাণ নেবার জন্য আসছে। আচ্ছা? ঐ অপরাধী সকলের আগে, সে-ই এখানকার নেতা নির্বাচিত হয়েছে। আমার সামনে কেমন ভিজে বিড়াল হয়েছিল; কিন্তু এখানে সবার আগে আগে আসছে।

শেঠজী এখনও বোঝাপাড়া করতে পারতেন; কিন্তু সব কিছু দাবিয়ে বিদ্রোহীদের কাছে কিছু আলোচনা করাটা তাঁর কাছে অসহ্য বলে মনে হল।

এমন সময় দেখলেন যে সেই এগিয়ে আসা জনতা মাঝখানে থেমে গেল। যুবকটি সেই লোকদের সাথে কিছু পরামর্শ করলো এবং একাই শেঠজীর দিকে এগিয়ে এল। শেঠজী মনে মনে ভাবলো—সম্ভবত আমার কাছে প্রাণদানের শর্ত ঠিক করতে আসছে। সকলে মিলে নিজেদের মধ্যে এই আলোচনা করেছে। দেখো, কত নিসঙ্কোচে চলে আসছে, যেন কোন বিজয়ী সেনাপতি। কনেস্টবলগুলো কি করে তাদের কাছ থেকে সরে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু তোমাকে কেউ বাঁচাতে আসবে না, যা কিছু হবে, দেখা যাবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার কাছে রিভলবার আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি আমায় কি করতে পারবে? তোমার কাছে হার মানবো না।

যুবক সামনে এসে কিছু বলতে চাইলে শেঠজী রিভলবার বার করে ফায়ার করে দিল, যুবকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো এবং হাত-পা ছুড়তে লাগলো।

সে পড়ে যেতেই শ্রমিকরা উত্তেজনায় ফেটে পড়লো। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের মধ্যে হিংসাভাব ছিল না। তারা কেবল শেঠজীকে এটাই দেখাতে চাইছিল যে তুমি আমাদের মজুরী কেটে নিয়ে শান্ত হয়ে বসিয়ে রাখতে পারবে না; কিন্তু হিংসা হিংসাকে উদ্দীপ্ত করে দেয়। শেঠজী দেখলো, প্রাণ বাঁচান দায় এবং এই সমতল ভূমির উপর রিভলবার নিয়েও বেশী সময় পর্য্যন্ত প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব নয়, কিন্তু পালাবারও কোন জায়গা ছিল না। যখন কোন পথ না পেল তখন সে সেই তুলোর গাদার উপর উঠে গেল এবং রিভলবার দেখিয়ে দেখিয়ে নীচের লোকদেরকে উপরে

উঠতে বাধা দিতে লাগলো। নীচে প্রায় পাঁচ-ছয় শ লোকদের দিয়ে ঘেরা অবস্থায় ছিল। আর এপারে শেঠজী রিভালবার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোনদিক থেকে কোন সাহায্য না আসতে দেখে প্রতিক্ষণে প্রাণের আশা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলো। কনস্টেবলরাও অফিসারদেরকে এখানকার পরিস্থিতি কিছু বলেনি ; নাহলে তারা এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেউ না কেউ আসতো। কেবলমাত্র পাঁচটা গুলি নিয়ে কতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণ বাঁচবে ? যে কোন মুহূর্তেই সব-কিছুর সমাপ্তি হয়ে যাবে। ভুল হয়ে গেছে ; আমাকে বন্দুক আর কারতুজ আনা উচিৎ ছিল। তারপর দেখতাম তাদের বাহাদুরী। এক একটাকে মেরে রেখে দিতাম ; কিন্তু কে জানতো যে এখানে এত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি এসে দাঁড়াবে।

নীচ থেকে একটি লোক বললো—গুদামে আগুন লাগিয়ে দাও, বার করোতো একটা দেশলাই। যে তুলো থেকে পয়সা আয় করেছে ; সেই তুলোর চিতায় সে জ্বলুক।

সঙ্গে সঙ্গে একটি লোক পকেট থেকে দেশলাই বার করলো এবং আগুন জ্বালাতে যাবে এমন সময় সেই আহত যুবকটি পেছন থেকে এসে সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। তার পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ; তবুও রক্ত ঝরে পড়ছিল। তার মুখের রঙ হলুদ, এবং তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যে তার শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। তাকে দেখেই লোকেরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো। হিংসার উন্মত্ততার মধ্যে নিজেদের নেতাকে বেঁচে থাকতে দেখে তাদের আনন্দের সীমা রইল না। জয় ধ্বনীতে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেল—"গোপীনাথ কি জয়।"

আহত গোপীনাথ জনতাকে শান্ত করতে হাত উঠিয়ে সংকেত করে বললো—ভাইয়েরা, আমি তোমাদের কাছে একটি কথা বলবার জন্য এসেছি। বলতে পারি না, বাঁচবো কিনা ? মনে হয়, এটাই আমার শেষ নিবেদন। তোমরা কি করতে যাচ্ছো ? দরিদ্রের মধ্যেই স্বয়ং নারায়ণ বাস করেন, তোমরা এটাকে কি মিথ্যা প্রমাণিত করতে চাও ? ধনীদের ধনের অহংকার থাকতে পারে কিন্তু তোমাদের কিসের অহংকার আছে ? তোমাদের ঝুপড়িতে ক্রোধ এবং অহংকারের জায়গা কোথায় ? আমি তোমাদের কাছে হাত জোড় করে প্রার্থনা করছি যে তোমরা এখান থেকে চলে যাও। যদি তোমরা আমাকে সত্যিই ভালবাস, যদি তোমাদের জন্য আমি কিছু করে থাকি তাহলে তোমরা ঘরে ফিয়ে যাও আর শেঠজীকেও ঘরে ফিরে যেতে দাও।

চারদিক থেকে আপত্তিজনক ধ্বনি উঠতে লাগলো ; কিন্তু গোপীনাথকে

উপেক্ষা করার সাহস কারো নেই। আস্তে আস্তে লোক সেখান থেকে চলে গেল। মাঠ পরিষ্কার হয়ে গেলে গোপীনাথ নম্রভাবে শেঠজীকে বলল—সরকার, আপনি এখন চলে যান। আমি জানি আপনি আমাকে ভুল করে মেরেছেন। আমি এই কথাটা বলবার জন্যই আপনার কাছে যাচ্ছিলাম, যা আমি এখন বলছি। আমার দুর্ভাগ্য যে আপনি ভুল করেছেন। ঈশ্বরের এই ইচ্ছাই ছিল।

গোপীনাথের উপর শেঠজীর একটু একটু শ্রদ্ধা হতে লাগলো। নীচে নামতে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন। কিন্তু উপরেও তো প্রাণ রক্ষার কোন আশা নেই। তিনি এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ভয়ে ভয়ে নামছিলেন। প্রায় দশ গজ দূরে সেই জন সমুদ্র তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের চোখে মুখে বিদ্রোহ এবং হিংসার পুষ্প ফুটে আছে। কিছু লোকেরা আস্তে আস্তে শেঠজীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বাজে আলোচনা করছে, আবার কারো কারো অত সাহসই নেই যে শেঠজীর সামনে আসে। ঐ মরোন্মুখ যুবকের আদেশের এত শক্তি?

শেঠজী মোটরে চড়ে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই গোপী মাটিতে পড়ে গেল।

তিন

শেঠজীর মোটর যত জোরে চলছিল, ঠিক তেমনি জোরে তাঁর চোখের সামনে আহত গোপীর ছায়া দৌড়াচ্ছিল। মাঝে মাঝে তার সম্পর্কে নানান চিন্তা মনে উঁকি মারছিল। অপরাধবোধ তাঁর মনকে বেশ নাড়া দিচ্ছিল। গোপী যদি সত্যিই তার শত্রু হতো, তাহলে তার প্রাণ বাঁচাতো—এমন অবস্থাতেও। যখন সে নিজেই মৃত্যু মুখে পড়িত? এর উত্তর তাঁর কাছে নেই। হাত বাঁধা অবস্থাতে নিরপরাধ গোপী যখন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কথাগুলি বলছিল—কেন তাঁর অপরাধগুলো সে এড়িয়ে গেল?

ভোগ লিপ্সা মানুষকে স্বার্থান্বেষী করে তোলে। তবুও শেঠজীর আত্মা এতটা অভ্যস্ত এবং কঠোর হয়ে ওঠেনি যে একজন অপরাধীকে হত্যা করে তাঁর একটুও গ্লানি হচ্ছে না। তিনি শত শত যুক্তি দিয়ে নিজের মনকে বোঝাতে চাইলেন, কিন্তু ন্যায় বুদ্ধি কোন যুক্তিকেই স্বীকার করতে পারছিল না। যেন তাঁর সেই ধারণা ন্যায়-দুয়ারে বসে সত্যাগ্রহ করছিল এবং আশীর্বাদ নিয়েই যেন সে সেখান থেকে নড়বে। তিনি এত দুঃখ এবং হতাশা নিয়ে ঘরে ফিরবেন তাঁকে কেউ হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে।

প্রমীলা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলো – হরতালের কি হ'ল ? এখনও পর্য্যন্ত হচ্ছে, না বন্ধ হয়ে গেছে ? শ্রমিকেরা মারদাঙ্গা তো করেনি ? আমি তো খুব চিন্তায় ছিলাম। খুবচন্দবাবু ইজিচেয়ারটি টেনে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—কিছু জিজ্ঞাসা করো না, কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গেছি—ব্যাস, এটাই শুধু জেনে রাখো। পুলিশের লোকেরা তো পালিয়ে গেছে ; আমাকে তো সব লোকেরা ঘিরে ফেলেছিল। কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছি। যখন আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল ; কি আর করবো, আমিও রিভালবার চালিয়ে দিলাম।

প্রমীলা ভয় পেয়ে বললো—কেউ জখম হয়নি তো ?

"সেই গোপীনাথই জখম হয়েছে যে শ্রমিকদের নেতা হয়ে আমাদের বাড়ীতে আসতো। সে পড়ে যেতেই এক হাজার লোক আমায় ঘিরে ফেলেছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে সেই তুলোর গুদামে উঠে পড়লাম। প্রাণে বাঁচবার কোন আশা ছিল না। শ্রমিকেরা গুদামে আগুন লাগাতে যাচ্ছিল।"

প্রমীলা কেঁপে উঠলো।

"হঠাৎ সেই আহত লোকটি উঠে শ্রমিকের সামনে এল এবং তাদেরকে বুঝিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা করলো। সে যদি না আসতো তাহলে আমি কিছুতেই বাঁচতাম না।"

ঈশ্বরের অপার করুণা। সেই জন্যই আমি তোমাকে একলা যেতে বারণ করছিলাম, সেই লোকটিকে, লোকেরা হাসপাতালে নিয়ে গেছে ?"

শেঠজী শোকার্ত কণ্ঠে বললেন—আমার ভয় হচ্ছে লোকটি হয়তো মরে যাবে। যখন আমি মোটরের উপর বসলাম, তখন যেন দেখলাম সে পড়ে গেল এবং বহুলোক তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। না জানি, তার কী অবস্থা হয়েছে।

প্রমীলা হলেন সেই ধরণের মহিলা যাঁর শিরায় রক্তের জায়গায় শ্রদ্ধা প্রবাহিত হয়। স্নান-পূজা, তপস্যা এবং ব্রতই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। সুখে, দুখে, অসুখে, বিসুখে—প্রার্থনা ছিল তার একমাত্র কবচ। এই সময় তার উপর এমন সংকট এসে পড়লো ; ঈশ্বর ছাড়া আর তাকে কে উদ্ধার করবে ! সে দরজার উপর দাঁড়িয়ে সেই দিকে তাকাচ্ছিল আর তার ধর্মনিষ্ঠ মন ঈশ্বরের চরণে পড়ে যেন ক্ষমা ভিক্ষা করছিল।

শেঠজী বললেন—এই শ্রমিকটি আর জন্মে কোন মহাপুরুষ ছিলেন, নাহলে যে লোকটি তাকে মারলো আর তার প্রাণরক্ষার জন্য সে তপস্যা করলো।

প্রমীলা বললো—ঈশ্বরের প্রেরণা ছাড়া আর কি? ঈশ্বরের দয়া হলে আমাদের মনে সদ্‌বিচারও আসবে।

শেঠজী জিজ্ঞাসা করলো—তাহলে খারাপ বিচারও তো ঈশ্বরের প্রেরণা থেকে আসতে পারে?

প্রমীলা তৎপর হয়ে বললো—ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ। প্রদীপের আলোতে কখনও অন্ধকার দূর হয় না।

শেঠজী কোন উত্তর চিন্তা করছিলেন এমন সময় বাইরের দিকে চিৎকার শুনে চমকে উঠলেন। দু'জনে রাস্তার দিকের দরজা খুলে দেখলো—হাজার হাজার লোক কালো পতাকা নিয়ে ডান দিক থেকে আসছে। পতাকার পরেই একটা মৃতদেহ যার উপর পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। মৃতদেহের পর যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল মাথার পর মাথা দেখা যাচ্ছিল। গোপীনাথকে নিয়ে শোভাযাত্রা বার করেছে। শেঠজী তো মোটরের উপর বসে মিল থেকে ঘরের দিকে চলে এসেছে। ওদিকে শ্রমিকরা অন্য মিলেও এই হত্যাকাণ্ডের খবর পাঠিয়ে দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ সারা শহরে এই খবর বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়েছে এবং কয়েকটা মিলে ধর্মঘট হয়ে গেছে। সারা শহরে শূন্যতা ছড়িয়ে পড়েছে, সবাই উপদ্রবের ভয়ে দোকান-পাট বন্ধ করে দিয়েছে।

এই শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে সবশেষে শেঠ খুবচন্দের বাড়ীর সামনে এসেছে এবং গোপীনাথের রক্তের প্রতিশোধ নিতে তারা বদ্ধ-পরিকর। ওদিকে পুলিশ অফিসার শেঠজীকে রক্ষা করতে ব্যবস্থা নিয়েছেন, যদি রক্তের নদী বয়ে যায়। শোভাযাত্রার পিছনে সশস্ত্র পুলিশের দু'শো জোওয়ান ডবল মার্চ করে উপদ্রবকারীদের দমন করতে চলে আসছে।

শেঠজী এই মুহূর্তে নিজের কর্ত্তব্য বুঝতে পারছেন না। বিদ্রোহীরা অফিস ঘরে ঢুকে লেন-দেনের বই খাতাকে জালিয়ে এবং সিন্দুকের তালা ভাঙতে শুরু করেছে। সেই সময় বাঁদিক থেকে পুলিশ কমিশনার এসে ধমক দিলেন, বিদ্রোহীদেরকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে যেতে বললেন।

সকলে এক স্বরে বলে উঠলো—গোপীনাথের জয়।

এক ঘণ্টা আগে এই পরিস্থিতি যদি হোত তাহলে শেঠজী খুব নিশ্চিন্ত হয়ে উপদ্রব কারিদের উপর পুলিশী হামলা চালতে বলতেন। কিন্তু গোপীনাথের সেই দেবোপম সৌজন্য এবং আত্ম সমর্পণ তার মনের বিকারকে দমন করে দিয়েছে এবং এখন সাধারণ ওষুধও তাঁর কাছে রামবাণের মত চমৎকার মনে হচ্ছে।

তিনি প্রমীলাকে বললেন—আমি সবার সামনে গিয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিই, নাহলে আমার জন্য কত ঘরের দুঃখ বাড়বে।

প্রমীলা কাঁপতে কাঁপতে বললো—এই দরজা থেকেই লোকেদেরকে কেন বুঝিয়ে বলছো না? এরা যত পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দিতে বলছে, দিয়ে দাও।

"এ সময় আমার রক্তই ওদের পিপাসা। পারিশ্রমিক বাড়ালে ওদের কোন পরিবর্ত্তন হবে না।"

সজল চোখে প্রমীলা বললো—তবে তো তোমার উপর হত্যার অভিযোগ এসে পড়বে।

শেঠজী খুব ধীরে ধীরে বললেন—ভগবানের যদি সেই ইচ্ছাই থাকে, তাহলে আমি আর কি করতে পারি? একটা লোকের জীবন অতটা মূল্যবান নয় যে তার জন্য অসংখ্য জীবন চলে যাবে। প্রমীলার মনে হলো স্বয়ং ভগবানই সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে বললো—আমাকে কি বলে যাচ্ছ? শেঠজীও তার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন—ভগবান তোমাকে রক্ষা করবেন। তাঁর মুখ থেকে আর কোন আওয়াজ বেরোল না। প্রমীলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। সেই কান্না দেখে শেঠজী নীচে নেমে গেলেন।

সেই সারা সম্পত্তি, যার জন্য—তিনি যা কিছু করা উচিৎ, তা করেছেন, যা অনুচিৎ, তাও করেছেন, যার জন্য খোশামোদ করেছেন, ছল, অন্যায় সবকিছু করেছেন, যাকে নিজের জীবন তপস্যার বরদান বলে মনে করেছেন, আজ হঠাৎ চিরদিনের জন্য তা চলে যাচ্ছে; কিন্তু তার জন্য এই মুহূর্তে একটুও মোহ ছিল না, অনুতাপও ছিল না। তিনি জানতেন চিরদিনের জন্য তাঁকে শাস্তি পেতে হবে। তাঁর সমস্ত ব্যথা দূর হয়ে যাবে, তাঁর এই সম্পত্তি ধুলোয় মিশে যাবে, কে জানে প্রমীলার সাথে আর কখনও দেখা হবে কি না? কে মরবে, কে বাঁচবে—কে বলতে পারে? মনে হয় তিনি স্বেচ্ছায় যেন যমদূতকে আহ্বান করছেন। সেই বেদনাময় অবস্থা যা মৃত্যুর সময় আমাদেরকে দাবিয়ে রাখে, যেন তাঁকেও সেই অবস্থায় দাবিয়ে রেখেছে।

প্রমীলা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নীচে পর্য্যন্ত এলো। সে সেই সময় তাঁর সঙ্গে থাকতে চাইলো, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জনতা তাকে আলাদা না করে দেয়। কিন্তু শেঠজী তাকে ছেড়েই তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেলেন এবং সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো।

চার

বলি পেতেই বিদ্রোহের পিচাশেরা শান্ত হয়ে গেল। শেঠজী এক সপ্তাহ হাজতে রইলেন। তারপর তাঁর উপর বিচার চলতে লাগলো। বোম্বাই-এর সব থেকে নামী ব্যারিষ্টার গোপীনাথের তরফ থেকে দেখাশুনা করতে লাগলেন। শ্রমিকেরা খুবচন্দ বাবুর কাছ থেকে অনেক টাকা সংগ্রহ করেছিল এবং এও জমা করেছিল যে যদি শেঠজী আদালত থেকে মুক্ত হয়ে যায় তাহলে তাকে খুনও করা হবে। প্রত্যেকদিন সেই এজলাসে কয়েক হাজার কুলি জমায়েত হোত। অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল। অপরাধী তার নিজের অপরাধ স্বীকার করেছিল। খুবচন্দ বাবুর তরফ থেকে তাঁর উকিল হালকা অপরাধের দলিল পেশ করেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত এটাই ঠিক হয়েছিল যে চোদ্দ বছর কারাবাস করতে হবে।

শেঠজী চলে যাবার পর মনে হ'ল যেন মা লক্ষ্মী ক্ষেপে গেছেন; তাই বৈভবের আত্মা যেন বাইরে বেরিয়ে এল। এক বছরের মধ্যে সেই বৈভবের কঙ্কাল মাত্র রয়ে গেল। মিল তো আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত হিসাব পত্র চুকিয়ে দিতে কিছুই অবশেষ থাকেনি, এমন কি থাকবার বাড়ী পর্য্যন্ত হাতের বাইরে চলে গেল। প্রমীলার কাছে লাখ লাখ টাকার গয়না ছিল। সে যদি চাইতো তো তাকে রক্ষা করতে পারতো। কিন্তু ত্যাগ করার নেশায় তখন তিনি মেতে উঠেছেন। সাত মাস পরে যখন তার পুত্র সন্তান জন্মাল তখন সে ছোট একটা ঘরভাড়া করে ছিলো। পুত্রকে পেয়ে তার সমস্ত দুঃখকে সে ভুলে গেলো। যেটুকু দুঃখ ছিল তা হ'ল এই যে, এই সময় যদি তার স্বামী থাকতো তবে তিনি কি খুশীই না হতেন।

প্রমীলা কত কষ্ট করে পুত্রকে মানুষ করছিল—তার ইতিহাস অনেক বড়। সমস্ত কিছু সহ্য করেছিল। তবুও কারো কাছে হাত পাতে নি। যেভাবে সমস্ত ঋণ মিটিয়ে ছিলো তা থেকে তার উপরে লোকেদের ভক্তি জন্মেছিল। কিছু ভদ্রলোকেরা তো তাঁকে কিছু মাসহারার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু প্রমীলা কারো উপকার নেয়নি। ভাল ভাল ঘরের মহিলা-দের সাথে তাঁর পরিচয় ছিলই। সেই সমস্ত ঘরে নিয়ে স্বদেশী বস্তুর প্রচার করে সে তার নিজের খরচ চালাতো। যতদিন পর্য্যন্ত বাচ্চা দুধ খেত ততদিন পর্য্যন্ত তার কাজ করতে খুব অসুবিধা হতো। কিন্তু দুধ ছেড়ে দেবার পর সে বাচ্চাকে ঝি-এর কাছে রেখে নিজের কাজে বেরোতো।

সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের পর যখন সে সন্ধ্যার সময় ঘরে এসে বাচ্চাকে

কোলে নিতেন তখন তার মন আনন্দে ভরে গিয়ে স্বামীর কাছে উড়ে যেত, না জানি কি অবস্থায় তিনি পড়ে আছেন। সম্পত্তি লুঠ হওয়ার লেশ মাত্র দুঃখ তার মনে নেই। কেবল এইটুকুই লোভ ছিল যে স্বামী ভালভাবেই ফিরে আসুক এবং ছেলেকে দেখে নিজের চোখকে ঠাণ্ডা করুক। তখন সে এই দারিদ্রতার মধ্যেও সুখে থাকবে। সে প্রত্যেকদিন মাথা নীচু করে ঈশ্বরের কাছে স্বামীর মঙ্গল কামনা করতো। তার বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বর যা কিছু করবেন তাতেই তার কল্যাণ হবে। ঈশ্বরের বন্দনায় সে অলৌকিক ধৈর্য, সাহস এবং জীবনের আভাস পেত। প্রার্থনাই তার এখন একমাত্র সম্বল।

পাঁচ

আশায় আশায় পনেরো বছর ধরে বিপদের দিনগুলো কেটে গেল।

সন্ধ্যার সময়। কৃষ্ণচন্দ্র মনমরা হয়ে মার কাছে বসে রইলো। মা-বাবা দু'জনই নিরক্ষর।

প্রমীলা জিজ্ঞাসা করলো—কি বাবা; তোমার পরীক্ষা তো শেষ হয়ে গেছে?

ছেলেটি নরম গলায় উত্তর দিল—হ্যাঁ, মা! হয়ে গেছে। কিন্তু আমার বিচারে ভাল হয়নি। আমার এখন পড়তে মন বসছে না।

এই কথা বলতে বলতে তার চোখ জলে ভরে গেল। প্রমীলা আদর করে বললো—এটা ভাল কথা নয়, বাবা! পড়াতে তোমার মন লাগানো উচিৎ।

ছেলেটি সজল চোখে মার দিকে তাকিয়ে বললো—আজ বার বার বাবার কথা মনে হচ্ছে। তিনি তো এখন বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন। আমি ভাবছি যে তিনি ফিরে এলে আমি ভাল করে তাঁর সেবা করবো। এত বড় উৎসর্গ কে আর করবে, মা? তাঁর উপর লোকেরা তাঁকে নির্দ্দয় বলে। আমি গোপীনাথের ছেলে মেয়ের খবর নিয়েছি, মা! তাঁর স্ত্রী আছে, মা আছেন, এক মেয়ে আছে যে আমার থেকে দু'বছরের বড়। মা এবং মেয়ে দু'জনেই মিলে চাকরী করে। আর দিদা খুব বুড়ি হয়ে গেছেন।

প্রমীলা বিস্মিত হয়ে বললো—তাদের খবর তুই কি করে জানলি, বাবা?

কৃষ্ণচন্দ্র প্রসন্ন হয়ে বললো—আজ আমি সেই মিলে গিয়েছিলাম। আমি সেই জায়গাটা দেখতে চেয়েছিলাম; যেখানে শ্রমিকরা বাবাকে ঘিরে ফেলেছিল এবং সেই জায়গা যেখানে গোপীনাথ গুলি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল; কিন্তু সেই

দু'টো জায়গার মধ্যে একটা জায়গাও নেই। সেখানে বাড়ী তৈরী হয়েছে। মিলের কাজ খুব এগিয়ে চলেছে। আমাকে দেখেই অনেক লোক আমায় ঘিরে ফেললো। সবাই এই কথা বলছিল যে তুমি বাবা গোপীনাথের রূপ ধরে এসেছো। শ্রমিকেরা সেখানে গোপীনাথের একটা ছবি টাঙিয়ে রেখেছে। সেই ছবি দেখে আমি চমকে উঠলাম। মা ; যেন আমারই ছবি ; কেবল গোঁফের পার্থক্য। যখন আমি গোপীর স্ত্রীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তো একজন লোক দৌড়ে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এল। তিনি আমাকে দেখেই কাঁদতে লাগলেন। না জানি কেন, আমারও কান্না পেয়ে গেল। বেচারী খুব কষ্টে আছেন। আমার তো তাঁর উপর এত দয়া হ'ল যে তাঁকে আমি কিছু সাহায্য করবো।

প্রমীলার ভয় হোল যে ছেলে এই ঝগড়ার মধ্যে পড়ে লেখা পড়া না ছেড়ে দেয়। বললো—এখন তুমি তাদেরকে কি করে সাহায্য করবে, বাবা ? টাকা থাকতো তো বলতাম পাঁচ দশটাকা প্রতি মাসে দিয়ে দাও। কিন্তু আমাদের অবস্থা তো তুমি জানো। এখন মন দিয়ে লেখাপড়া করো। যখন তোমার বাবা ফিরে আসবেন তখন তোমার যা মন চায় তাই করো।

কৃষ্ণচন্দ্র সে সময় কোন উত্তর দিল না, কিন্তু আজ থেকে তার নিয়ম হয়ে গেল যে স্কুল থেকে ফিরবার পথে সে রোজ একবার করে অবশ্যই গোপীনাথের বাড়ী যাবে! প্রমীলা হাত খরচের জন্য তাকে যে টাকা দিতেন সে তা অনাথাদের জন্য খরচ করতো। কখনও কিছু ফল নিত, আবার কখনও শাক-সবজীও নিত।

একদিন ঘরে ফিরতে কৃষ্ণচন্দ্রের দেরী দেখে প্রমীলা খুব ভয় পেয়ে গেল। খবর নিয়ে সেই বিধবার ঘরে পৌঁছে দেখলো—একটা সরু গলিতে, ভেজা, স্যাঁতসেঁতে ঘরে গোপীর স্ত্রী একটা ভাঙা খাটে শুয়ে আছে আর কৃষ্ণচন্দ্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে হাওয়া করছে। মাকে দেখেই বললো—আমি এখন বাড়ী যাব না, মা ; ত্যাখো, কাকীমা কত অসুস্থ। দিদা কিছু বোঝেন না, বিন্নী রান্না করছে। এঁর কাছে কে বসবে ?

প্রমীলা একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললো—এখন তো অন্ধকার হয়ে গেছে, তুমি এখানে কতক্ষণ পর্য্যন্ত বসে থাকবে ? ঘরে একলা থাকতে আমারও ভাল লাগছে না। এখন চলো। সকালবেলা আবার আসবে।

রুগিনী প্রমীলার স্বর শুনতে পেয়েই চোখ খুললো এবং মৃদুস্বরে বললো—

এস মা, বোস। আমি তো ছেলেকে বলছিলাম, দেরী হয়ে যাচ্ছে, এখন ঘরে যাও ; কিন্তু সে কিছুতেই গেল না। আমার মত অভাগিনীর উপর না জানি কেন তার এত দয়া! নিজের ছেলেও এর থেকে বেশী সেবা করতে পারে না।

চারদিক থেকে দুর্গন্ধ আসছিল। মনে হচ্ছিল যেন দম আটকে যাচ্ছে। ওই দুর্গন্ধযুক্ত হাওয়া কোনদিক থেকে আসছে? কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র এত প্রসন্ন ছিল যে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন বিদেশী চারদিক থেকে ঠোকর খেয়ে নিজের ঘরে এসে বসেছে।

ঘরের চারিদিক দেখতে দেখতে দেওয়ালে টাঙ্গানো একটা ছবির দিকে প্রমীলার নজর পড়লো। সে কাছে গিয়ে দেখতেই তার বুক ধক্ করে কেঁপে উঠলো। ছেলের দিকে তাকিয়ে বললো—তুই এই ছবি কবে তুলেছিস, বাবা?

কৃষ্ণচন্দ্র মুচকি হেসে বললো—এটা আমার ছবি নয়, মা।

গোপীনাথ বাবুর ছবি।

প্রমীলা অবিশ্বাস করে বললো—চল্, মিথ্যাবাদী কোথাকার। রোগিনী কাতর ভাবে বললো—না, মা, এটা আমার স্বামীর ছবি, ভগবানের লীলা কেউ জানে না। কিন্তু ছেলের মুখের সাথে এত মিলে যায় যে আমারই মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। যখন আমার বিয়ে হয়েছিল, তখন তাঁর এই বয়স ছিল এবং মুখও ঠিক এমনি ছিল। এরকম হাসি ছিল, কথা বলার ঢং, স্বভাব ঠিক ছিল এমনি। কি যে রহস্য আছে, আমি বুঝতে পারি না, মা। যখন থেকে সে আসতে লাগলো ; আমি বলতে পারবো না যে আমার জীবন কত সুখী হয়ে গেছে। সবাই একে দেখে অবাক হয়ে যায়।

প্রমীলা কোন উত্তর দিল না। তার মনে একটা অব্যক্ত আশঙ্কা ছেয়ে গিয়েছিল, যেন সে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছে। তার মনে বার বার একটা প্রশ্ন জাগে যা কল্পনা করলেই শিউরে ওঠে।

হঠাৎ কৃষ্ণচন্দ্রের হাত ধরে ফেললো এবং খুব জোরে টানতে টানতে দরজার দিকে নিয়ে গেল যেন কেউ তার হাত থেকে তার ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

রোগিনী কেবল এইটুকুই বললো—মা ; মাঝে মাঝে ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও ; নাহলে আমি মরে যাবো।

ছয়

পনেরো বছর পর ভূতপূর্ব সেই খুবচন্দবাবু নিজের শহরের ষ্টেশনে এসে পৌঁছালেন। সবুজে ভরা গাছ যেন শুধুমাত্র ডালপালা হয়ে রয়ে গেছে। চেহারার উপর ঝুরি নেমেছে। মাথার চুল পাকা, জঙ্গলের মত দাড়ি বেড়েছে। দাঁতের নামই নেই, কোমর ভেঙে গেছে। ঠুঁঠো কে দেখে কে চিনবে যে এই সেই গাছ যে ফুলে ফলে পাতায় একদিন ভরা ছিল, যার উপর পাখিরা কলরব করতো।

স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে সে ভাবতে লাগলো—কোথায় যাবো? নিজের নাম বলতে লজ্জা করছিল। কার কাছে জিজ্ঞাসা করবো যে প্রমীলা বেঁচে আছে, না, মরে গেছে? আর যদি বেঁচে থাকে তো সে কোথায়? তাকে দেখে সে প্রসন্ন হবে, না উপেক্ষা করবে?

প্রমীলার খবর নিতে বেশী দেরী হ'ল না। খুবচন্দের বাড়ীতে এখনও পর্য্যন্ত সবাই খুবচন্দের কথাই বলতো। আইনের উল্টোরূপ পৃথিবী কি জানে? নিজের বাড়ীর সামনে গিয়ে তিনি একজন পান ব্যাপারীকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা ভাই ; এটা কি খুবচন্দের বাড়ী?

পান ব্যাপারী তাঁর দিকে কৌতুহল হয়ে দেখে বললো—খুবচন্দ যখন ছিল, তখন তার বাড়ী ছিল, এখন তো লালা দেশরাজের। "আচ্ছা? আমি এখানে বহুদিন আগে এসেছিলাম। শেঠজীর কাছে আমি চাকর ছিলাম। শুনেছি শেঠজীর জেল হয়েছে।"

"শেঠানী তো আছেন?"

তাঁর ছেলেও আছে।"

শেঠজীর চেহারার উপর অলিখিত এক ঝলক এসে পড়লো। জীবনের সেই আনন্দ এবং উৎসাহ যা আজ পনেরো বছর ধরে কুম্ভকর্ণের মত শুয়েছিল, মনে হ'ল নতুন ফুর্তি পেয়ে সে উঠে বসলো এবং দুর্বল কায়া হয়ে আর লুকিয়ে রইলো না।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে পান ব্যাপারীর হাত ধরে ফেললেন যেন তার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং বললেন—আচ্ছা, তাঁর ছেলেও আছে! কোথায় থাকে তারা ; বলে দাও তো সেখানে সেলাম করে আসবো। অনেকদিন ধরে তাদের নুন খেয়েছি।

পান ব্যাপারী প্রমীলাদের ঘরের ঠিকানা বলে দিল। প্রমীল: এই অঞ্চলেই থাকতো। শেঠজী যেন আকাশে ওড়ার মত সেখান থেকে এগোতে লাগলেন।

কিছুদূর যেতেই সে ঠাকুরের এক মন্দির দেখতে পেল। মন্দিরে গিয়ে প্রতিমার চরণে মাথা নোয়ালেন, তখন তাঁর দেহে আস্থার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এই পনেরো বছরের কঠিন প্রায়শ্চিত্তে অনুতপ্ত আত্মার যদি কোন আশ্রয় হয়ে থাকে তবে তা হ'ল ভগবানের চরণ। সেই শুদ্ধ চরণেই তিনি শান্তি পেতেন। সমস্ত দিন আখের ঘানিতে জুড়ে থাকার পর বা নাঙল চষার পর যখন সে রাত্রিতে পৃথিবীর কোলে মাথা রাখতো তখন পূর্বের স্মৃতি একে একে তার মানসপটে ভেসে উঠতো। সেই বিলাসময় জীবন, যেন কান্নার মাঝে তার চোখের সামনে আসতো এবং ব্যথায় জর্জরিত অন্তঃকরণ থেকে এই ধ্বনি বেরিয়ে আসতো—হে ঈশ্বর! আমাকে দয়া করো। এই দয়া-প্রার্থনার মধ্যে তিনি খুব শান্তি পেতেন এবং স্থির হতেন। মনে হতো যেন কোন বালক মায়ের কোলে শুয়ে আছে।

যখন তাঁর কাছে সম্পত্তি ছিল, বিলাসের উপায় ছিল, যৌবন ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, অধিকার ছিল, তখন তাঁর আত্ম-চিন্তার অবকাশ ছিল না। মন প্রবৃত্তির দিকেই ধাওয়া করে; এখন এই স্মৃতিকে নিয়ে এই দীনাবস্থাতে তার মন ঈশ্বরের দিকে ঝুঁকেছিল। জলের উপর যতক্ষণ পর্য্যন্ত আবরণ থাকে ততক্ষণ সূর্য্যের আলো কি করে সেখানে পৌছাবে?

সে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেই একজন স্ত্রীলোক সেখানে প্রবেশ করলো। খুবচন্দের হৃদয় উৎলে উঠলো। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে এক থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। সেই-ই ছিল প্রমীলা।

দীর্ঘ পনেরো বছরে একদিনও এমন কাটেনি যেদিন প্রমীলার কথা তার মনে হয়নি। প্রমীলার ছায়া যেন তার চোখের পাতায় লেগেছিল। আজ সেই ছায়া এবং এই সত্যের মধ্যে কত পার্থক্য? ছায়ার উপর সময়ের কি প্রভাবই না পড়ে? তার উপর সুখ দুঃখের ছাপ পড়ে না। সত্য তো এত অভেদ্য নয়। সেই ছায়াতে সে সব সময় প্রমোদের রূপ দেখতো। এই সত্যের মধ্যেই তিনি সাধনার তেজস্বীতার রূপ দেখতেন এবং অনুরাগে ডুবে থাকা স্বরের মত তাঁর হৃদয় থর থর করে কেঁপে উঠতো। মনে এমন উদ্গার উঠতো যে সেই গায়ের উপর আছাড় খেয়ে বলতো—হে দেবী! এই পতিতকে উদ্ধার করো; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো এই চেষ্টা কখনও তোমায় উপেক্ষা করবে না। এই অবস্থায় তার সামনে যেতে শেঠজীর লজ্জা করছিল।

কিছুদূর যাওয়ার পর প্রমীলা গলির মধ্যে ঢুকলো। শেঠজীও তার পিছনে

পিছনে যেতে লাগলেন। একটু এগিয়ে একটা বাড়ীর মহল ছিল। শেঠজী প্রমীলাকে সেই বাড়ীতে ঢুকতে দেখলেন কিন্তু এটা দেখতে পেলেন না যে সে কোন দিকে গেল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন—কার কাছে জিজ্ঞাসা করবেন ?

হঠাৎ একজন কিশোরকে বের হতে দেখে তাকে ডাকলেন। যুবকটি তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাঁর পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। শেঠজীর প্রাণ ধক্ করে উড়ে গেল। এ তো গোপীনাথ ; কেবল বয়সে তার থেকে ছোট। সেই একই রূপ, একই গড়ন, যেন সে নতুন জন্ম নিয়ে আবার এসেছে। তাঁর সারা শরীরে এক বিচিত্র ভয়ে শিহরণ জেগে উঠলো।

কৃষ্ণচন্দ্র এক মুহূর্তের মধ্যে উঠেই বললো—আমরা তো আজ আপনার প্রতীক্ষা করছিলাম। স্টেশনে যাওয়ার জন্য গাড়ী ধরতে যাচ্ছিলাম। এখানে আসতে আপনার নিশ্চয়ই কষ্ট হয়েছে। আসুন! ভেতরে আসুন। আমি আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছি। অন্য কোথাও দেখলে চিনতে পারতাম।

খুবচন্দবাবু তার সাথে ভিতরে গেলেন। কিন্তু মনে যেন তাঁর অতীতের কাঁটা বিঁধছিল। গোপীনাথের মুখ কি তিনি কখনও ভুলতে পারেন? সেই চেহারাটাকে তিনি তো কতবার স্বপ্নের মধ্যে দেখেছেন। সেই ঘটনা তাঁর জীবনের সবচেয়ে চিরস্মরণীয়। এবং আজ এক যুগ পার হবার পরও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে আগের মত অটল রইলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র একের পর এক লোকের কাছে থেমে থেমে বললো—যাও, মাকে গিয়ে বলে এস, বাবা এসে গেছেন। আপনার জন্য নতুন নতুন কাপড় এনে রাখা হয়েছে।

খুবচন্দবাবু পুত্রের মুখে এমন চুম্বন দিলেন যেন সে শিশু এবং তাকে কোলের উপর তুলে নিলেন। সেজন্য সে লজ্জা পেয়েছিল। এটা মনোল্লাসের শক্তি ছিল।

সাত

ত্রিশ বছর ধরে ব্যাকুল পুত্র-লালসা, এই জীবনে পেয়ে, যেন তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে চাইছিল। জীবন নতুন নতুন অভিলাষকে নিয়ে তাদেরকে সম্মোহিত করছিল। এই রত্নের জন্য তিনি কত কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করে নিয়েছেন। সেই তত্ত্ব তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের মাথায় ভরে দিতে চাইছিলেন। তিনি একথা

ভুলে গিয়েছিলেন যে কৃষ্ণচন্দ্র চতুর নয়, যশস্বী নয়, বরং সে দয়াবান, নম্র এবং শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য।

ঈশ্বরের দয়াতে আজ তাঁর অসীম বিশ্বাস না হলে তাঁর মতন অধম ব্যক্তির কি এই যোগ্যতা ছিল যে তিনি এই কৃপার পাত্র হতে পারেন? আর প্রমীলা তো স্বয়ং দেবী।

কৃষ্ণচন্দ্র তো বাবাকে পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে গেছে। নিজের সেবার দ্বারা বাবার অতীত জীবনকে ভুলিয়ে রাখতে চাইছে। যেন পিতার সেবার জন্য তার জন্ম হয়েছে। যেন পূর্বজন্মের কোন ঋণ মেটাতে সে এই সংসারে এসেছে।

সাতদিন হয়ে গেল শেঠজী এসেছেন। সন্ধ্যার সময় শেঠজী সন্ধ্যাপূজা করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় গোপীনাথের মেয়ে বিন্নী এসে প্রমীলাকে বললো—মা, আমার মার শরীর খুব খারাপ। তাই মা আবার ভাইকে ডাকছে।

প্রমীলা বললো—আজ তো সে যেতে পারবে না। তার বাবা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে সে কথা বলছে।

কৃষ্ণচন্দ্র অন্য ঘর থেকে তার কথা শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে এসে বললো—না, মা। আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করে একটু পরে যাব।

প্রমীলা রেগে গিয়ে বললো—তুই কোথাও গেলে ঘর ফাঁকা লাগে। না জানি ওরা তোকে কি এমন জড়িবুটি শুঁকিয়ে দিয়েছে—

"আমি তাড়াতাড়ি চলে আসব মা, তোমার পায়ে পড়ি।"

"তুই বা কেমন ছেলে! তিনি একলা বসে আছেন আর তুই যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছিস।"

শেঠজীও একথা শুনলেন। এসে বললেন—অসুবিধার কি আছে, তাড়াতাড়ি যখন আসবে বলছে; ওকে যেতে দাও।

কৃষ্ণচন্দ্র প্রসন্ন চিত্ত হয়ে বিন্নীর সাথে চলে গেল। একটু পরে প্রমীলা বললো—যখন থেকে গোপীর ছবি দেখেছি তখন থেকেই আমার সব সময় ভয় করছে যে না জানি ভগবান কি আবার করেন। ব্যস এটাই আমি বুঝি।

শেঠজী গম্ভীর স্বরে বললেন—আমিও তো প্রথমে দেখে অবাক হয়ে গেছিলাম। মনে হয়েছিল—গোপীনাথই যেন দাঁড়িয়ে আছে।

"গোপীর স্ত্রী বলে—ওর স্বভাবও নাকি গোপীর মত।"

শেঠজী গূঢ় রহস্যের হাসি হেসে বললেন—ভগবানের লীলা, যাকে আমি হত্যা করেছি সেই আমার পুত্র হয়ে এসেছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে গোপীনাথই এখানে অবতার হয়ে জন্ম নিয়েছে।

প্রমীলা মাথায় হাত রেখে বললো—এই জন্যই কখনও কখনও আমারও বড্ড ভয় করে।

শেঠজী শ্রদ্ধা ভরা চোখে বললে—ঈশ্বর আমাদের সহায় আছেন। তিনি যা কিছু করেন প্রাণীদের কল্যাণের জন্য করেন। আমরা মনে করি আমাদের সঙ্গে ভগবান অন্যায় করছেন। কিন্তু এটা আমাদের মুর্খতা। বিধি অবোধ বালক নন যে তৈরী খেলনাটাকে ভেঙ্গে চুরে আনন্দ পাবেন। তিনিই অবলম্বন ছিলেন যিনি নির্বাসনকালে আমাকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। তিনি ছাড়া বলতে পারি না, আমার জীবন-তরী আজ কোথায় কোথায় ঘুরে মরতো এবং তার শেষ কোথায় ছিল।

আট

একটু এগিয়ে গিয়েই বিন্নী বললো—আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছি। —মা এখন বেশ ভাল আছেন। তুমি বেশ কয়েকদিন যাওনি, তাই তিনি আমাকে বলেছেন—এই ছলনা করে তুই তাকে ডেকে নিয়ে আয়। তোমার সাথে তিনি একটা পরামর্শ করবেন।”

কৃষ্ণচন্দ্র কৌতুহল ভরা চোখে দেখলো।

“আমার সাথে পরামর্শ করবেন। আমি কি পরামর্শ দেব? আমার বাবা এসেছেন, এজন্য যেতে পারিনি।”

“তোমার বাবা এসে গেছেন। তাহলে তো উনি নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করেছেন—এ মেয়েটি কে?”

“না কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নি।”

“মনে মনে তো বললেন, এ কেমন বেলজ্জ মেয়ে।”

“বাবা সে রকম লোকই নন। যদি তিনি জানতেন যে তুমি কে; তাহলে তিনি খুব ভাল করে কথা বলতেন। আমি তো আগে মাঝে মাঝে ভয় পেতাম যে তাঁর মেজাজ কেমন হবে। শুনেছিলাম, কারাবাসীরা খুব কঠোর হৃদয়ের হয়, কিন্তু বাবা তো সাক্ষাৎ দেবতা।”

দুজনে বেশ কিছুদূর চুপচাপ চললো। তখন কৃষ্ণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলো—তোমার মা আমার সাথে কি ব্যাপারে পরামর্শ করবেন?

বিন্নীর যেন ধ্যান ভেঙ্গে গেল।

"আমি কি জানি ; কি নিয়ে পরামর্শ করবেন ? আমি যদি জানতাম যে তোমার বাবা ফিরে এসেছেন, তাহলে আমি যেতাম না। মনে মনে তিনি ভাববেন—এত বড় মেয়ে একা একাই দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায়।"

কৃষ্ণচন্দ্র এমনি বললো—হ্যাঁ, তা তো বলবেনই। আমি গিয়ে আরও বাড়িয়ে বলবো।

বিন্নী রেগে গেল।

"কি, তুমি আরও বাড়িয়ে বলবে ? বলোতো আমি কোথায় কোথায় ঘুরি ? তোমাদের ঘর ছাড়া আমি আর কোথায় যাই ?

"আমার মুখে যা আসবে, বলে দেব, নাহলে আমাকে বলো, কি পরামর্শ করতে হবে।"

"আমি কখন বললুম যে তোমাকে বলব না, আগামীকাল আবার ধর্মঘট হবে। আমাদের ম্যানেজার এত নির্দয় যে কারো যদি পাঁচ মিনিট দেরী হয় তাহলে তার অর্ধেক দিনের পারিশ্রমিক কেটে নেবে এবং দশ মিনিট দেরী হয়ল সারা দিনের মজুরী কেটে দেয়। কয়েকবার সবাই গিয়ে তাঁকে বললো কিন্তু তিনি কিছুই মানলেন না। তুমি থাকলে খুব ভাল হয়। কেন না, তোমার ওপর মায়ের অগাধ বিশ্বাস ; কেবল মা নয়, সমস্ত শ্রমিকদেরই ভরসা। সবাই ঠিক করেছে যে তুমি ম্যানেজারেরর কাছে গিয়ে একটু কথা বলবে। হ্যাঁ, কিম্বা না—কিছু তো তিনি বলবেন। যদি নিজের মতে অটল থাকেন তাহলে আমরা আবার ধর্মঘট করবো।

কৃষ্ণচন্দ্র নিজের মনেই বিচার করছিল। মুখে কিছু বললো না।

বিন্নী আবার বেশ উগ্রভাবেই বললো—এত কড়া ব্যবস্থা যে কিজন্য তা ম্যানেজারই জানে, আমরা সবাই নিরুপায় এবং আমাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। সেইজন্য আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে প্রয়োজন বোধে আমরা না খেয়ে মরবো কিন্তু অন্যায় সহ্য করবো না।

কৃষ্ণচন্দ্র বললো—উপদ্রব হলে তো গুলিও চালাবে।

"তা চালাতে দাও! আমার বাবা মারা গেছেন তো আমরা বেঁচে নেই ?"

দুজনে ঘরে দেখলো দরজার সামনে বহু শ্রমিকরা জড়ো হয়েছে এবং এই সম্পর্কে আলোচনা করছে।

কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখতে পেয়েই সবাই চিৎকার করে বললো—নাও, দাদা এসে গেছেন।

সেই মিল ; যেখানে খুবচন্দবাবু গুলি চালিয়েছিলেন। আজ তাঁরই ছেলে শ্রমিকদের নেতা হয়ে গুলির সামনে দাঁড়িয়েছে।

কৃষ্ণচন্দ্র এবং ম্যানেজারের মধ্যে আলোচনা হ'ল। ম্যানেজার নিয়মকে শিথিল করতে স্বীকার করলেন না। ধর্মঘটের ঘোষণা করা হ'ল। আজ ধর্মঘট। শ্রমিকরা মিলের সামনে জমায়েত হয়েছে, ম্যানেজার—মিলকে রক্ষা করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে ডেকে এনেছেন। মিলের শ্রমিকরা উপদ্রপ করতে চায়নি। বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ধর্ম্মঘট করতে চেয়েছিল। কিন্তু সৈন্যবাহিনীকে দেখে তাদেরও জেদ চেপে গেলো। দু'দলই তৈরী। একদিকে গুলি, অন্যদিকে ইঁট পাটকেলের টুকরো।

যুবক কৃষ্ণচন্দ্র বললো—আপনারা সবাই তৈরী ? আমরা মিলের মধ্যে ঢুকবো যদি সবাই মরেও যাই। একসাথে সবাই আওয়াজ করে বললো—আমরা সবাই তৈরী। "যাদের বাচ্চা-কাচ্চা আছে, তাঁরা ঘরে ফিরে যান"। বিন্নী পিছনে দাঁড়িয়ে বললো—বাচ্চা-কাচ্চা সবাইকে ভগবান-ই রক্ষা করবেন।

কয়েরজন শ্রমিক ঘরে ফিরবার কথা ভাবছিলেন, এই কথায় তারাও দাঁড়িয়ে গেল। জয় জয়কার হ'ল এবং এক হাজার শ্রমিক মিলের গেটের দিকে এগিয়ে গেল। সেনাবাহিনী গুলি চালালো। সবার আগে কৃষ্ণচন্দ্র পড়ে গেল, তারপর আরও কয়েকজন পড়ে গেল। লোকেদের পা টলতে লাগলো।

ঠিক সেই সময় খুবচন্দ বাবু খালি মাথায়, খালি পায়ে সেখানে এসে পৌছালেন এবং কৃষ্ণচন্দ্রকে পড়ে যেতে দেখলেন। এই সব পরিস্থিতি তিনি ঘরে বসেই শুনেছিলেন, তিনি উন্মাদের মত বললেন—কৃষ্ণচন্দ্র কী জয়! এবং দৌড়ে গিয়ে আহত কৃষ্ণচন্দ্রের গলা জড়িয়ে ধরলেন। এই দেখে শ্রমিকরা এক অদ্ভুত সাহস এবং ধৈর্য্য পেলো।

"খুবচন্দ",—এই নাম যাদুর মত কাজ করলো। এই পনেরো বছরে 'খুবচন্দ' শহীদদের মধ্যে যে উঁচু আসন পেয়েছিলেন। তাঁর ছেলে আজ শ্রমিককেরই নেতা। ধন্য, ঈশ্বরের লীলা, শেঠজী ছেলের মৃতদেহ মাটিতে শুইয়ে দিয়ে অবিচলিত ভাবে বললেন—ভাই-য়েরা, এই ছেলেটি আমার পুত্র। আমি পনেরো বছর জেল খেটে ফিরেছি, ভগবানের কৃপায় আমি এর দর্শন পেয়েছি। আজ অষ্টম দিন। আজ ভগবান তাকে আবার তাঁর চরণে আশ্রয় দিয়েছেন, সেও তাঁর কৃপা ছিল, এও তাঁর কৃপা। আমি যে মূর্খ, অজ্ঞান তখনও ছিলাম, আজও আছি, এই বলে আমি গর্ব অনুভব করি যে ভগবান আমাকে

এরকম একটি বীর বালক দিয়েছিলেন। এখন আপনারা আমাকে অভিনন্দন জানান। কি করে এরকম বীর গতি পাওয়া যায়। অন্যায়ের সামনে যে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়, সে-ই তো সত্যিকারের বীর! সেজন্য বলুন কৃষ্ণচন্দ্রের জয়।

এক হাজার গলা থেকে জয়-ধ্বনি বার হ'ল এবং তার সাথে সবাই হল্লা করেই অফিসের মধ্যে ঢুকে পড়লো। সেনা দলের জোয়ানরা তারপর কোন গুলিও চালালো না। এই অপূর্ব ঘটনা তাদের সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

ম্যানেজার পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখলেন, সবার আগে খুবচন্দবাবু।

লজ্জিত হয়ে বললেন—আমার খুব দুঃখ হচ্ছে যে দৈবযোগে আজ এই দুর্ঘটনা হয়ে গেল; কিন্তু আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন, আমি কি করতে পারি।

শেঠজী শান্ত স্বরে বললো—ভগবান যা কিছু করেন আমাদের কল্যাণের জন্যই করেন। যদি এই বলিদানের জন্য শ্রমিকদের কিছু উপকার হয় তো আমার একটুও আক্ষেপ থাকবে না।

ম্যানেজার বললেন—এই ধরাতে তো মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারে না। জ্ঞানীরও মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

শেঠজী এই প্রসঙ্গকে শেষ করবার জন্য বললেন—তাহলে এখন কি ঠিক করলেন?

ম্যানেজার সংকোচিত হয়ে বললেন—এই ব্যাপারে আমি স্বাধীন নই, প্রভুদের যা আদেশ ছিল আমি পালন করেছি মাত্র।

শেঠজী কঠোর স্বরে বললেন—যদি আপনি বোঝেন যে শ্রমিকদের সাথে অন্যায় করা হচ্ছে তাহলে আপনার ধর্ম হওয়া উচিৎ তাদের পক্ষে যোগ দেওয়া। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া, অন্যায় করারই সমান।

এদিকে কিছু শ্রমিক কৃষ্ণচন্দ্রের দাহ-সংস্কার করবার জন্য আয়োজন করছিলো, অন্যদিকে মিলের ডাইরেক্টর এবং ম্যানেজার শেঠ খুবচন্দবাবুর সাথে বসে এমন কোন ব্যবস্থা চিন্তা করছিলেন যাতে শ্রমিকদের প্রতি অন্যায়-অবিচার শেষ হয়।

দশটার সময় শেঠজী বাইরে বেরিয়ে শ্রমিকদেরকে খবর দিতে গিয়ে বললেন—বন্ধুগণ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, তাঁরা তোমাদের দাবী মেনে নিয়েছেন। তোমাদের উপস্থিতির জন্য এখন থেকে এক নতুন নিয়ম চালু করা হবে এবং বর্তমান জরিমানা প্রথাও উঠে যাবে।

শ্রমিকরা সবাই শুনলো ; কিন্তু তাদের আনন্দ হল না, যদি একঘণ্টা আগে হ'ত ! তাহলে কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রাণ দিয়ে এত বড় মূল্য দিতে হতো না।

শবদেহ চিতায় ওঠানোর আগেই প্রমীলা লাল চোখে পাগলের মত দৌড়ে এসে তার দেহের সাথে একবারে চিপটে গেল, যাকে সে নিজের গর্ভে জন্ম দিয়েছিল এবং যাকে সে নিজের রক্ত দিয়ে এতদিন ধরে মানুষ করে তুলেছিল, চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেছে। এমন কোন শ্রমিক বা মালিক ছিল না যে এই দৃশ্য দেখে চোখের জলকে ধরে রাখতে পেরেছিল।

প্রমীলা একই ভাবে শবকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল, যে নিধিকে পেয়ে সমস্ত বিপত্তিকে সে সম্পত্তি বলে ভেবেছিল, পতি বিয়োগের অন্ধকারময় জীবনে যে প্রদীপ থেকে আশা, ধৈর্য্য এবং অবলম্বন পেয়েছিল সেই প্রদীপ আজ নিভে গেল। যে বিভূতিকে পেয়ে ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা এবং ভক্তি তার প্রতিটি লোমে ব্যপ্ত হয়েছিল, সেই বিভূতি আজ তার কাছ থেকে কে যেন ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

হঠাৎ সে স্বামীর দিকে অস্থির চোখ তুলে বললে—তুমি বুঝতে পারছো, ঈশ্বর যা কিছু করেছেন, আমাদের কল্যাণের জন্যই করেছেন। আমি আর তা বুঝতে চাই না। বুঝতে পারিও না। কি করে বুঝবো ? হায় আমার সোনা ! আমার প্রিয় পুত্র ! আমার রাজা, আমার সূর্য, আমার চন্দ্র, আমার জীবনের অবলম্বন !·আমার সর্বস্ব ! তোকে খুইয়ে কি করে মনকে শান্ত রাখবো ? যাকে কোলে নিয়ে নিজের ভাগ্যকে ধন্য মনে করেছি, তাকে আজ মাটিতে পড়তে দেখে কি করে নিজেকে সামলাবো ! মানি না, হায়, মানি না ! !

এই কথা বলতে বলতে সে খুব জোরে জোরে বুক চাপড়াতে লাগলো। সেই রাত্রেই শোকাতুর মা সংসার থেকে চলে গেলেন। পাখি তার নিজের বাচ্চার খোঁজে খাঁচা থেকে বেরিয়ে গেলো।

দশ

তিন বছর কেটে গেছে।

শ্রমজীবিদের পল্লীতে আজ কৃষ্ণাষ্টমী উৎসব পালিত হচ্ছে। তারা সবাই মিলে চাঁদা তুলে একটা মন্দির তৈরী করেছিল। মন্দিরটি দেখতে খুব সুন্দর, তবে আকারে বড় নয়, কিন্তু যে ভক্তি ভরে এখানে সবাই মাথা নোওয়ায় সে রকম অনেক বড় মন্দিরে গিয়েও লোকে তা করতে পারে না। এখানে

লোকেরা নিজের সম্পত্তি দেখাতে আসে না বরং নিজের শ্রদ্ধার উপহার দিতে আসে।

মহিলা শ্রমিকেরা গান গাইছে, বালকেরা দৌড়ে দৌড়ে ছোট ছোট কাজ করছে আর পুরুষেরা অপূর্ণ দর্শনকে পূর্ণ করতে ব্যস্ত হয়ে আছেন।

সে সময় শেঠ খুবচন্দজী এলেন। মহিলারা এবং ছেলেরা তাঁকে দেখেই চারদিক থেকে দৌড়ে এসে জমায়েত হলো। এই মন্দির তাঁরই প্রচেষ্টাতে তৈরী হয়েছে, শ্রমিক পরিবারদেরকে সেবা করাই এখন ত'ার জীবনের উদ্দেশ্য। ত'ার ছোট পরিবার এখন অনেক বড়ো আকার ধারণ করেছে। ত'াদের দুখেই তিনি দুঃখী, আবার তাদের সুখেই তিনি সুখী। শ্রমিকদের মধ্যে মদ্য-পান, জুয়াখেলা এবং দুশ্চরিত্রের সেই কু-অভ্যেস আর এখন নেই। শেঠজীর প্রচেষ্টায়, সৎসঙ্গে এবং সদ্‌ব্যবহারে পশুকে মানুষ করে তুলছে।

শেঠজী বালক-রূপী ভগবানের সামনে নিয়ে মাথা নোয়ালেন এবং তাঁর মন এক অলৌকিক আনন্দে ভরে গেল। সেই আলোতে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন পেলেন। এক মুহূর্তেই তিনি যেন গোপীনাথের রূপ ধারণ করলেন। ডান দিক থেকে দেখলেন কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ আর আর বাঁ দিক থেকে দেখলেন গোপীনাথকে।

শেঠজীর প্রতিটি লোম পুলকিত হয়ে উঠলো। ভগবানের অসীম দয়ার রূপ আজ তিনি জীবনে প্রথম উপলব্ধি করলেন। এতদিন পর্য্যন্ত ভগবানের দয়াকে তিনি সিদ্ধান্ত রূপে মানতেন, আজ তিনি তাঁর প্রত্যক্ষরূপ দেখলেন, এক পথ-ভ্রষ্টা, পতনোন্মুখী আত্মাকে উদ্ধার করার জন্য এত দৈব বিধান। এত অনবরত ঈশ্বরীয় প্রেরণা। শেঠজীর মানসপটের উপর নিজের সম্পূর্ণ জীবন সিনেমার ছবির মতো দেখতে পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, আজ বিশ বছর ধরে ঈশ্বরের কৃপা তাঁর উপর ছায়ার মত কাজ করছে। গোপীনাথের বলিদানে কি ছিল? বিদ্রোহী শ্রমিকরা যখন তাঁর বাড়ী ঘিরে ফেলেছিল, সে সময় তাঁর আত্মসমর্পণ ঈশ্বরের দয়া ছাড়া আর কি হতে পারে। পনেরো বছরের নির্বাসিত জীবনে কৃষ্ণচন্দ্ররূপে কে তাঁর আত্মাকে রক্ষা করলো?

শেঠজীর অন্তঃকরণ থেকে ভক্তি-বিহ্বলতা ভরা জয়ধ্বনি বেরিয়ে এল—কৃষ্ণ ভগবানের জয়। এবং যেন সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড দয়ার আলোতে জ্বল জ্বল করে উঠলো।

ভাষান্তর : গায়ত্রী চক্রবর্তী

রাজা হরদৌল

ওরছা বুন্দেল খণ্ডের একটি পুরোনো রাজ্য। এখানের রাজা বুন্দেল সম্প্রদায়ভুক্ত। বুন্দেলরা পাহাড়ি জাতি। সাহসী ও বুদ্ধিমান হিসেবে খ্যাত। মহারাজ জুঝার সিং এক সময় এখানে রাজত্ব করতেন। তখন দিল্লীর বাদশা ছিলেন শাজাহান। শাজাহান একবার যখন ওরছা দখলের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন তখন জুঝার সিং বীরত্বের সঙ্গে তার মোকাবিলা করেছিলেন। গুণগ্রাহী বাদশার ভাল লেগেছিল জুঝার সিং-এর সাহসিকতা। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। ওরছার জীবনে সেটা বড় আনন্দের দিন। বাদশার দূত এল আমন্ত্রণ নিয়ে। জুঝার সিং ভ্রমণের আয়োজন করলেন। যাবার আগে ছোট ভাই হরদৌলকে ডেকে বললেন।"—ভাই, আমি তো যাচ্ছি। এখন এই রাজ্য তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। তুমি আমার এই রাজ্য, আমার প্রিয় প্রজাদের দেখো। ন্যায়ই রাজার প্রধান অবলম্বন। ন্যায়ের রাজ্যে শত্রু প্রবেশ করতে পারে না, তা সে রাবণের সৈন্যবাহিনী বা ইন্দ্রের শক্তি নিয়ে আসুক না কেন। কিন্তু ন্যায় তখনই সফল হবে যখন প্রজারাও তাকে ন্যায় বলে মনে করবে। কেবল ন্যায়কে রক্ষা করাই নয়, প্রজাদের হৃদয়ে সেই ন্যায় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করানোও হবে তোমার কাজ। তোমাকে আর কি বোঝাবো, তুমি নিজেই যথেষ্ট সমঝদার।'

এই বলে তিনি তাঁর পাগড়ী খানা পরিয়ে দিলেন হরদৌল সিং এর মাথায়। হরদৌল অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন। মহারাজ এর-পর মহারাণীর নিকট বিদায় নিতে গেলেন। মহারাণী চৌকাঠে দাঁড়িয়েছিলেন। রাজাকে দেখতে পেয়ে তাঁর পায়ে পড়ে গেলেন। মহারাজ তাঁকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন।" প্রিয়ে, এটা কাঁদবার সময় নয়। বুন্দেলী স্ত্রীদের এসময় কাঁদতে নেই। ভগবান চাইলে খুব শীঘ্রই আমাদের মিলন হবে। তখনও যেন আমার প্রতি এমনই ভালবাসা থাকে। আমি হরদৌলের হাতে রাজ্যভার দিয়ে গেলাম। সে এখনও বালক। দুনিয়াটা ভাল করে দেখেই নি। তুমি প্রয়োজনে তাকে পরামর্শ দিও।

মহারাণীর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেছে। তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন।" বুন্দেলী স্ত্রীদের এই দুঃসময়েও যদি চোখের জল ফেলতে—না থাকে, তবে তাদের হৃদয় বলেই কিছু নেই, নয়তো প্রেম বলেই কিছু নেই।' বুকের ওপর পাথর চাপিয়ে রাণী অশ্রু সংবরণ করলেন। রাজার দিকে হাসি মুখে তাকালেন। এক বিশাল অন্ধকার ময়দানে একটু করে মশালের আলোর মত সে হাসিটুকু নিজের বিচার বোধের কাছে এক বিরাট ঠাট্টা—দুঃখকে আরো গভীরতর করে তুলল।

মহারাজ জুঝার সিং—চলে যাবার পর হরদৌল রাজকার্য শুরু করলেন। কিছু দিনের মধ্যেই তার ন্যায়নীতি, প্রজাবাৎসল্য প্রজাদের হৃদয় হরণ করে নিল। লোকে জুঝার সিং কে প্রায় ভুলেই গেল। জুঝার সিং এর শত্রু মিত্র দুই ছিল। কিন্তু হরদৌলের কোন শত্রু নেই। তাঁর হাসি মুখ, মধুর ভাষণ সকলকেই তাঁর ভক্ত করে তুলেছিল, তাঁর দরবার সকলের জন্য দিন রাত খোলা থাকত। ওরছার জীবনে এমন সর্বজন প্রিয় রাজা আর কখনো আসে নি। তিনি উদার, ন্যায় পরায়ণ, বিদ্যা ও গুণের গ্রাহক ছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তার বীরত্ব। এটাই জাতির জীবনের প্রধান অস্ত্র।

এই ভাবে এক বছর কেটে গেল। ওদিকে জুঝার সিং দাক্ষিণাত্যে বাদশাহী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় সফল, এদিকে ওরছার জনগণের ওপর রাজা হরদৌলের তুলনাহীন প্রভাব।

ফাল্গুণ মাস। আবার আর গুলালে জমি লাল। ক্ষেত ভরা ফসল। সোনার ফসলে বাতাস ঢেউ খেলে যাচ্ছে, সে ঢেউ এর রাঙন প্রভাব পড়েছে সোনার রাজপ্রাসাদেও। এই রকমই এক সময় দিল্লীর নাম করা পালোয়ান কাদির খাঁ হাজির হলেন ওরছায়। বড় বড় পালোয়ান সব তার দাসত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। দিল্লী থেকে ওরছার পথে শত শত বীর জওয়ান তাঁর মোকাবিলায় নেমেছে। কিন্তু কাদির খাঁর সঙ্গে লড়াই তো ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই নয়। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই। ঠিক দোলের দিন সকালে খুব ধুম-ধামের সঙ্গে তিনি প্রবেশ করলেন ওরছায়। পৌছেই—ঘোষণা করলেন। "দিল্লী থেকে খোদার সন্তান কাদির খাঁ এসে পৌছলো ওরছায়। নিজের জীবনটা যে তুচ্ছ জ্ঞান করে সে এসে একবার নিজেকে পরখ করে নিক।" এই অহঙ্কারী ঘোষণা শুনে বীর বুন্দেলীদের রক্ত হয়ে উঠল গরম। আবীর

গুলালের সুরভির বদলে শোনা গেল তরবারি আর ঢালের ঝনঝনানি। হরদৌলের আখড়াটি ছিল ওরছার বীরপুরুষদের আড্ডাখানা। সন্ধ্যায় সেখানে জমায়েত হল সকলে। কালদেব ও ভালদেব—ওরছার দুই বীর ভাই, ওরছার আশা-ভরসা। ওরছার সম্মান রক্ষার্থে শপথ নিলেন। কাদির খাঁর অহঙ্কার দূর করতেই হবে।

পরের দিন কেল্লার সামনে দীঘির পাড়ে ওরছার ভীড় যেন ভেঙ্গে পড়ল। কত শত জওয়ান বীর, কত তাদের সাজ, মাথায় পাগড়ি। কপালে চন্দনের ফোঁটা, কোমরে তলোয়ার। কত বৃদ্ধ—যারা একদিন পালোয়ান ছিলেন, আজও যেন তেমনিই দৃঢ় সংঘবদ্ধ, বাঁকানো চওড়া গোঁফ, কাজের সময় কেউ বুঝতেই পারবে না যে এদের এত বয়স হয়েছে। তাঁদের চলাফেরা যেন জওয়ানদের ও লজ্জা দেয়। প্রত্যেকের কণ্ঠে তখন বীরত্বের সুর।

বীর যুবাপুরুষ বলছে, দেখি আজ ওরছার লজ্জা রক্ষা করা যায় কিনা।' কিন্তু বৃদ্ধের কণ্ঠে আরো দৃঢ়তার ছাপ—"ওরছা কখনো হারে নি। হারবেও না।

বীরত্বের এই প্রতিধ্বনি দেখে রাজা হরদৌল আরো উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"খবর্দার, বুন্দেলের লজ্জা শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাক বা না পাক্, তার প্রতিষ্ঠায় যেন ঘাটতি না থাকে। বিদেশী কেউ যেন এ কথা বলার সুযোগ না পায় যে, ওরছার লোক তলোয়ার দেখে ভয়ে পিছিয়ে গেছে। যদি কারো ক্ষেত্রে এরকম ঘটে তবে সে যেন এখনই নিজেকে ওরছার শত্রু বলে মনে করে।"

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে কালদেব আর কাদির খাঁর মর্যাদার লড়াই শুরু হল। দর্শকদের কারো মুখ থেকে এতটুকু কথা সরছে না। তলোয়ারের রেশমী ছটা যেন মেঘচেরা বহ্নিশিখা। পুরো তিন ঘণ্টা যেন আগুনের ঝলক। হাজার হাজার দর্শকের মাঝে মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা। যখন কালদেব তলোয়ারে মারাত্মক কোন প্যাঁচে কাদির খাঁ কে নাজেহাল করে দিচ্ছেন তখন দর্শকদের পক্ষে নিশ্চুপ থাকা কঠিন তবু তারা নির্বাক স্তব্ধ। জাতির প্রতিষ্ঠা যখন দোদুল্যমান—সেই মর্যাদার রণক্ষেত্রে দর্শকেরা কি স্তব্ধ হয়ে থাকতে পারে। হঠাৎ কাদির খাঁ চিৎকার করে উঠলেন—'আল্লাহ আকবর' —যেন মেঘ উঠল গর্জে—আর তৎক্ষণাৎ কালদেবের মাথার ওপর বজ্রাঘাত, লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

কালদেবের পতনে বুন্দেলীরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পড়ল

সবাই। হাজার হাজার দর্শক আখড়ার দিকে ধেয়ে এল। এই ক্রোধের কি পরিণতি হবে বুঝতে পেরে হরদৌল চিৎকার করে আদেশ দিলেন—'খবরদার, কেউ এক পাও এগোবে না।' তাঁর বজ্র কঠিন কণ্ঠস্বর যেন ধেয়ে আসা উন্মত্ত প্রজাদের পায়ে শিকল পরিয়ে দিল। কালদেবের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। তার জীবনের মত তলোয়ারটাও দু টুকরো হয়ে গেছে।

দিন গেল। রাত এল। কিন্তু বুন্দেলীদের চোখে ঘুম কোথায়? দুঃখের রাত যেমন মন্থর, তেমনি বুন্দেলীদের সেই রাতটাও বুঝি কাটতে চাইছে না। বার বার আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রহর গুণে চলেছে। তাদের জাতির গর্বে যে প্রচণ্ড এক আঘাত এসে পড়েছে। পরের দিন ভোর হতেই তিনলাখ প্রজা সেই কেল্লার কাছে দীঘির পাড়ে জমায়েত হল। এমন সময় বোঝা গেল সিংহের মত দৃঢ় পদক্ষেপে ভালদেব এগিয়ে চলেছেন আখড়ার দিকে আর উত্তেজনায় সারা বুন্দেলবাসীর হৃদস্পন্দন গেল বেড়ে। কাল যখন কালদেব এই আখড়াতে পা রেখেছিলেন তখন সকলে জয়ধ্বনি দিয়েছিল। আজ কিন্তু অবস্থাটা অন্যরকম। কাদির খাঁ কোন নতুন প্যাচ লাগাতেই সকলে শিউরে উঠতে লাগল। ভালদেব যে তার দাদার চেয়ে বেশি শক্তিশালী তাতে সন্দেহ ছিল না। তিনি বেশ কয়েকবার কাদির খাঁকে প্রায় কাৎ করে ফেলেছিলেন কিন্তু দিল্লীর এই বিখ্যাত পালোয়ান তা সামলে নিলেন। পুরো তিন ঘণ্টা ধরে লড়াই চলল। হঠাৎ কাদির খাঁর এক সুনিপুণ প্যাচে ভালদেবের তলোয়ার দুটুকরো হয়ে গেল। রাজা হরদৌল কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি চটপট নিজের তলোয়ারখানা ছুঁড়ে দিলেন ভালদেবের দিকে। ভালদেব সেই তলোয়ার খানা নেবার জন্য মাথা নীচু করেছেন অমনি মুহূর্তের মধ্যে কাদির খাঁর তলোয়ার তাঁর মাথার ওপর এসে পড়ল। আঘাত জোরে ছিল না কিন্তু ভালদেব মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। লড়াই এর ফয়সালা হয়ে গেল।

হতাশ বুন্দেলবাসী যে যার ঘরে ফিরে গেল। ভালদেব তখনো লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু রাজা হরদৌল তাকে বোঝালেন যে লড়াই-এর হারজিত তখনই হয়ে গেছে যখন তলোয়ার দু'টুকরো হয়ে গেল। আমি যদি আজ কাদির খাঁর জায়গায় থাকতাম তবে অস্ত্রহীনের ওপর হাত তুলতাম না। কিন্তু কাদির খাঁর মধ্যে সেই মহানতা কোথায়? বিপুল বলশালীর বিপক্ষে লড়াই করার সময় উদারতার কথা ভুলে যেতে হয়। তবু আমরা দেখিয়ে দিয়েছি—যে তলোয়ারের লড়াইতে আমরা এখনো অজেয়। তলোয়ার

হাত থেকে ছিটকে যাবার পরই কাদির খাঁ বিজয়ী হয়েছে। এখন আমাদের প্রমাণ করতে হবে আমাদের তলোয়ার এখনো পরাজিত হয়নি।' এই বলে রাজা হরদৌল রাজ প্রাসাদে ফিরে গেলেন। মহারানীর মহলে যেতেই মহারাণী তাঁকে প্রশ্ন করলেন—আজ কি হল ?

রাজা হরদৌল মাথা নীচু করে বললেন আজ কালকের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

রাণী—'ভালদেব মারা গেছেন ?'

হরদৌল—না, প্রাণে মারা যান নি, কিন্তু হেরে গেছেন !'

রাণী—তবে এখন কি হবে ?

হরদৌল—আমিও তাই ভাবছি। আজ পর্যন্ত ওরছার এ দুর্দশা হয় নি। আমাদের কাছে প্রচুর ধন সম্পদ ছিল না। কিন্তু বীরত্বের প্রাচুর্য ছিল। এখন আমি কি মুখে সেই বীরত্বের অহংকার করব ? ওরছায় বুন্দেলীদের লজ্জা রাখার আর জায়গা রইল না।'

রাণী—আর কোন আশাই কি নেই ?

হরদৌল—আমাদের পালোয়ানদের মধ্যে এমন আর কেউ নেই যে বাজী জিততে পারবে। বুন্দেলবাসীর সমস্ত আশা শেষ হয়ে গেছে। ভালদেবের পরাজয়ের সাথে। আজও সমস্ত নগরীতে যেন শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কত বাড়িতে রান্নার উনুন জ্বালানো হয়নি। প্রদীপ জ্বলেনি। দেশ ও জাতির শেষ রক্ষাকবচ যেন হারিয়ে গেছে। ভালদেব আমাদের বীরশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। সে কাজের ভার আমার নেওয়া ধৃষ্টতারই সামিল। তবু আজ সমস্ত বুন্দেলবাসীর আশীর্বাদ নিয়ে আমাকে আমার প্রাণ পণ করে নামতেই হবে। কাদির খাঁ অবশ্যই একজন বীর কিন্তু আমাদের ভালদেব তাঁর কোন অংশে কম নন্। সারা ওরছায় একটিই মাত্র তলোয়ার এখনো আছে যে তলোয়ার কাদির খাঁর মুখের ওপর সমুচিত জবাব দেবার ক্ষমতা রাখে—সেটা আমার দাদার তলোয়ার। তুমি যদি ওরছার মান সম্মান রাখতে চাও তবে সেই তলোয়ার আমার হাতে তুলে দাও বৌদি। এই হবে ওরছার তরফে শেষ প্রচেষ্টা। অন্যথা ওরছার নাম ইতিহাসের পাতা থেকে চিরকালের মত মুছে যাবে।

রাণী দ্বিধায় পড়লেন—তলোয়ার দেবে কি দেবে না। মহারাজার নিষেধ ছিল অন্য কারো ছায়া পর্যন্ত যেন তাঁর এই প্রিয় তলোয়ারের ওপর না পড়ে। তবু দেশের এই চরম দুর্দিনে, এই মান সম্মানের শেষ প্রশ্নে যদি তলোয়ার সে মর্যাদা রক্ষা করতে না পারে. তবে তার কিসের মূল্য। মহারাজ যদি এই ঘটনার কথা উপলব্ধি করেন তবে নিশ্চয় তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না! তাঁর চেয়ে বুন্দেলবাসীদের আর কে এমন ভাবে ভালো বেসেছেন। রাণী রাজাহরদৌলের হাতে তুলেদিলেন তলোয়ার খানা।

ভোর হতেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল খবর—রাজা হরদৌল নিজেই নামছেন রণাঙ্গনে। হাজার হাজার প্রজা ছুটে এল পাগলের মত হয়ে। রাজার পরিবর্তে তারা প্রত্যেকে লড়াই এর জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আখড়ার সামনে পৌছে তারা শুধু বিজলীর চমকই দেখতে পেল। রাজা হরদৌল প্রস্তুত। হাজার হাজার বুন্দেলবাসী উদ্বিগ্ন হৃদয়, নিস্তব্ধ। প্রত্যেকটি দৃষ্টি আখড়ায় সুনিবদ্ধ। মনে ঈশ্বরের নিকট মঙ্গল কামনা। কাদির খাঁ এক একবার হাজার হাজার হৃদয় যেন টুকরো টুকরো করে দিচ্ছিলেন। আবার পরক্ষণেই হরদৌলের এক একটি প্যাঁচ আনন্দের জোয়ার এনে দিচ্ছিল। আখড়ার ভেতরে যেমন দু' পালোয়ানের লড়াই, তেমনি আখডার বাইরে লড়াই আশা আর নিরাশার, এমন সময় মহাকালের ইচ্ছাপূর্ণ হল। হরদৌলের তলোয়ার এসে পড়ল কাদির খাঁর মাথায়। আনন্দে উল্লাসে বুন্দেলবাসী উন্মত্ত হয়ে উঠল। হাজার হাজার মানুষ যেন পাগল হয়ে গেল আনন্দে। রাজা হরদৌল তলোয়ার খাপে পুরে বাইরে এলেন। এত উল্লাস, এত আনন্দ, এত পাগলামী কিসের? বুন্দেল বাসীর নিকট জয় কি এই প্রথম? লোকে শান্ত হল। হরদৌলের বীরত্ব তাদের হৃদয়ে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করল। এতদিন তিনি সর্বপ্রিয় রাজা ছিলেন। এবার তিনি শূর শ্রেষ্ঠ হলেন।

তিন

এদিকে মহারাজ জুঝার সিং দাক্ষিণাত্যে বাদশাহের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে। বাদশার অনুমতি নিয়ে দেশে ফিরে চললেন। ওরছার জন্য তাঁর বড়ই মন কেমন করছিল। ওরছা! আমার প্রিয় ওরছা, কবে আবার দেখতে পাব তোমায়। ওরছার প্রান্তে জঙ্গলে এসে পৌছলেন তিনি। তাঁর সঙ্গি লোকটি পিছিয়ে পড়েছে। দুপুর বেলা। বিশ্রামের জন্য রাজা ঘোড়া থেকে নেমে একটু দূরে গাছতলায় গিয়ে বসলেন। রাজা হরদৌল জয়লাভের

পর শিকার করতে বেরিয়েছেন। কার্য্যবশতঃ তিনিও ঐ সময় ঐ খানে এসে পৌঁছলেন। তাঁর সঙ্গে প্রচুর লোকজন, জয়ের আনন্দে সকলে দিশে হারা। কেউই গাছের ছায়ায় বসে থাকা মহারাজ কে চিনতে পারলো না। রাজাও গাছের ছায়ায় বসে থাকা মহারাজকে দূর থেকে দেখে ভাবলেন কোন যাত্রী হবে। তিনি ঘোড়া ছুটিয়েই তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করতে চাইলেন—কে তুমি? আর তখনই দাদাকে চিনতে পেরে লাফিয়ে নেমে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। মহারাজও ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু সে আলিঙ্গনে আর প্রেম নেই। রয়েছে ভয়ঙ্কর ঈর্ষা আর ক্ষোভ। কেন হরদৌল দূর হতে তাকে দেখে খালি পায়ে দৌড়ে এল না। সন্ধ্যা নাগাদ দু ভাই ফিরে এলেন রাজধানীতে। মহারাজের প্রত্যাবর্তনের খবরে রাজ্যে দুন্দুভি বেজে উঠল। আনন্দবাসর বসল ঘরে ঘরে।

আজ মহারাণী নিজের হাতে রান্না করেছেন, রাত ন'টা বেজে গেল। দাসী এসে খবর দিল মহারাজ—খাবার-তৈরী। দু ভাই খেতে এলেন, রাণী নিজের হাতে রান্না করেছেন। নিজের হাতে থালা সাজিয়েছেন, সোনার থালায় মহারাজের জন্য, আর রূপোর থালায় হরদৌলের জন্য। কিন্তু পরিবেশনের সময় তাঁর কি হয়ে গেল—রূপোর থালা রাখলেন মহারাজের সামনে, আর সোনার থালা হরদৌলের সামনে। হরদৌল এসব খেয়াল করলেন না। বছরের পর বছর সোনার থালায় খেয়ে তিনি অভ্যস্ত, কিন্তু ঘটনাটা জুঝার সিং এর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে লাগল। মুখে কিছু বললেন না। মুখ লাল হয়ে গেল। মহারাণীর দিকে একবার তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে খাওয়া শুরু করলেন। খাচ্ছেন না যেন মনে হচ্ছে বিষ মুখে তুলছেন। দু চার গ্রাস খাবার পর উঠে গেলেন। মহারাণী তাঁর তীব্র দৃষ্টি দেখে কেঁপে উঠলেন অজানা আশঙ্কায়। এতকাল পর এত যত্ন করে রান্না করলেন তিনি, কত প্রতিক্ষার পর এই শুভদিন আজ আগত কিন্তু মহারাজার চোখে মুখে এমন বিষাদের ছাপ কেন? মহারাজ উঠে যাবার পর থালার দিকে তাকিয়ে—তিনি শিউরে উঠলেন। নিজের মাথা চাপড়ে উঠলেন। হায় ভগবান, এ আমি কি করলাম।

মহারাজ জুঝার সিং তখন শীশমহলে। চোখে ঘুম নেই। রাণীকে অপরূপ শৃঙ্গারে ভূষিতা করে দাসী মৃদু হেসে চলে গেল। কিন্তু মহারাণীর পা যেন সরছে না। কি মুখ নিয়ে তিনি মহারাজের কাছে যাবেন? আমার-এ

শৃঙ্গার দেখে কি তিনি খুশি হবেন ? আমার অপরাধ হয়েছে, আমি অপরাধিনী। এই শৃঙ্গার আমার উপযুক্ত নয়। আমি আজ শৃঙ্গার ভূষিতা হবার যোগ্য নই। আজ আমার ভিখারিনীর বেশে যাওয়া উচিত মহারাজের কাছে। এই ভাবতে ভাবতে মহারাণী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন আয়নার কাছে। কত কত সুন্দর ছবি তিনি দেখেছেন, কিন্তু আজকের আয়নার এই প্রতিছবির কাছে সে সব নগন্য।

আত্মরুচি আর সৌন্দর্য পরস্পরের পরিপূরক, যেমন হলুদ আর রঙের সম্বন্ধ। কিছুক্ষণ বাদে মহারাণী নিজের সৌন্দর্যের মাদকতায় যেন মত্ত হয়ে উঠলেন। লোকে বলে সৌন্দর্যের মধ্যে এমন জাদু আছে যার কোন তুলনা চলে না। ধর্ম, কর্ম, দেহ, মন সে সব পরিত্যাগ করা যায় সৌন্দর্যসাগরে অবগাহনের মনোবাসনায়। আমার সৌন্দর্যে কি এমন শক্তি নেই যা দিয়ে মহারাজার কাছে সব অপরাধের ক্ষমা পাওয়া যায় ? এই বাহুলতা, এই কণ্ঠহার, এই সুরভি, এই আঁখি এসব কি ক্রোধাগ্নির উত্তাপ কমাতে পারবে না ? কিছুক্ষণ বাদে মহারাণীর আবার মোহভঙ্গ হল। আমি কি স্বপ্ন দেখছি। আমার মনে অহঙ্কার আসে কোন পথে ? আমি সুন্দরী হই বা না হই আমি তার সহচরী দাসী। আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এই শৃঙ্গারের প্রয়োজন নেই। মহারাণী গয়না খুলে ফেললেন। রেশমী শাড়ি খুলে সাধারণ শাড়ি পরলেন। ভিখারিনীর বেশে চললেন মহারাজের নিকট। পা যত এগিয়ে চলে মন তত পিছোতে চায়। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন। মহারাজ বুঝতে পারেন, প্রশ্ন করেন "কে ? রাণী ? ভেতরে আসছো না কেন ?"

মহারাণী ভিতরে প্রবেশ করে বললেন, মহারাজ কি মুখ নিয়ে আসব। আমি যে নিজের আসনে ক্রোধকে বসিয়ে রেখেছি।'

মহারাজ—এ কথা বলতে পারছো না কেন যে মনই তোমার দোষী। তাইতো চোখে চোখ রাখতে ভয় পাচ্ছো।'

মহারাণী—নিঃসন্দেহে আমি অপরাধিনী। এক অবলা নারী আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছে।

মহারাজ—এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ?

মহারাণী—কি ভাবে ?

মহারাজ—হরদৌলের রক্ত দিয়ে।

মহারাণীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। বললেন

—কি জন্য এ শাস্তি মহারাজ। আজ খাবারের থালা উল্টোপাল্টা হয়ে গিয়েছিল সে জন্যই কি ?

মহারাজ—না, এই জন্য যে তোমার প্রেম হরদৌলকে অন্ধ করে দিয়েছে।

আগুনে তেতে লোহা যেমন লাল হয়ে ওঠে তেমনি ভাবে মহারাণীর মুখ লাল হয়ে গেল। ক্রোধের আগুন মানুষের সমস্ত সদগুণ কে ভস্ম করে দেয়। প্রেম, প্রতিষ্ঠা, দয়া, ন্যায় সব জলাঞ্জলি হয়ে যায়। মহারাণী নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন হরদৌলকে আমি আমার ছেলে আর ভাই এর মত মনে করি।'

রাজা উঠে বসলেন। নরম স্বরে বললেন—না। হরদৌল বাচ্চা ছেলে নয়। আমি-ই বাচ্চা, সে কিনা তোমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছিল। রাণী, তোমার কাছে এমনটি আমি আশা করিনি। তোমার জন্য আমার গর্ব ছিল। আমি ভাবতাম চাঁদ সূর্য স্খলিত হবে তবু তুমি স্থির থাকবে। এখন বুঝছি এটা আমার অপরিণীত চিন্তা। মহাপুরুষেরা ঠিকই বলেছেন—স্ত্রীর প্রেম যেন জল ধারা। যে পাত্র কাছে পাবে সেই পাত্রের আকার ধারণ করবে। সোনা বেশী গরম করলে এমনই নষ্ট হয়ে যায়।

মহারাণী কাঁদতে লাগলেন। ক্রোধের আগুন অশ্রু বিন্দু হয়ে ঝরতে লাগল। এক সময় বললেন—আপনার সন্দেহ কিভাবে দূর করব ?

মহারাজ—হরদৌলের রক্ত দিয়ে।

মহারাণী—আমার রক্তে কি সে দাগ মিটবে না ?

মহারাজ—তোমার রক্তে সে দাগ আরো পাকা হবে।

মহারাণী—আর কোন উপায় নেই ?

মহারাজ—না।

মহারাজ—এই কি আপনার শেষ বিচার ?

মহারাজ—হ্যাঁ। এই আমার শেষ সিদ্ধান্ত। এই ছ্যাখো, পান রাখা আছে। এই পান তুমি নিজের হাতে খাইয়ে আসবে। যখন রাজ গৃহ থেকে হরদৌলের লাশ বেরোবে চিরকালের মত সেদিনই আমার সন্দেহ দূর হবে।

ঘৃণার দৃষ্টিতে রাণী পানের বাটার দিকে চেয়ে দেখলেন। ভাবতে লাগলেন—"আমি কি হরদৌলের প্রাণ নেব। নির্দোষ, সৎচরিত্র বীর হরদৌলের রক্তে আমি আমার সতীত্বের পরীক্ষা দেব ? এই পাপে কি পাপী হব না ? এক নির্দোষের রক্ত দিয়ে কিসের পরীক্ষা। হায় রে ! আজ কি সতীত্বের পরীক্ষা দেবার প্রয়োজন পড়ল। এ পাপ কাজ আমার দ্বারা হবে না।

মহারাজার সন্দেহ হল তো কি হল ? রাজার এমন সন্দেহ হবে কেন ? কেবল কি খাবারের থালা বদলাবার জন্য, না কি এর পেছনে আরো কোন কারণ আছে ? দুজনের দেখা হয়ে ছিল জঙ্গলে। তবে কি হরদৌলের কোমরে মহারাজের তরবারি দেখে এত ক্ষোভ। না কি হরদৌল কোন ভাবে অপমান করেছে মহারাজ কে ? কিন্তু আমার কি অপরাধ ? হে ভগবান তুমিই সাক্ষী। যা হবার হোক কিন্তু আমাকে দিয়ে এ পাপ হবে না।

মহারাণী আবার ভাবতে লাগলেন—মহারাজের মন এত নীচ। আজ তিনি নিজের ভাইকে হত্যা করতে চাইছেন ? যদি আজ তার প্রতিষ্ঠা আর সম্মান দেখে হিংসে হয় তবে সোজাসুজি সে কথা বলছেন না কেন ? মহারাজ আপনি খুব ভাল করেই জানেন এ-কাজ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি আমি অপরাধিনী হই তবে আমাকে মথুরা বৃন্দাবন পাঠিয়ে দিন, সেখানে চলে যাই। পতিব্রতের ওপর যদি সন্দেহ থাকে আমাকে সরিয়ে দিন। কিন্তু একজন নিরপরাধ কে হত্যা করবেন কেন ? নিজের জীবন দিয়েও হরদৌল কে বাঁচাতে আমি রাজী। যদি তোমার হৃদয়ে এতটুকু প্রেম থাকত। যদি তুমি মানুষ হতে তবে এমন কাজ করতে বলতে না। তোমার যদি এই শেষ ইচ্ছে হয় তবে আমি পাপ করলাম। কিন্তু কি ভাবে। কিভাবে হরদৌলকে হত্যা করব। ভেবেই মহারাণী আবার শিউরে উঠলেন। না, না আমার হাত কখনো উঠবে না। আমি নিজেই খেয়ে নেব এই বিষ। হ্যাঁ, আমি জানি তাতেও তুমি না করবে না। কিন্তু আমার দ্বারা এই মহাপাপ সম্ভব নয়। একবারও নয়, হাজার বারও নয়।

চার

রাজা হরদৌল এসব খবর জানতেন না। অর্ধেক রাতে তাঁকে জাগিয়ে অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে দাসী সমস্ত ঘটনা জানাল। সে দরজার বাইরে থেকে সবকিছু শুনছিল। মহারাজের আচার ব্যবহার হরদৌলের মনেও একটা কাঁটার মত খোঁচা দিচ্ছিল। এবার তার কারণ পরিষ্কার হয়ে গেল দাসীকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন যে অন্য আর কেউ যেন একথা জানতে না পারে।

হরদৌল বুন্দেলী বীরের সূর্য স্বরূপ। তাঁর একটু ইশারাতে লাখ লাখ বুন্দেলবাসী জীবনদানে প্রস্তুত। সমস্ত ওরছা রাজ্যই তার পদতলে সমর্পিত। মহারাজ জুঝার সিং যদি সর্বসমক্ষে তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতেন তবে

অন্য কথা ছিল। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে মরণ বাঁচন লড়াইতে বুন্দেলীবীর পেছপা নয়। বুন্দেলবাসী সব সময় এই সুযোগের প্রতিক্ষায় থাকে যে তাকে কেউ অপমান করুক রক্তের নেশায় রক্তের স্বাদ পাওয়া যায় তখনই। কিন্তু নির্দোষ আর অবলা সতীর তাঁর রক্তের বড় প্রয়োজন। দাদার মনে যদি এই সন্দেহ থাকত যে তাঁকে হত্যা করে রাজ্য অধিকার করতে চান তবে কোন কথা ছিল না। রাজ্য লাভের জন্য কপটতা, ভ্রাতৃহত্যা, দাঙ্গা, যুদ্ধ নতুন কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু আজ তিনি যে সন্দেহের দাস, হরদৌলের মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন কিছুর বিনিময়ে সে সন্দেহেই অবসান সম্ভব নয়। এই পবিত্র সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। আমি খুশি মনে বিষ গ্রহণ করব। বীরের মত মৃত্যু-এর চাইতে বড় আর কি হতে পারে ?

ক্রোধম্মত্ত হয়ে রণক্ষেত্রে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করাও এত কঠিন কাজ নয়—আজ ঠাণ্ডা মাথা বীরশ্রেষ্ঠ রাজা হরদৌল যে কাজ করতে যাচ্ছেন।

পরের দিন ভোরে হরদৌল খুব পরিপাটি করে স্নান করলেন। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে তিনি মহারাজের কক্ষে এলেন। মহারাজ তখনই ঘুম থেকে উঠেছেন। এমন সুসজ্জিত বেশে হরদৌলকে দেখে তিনি বিস্মিত। সামনে পাথরের বাটায় সাজানো রয়েছে পান। মহারাজের চোখ একবার হরদৌলের দিকে, আরেকবার পানের বাটার দিকে ঘোরাফেরা করতে লাগল। তিনি প্রশ্ন করলেন—কোথায় চললে এত সকালে।

হরদৌল হাসলেন "কাল আপনি ফিরে এসেছেন, সেই খুশিতে আজ বনে যাচ্ছি শিকার খেলতে। ভগবান আপনাকে অর্জিত করেছেন, আমাকে নিজের হাতে বিজয়াশীর্বাদ দিন।

এই বলে হরদৌল বাটা থেকে পান তু'লে নিয়ে রাজার সামনে মাথা নীচু করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। হরদৌলের চোখে মুখে পরমানন্দ, সুখের ছাপ দেখে মহারাজ আরও ক্রুদ্ধ হলেন। মনে মনে বললেন—তুই, আমার মান সম্মান মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আবার এসেছিস্ আশীর্বাদ চাইতে। হ্যাঁ, বিজয়াশীর্বাদই দেব, তবে তোমায় নয়, নিজেকে।

জুঝার সিং আশিবাদের ভঙ্গিতে হাত তুললেন। মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়ে কি ভাবলেন, তারপর হরদৌলকে আশীর্বাদ করলেন। মাথা ঝুকিয়ে হরদৌল সে আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। করুণার দৃষ্টিতে চারিদিক তাকালেন, তারপর পান মুখে পুরে দিলেন। একজন বীর রাজপুত তাঁর বীরত্বের প্রমাণ রাখলেন।

ভয়ঙ্কর বিষ ছিল পানে। গলা দিয়ে নামতে না নামতেই হরদৌলের মাথা ঘুরে গেল। দু' হাত জোড় করে একবার মহারাজকে, আরেকবার মাতৃভূমিকে প্রণাম করে উঠে বসলেন, কপালে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম। নিঃশ্বাস বইছে তীব্র বেগে। চেহারায় অদ্ভুত প্রশান্তি।

জুঝার সিং স্থির হয়ে বসে আছেন। মুখে তখনও ঈর্ষার ছাপ। শুধু চোখের দু' বিন্দু জল টল টল করে উঠল। আলো মিলিত হল অন্ধকারে।

নেশা

ঈশ্বরী এক বড় জমিদারের ছেলে, আর আমি হলাম এক গরীব ক্লার্কের— আমার কাছে পরিশ্রম ও মজুরী ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি নেই। আমাদের দুজনের মধ্যে প্রায় তর্ক-বিতর্ক হতো। আমি জমিদারদের নিন্দা করতাম, তাদের হিংস্র পশু, রক্তচোষা জোঁক এবং গাছের মাথায় বসা শকুন বলতাম। সে জমিদারদের পক্ষ নিত, কিন্তু স্বভাবতঃ তার যুক্তি কিছু দুর্বল; কেননা তার কাছে জমিদারদের আনুকুল্যে কোন দলিল নেই। সব মানুষ সমান হয় না, সর্বদা ছোট-বড় হয়ে থাকে, এবং হবে—নিতান্ত সাধারণ দলিল। কোন মানবিক বা নৈতিক নিয়মে এই অবস্থার ঔচিত্য প্রমাণ করা কঠিন। এই তর্ক-বিতর্কের উষ্ণ আবহাওয়ায় আমি মাঝে-মাঝে উত্তেজিত হয়ে পড়তাম, এবং আঘাতজনিত কথা বলে ফেলতাম; কিন্তু ঈশ্বরী হেরে গিয়েও হাসতে থাকত। আমি কখনও তাকে উত্তেজিত হতে দেখিনি। হয়তো সে নিজের পক্ষের দুর্বলতা বুঝতো। চাকরদের সঙ্গে সে কখনও ভাল করে কথা বলত না। ধনীদের মাঝে যে এক ধরণের নির্মমতা ও অহঙ্কার থাকে, ঈশ্বরীর মাঝেও তা প্রচুর পরিমাণে ছিল। চাকর যদি কখনও বিছানা পাততে সামান্য দেরী করত, প্রয়োজনের চেয়ে দুধ বেশী গরম বা ঠাণ্ডা হত, কিংবা সাইকেল ভাল করে ধোয়ামোছা না হতো—তাহলে সে নিজের ভেতর থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসত। আলস্য এবং অভদ্রতা সে এতটুকু বরদাস্ত করতে পারত না। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে—বিশেষ করে আমার সঙ্গে—তার ব্যবহার সৌহার্দ্যপূর্ণ ও নম্র ছিল। যদি তার জায়গায় আমি হতাম, তাহলে আমার মাঝেও সেই

কঠোরতা সৃষ্টি হত—যা তার মাঝে আছে ; কেন না আমার লোক-প্রেম কোন সিদ্ধান্তে নয় বরং আমার নিজস্ব অবস্থায় টিঁকে আছে। কিন্তু, সে আমার জায়গায় থেকেও ধনী থাকত ; কেন না সে ছিল প্রকৃতিগত বিলাসী ও ঐশ্বর্য ছিল।

এবার পূজোর সময় ঠিক করেছি, বাড়ী যাবো না। আমার কাছে ভাড়ার টাকা নেই, তাছাড়া বাড়ীর লোকদের অসুবিধায় ফেলতে চাই না। জানা ছিল, তাঁরা আমায় যা পাঠান, তা তাঁদের সামর্থ্যের বাইরে, তাছাড়া পরীক্ষার ব্যাপারেও চিন্তা আছে ! এখনও বহু পড়া বাকী, বাড়ী গিয়ে কে আর পড়াশুনা করে ! বোর্ডিং-এ ভূতের মত একা পড়ে থাকতেও মন চাইছে না। এমন সময় ঈশ্বরী যখন আমায় তার বাড়ী যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়, কোন ওজর-আপত্তি ছাড়াই আমি রাজী হয়ে পড়ি। ঈশ্বরীর সঙ্গে পরীক্ষার পড়াও তৈরী করা যাবে। সে ধনী হলেও বেশ পরিশ্রমী ও বিদ্যানুরাগী।

ঈশ্বরী এই সঙ্গে এও বলে রাখে—দ্যাখো ভাই, একটা ব্যাপার মনে রেখো। সেখানে যদি জমিদারদের নিন্দা করো, তাহলে অবস্থা সঙ্গীন হবে এবং আমার বাড়ীর লোকদের সেটা খারাপ লাগবে। আসামীদের তাঁরা এই দাবী নিয়ে শাসন করে যে ঈশ্বর তাঁদের সেবা করতেই আসামীদের সৃষ্টি করেছে। আসামীরাও এটা মনে করে। যদি তাদের বুঝিয়ে দেয়া হয়, জমিদার ও আসামীদের মাঝে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, তাহলে জমিদারদের অবস্থা কি দাঁড়াবে, বল।

আমি বলি—তুমি কি মনে করো আমি সেখানে গিয়ে অন্য ধরণের হয়ে যাবো ?

'হ্যা, আমার তাই বিশ্বাস।'

'তুমি কিন্তু ভুল ভাবছো।'

ঈশ্বরী এর কোন উত্তর দেয় না। এই বিষয়টা সে আমার বিবেকের ওপর ছেড়ে দেয়। যদি সে নিজের ধারণা আকড়ে ধরে থাকতো, তাহলে আমিও জেদ ধরে থাকতাম।

দুই

সেকেণ্ড ক্লাশ দূরের কথা, আমি কখনও ইণ্টার ক্লাশে চেপে ভ্রমণ করিনি। এবার সেকেণ্ড ক্লাশে ভ্রমণের সৌভাগ্য ঘটে। গাড়ী আসার সময় রাত ন'টা ;

কিন্তু যাওয়ার আনন্দে আমরা সন্ধ্যে নাগাদ ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াবার পর রিফ্রেশমেণ্ট রুমে খাবার খেতে যাই। আমার বেশ-ভূষা এবং চাল-চলন দেখে অভিজ্ঞ খানসামাদের বুঝতে দেরী হয় না মনিব কোনজন আর কেই বা কে; কেন জানি, তাদের গোস্তাকী আমার খারাপ লাগতে থাকে। পয়সা ঈশ্বরীর পকেট থেকে বেরোয়। সম্ভবতঃ আমার বাবা যে মাইনে পান, তার চেয়ে বেশী এইসব খানসামাদের ইনাম-বখশিসে প্রাপ্ত হয়। যাবার সময় ঈশ্বরী একটা আধলি দেয়। তবুও আমি ওদের কাছ থেকে সেই রকম তৎপরতা ও বিনয়ের প্রতীক্ষা করি—যেমনটি তারা ঈশ্বরীর সেবা করে। ঈশ্বরীর হুকুমে সকলে দৌড়ে আসে; অথচ আমি একটা কিছু চাইলে তেমন উৎসাহ দেখায় না। খাবারে তেমন কোন স্বাদ পাই না। এই পার্থক্য আমার মন একেবারে নিজেকে ধরে রাখে।

গাড়ী আসে, আমরা দুজনে উঠে পড়ি। খানসামা ঈশ্বরীকে সেলাম জানায়। আমার দিকে ফিরেও তাকায় না এতটুকু।

ঈশ্বরী বলে—দেখেছো, এরা সকলে কেমন কায়দা-দুরস্ত! অথচ আমাদের চাকরগুলোকে দেখো—কাজ করার কোন কায়দা নেই।

আমি নিরুৎসাহ গলায় বলি—তোমার চাকরদের তুমি যদি রোজ এই রকম আট-আনা বখশিস দাও; তাহলে হয়তো এর চেয়ে বেশী ভদ্র-সেবাপরায়ণ হয়ে উঠবে।

'তুমি কি মনে করো, এরা শুধু বখশিসের লোভে এত আদব-কায়দা করে?'

'আজ্ঞে না, কখনই না! ভদ্রতা ও আদব-কায়দা এদের রক্তে যে মিশ্রিত আছে।'

গাড়ী রওনা হয়। ডাকগাড়ী। প্রয়াগ থেকে রওনা হবার পর প্রতাপগড়ে এসে থামে। একজন লোক আমাদের কম্পার্টমেণ্ট খোলে। আমি সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠি—সেকেণ্ড ক্লাস! সেকেণ্ড ক্লাস!

সেই যাত্রী কামরার ভেতর ঢুকে আমার দিকে এক বিচিত্র দৃষ্টিতে দেখে বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, অধম এটা ভাল করেই জানে, বলেই মাঝখানের বার্থে গিয়ে বসে পড়ে। আমার এমন লজ্জা হয় যে কি বলবো।

ভোর হতে হতে আমরা মোরাদাবাদে গিয়ে পৌছাই। ষ্টেশনে কয়েকজন লোক আমাদের স্বাগত জানাবার জন্য দাঁড়িয়েছিল। দুজন ভদ্রলোক। পাঁচজন চাকর। চাকরেরা এগিয়ে এসে আমাদের লাগেজ তোলে। ভদ্রলোক

দুজন আমাদের পেছনে পেছনে আসে। তাদের একজন মুসলমান—রিয়াসত আলী! অন্যজন ব্রাহ্মণ—রামহরণ। দুজনেই আমার দিকে অপরিচিত চোখে দেখে, যেন বলে, তুমি কে হে হাঁসের সঙ্গে কাক?

রিয়াসাত আলী ঈশ্বরীকে জিজ্ঞেস করে—বাবুসাহেব কি আপনার সঙ্গে পড়াশুনা করেন?

ঈশ্বরী জবাব দেয়—হ্যাঁ, এক সঙ্গে পড়াশুনা করেন, এক সঙ্গে থাকেনও। বলতে পারেন, এর দৌলতেই আমি এলাহাবাদে পড়ে আছি, নইলে কবে লক্ষ্ণৌ চলে যেতাম। এবার এঁকে ধরে এনেছি। বাড়ী থেকে কতগুলো টেলিগ্রাম এসেছে; কিন্তু আমি সবকটার রাজী না হওয়ার জবাব পাঠিয়ে দিয়েছি। শেষ টেলিগ্রামটি দিল আর্জেণ্ট—যার প্রতি শব্দের ফি চার আনা—সেটার জবাবেও 'রাজী না হওয়া' পাঠিয়ে দিয়েছি।

ওরা দুজনে আমার দিকে চকিত দৃষ্টিতে দেখে।

রিয়াসত আলী কিছুটা শঙ্কিত স্বরে বলে—কিন্তু ইনি বড় সাধারণ বেশভূষায় থাকেন।

ঈশ্বরী তার শঙ্কা সঙ্গে সঙ্গে নিবারণ করে—মহাত্মাগান্ধীর শিষ্য বুঝলেন! খাদি ছাড়া অন্য কোন কিছুই পরেন না। পুরনো সমস্ত পোষাক-আশাক পুড়িয়ে ফেলেছেন! বলতে পারেন রাজা মানুষ। আড়াই-লাখ সম্রাসের জমিদারী; কিন্তু এঁর চেহারা দেখুন, মনে হবে এইমাত্র অনাথালয় থেকে ধরে আনা হয়েছে।

রামহরণ বলে—বড়লোকের মধ্যে এমন স্বভাব খুব কম দেখা যায়। কেউ এতটুকু অনুমান করতে পারবে না। রিয়াসত আলী সমর্থন জানায়—আপনি যদি মহারাজা চাওলীকে দেখতেন, তাহলে অবাক হতেন। একটা মোটা কাপড়ের মেরজাই আর কাঁচা চামড়ার জুতো পরে বাজারে ঘুরে বেড়াতেন। শুনেছি, একবার নাকি বেগার খাটাবার জন্য ধরে নিয়ে যায়, উনিই কিনা দশ লাখ টাকা দিয়ে কলেজ খুলে দেন।

আমি মনে-মনেই মাটিতে মিশে যাচ্ছি; কিন্তু জানি না কি কারণে এই সরাসরি মিথ্যে সে সময়ে আমার কাছে হাস্যাস্পদ মনে হয় না। তার প্রতিটি কথার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন ঐ কল্পিত বৈভবের সমীপে এসে পড়তে থাকি।

আমি ঘোড়সওয়ার নই। সেই ছেলেবেলায় কয়েকবার টাট্টু ঘোড়ায় চড়েছি। বেরিয়ে দেখি, দুটো দীর্ঘ ঘোড়া আমাদের জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে যায়। চেপে বসি ; এদিকে হৃদপিণ্ড কাঁপতে থাকে। অথচ চোখে-মুখে সামান্যতম ভ্রূকুটি ফুটতে দিই না। ঘোড়াটাকে ঈশ্বরীর পেছনে এগিয়ে দিই। ভাগ্য ভালো যে ঈশ্বরী ঘোড়াটাকে জোরে হাঁকালো না, নইলে হয়তো আমি হাত-পা ভেঙ্গে ফিরে আসতাম। ঈশ্বরী হয়তো বুঝতে পেরেছে, কতখানি জলে আমি পড়ে আছি।

তিন

ঈশ্বরীর বাড়ী তো নয়, একটা দূর্গ বলা চলে। ইমামবাড়ার মত ফটক, দরজায় টহলরত প্রহরী, চাকর-বাকরদের কোন হিসেব নেই, দোরে একটা হাতি বাঁধা। ঈশ্বরী তার বাবা, কাকা, জ্যেঠা সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়, তেমনই অতিশয়োক্তি সহ। এমনভাবে আকাশে তুলে ধরে যে কহতব্য নয়। চাকর-বাকররাই শুধু নয়, বাড়ীর প্রতিটি লোকেরা আমায় সমীহ করতে থাকে। গাঁয়ের জমিদার, লাখ টাকার আমদানী, অথচ পুলিশ-কনষ্টেবলকেও অফিসার মনে করে। কয়েকজন লোক আমায় হুজুর হুজুর ডাকতে শুরু করে।

যখন একটু ফাঁকা হয়, আমি ঈশ্বরীকে বলি—তুমি তো আচ্ছা শয়তান হে, আমায় এমন নাজেহাল করছো কেন ?

ঈশ্বরী দৃঢ় হাসি হেসে বলে—এই সব গাধাদের সামনে এই চালাকীর দরকার ছিল, নইলে সাদা মুখে কথাও বলতো না।

একটুক্ষণ পরে নাপিত আসে আমাদের পা টিপতে। কুমার বাহাদুররা ষ্টেশন থেকে এসেছেন, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ঈশ্বরী আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন—আগে কুমারবাহাদুরের পা টেপ।

আমি খাটের ওপর শুয়েছিলাম। আমার জীবনে এমন সৌভাগ্য কখনও ঘটেনি যে কেউ আমার পা টিপে দিয়েছে। এইসব ব্যাপারগুলি ধনীদের বিলাসীতা, জমিদারদের গাধামী এবং বড়লোকদের খেয়াল আরও কত কি বলে ঈশ্বরীকে পরিহাস করতাম। আজ আমিই কিনা সেইসব ব্যবহার করে রঈস হওয়ার অনুকরণ করছি !

এরি মধ্যে দশটা বেজে গেছে। প্রাচীন সংস্কারের লোক। নতুন আলো এখন সবে পাহাড়ের চূড়োয় এসে পড়েছে। ভেতর থেকে খাবারের ডাক আসে। আমরা স্নান করতে বেরিয়ে পড়ি। আমার ধুতি আমি সর্বদা নিজেই কেঁচে নিই ; কিন্তু এখানে ঈশ্বরীর মত আমিও ধুতি ফেলে রেখে দিই। নিজের হাতে

নিজের ধুতি কাঁচতে লজ্জা বোধ হয়। ভেতরে খেতে যাই। হস্টেলে জুতো পরে টেবিলে গিয়ে বসতাম। এখানে পা ধোয়াটা জরুরী। কাহার জল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঈশ্বরী পা এগিয়ে দেয়। কাহার ওর পা ধুইয়ে দেয়। আমিও পা এগিয়ে দিই। কাহার আমার পাও ধুইয়ে দেয়। আমার সেইসব সিদ্ধান্ত ধারণা না জানি কোথায় উবে যায়।

চার

ভেবেছিলাম, গাঁয়ে এসে একাগ্র মনে পড়াশুনা করবো; কিন্তু, এখানে সারাটা দিন ঘুরে-বেরিয়ে কেটে যায়। কখনও নদীর ওপর বজরায় ভ্রমণ করি; কখনও মাছ বা পাখী ধরার শিকার করে বেড়াই; কখনও পালোয়ানদের কুস্তি দেখি, কখনও বা দাবা নিয়ে বসে পড়ি। ঈশ্বরী প্রচুর ডিম আনায়, ঘরে স্টোভ ধরিয়ে 'ওমলেট' করে। চাকরদের একটা দল সর্বদা আমাদের ঘিরে থাকে। আমাদের হাত-পা নাড়ানোর কোন দরকার নেই। শুধু জিভ নাড়ানোই যথেষ্ট। স্নান করতে বসলে লোকেরা স্নান করানোর জন্যে হাজির, শুয়ে থাকলে দু'জন লোক পাখা টানার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে।

মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য কুমার বাহাদুরের বেশ নাম ডাক, ভেতরে-বাইরে সর্বত্রই আমার দাপট। প্রাতঃরাশে একটুও যেন দেরী না হয়, পাছে কুমার বাহাদুর রাগ না করে বসেন : বিছানা ঠিক সময়ে পাতা হয়, কুমারবাহাদুরের নিদ্রার সময় উপস্থিত। আমি ঈশ্বরীর চেয়েও বেশী স্পর্শকাতর হয়ে পড়ি, অথবা হওয়ার জন্য বাধ্য হই। ঈশ্বরী নিজের হাতে বিছানা পেতে নেয়, কিন্তু কুমার যে অতিথি, নিজের হাতে কি করে সে বিছানা পাতে! তার মহানতায় যে দাগ ধরবে।

একদিন সত্যি-সত্যি এমন একটা ব্যাপার ঘটে। ঈশ্বরী বাড়ীতেই ছিল। হয়তো বাবা-মা'র সঙ্গে কথাবার্তায় দেরী করছে আসতে! এদিকে দশটা বেজে গেছে। ঘুম-ভারে আমার চোখ টেনে আসছিল, কিন্তু বিছানা পাতি কি করে? কুমার বাহাদুর হয়েছি যে। প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ কাহার আসে। বেশ খোসামুদে, মোসাহেবী ধরনের চাকর। বাড়ীর কাজকর্মে ব্যস্ত থাকায় আমার বিছানা পাতার কথা মনে ছিল না। এখন মনে পড়তেই, দৌড়ে ছুটে এসেছে। আমি ওকে এমন ধমক দিয়ে উঠি যে বেচারা মনে রাখবে বহুদিন।

ঈশ্বরী আমার ধমকানি শুনে বেরিয়ে আসে, বলে—খুব ভাল করেছো। এইসব হারামখোরেরা এমন ব্যবহারের যোগ্য।

এই রকম ঈশ্বরী একদিন একজায়গাও নিমন্ত্রণে গিয়েছিল। রাত হয়ে গেছে; অথচ লম্ফ জ্বলেনি। টেবিলের ওপর লম্ফ রাখা ছিল। দেশলাই-ও সেখানেই ছিল; কিন্তু ঈশ্বরী নিজে কখনও লম্ফ জ্বালাতো না। কুমার বাহাদুরই বা জ্বালায় কি করে? আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। খবরের কাগজ এনে রাখা আছে। মন সেদিকেই পড়ে আছে; অথচ লম্ফ নেই। দৈবযোগে সে-সময় মুন্সী রিয়াসত সেখানে আসে। আমি তার ওপর ফেটে পড়ি, এমন ধমকানি দিই যে বেচারা হতভম্ব হয়ে পড়ে—তোমাদের এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই যে লম্ফ জ্বালাতে হবে। বুঝি না, কি করে যে এমন কাম-চোর লোকেদের নিয়ে এখানে কাজ চলে। আমার ওখানে এক ঘণ্টাও চলতো না। রিয়াসত আলী কাঁপা-কাঁপা হাতে লম্ফ জ্বালিয়ে দেয়।

সেখানে একজন প্রামণিক প্রায় আসতো। কিছুটা সাহসী ব্যক্তি, মহাত্মা গান্ধীর পরম ভক্ত। আমায় মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য মনে করে খুব সম্ভ্রম করতো; কিন্তু কিছু জিজ্ঞেসা করতে সংকোচ বোধ করত। একদিন আমায় একা পেয়ে কাছে এগিয়ে আসে, হাতজোড় করে বলে—হুজুর তো গান্ধীবাবার চেলা? লোকেরা বলাবলি করে এখানে স্বরাজ হলে আর জমিদার থাকবে না।

আমি দৃপ্তভাবে বলি—জমিদারদের থাকাটা দরকার কিসের? এরা গরীবদের রক্তচোষা ছাড়া আর কি বা করে?

প্রামাণিক আবার জিজ্ঞেস করে—তাহলে কি হুজুর, সব জমিদারদের জমি কেড়ে নেয়া হবে?

আমি বলি—অনেকে স্বেচ্ছায় দিয়ে দেবে। যারা স্বেচ্ছায় দেবে না তাদের জমি কেড়ে নিতেই হবে। আমরা তো তৈরী হয়ে বসে আছি যেই স্বরাজ হবে, আমার এলাকার সমস্ত চাষীদের নামে দানপত্র করে দেবো।

আমি চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসে ছিলাম। প্রামাণিক আমার পা টিপতে থাকে। আবার বলে—আজকাল জমিদারেরা বড্ড জুলুম করে হুজুর! আপনার এলাকায় সামান্য জমি দিন, গিয়ে সেখানে আপনার সেবা করে কাটাবো।

আমি বলি—এখন আমার কোন অধিকার নেই ভাই; কিন্তু যখন অধিকার পাবো, আমি তোমাকেই সবচেয়ে আগে ডাকবো। তোমাকে মোটর ড্রাইভার করে নেবো।

শুনেছি, সেদিন সে প্রচুর সিদ্ধি খেয়ে বৌকে প্রচণ্ড মারধোর করেছিল, তারপর গাঁয়ের মহাজনের সঙ্গে ঝগড়া করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল !

পাঁচ

এভাবে ছুটি শেষ হয়, আমরা আবার প্রয়াগে রওনা হই। গাঁয়ের অনেকে আমাদের তুলে দিতে আসে। প্রামাণিক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশন পর্যন্ত আসে। আমিও নিজের অংশ খুব ভাল করে অভিনয় করি, এবং নিজের বিনয় ও দেবত্বের মোহর সকলের হৃদয়ে এঁকে দিই। ইচ্ছে করছিল প্রত্যেক চাকরকে বেশ ভালরকম বখশিস দিই, কিন্তু সেই সামর্থ কোথায় ? রিটার্ন টিকিট কাটা ছিল, কেবল গাড়িতে উঠে গিয়ে বসা ; কিন্তু গাড়ী এলো একেবারে ভিড়ে ঠাসা। দুর্গাপুজোর ছুটি উপভোগ করে সকলেই ফিরে যাচ্ছে। সেকেণ্ট ক্লাসে তিল ধারনের জায়গা নেই। ইণ্টার ক্লাসের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ ! এটাই শেষ গাড়ী। এখানে আর থাকার উপায় ছিল না। কোন রকমে তৃতীয় শ্রেণীতে জায়গা পাই। আমাদের ঐশ্বর্য সেখানে মোহাবিষ্ট করে ফেলেছিল, তাই আমার বসতে খারাপ লাগছিল। এসেছিলাম আরামে শুয়ে শুয়ে, যাচ্ছি প্রায় কুঁকড়ে। পাশ ফেরার জায়গাও ছিল না।

কয়েকজন লেখাপড়া জানা লোক ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে ইংরেজ রাজত্বের প্রশংসা করছিল। একজন বলে ওঠে—এমন ন্যায়নীতি অন্য কারো রাজত্বে দেখা যায় নি। ছোট-বড় সকলেই সমান। রাজা যদি কারো প্রতি অন্যায় করে. আদালত তার গলাও চেপে ধরে।

অন্যজন তাকে সমর্থন করে—আরে মশাই, আপনি নিজে বাদশার ওপর দাবী করতে পারেন। আদালতে বাদশা'য় ডিক্রী হয়ে যায়।

একজন যাত্রী, যার পিঠের ওপর বেশ বড় সাইজের বোচকা বাঁধা, কলকাতায় যাচ্ছিল। কোথাও রাখার জায়গা পাচ্ছিল না। পিঠের ওপর বাঁধা। বেচারা অস্থির হয়ে বার বার দরজার কাছে দাঁড়ায়। আমি দরজার কাছেই বসে ছিলাম। বারবার আমার মুখের ওপর বোচকার ঘষাঘষি ভাল লাগছিল না ! একেই হাওয়া-বাতাস কম, তদুপরি সেই গেঁয়ো লোকটা এসে আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে যেন আমার গলা টিপে ধরে। আমি কিছুক্ষণ দম বন্ধ অবস্থায় বসে থাকি। হটাৎ-ই আমার রাগ ধরে ওঠে। আমি ওকে ধরে পেছনে ঠেলে দিই, তারপর কষে দুটো চড় বসিয়ে দিই।

সে চোখ রাঙা করে বলে—মারছেন কেন বাবুজী, আমিও ভাড়া দিয়েছি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে আরও দু-তিনটি চড় কষিয়ে দিই।

কামরায় ঝড় ওঠে। চারদিক থেকে আমার ওপর কটু বর্ষণ শুরু হয়।

এতই যখন কোমল মন, উঁচু ক্লাসে গেলেই পারে ?

বড়লোক নিজের বাড়ীতে। আমায় যদি এমন মারত, তাহলে দেখিয়ে দিতাম।'

কি অন্যায় করেছিল বেচারা। কামরায় নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা নেই, জানালার ধারে একটু দম নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়াছে—তাতেই এত রাগ। বড় লোক হলে কি মানুষ নিজের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে ফেলে ?

এটাও ইংরেজ রাজত্ব মশাই, এত যার প্রশংসা করেছিলেন।

কয়জন গ্রাম্য লোক বলে—চাকরীতে এখনও ঢোকে নি, তাই মেজাজ কত !

ঈশ্বর ইংরেজীতে বলে—হোয়াট অ্যান ইডিয়ট য়ু আর !

এবং আমার নেশা এখন কিছুটা কমতে শুরু করেছে টের পাই।

ঘাসওয়ালী

মুলিয়া কচি ঘাসের গাঁটটা মাথায় নিয়ে এসে দাঁড়াতেই মহাবীর তার দিকে তাকিয়ে দেখলো, ওর গমের মতো গায়ের রংটা যেন একটু লালচে হয়ে উঠেছে, বড় বড় মাতাল করা হরিণ চোখ দুটোতে যেন একটা ভয়ের মেঘ জমা হয়ে আছে।

মহাবীরের মনেও খট্‌কা লাগলো, বাঁকা ভুরুর দিকে চেয়ে কিছুটা আঁচ করেই জিজ্ঞেস করলো—কি হয়েছেরে মুলিয়া, শরীরটা ভাল আছে তো ?

মুলিয়া মুখে কিছু না বললেও—তার আকর্ষণীয় দুচোখে জল ভরে এলো !

মহাবীর আরও একটু কাছে এসে জিজ্ঞেস করে—আরে, বলবি তো, না-কি ? কেউ কিছু বলেছে ? মা বকেছে বোধহয় ? অমন চুপচাপ আছিস, কেন ?

মুলিয়া ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে—কই কিছু না তো, কি আবার হবে? ভালই তো আছি?

মহাবীর মুলিয়ার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে বলে—চুপচাপ কেঁদেই যাবি, কিছু বলবি না আমায়?

মুলিয়া মহাবীরের কথা এড়াতে বলে—কিছু হলে তো বলবো।

এই উষর জীবনে হরিণী নয়না মুলিয়া যেন এক ফুটন্ত গোলাপ। গায়ের রং পাকা গমের মতো সোনালী, টানা টানা স্বপ্নালু দু চোখের পাতায় যেন জাদু কাজল মাখানো, গালে প্রভাতী সূর্যের আভা ছড়িয়ে আছে, সুডোল চিবুক। চোখ দুটোতে এক আশ্চর্য আর্দ্রতা, তাতে বেদনা, মূক ব্যথার স্পষ্ট রেখা। জানি-না চামারের ঘরে এই অপ্সরা কি করে এলো। দেখে তো মনে হয় যেন ফুলের ঘায়েই মূর্ছা যাবে, এ হেন কোমলাঙ্গী মাথায় ঘাসের বোঝা নিয়ে বেচতে যায়? গাঁয়ে এমন লোকেরও অভাব নেই যারা ওর বাঁকা চোখের চাহনির বিনিময়ে হাসতে হাসতে মরতেও দ্বিধা করবে না, ও তাদের সঙ্গে একটু কথা বললেই নিজেদের ধন্য মনে করবে, কিন্তু ও শ্বশুর ঘর করতে এসেছে তা বছর-খানেকের ওপর হয়ে গেল, এ গাঁয়ের সোমত্ত ছেলেদের সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক চোখ তুলে তাকায় নি পর্যন্ত। মুলিয়া যখন ঘাস নিয়ে বাজারের পথ ধরে এগোতে থাকে তখন তাকে দেখে মনে হয় মূর্তিমতি উষাই বোধহয় বাসন্তী রংয়ের শাড়ী পড়ে এ ধরার বুকে নেমে এসে সোনা-ঝড়া আলোর ছটা দিচ্ছে। ওর সেই স্পর্দ্ধিত গমনপথের দিকে চেয়ে কেউ গজলের সুর ভাজতে থাকে, কেউ বা শিস্ দিয়ে বুক চাপড়ে পাক্কা অভিনেতার মতো বিরহীর অভিনয় করতে শুরু করে, মুলিয়া সে সব দেখেও না দেখার ভান করে পথ চলে। রোমিওর দল হয়রান হয়ে হা-হুতাশ করে—এত গুমোর ভাল নয়! মহাবীরের ঐ তো চেহারা, মাসের মধ্যে পনর দিন শয্যেশায়ী হয়েই থাকে, ওর সঙ্গে ও থাকে কি করে? কাঁচা বয়েস, তার ওপর এত রূপ-যৌবন!

কিন্তু আজ তাই ঘটেছে। ওদের জাতের অনেক যুবতীর কাছেই যা গোপন সন্দেশ, মুলিয়ার কাছে তা মর্মান্তিক যন্ত্রণা। ভোরের হাওয়ায় আমের মুকুলের সুগন্ধ। আকাশ পৃথিবীর বুকে মুঠো মুঠো সোনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। মাথায় ডালা নিয়ে মুলিয়া ঘাস কাটতে চলেছে, প্রভাতী সোনালী কিরণে তাকে দেখে মনে হচ্ছে ঠিক যেন এক গোছা যুঁই ফুল ফুটে আছে। হঠাৎ যুবক চৈন সিং তার দিকে এগিয়ে এলো। মুলিয়া তার চোখ বাঁচিয়ে সরে পড়তে

চাইলে কি হবে ; চৈন সিং তার হাত ধরে বলে—মুলিয়া, আমায় দেখে তোর মনে এতটুকু দয়া হয় না ?

মুলিয়ার সুন্দর চোখ দুটো যেন দপ করে জ্বলে উঠলো। নিঃসংকোচে, নির্ভয়ে ডালাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বলে—ছেড়ে দাও, নয়তো চীৎকার করে লোক জড়ো করবো বলে রাখ্লাম।

জীবনে আজই প্রথম এক নতুন অনুভূতিতে চৈন সিংয়ের মনটা ভরে উঠলো। অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতের খেলার পুতুল হতেই তো নীচু জাতের ঘরে রূপ-লাবণ্যের সম্ভার ফুটে ওঠে। এত কাল সে তাই তো দেখে এসেছে ; কিন্তু আজ মুলিয়াই তার সে ভুল ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে। লজ্জায়-রাগে-অপমানে-অভিমানে আহত নাগিণীর মতো আছড়ে পড়তে দেখে তার জ্ঞান-চক্ষু খুলে গেল। লজ্জিত হয়ে তার হাত ছেড়ে দিল। মুলিয়া প্রায় দৌড়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সংঘর্ষের উত্তেজনায় গভীর ক্ষত হলেও ব্যথা অনুভূত হয়না, সম্বিত ফিরে পেতেই সে যন্ত্রণা মর্মান্তিক আকার ধারণ করে। কিছু দূর পেরিয়ে আসতেই রাগ-ভয় ও বেপরোয়া ভাবের কথা মনে আসতেই দুচোখে জল ভরে এলো। কিছুক্ষণ পর্যন্ত মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে নিজেকে চেপে রাখতে চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত আর পারলো না, দু হাতে মুখ চেপে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। আজ গরীব না হলে কি কেউ তাকে এ ধরণের অপমান করতে পারতো ! কাঁদতে কাঁদতেই সে ঘাস কাটছে। মহাবীরের রাগ তার অজানা নয়। একথা তাকে বললে সে এই ঠাকুরকে আর আস্ত রাখবে না। শেষ কালে কি খুনের দায়ে জেলে যাবে ! জেলের কথা ভাবলেও তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। তাই সে মহাবীরের প্রশ্নের কোনো জবাব দেয় নি।

দুই

পরদিন অনেক বেলা হয়ে গেল অথচ মুলিয়া তখনো ঘাস কাটতে যায় নি দেখে তার শাশুড়ী এসে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁরে বৌ, সবাই তো চলে গেল, তুই এখনো ঘাস কাটতে যাসনি যে ? ব্যাপার খানা কি ?

মুলিয়া মাথা নীচু করে বলে—একা যাব না মা।

শাশুড়ী রেগে গিয়ে বলে—কেন ? বাঘে তুলে নিয়ে যাবে মনে হচ্ছে ?

দুই হাটুর মধ্যে মুখ গুঁজে চাপা স্বরে মুলিয়া জবাব দেয়—সবাই যা তা বলে।

শাশুড়ী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—একলাও যাবি না, কারুর সঙ্গেও যাবি না, তবে কি করে যাবি বলবি তো! তার চেয়ে বলে দে না কেন যাবি না। তা তুমি আমার ঘরে রাণীর মতো পায়ের ওপর পা তুলে খাবে, ওসব চলবে না, এই বলে রাখলুম। কাজ না করলে কে তোমায় আদর করবে বাছা! তোর ধলা চামড়া ধুয়ে জল খাব না সুন্দরী বলে তোমায় মাথায় তুলে নাচবো। আদিখ্যেতায় আর কাজ নেই। রূপের দেমাকে মাটিতে পা-ই পড়ে না। নে, নে, ডালা তোল্, ঘাস নে আয়গে যা!

দরজার সামনে নিম গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মহাবীর ঘোড়ার গায়ে হাত বুলোচ্ছিল। মুলিয়াকে কাঁদো কাঁদো মুখে যেতে দেখেও কিছু বললো না। মন চায় ওকে বুকের মধ্যে বসিয়ে রেখে চোখের পাতার আড়ালে লুকিয়ে রাখতে। কিন্তু ঘোড়ার পেট-টাও তো দেখতে হবে। ঘাস খাওয়ালে তবেই না কম সে কম রোজ অন্তত আনা বার হাতে আসবেই। ওটাই বা কম কি। কোনো কোনো দিন দেড়-দু টাকাও হয়, তবে তা কালে-ভদ্রে। সর্বনেশে লরি এসে একাওয়ালাদের রুজি-রোজগার বলতে গেলে একরকম কেড়েই নিয়েছে। কিন্তু তা বললে তো চলবে না। মহাজনের কাছ থেকে দেড়'শো টাকা ধার নিয়ে এ একা, ঘোড়াটা কিনেছিল, দুরন্ত গতির লরি ছেড়ে কেউ আর খুব একটা একার খোঁজ করে না। আসল তো দূরের কথা, ঠিকমতো মহাজনের বকেয়া সুদটাও দিতে পারছে কই! তাই দায় সারা গোছের উপরি মনোভাব নিয়ে বলে—ইচ্ছে না হলে থাক না, সে পড়ে দেখা যাবে।

স্বামীর কথায় মুলিয়ার মন থেকে ক্ষোভের মেঘ এক নিমেষেই উধাও হয়ে গেল। বলে—ঘোড়াটা কি না খেয়ে থাকবে না-কি?

আজ আর কালকের রাস্তা দিয়ে না গিয়ে ক্ষেতের আল ধরে যেতে শুরু করলো। দুধারেই আখ ক্ষেত, সতর্ক চোখে বার বার চারদিকে দেখছে, একটু খড়-খড় আওয়াজ হলেই তার যেন আর পা চলছে না—কেউ আবার আখ-ক্ষেতে লুকিয়ে নেই তো। কে জানে, বলা তো যায় না!

যাই হোক, আখ-ক্ষেত পেরোতেই আম বাগানে পা দিল, সে বাগানও ছাড়িয়ে এলো, আর ভয়ের কিছু নেই, সারা রাত ধরে জমিতে নিশ্চয়ই জল সেচ করা হয়েছে, তাই ভেজা-ভেজা চারাগাছগুলো নরম রোদে ঝলমল করছে। দূরের কুয়োটার দিকে নজর পড়তেই মনে হোল অনেকক্ষণ আগেই ভোর হয়ে গেছে। অনেকেই জল নিয়ে যে যায় ঘরে ফিরে যাচ্ছে, কেউ বা নেবে বলে

দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষেতের আলে সবুজ ঘাসগুলো কেমন মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে। দেখে মুলিয়ার লোভ হোল। এখানে আধ ঘণ্টায় যত ঘাস কাটা যাবে, শুকনো মাঠে সারা দুপুর বসে থাকলেও তা হবে না! এখানে কে-ই-বা দেখতে আসছে। কেউ চেঁচালে, উঠে চলে গেলেই হবে। ও ঘাস কাটতে শুরু করে, এক ঘণ্টার মধ্যে ওর ডালা প্রায় ভর্ত্তি হয়ে ওঠে। তন্ময় হয়ে নিজের কাজ করে যাচ্ছে, চৈন সিং যে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে খেয়ালটুকুও নেই। হঠাৎ কারোর পায়ের শব্দ শুনে মুলিয়া মাথা তুলেই চৈন সিংকে তার সামনে দেখতে পেয়ে ভুত দেখার মতো চমকে ওঠে। বুকের ভেতরে যেন হাতুড়ি পেটার মতো ধক্ ধক্ শব্দ হচ্ছে। একবার মনে হোল, ঘাসগুলো এখানে ঢেলে রেখে খালি ডালাটা নিয়ে চলে গেলে কেমন হয়; যেমনি ভাবা তেমনি কাজ, চৈন সিং তার কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে —ভয় পাসনেরে মুলিয়া, ভগবানের দিব্যি দিয়ে বলছি, তোকে কিচ্ছুটি বলবো না! এ জমি আমারই, যত ইচ্ছে ঘাস নিয়ে যা।

মুলিয়ার হাতদুটো কেমন অসাড় হয়ে পড়েছে, খুরপিটা যেন হাতে জমে গেছে, এমন অবস্থায় ঘাসও চোখে পড়ছে না। মন বলছে; মা বসুমতী, আমাকে তোমার বুকে ঠাঁই দাও। মাঠ-গাছ-পালা সব কিছু যেন তার চোখের সামনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

চৈন সিং আশ্বাস দিয়ে বলে—কিরে বসে আছিস কেন? কাট! এখনো তোর ভয় কাটেনি দেখছি। রোজ এখানে এলে অনেক ঘাস নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারবি, আমি নিজে হাতে তোকে কেটে দোব।

মুলিয়া তখনো ছবির মতো বসেই আছে।

চৈন সিং আরো এক পা এগিয়ে এসে বলে—আচ্ছা, এতো ভয়ের কি আছে বলতো? বুঝেছি, কালকের কথা এখনো ভুলতে পারিসনি বোধ হয়? ভগবান বৈ আর কেউ জানেন না, কাল তোকে বেইজ্জত করতে হাত ধরিনি। তোকে দেখে আমার এই হাত দুটো নিজে থেকেই এগিয়ে গেল। কলের পুতুলের মতো হয়ে গিয়েছিলুম, সোধ-বোধ কিছু যেন ছিল না। তারপর তুই চলে যেতে, ওখানেই বসে বসে কতক্ষণ নিজের অপকম্মের কথা ভেবে চোখের জল ফেললুম। তখন যে আমার কি অবস্থা তা ঠাকুর ভিন্ন আর কেউ জানেন না, একবার ভাবছি এ হাতটাই কেটে ফেলবো, পরক্ষণে মনে হচ্ছে বিষ খেয়ে মনের জ্বালা জুড়োই। তখন থেকে শুধু তোকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। আজ যে তুই

এ রাস্তা দিয়ে আসবি কি করে জানবো ? আমি তো সারা গাঁ-টা একরকম চষেই বেড়ালুম। এখন আমাকে যে শাস্তি তুই দিবি তাই মাথা পেতে নোব। মাথাটা কেটে নিলেও ট্যা-ফোঁ করবো না। হতে পারি গুণ্ডা-বদমাশ-লম্পট, কিন্তু বিশ্বাস কর, তোকে দেখার পর থেকে ওসব করতে আর আমার মন চায়নারে ! এখন মনে হয় তোর পোষা কুকুর হলে পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াতুম, যদি তোর ঘোড়া হতুম, তাহলে তুই নিজের হাতে আমাকে ঘাস খাওয়াতিস্। এ দেহ তোর কোনো কাজে লাগলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। বিশ্বাস কর, এ আমায় মনের কথা। মহাবীর সত্যিই ভাগ্যবান, এমন দেবীর মতো বৌ ওর ঘরে এসেছে।

মুলিয়া চুপচাপ সব শুনে গেল, তারপর শান্তভাবে বললো—তাহলে আমাকে এখন কি করতে বলো ?

চৈন সিং আরো একটু এগিয়ে এসে বলে—একটু দয়া কর মুলিয়া, এ ছাড়া আর কিচ্ছু চাইনে।

মুলিয়া মুখ তুলে তার দিকে তাকায়। জানি-না, এ মুহূর্তে তার সব লজ্জা-জড়তা কোথায় গায়েব হয়ে গেছে। কথার হূলে বিদ্ধ করে বলে—একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবে না তো ? তোমার বিয়ে হয়েচে না হয়নি ?

চৈন সিং চাপা গলায় বলে—বিয়েতো অনেকদিন আগেই হয়েছে, তবে তাকে বিয়ে না বলে খেলা বল্লেই বোধহয় ঠিক হয়।

ঠোঁটে অবহেলার মুচ্‌কি হাসি নিয়ে মুলিয়া বলে—তবে আমার বর যদি তোমার বৌ-য়ের সঙ্গে এভাবে কথা বলে তাহলে তোমার কেমন লাগবে সেকথা শুনতে পাই কি ? ওকে তখন খুন করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগতে কি-না ঠিক করে বলো ! নাকি ভেবেছো যে, মহাবীর চামার, ওর দেহে মানুষের রক্ত নেই, মনে লজ্জা নেই, মান-মর্যাদা, ঘরের আব্রু-ইজ্জত বলতে কিচ্ছুই নেই, তাই না ? তাই আমার রূপ-যৌবনের দিকে হাত বাড়িয়েছো। ঘাটে গেলে দেখতে পাবে, আমার চেয়েও অনেক সুন্দরী আচে, আমি তাদের কড়ে আঙুলের যুগ্যি নই। তাদের কারুর কাছে গিয়ে দয়া চাইলেই পারতে ? নাকি সেখানে যেতে সাহসে কুলোচ্ছে না। ভেবেছো চামারণী, ছোট জাত, একটু ভয়-হুমকী, দুটো মিঠে কথা বললেই গলে গিয়ে তোমার ছিচরণের দাসী হয়ে নিজেকে বিকিয়ে দোব তাই-না ? খুব সস্তা সওদা ভেবেছো। জাতে ঠাকুরতো, তাই পরের ঘরের মেয়ে-বৌ দেখলেই নোলায় জল সপ্‌সপ করে, আবার

ছোটলোকের ঘরের হলে তো কথাই নেই। সস্তার মাল কে না কিনতে চায় বলো?

চৈন সিং লজ্জিত হয়ে বলে—এটা ছোটলোক, বড়লোকের কথা নয়রে মুলিয়া, সত্যি, বিশ্বাস কর, সব মানুষই সমান। তোর পায়ে মাথা রেখে মরতেও রাজি।

মুলিয়া—তা আর বলতে? বেশ ভাল করেই জানো, যে আমি কিচ্ছু করতে পারবো না। কোনো ক্ষত্রেণীর পায়ে মাথা রাখলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবে। তখন বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল! তোমার এই উঁচু মাথাটা আর ঘাড়ে না থেকে মাটিতে লুটোবে, এই বলে দিলাম।

লজ্জার চৈন সিং-য়ের মাটিতে মিশে যাবার জোগাড়। ছ'মাসের রুগীর মতো মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে কথাই সরছে না। মুলিয়ার এই বাক্‌পটুতায় সে হতভম্ব।

মুলিয়া আবার বলতে শুরু করে—গরীবের সংসার, তাই আমাকে বাজারেও যেতে হয়। ভদ্দর লোকেদের হাড়ীর হাল জানতে, পয়সাওলা ঘরের কেচ্ছা জানতে আর আমার বাকী নেই। সেখানে তো কত ঘরেই সইস, কোচয়ান, কাহার, ঠাকুর, চাকর ঢুকে বসে আছে, তার বেলা? না কি তাদের ঘরের বৌ-ঝি'রা যা করছে, সব ঠিক করছে? বাবুদের বাড়ীর বাবুরা সব তো চামারণী, কাহারণীর পায়ে নিজেদের সঁপে দিয়ে বসে আছে। কে কার দোষ ঘাটবে! এ যায় ডালে ডালে, তো ও যায় পাতায় পাতায়। কিন্তু গরীব-গুবরোদের ওসব জ্বালা নেই। আমার কথাই ধরো না কেন, আমার সোয়ামির কাচে আমি সব। অন্য মেয়ে মানুষের পানে ভুলেও চোখ তুলে চায় না। সুন্দরী না হয়ে কেলে-কুচ্ছিত, যদি হতুম, তাহলেও ও আমাকে এমনি ভাল বাসতো। সে আমায় বিশ্বেস করে, চামারণী বলে লজ্জা-ঘেন্না সব গুলে খেয়ে বসিনি যে বিশ্বেসের ঘরে চুরি করবো, বুঝলে! তবে হ্যাঁ, ও যদি আমার সঙ্গে বেইমানি করতো, আমিও তাহলে তাকে ছেড়ে কথা বলতুম না। তুমি আমার রূপে মজে পাগল হয়ে উঠেচো, তাই না? আজ যদি আমি পাগল-ছাগল হয়ে ঘুরে বেড়াতুম, কি কানা হয়ে যেতুম, তখন আমার দিকে ভুলেও তাকাতে না। বলো, ঠিক বলেচি কি-না?

চৈন সিং চুপচাপ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মুলিয়ার গলা থেকে অহঙ্কারের স্বর ঝরতে থাকে—কিন্তু একটা নয়, দুটো

চোখ নষ্ট হয়ে গেলেও আমাকে এভাবেই রাখবে। ওঠাবে, বসাবে, খাওয়াবে ও-ই। তুমি কি চাও, যে এমন লোকের সঙ্গে বেইমানি করি? যাও, আর কোনো দিন এভাবে জ্বালাতে এসো না, তাহলে ভালো হবে না বলছি।

তিন

যৌবনের উৎসাহে শক্তি-সাহস, দয়া-আত্মবিশ্বাস, গৌরব সব কিছু আছে যা মানব জীবনকে পবিত্র উজ্জ্বল আর পূর্ণতার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যায়। অপর দিকে তারুণ্যের নেশা বড় সাংঘাতিক, এতে মানুষ নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, বিষয়-বাসনা, নীচতা ইত্যাদি এমন অনেকগুলো সিঁড়ি পেরিয়ে পশুত্ব ও পতনের শেষ সীমায় এসে পৌছোয়। চৈনসিংও যৌবনের এই নেশা প্রভাবে একটার পর একটা কুকর্ম করে যাচ্ছিল। মুলিয়া ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতেই তার সব নেশার ঘোর কেটে গিয়েছে। ফুটন্ত রসে জলের ছিঁটে দিলে যেমন ফেনা মরে গিয়ে যা কিছু ময়লা সব ওপরে ওঠে এসে পরিষ্কার হয়ে যায়। ঠিক তেমনি করে যৌবনের নেশার মোহ মুছে গিয়ে কেবল যৌবনটুকুও রয়ে গেল। 'কামিনী' এ শব্দ যত সহজে মানুষের মনের দীনতা, বিশ্বাস সত্যিকে তছ্‌নছ্‌ করতে পারে, আবার ঠিক তত সহজেই তাকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠিত করতেও তার জুড়ি মেলা ভার।

সেদিন থেকে চৈনসিং যেন অন্য মানুষ। বদমেজাজী, কথায় কথায় জন-মজুরদের গালা-গালি, মারধোর করতো। গরীব প্রজাদের ওর নামে বুকের রক্ত হিম হয়ে উঠতো। ওকে আসতে দেখলেই মজুররা যে যার কাজে মন দিত, আবার ও একটু পেছন ফিরেছে কি-না, অমনি বিড়ি, কলকে, খৈনি নিয়ে বসে খোস-গল্প শুরু করতো। আড়ালে সবাই ওকে গালি দিত। কিন্তু সেদিনের পর থেকে সবাই চৈনসিংয়ের দয়া, গাম্ভীর্য, সহিষ্ণুতায় মুগ্ধ হয়ে গেল।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। একদিন বিকেলে চৈন সিং ক্ষেতের কাজকর্ম দেখতে গিয়েছে। জোর কদমে কাজ চলছে। হঠাৎ তার নজরে পড়লো, নালির একটা জায়গা ভেঙ্গে গিয়ে সব জল অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। গাছের গোড়ায় সেই জল ধরে রাখতে এক বুড়ী ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। শেষে আর না পেরে চুপচাপ বসে পড়লো, ক্যায়ারীর ভেতর কেন যে জল ঢুকছে না, সেটা সে ধরতেই পারছে না। আগে হলে এই বুড়ীর সারাদিনের মজুরী কেটে নিয়ে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু আজ এ দৃশ্য দেখেও তার রাগ তো

হোলই না, উপরন্তু মাটি দিয়ে ছেড়ে যাওয়া জায়গাটায় ঠিকমতো বাঁধ দিয়ে এসে বুড়ীর কাছে বলে—তুই বুড়ী এখানে চুপচাপ বসে আছিস, ওদিকে জল যে সব বয়ে যাচ্ছে রে।

বুড়ী ঘাবড়ে গিয়ে বলে—এক্ষুণি হয়তো খুলে গেচে সরকার! এই তো দেখে এলুম, যাই, ঠিক করে দিগে যাই।

একথা বলছে আর থরথর করে কাঁপছে। চৈন সিং তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে—আরে, চললি কোথায়? দাঁড়া, দাঁড়া! আমিই ঠিক করে দিয়ে এসেছি। হ্যাঁরে বুড়োকে কদিন ধরে দেখছি না কেনরে, আর কোথাও কাজে গেছে বোধহয়?

বুড়ী তো চৈনসিংয়ের এহেন ব্যবহারে গদগদ হয়ে গিয়ে বলে—কাজ আর করচে কোতায়? ঘরেই বসে আচে!

চৈনসিং নম্রভাবে বলে—কাল থেকে আমার এখানে পাঠিয়ে দিস, কিছু পাট আছে, ওগুলো বসে বসে ঠিক করে দেবে।

একথা বলেই সে কুয়োর দিকে চললো। ওখানে তখন চারজন মজুরের কাজ করার কথা, কিন্তু তাদের মধ্যে দুজনে কুল পারতে গেছে। চৈনসিংকে দেখে বাকী দুজনের তো আক্কেল গুড়ুম। ঠাকুরসিং জিজ্ঞেস করলে তারা কি জবাব দেবে? আজ যে তাদের সবায়ের কপালে কি আছে কে জানে? মেরে সব ক'টার পিঠের চামড়া না তুলে নেয়।

চৈন সিং জিজ্ঞেস করে—আর দুজনকে দেখছি না যে, তারা কোথায় গেছে?

কারো মুখে কোনো কথা নেই। হঠাৎ তাদের সামনে দিয়ে মজুর দুজনকে ধুতির খুঁটেতে কুল নিয়ে আসতে দেখা গেল। মনের আনন্দে কথা বলতে বলতে আসছিল, চৈনসিংয়ের দিকে চোখ পড়তেই ওদের দুজনের যেন বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল। পা যেন কয়েক মণ ভারি হয়ে উঠেছে, তুলতেই পারছে না। আজ তাদের কপাল মন্দ, না হলে এ সময়ে চৈনসিং কখনো আসে? নির্ঘাৎ মজুরী কাটা যাবে, চড়-চাপ্পড় তো পড়বেই। এসব ভাবতে ভাবতে ঢিমে তালে আসছে। ওদের রকম সকম দেখে চৈন সিং ডাক দিল—এই, এগিয়ে আয়, এগিয়ে আয়, দেখি, কুলগুলো কেমন? আমাকেও দুটো দে রে।

চৈনসিংয়ের কথা শুনে ওদের ভয় আরো দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আজ ঠাকুর কাউকে ছাড়বে না। যা মিষ্টি মিষ্টি করে বলছে, ওমনি করেই পিঠে পড়বে। মারের কথা ভেবে তারা শিউরে উঠলো।

চৈন সিং ফের বলে ওঠে—কিরে দেরী করছিস, কেন? নিয়ে আয়। পাকা পাকাগুলো কিন্তু আমি সব নেব। এই, একজন যা তো, বাড়ী থেকে একটু নুন নিয়ে আয় তো! (বাকী দুজন মজুরকে) তোরা দুজনেও আয়, ওগাছের কুল কিন্তু খুব মিষ্টি হয়রে। নে, নে, কুল খেয়ে নে, কাজও তো করতে হবে।

তার কথা শুনে দুজনের মনে যেন একটু সাহসের সঞ্চার হল। সবাই এসে সব কুল চৈনসিংয়ের সামনে রেখে পাকা পাকা দেখে বেছে বেছে তাকে দিল। একজন নুন আনতে ছুটলো। আধ ঘণ্টা ধরে সবাই কুল খাওয়ায় মশগুল রইলো। খাওয়া শেষ হলে ঠাকুর যাবার জন্যে উঠলো, তখন অপরাধী দুজন এসে হাত জোড় করে বলে—দাদা, আজ বড্ড ভুল হয়ে গেছে, খুব খিদে পেয়েছিল তাই গিরেছিলাম, নয়তো আর কোনো দিন ওদিকে যাইনি।

চৈন সিং বেশ শান্তভাবে বলে—তাতে কি হয়েছে রে? আমিও তাই কুল খেতে পেলুম। এক-আধ ঘণ্টা এদিক ওদিক হলে কিচ্ছু যায় আসে না বুঝলি? ইচ্ছে করলে তোর, কয়েক ঘণ্টার কাজ আধ ঘণ্টায় শেষ করে দিতে পারিস্। আর যদি ঠিক করিস যে করবো না, তাহলে ঘণ্টাখানেকের কাজ দিনভরেও শেষ হবে না।

চৈনসিং চলে গেলে, চারজনে কথা বলতে লাগলো।

একজন বলে—মালিক যদি এমনি ধারা থাকে, তবে না কাজ করতে মন লাগে, সব সময় মুখ-ঝুক করলে কারই বা ভাল লাগে।

দ্বিতীয়জন—আমি তো ভেবেছিলাম; আজ কাঁচাই খেয়ে নেবে!

তৃতীয় ব্যক্তি—বেশ কয়েক দিন ধরে লক্ষ্য করছি, মেজাজটা জেন আগের চেয়ে তনেক নরম হয়েছে।

চতুর্থ ব্যক্তি—বেশি বকো না, সন্ধ্যেবেলা পুরো মজুরী পেলে তবে বুঝবো।

প্রথমজন—তোর মতন গোবর-গণেশ আর দুটো নেই। মানুষের মুখ দেখলে মনের ভাব বোঝা যায়, তা জানিস!

দ্বিতীয়জন—এবার থেকে খুব মন দিয়ে কাজ করতে হবে।

তৃতীয়জন—তা নয়তো কি! উনি যখন আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, আমাদেরও তো ধম্ম বলে একটা কথা আছে।

চতুর্থজন—তোমরা ভাই যাই বলো না কেন, আমার কিন্তু এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না।

চার

একদিন একটা বিশেষ কাজে চৈনসিংকে কোর্টে যেতে হয়েছিল। বাড়ী থেকে মাইল পাঁচেক দূর। অন্য সময় নিজের ঘোড়ায় চেপেই যায়, কিন্তু সেদিনের কড়া রোদে ভাবলো, একাতেই যাবো। মহাবীরকে ডেকে পাঠানো হোল। ন'টা নাগাদ মহাবীর একা নিয়ে এসে হাক দেয়। চৈনসিংও তৈরী হয়েই বসে ছিল। মহাবীরের গলা পেয়ে চটপট একায় এসে বসলো। কিন্তু একার ঘোড়াটা এতো দুর্বল যেন ধুকছে, তার ওপর ভেতরের গদীর অবস্থা আরো করুণ, ভেতরে বসতে চৈনসিংয়ের লজ্জা করছে। তাই মহাবীরকে ডেকে বলে—কি গো মহাবীর, সব ছিঁড়ে ফেটে যে একাকার হয়ে গেছে গো? আগে তো তোমার ঘোড়া এতো দুর্বল ছিল না। আজকাল কি সওয়ারী কম হচ্ছে?

মহাবীর জবাব দেয়—না কত্তা, সওয়ারী ঠিকই আছে; লরি হয়ে যেতে আজকাল কেউ আর-একায় চাপতে চায় না। আগে আড়াই-তিন টাকার কমে কখনো মজুরী হয় নি, আজকাল বিশ আনা হওয়াই মুশকিল। এতে জানোয়ারকেই বা কি খাওয়াবো, আর নিজেরাই বা কি খাবো বলুন? ভাবছি, একা-ঘোড়া বেচে-বুচে দিয়ে আপনার ওখানেই মজুর খাটবো, কিন্তু গাহেক পাচ্ছি-নে। বেশী নয় ঘোড়ার খোরাকই তো বার-আনা, তার ওপর আবার ঘাস আছে। নিজের পেটই চলে না, তার ওপর ঘোড়া। ওর ছেড়া ফতুয়াটার দিকে চেয়ে চৈনসিং বলে ওঠে—দু-চার বিঘে জমি কিনে নিলেই তো পার?

মহাবীর মাথা চুলকে বলে—জমি-জমা ভাগ্যে থাকলে তবে তো? তাছাড়া পয়সা কোথায়? ভাবছি একাটা ছেড়ে দিয়ে ঘাস কেটে নিয়ে বাজারে বসবো। আজকাল তো আমার মা-বৌ দুজনেই ঘাস কাটে। তবে না আনা দশ-বার রোজ হাতে আসে।

চৈনসিং—বুড়ীও বাজারে যায়?

মহাবীর লজ্জিত হয়ে বলে—না কত্তা, অতটা দূরে আর মা যেতে পারে না, আমার বৌ-ই যায়। দুপুর পর্যন্ত ঘাস কেটে তিনপোর বেলায় বাজারে গিয়ে বসে। ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে সাতটা, আটটা বেজে যায়। ওর মুখের দিকে তাকানো যায় না, কিন্তু কি করবো, কপালের লেখা খণ্ডাবো কেমন করে? চৈনসিং কোর্টে এসে গেল, মহাবীর তাকে নামিয়ে দিয়ে যাত্রীর উদ্দেশ্যে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে শহরের দিকে চললো। বিকেল পাঁচটার সময় চৈনিসং তাকে আসতে বলে দিয়েছে।

চারটের কিছু আগেই কাজ শেষ করে চৈনিসং বাইরে বেরিয়ে এলো। কাছেই একটা পানের দোকান, আর একটু এগিয়ে গেলেই একটা বিশাল বটগাছ তার শাখা বিস্তার করে ঘন ছায়ায় চারদিক ঘিরে রেখেছে। সেই ছায়ায় কত এক্কা, টাঙ্গা, ফিটন যে দাঁড়িয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। ঘোড়াগুলোকেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। উকীল, মোক্তার আর অফিসার যাত্রীরা এখানেই এসে দাঁড়ান। চৈনসিং এক গ্লাস জল খেয়ে একটা পান মুখে দিয়ে ভাবতে থাকে, একটা লরি পাওয়া গেলে শহরটাও একটু ঘুরে আসা যেতো, হঠাৎ এক ঘাসওয়ালীর দিকে তার নজর পড়ে। মাথায় ঘাস বোঝাই ডালা নিয়ে সহিসদের সঙ্গে দরদাম করছে। চৈনসিংয়ের হৃদয় যেন কোন হারানো বস্তুর সন্ধান পেয়ে নেচে ওঠে—আরে ঐ তো মুলিয়া! সাজ-গোজ করে, গোলাপী শাড়ী পরে কোচোয়ানদের সঙ্গে ঘাস নিয়ে দরকষাকষি করছে। ওকে ঘিরে বেশ কিছু কোচোয়ান হাসি-ঠাট্টা করছে, আর ও নির্বিবাদে সেগুলো হজম করছে।

একটা কালো কুচকুচে বেঢপ চেহারার কোচোয়ান এগিয়ে এসে বলে—এই মুলা, আনা ছ'য়েকের বেশী যদি তোর এই ঘাস বেচে পাস, তবে আমার নামে কুকুর পুষিস, বুঝলি!

মুলিয়া বিলোল কটাক্ষ হেনে বলে—ছ'আনায় নিতে চাওতো সামনে অনেক ঘেস্বুরনী বসে আছে, চলে যাও, আরও কমেও পেয়ে যেতে পারো, আমার ঘাস বার আনাতেই বিকোবে।

একজন আধ-বুড়ো কোচোয়ান ফিটনের ওপর থেকে বলে—তোরই তো জমানা রে মুলি, বার আনা কেন, এক টাকা চাইলেও পাবি! খদ্দেররাতো তোকে শুদ্দুন নেবে বলে মুখিয়ে আছে। উকীল সাহেবরা এই বেরোলেন বলে, তখনই বুঝতে পারবি।

মাথায় গোলাপী পাগড়ী বাঁধা-এক টাঙ্গাওয়ালা হাসতে হাসতে বলে—বুড়োদেরই জিভ সপ্ সপ্ করছে, কাকে ছেড়ে কাকে ধরবি রে মুলিয়া।

এদের কথাবার্তা শুনে চৈনসিংয়ের মাথায় যে খুণ চড়ে গেল, ইচ্ছে করছে এক্ষুনি গিয়ে সব কটাকে জুতো-পেটা করে শায়েস্তা করে দেয়। তাদের অপলক দৃষ্টিতে অতৃপ্ত ক্ষিদের জ্বালা। তাছাড়া মুলিয়াকে দেখেও তো বেশ খুশী খুশীই মনে হচ্ছে! লজ্জা, ঘেন্না, ভয় কোনো কিছুরই চিহ্ন নেই! কেমন হেসে হেসে বাঁকা চোখে চেয়ে কথা বলছে। মাথার ঘোমটাটাও নেই দেখছি। এ-কি সেই মূলিয়া যে সেদিন বাঘিনীর মতো গর্জে উঠেছিল।

এরই মধ্যে চারটে বেজে গেল। আমলা আর উকীল-মোক্তারা কোর্টের ভেতর থেকে যেন মিছিল করে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আমলারা লরির পেছনে ছুটলেন, উকীল-মোক্তাররা যার যার এক্কা-টাঙ্গা-ফিটনের উদ্দেশ্যে সেই বটগাছের তলায় এসে হাজির হলেন। কোচোয়ানরা সবাই গাড়ীর সঙ্গে ঘোড়া জুত্‌তে উঠে-পড়ে লেগেছে। কয়েকজন ভদ্রলোক তো রসিক চোখে মুলিয়ার দিকে তাকাতে তাকাতে যে যার গাড়ীতে এসে বসলেন।

হঠাৎ মুলিয়া ঘাসের ডালা মাথায় তুলে একটা ফিটনের পেছনে ছুটলো। ফিটনের আরোহী এক ইংরেজ কেতা দুরন্ততরুণ উকীল। তিনি পা-দানির একপাশে ঘাসের বোঝা রেখে দিয়ে পকেট থেকে কিছু বের করে মুলিয়ার হাতে দিলেন। মুলিয়া মুচ্‌কি হাসলো, দুজনের মধ্যে কিছু কথাও হোল, অবশ্য চৈনসিংয়ের কানে তা এসে পৌছোলো না।

প্রসন্ন মুখে মুলিয়া বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। চৈন সিংয়ের যেন বাহ্যিক জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে, সে তখনো একই ভাবে সেই পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দোকানদার দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করবে বলে নীচে আসতে চৈনসিংয়ের হুঁস হোল। জিজ্ঞেস করলো—দোকান বন্ধ করবে বুঝি।

দোকানদার সহানুভূতি দেখিয়ে বলে—তোমার অসুখটা কিন্তু খুব ভাল নয় ঠাকুর সিং, অসুধ-বিষুধ খাও!

চৈনসিং চমকে উঠে বলে—অসুখ কি রকম?

দোকানদার—অসুখ নয়! আধ ঘণ্টার বেশী হোল মরা মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছ। কোর্টবাড়ীতে আর একটা কাকপক্ষীও নেই, দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে গেছে, মেথরটাও সাফ করে দিয়ে চলে গেলো, তবু তোমার সোধ-বোধ নেই? না-না ভাল কথা নয়, তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখাও।

চৈনসিং হাতের ছড়ি সামলে এগিয়ে যেতেই মহাবীরের এক্কা দেখা গেল।

পাঁচ

কিছুদূর এক্কাটা এগিয়ে আসতেই, চৈনসিং জিজ্ঞেস করে—আজ কত হোল গো মহাবীর?

মহাবীর হেসে জবাব দেয়—আজতো দিনভর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাটালাম কর্তা। কেউ বেগার খাটতেও ডাকলো না। মাঝের থেকে বিড়ির পেছনে চারটে পয়সা বেকার বেরিয়ে গেল।

চৈনসিং একটু থেমে বলে—আমার একটা কথা শুনবে ? রোজ একটা করে টাকা তুমি আমার কাছ থেকে নেবে। আর যখনি আমি ডেকে পাঠাবো, তোমার এক্কাটা নিয়ে চলে এসো, পারবে না! তাহলে তো আর তোমার বৌকে ঘাস নিয়ে বাজারে যেতে হবে না। কি মহাবীর রাজী তো ?

মহাবীর ছলছল চোখে চেয়ে বলে—কত্তা আপনারই তো পরজা গো, আপনারই খাই-পরি। যখন খুশি ডেকে পাঠালেই চলে আসবো। আপনার কাছ থেকে টাকা······

চৈনসিং তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে—না, তোমাকে বেগার খাটাবো না। রোজ একটা করে টাকা তুমি আমার কাছ থেকে নেবে। কিন্তু ঘাস নিয়ে তোমার বৌ যেন আর বাজারে না যায়। মনে রেখো, তোমার আব্রু আমারও আব্রু। টাকাপয়সা যখন যা লাগবে চেয়ে নিয়ো, কোনো সংকোচ করো না। তবে হ্যাঁ, ভুলেও মুলিয়ার কাছে এসব কথা বলো না। কি লাভ!

এর কয়েকদিন পরে সন্ধ্যেবেলা চৈনসিংয়ের সঙ্গে মুলিয়ার দেখা হোল। চৈনসিং প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে বাড়ী ফিরছিল, সে জায়গায়, যেখানে সে মুলিয়ার হাত ধরেছিল, ঠিক সেখান থেকে মুলিয়ার গলার স্বর শোনা গেল। সে থেমে গিয়ে পেছনে ঘুরে দেখতেই মুলিয়াকে ছুটে আসতে দেখলো। বললো—কি হয়েছে মুলিয়া দৌড়ে আসার কি আছে ? আমিতো দাঁড়িয়েই আছি ?

মুলিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—কয়েকদিন ধরেই তোমাকে একটা কথা বলবো বলে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আজ আসতে দেখেই, ছুটে আসছি। এখন আর আমি ঘাস নিয়ে বাজারে যাই না।

চৈন সিং—এতো খুব ভাল কথা!

"আচ্ছা, তুমি কি আমাকে কোনোদিন কোথাও ঘাস বেচতে দেখেছিলে ?"

"হ্যাঁ, একদিন দেখেছিলাম। কেন, মহাবীর তোমাকে সব বলে দিয়েছে ? আমি তো ওকে মানা করে দিয়েছিলাম।"

"ও আমাকে কোনো কথা লুকোয় না।"

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। কারোর মুখেই কোনো কথা নেই। হঠাৎ মুলিয়া একটু হেসে বলে—এখানে তুমি আমার হাত ধরেছিলে, মনেআছে ?

চৈনসিং লজ্জিত হয়ে বলে—এখনো ভুলতে পারোনি দেখছি। জানি-না, সেদিন আমার মাথায় কোন্ ভুত চেপেছিল!

মুলিয়া গদ গদ স্বরে বলে—কেন, ভুলবো কেন? সেদিনের জন্যে আজ আর আমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। আমরা গরীব, ওটুকু তো তোমাদের পাওনা। যাক্ষে, তুমি কিন্তু আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছো।

দুজনেই আবার চুপ হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর আবার মুলিয়াই প্রথম মুখ খোলে—তুমি ভেবেছিলে, আমি খুব হাসি-ঠাট্টা করছিলাম, তাই না? কিন্তু কেন, সেটা বুঝতে পেরেছিলে?

চৈনসিং বেশ জোর দিয়ে বলে—না মুলিয়া, বিশ্বাস করো, কোনো সময়ের জন্যও আমি তা ভাবিনি।

মুলিয়া হেসে বলে—আমি জানি যে যাই বলুক তুমি অন্তত ভুল বুঝবে না।

জল সিঞ্চিত ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে সুরভিত বায়ু বিশ্রাম নিতে ঘরে চলে যাচ্ছে, শ্রান্ত সূর্যদেব নিশার কোলে একটু একটু করে ঢলে পড়ছে, আর সেই ম্লান আলোকে চৈনসিং মুলিয়ার ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাওয়া রেখার দিকে নির্নিমেষ চোখে চেয়ে আছে!